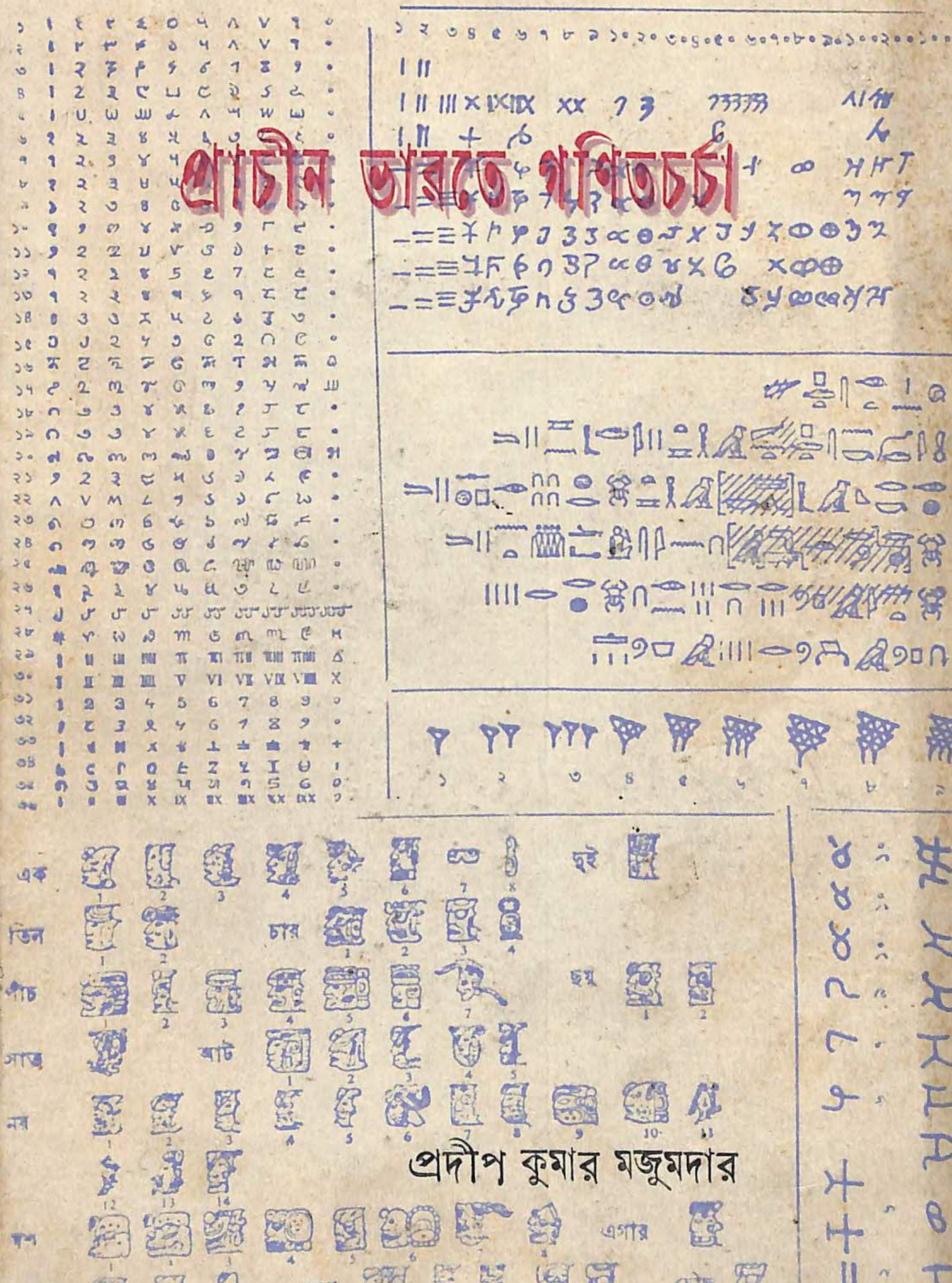
প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা



প্রদীপ কুমার মজুমদার

প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা

[সংখ্যা ও গণনা, পাটীগণিত ও বীজগণিত]

প্রদীপ কুমার মজুমদার

পরিবেশক :

গ্রন্থমেলা

এ/১২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা-৭

প্রকাশক :
শ্রীসনৎ কুমার সামন্ত
২৭, বেলুড় ষ্টেশন রোড, পোঃ বেলুড়মঠ, হাওড়া।

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৮৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ—**পঁচিশ টাকা মাত্র**
শোভন সংস্করণ—**তিরিশ টাকা মাত্র**

মুদ্রক :
মধু ঘোষ
প্রসাদ প্রিণ্টার্স
৪১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

—উৎসর্গ—

দাদামশাই স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (বিদ্যাভূষণ, কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ স্মৃতিশাস্ত্রী) *ও পিতৃবন্ধু কুমুদরঞ্জন বিশ্বাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—*

॥ প্রাক্-কথন ॥

'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা' প্রকাশিত হলো। ভারতীয় গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস রচনা যে অন্যতম দুরূহ কার্য-একথা অবশ্যই সত্য। কারণ প্রাচীন ভারতের জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন সম্পদ আমাদের দেশে উপেক্ষিত থাকলেও, বৈদেশিকরা পরমযত্নে তা গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই আজ ভারতীয় ঐতিহ্য জানতে গেলে, জানতে হবে পৃথিবীর নানা ভাষা। গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। জানি না কতটুকু সফল হয়েছি একাজে। তবে আন্তরিকতার অভাব ছিল না—একথা সবিনয়ে বলতে দ্বিধা নেই।

সমগ্র গ্রন্থটীকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি পর্যায়ই স্বয়ং সম্পূর্ণ। প্রথম পর্যায়ে আছে সংখ্যা ও গণনা; পাটীগণিত এবং বীজগণিত। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, সংহতি-তত্ত্ব (Set Theory) ব্যাস ও সমাসগণিত (Differential and Integral Calculas), মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব প্রভৃতি। গ্রন্থে 'বর্ণমালার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, এ সম্পর্কে বিতর্কের শেষ নেই। প্রথম বর্ণমালা কে কবে আবিষ্কার করেছিলেন সেটি এখনও ঐতিহাসিক বিতর্কিত বিষয় হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে। কতটুকু সফল হয়েছি, সে বিচারের ভার সুধী পাঠকবৃন্দের।

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে আর্যভট্ট নামটি দুভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়—(১) আর্যভট (২) আর্যভট্ট। বর্তমানে অধিকাংশ গণিত ঐতিহাসিক আর্যভট নামটি গ্রহণ করায়, আমিও গ্রন্থে 'আর্যভট' ব্যবহার করেছি। গ্রন্থে অনেকসময় একই লোকের নাম উচ্চারণের তারতম্য ঘটিয়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপিত করেছি। যেমন কোথাও খারেজমী, আবার কোথাও খোয়ারজমী। এর কারণ প্রচলিত পুস্তকগুলিতেও উচ্চারণের তারতম্য। আসলে এটি একই গণিতজ্ঞের নাম। একই ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অল-আল, রসেন-রোসেন। ৬·২ অনুচ্ছেদে যে প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদ্ এবং গণিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি তা সম্পূর্ণ নয়। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি। উৎসাহী পাঠক এ সম্পর্কে S. N. Sen লিখিত 'A Bibliography of Sanskrit works on Astronomy and Mathematics' গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

অক্ষরসংখ্যা প্রণালীর ক্ষেত্রে কয়েকটি গ্রীক বর্ণমালা পাওয়া সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে কয়েকটি ইংরাজী বর্ণমালা ব্যবহার করতে হয়েছে। এটি ত্রুটিযুক্ত মনে হলেও এছাড়া উপায় ছিল না। অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোকে 'হসন্ত' ব্যবহার করা হয়নি। কারণ এগুলি যে গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, সেখানে এগুলি রোমান হরফে লেখা ছিল এবং সেক্ষেত্রে হসন্ত দেবার কোনও সুযোগ ছিল না। কয়েকটি সাস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতিতে ত্রুটি আছে মনে হতে পারে। তবে এই শ্লোকগুলি যেখান থেকে উদ্ধৃত সেখানেই এই ত্রুটি ছিল। উদ্ধৃতির প্রামাণ্যতার জন্য এগুলি আর সংশোধন করিনি।

গ্রন্থরচনায় বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের সম্পূর্ণ সাহায্য নিতে হয়েছে এবং এ সম্পর্কে যথাস্থানে ঋণ স্বীকারও করেছি। তবে এ ব্যাপারে ঋণ স্বীকার করেই মুক্ত হতে চাইছি না। কারণ আমার ধারণা এই গ্রন্থের উৎকর্ষের সমস্ত কৃতিত্বই প্রাপ্য তথ্যসূত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিদের। আমি মৌমাছির মত শুধু মধুসংগ্রহ করেছি মাত্র। প্রকৃত সম্পদ তো তাঁদেরই। ইতি। মহালয়া / ১৩৮৬।

প্রদীপ কুমার মজুমদার

কমলাভিলা
৬০, তালপুকুর রোড়
পোঃ—নৈহাটী/২৪ পরগণা

সূচী

সংখ্যা ও গণনা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পাটীগণিত

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

বীজগণিত

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

১.১ কোথায় উৎপত্তি ?

গণিতশাস্ত্রের উৎপত্তি কোথায় এবং কবে থেকে এর শুরু, তা একটি ঐতিহাসিক বিতর্কিত বিষয়। তবে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ গণিতের আদিভূমি হিসাবে মিশরকে চিহ্নিত করেন। কেউ কেউ আবার ব্যাবিলনকে এই আসনে বসান। আবার অনেক পণ্ডিত গণিতশাস্ত্রের সূতিকাগৃহ হিসাবে ভারতবর্ষকে চিহ্নিত করেন। অবশ্য চীনের দাবীও এ সম্পর্কে থাকতে পারে সে কথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

গণিতচর্চা প্রথম দিকে ঠিক পদ্ধতিগতভাবে হোত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, পদ্ধতিগতভাবে গণিতচর্চা করতে গেলে লিপির প্রয়োজন। সভ্যতার উষালগ্নে লিপিমালার আবিষ্কার হয় নি। ফলে মুখে মুখে যতটুকু জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চা করা সম্ভব তাই করা হোত। এ অনুমানের যথার্থতা প্রমাণ করতে গেলে আমাদের শাস্ত্র অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয়দের লেখা বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ পড়া দরকার। যাই হোক সভ্যতার উষালগ্নের ইতিহাস খুঁজতে যাওয়া এক রীতিমত কঠিন ব্যাপার। কারণ সে সময়কার সভ্যতার নিদর্শন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে এদেশে সে দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঐতিহাসিকেরা এই সব প্রাচীন নিদর্শনগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত দিয়ে থাকেন। এবং দেখা যায় একই বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের মত বিভিন্ন রকমের। ফলে তাঁদের মধ্যে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব দোষ দেখা যায় এবং সেইহেতু প্রকৃত তথ্যের মূল্যায়ন অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না।

প্রাচীন কালের গণিতচর্চা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করে যাবেন তাঁদের মধ্যে টি. এরিক পিট, অটো নিউগেবাওয়ার, য়োশিও মিকামী, ডি. ই. স্মীথ, ফ্লোরিয়ান ক্যাজরী, জি. সার্টন, টি. এল. হীথ, কারা. ডি. ভো, শোপেন হাউয়ার, ভিনতারিজ, কার্ল ফিংক, মক্সিম বোচার, কারস্পিনস্কি, ডাম্পিয়র, জি. এ. মিলার, এইচ. হাঙ্কেল, ভোপেক, জি. থিবো, বি. জি. তিলক, এস. দ্বিবেদী, বাপুদেব শাস্ত্রী, বি. বি. দত্ত, পি. সি সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্র নাথ সেন, অমূল্য কুমার বাগ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

য়োশিও মিকামী তাঁর গ্রন্থে[১] চীনা গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন ২৯০০ খ্রীষ্টপূর্বে চীনারা কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে গণিতচর্চা করতেন। ২৭০০ খ্রীষ্টপূর্বে পীত সম্রাট হুয়ান তি'র আমলে কিছুটা পদ্ধতিগতভাবে গণিত চর্চা হয়েছে। দ্বাদশ খ্রীষ্টপূর্বে চীনা পণ্ডিত ওয়ান ওয়াঙ্গ 'আই কিং'[২] নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থে গণিতের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চৌ পেই[৩] নামক গ্রন্থে চৌ কাঙ্গ গণিতের কয়েকটি তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট করেন। গ্রন্থটি মূলতঃ বিজ্ঞানের হওয়ায় গণিত নিয়ে খুব বেশী আলোচনা করা হয়নি। চীনে পদ্ধতিগতভাবে গণিতচর্চা শুরু হয় ধরতে গেলে ১৫২ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে। চাঙ্গ ৎসাঙ্গ নামে একজন চীনা গণিতজ্ঞ 'কিউ চাঙ্গ সুয়ান সু' নামে একটি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ধরতে গেলে চীনাদের প্রথম পদ্ধতিগতভাবে লেখা বই এইটিই।

অটো নিউগেবাওয়ার 'দি এক্সাট সায়েন্সেস ইন এ্যান্টিকুইটি'[৪] গ্রন্থে মিশর এবং ব্যাবিলনের গণিতচর্চা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্যাবিলনে ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জ্যোতর্বিদ্যার চর্চা ছিল। ফলে অনুমান করা যেতে পারে যে ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে গণিতচর্চা করা হোত। আসুর, নিপ্পুর ও নিনেভে খননকার্যের ফলে যে সব মাটির চাকতি পাওয়া গিয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায়—ব্যাবিলনে ২০০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে গাণিতিক তৎপরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

মিশরীয় গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে টি. এরিক পিট 'রাইন্দ ম্যাথেমেটিক্যাল পেপিরাস'[৫] থেকে অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। এ থেকে জানা যায় ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরে হিকোসাস রাজত্বকালে ফারাও আ-আসার রে'র সময়ে আ-মোস নামে একজন লিপিকার এটি পূর্বের কোন গ্রন্থ বা পেপিরাস থেকে নকল করেছেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন তৃতীয় আমেন এম হেটের রাজত্বকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৪৯ থেকে ১৮০১ খ্রীষ্টপূর্বের মধ্যে লিখিত কোন গ্রন্থ থেকে সম্ভবত নকল করা হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ইউফ্রাতিস ও তাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং নীলনদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০' এর ওদিকে গণিতচর্চা শুরু হয় নি। যদিও বা শুরু

---

(১) Yoshio Mikami—The Development of Mathematics in China and Japan.
(২) James Legge—The sacred books of Chinese.
(৩) Alexander wylie—Chinese researches.
(৪) O. Neugebauer—The exact sciences in antiquity.
(৫) Thomas Eric Peet—The Rhind Mathematical Papyrus.

হয়ে থাকে তবে তার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য আমরা জানতে পারি নি। এবার দেখাবো সিন্ধু উপত্যকা এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় কি ভাবে এবং কতকাল পূর্বে গণিত চর্চা শুরু হয়েছিল।

১·২ ভারতবর্ষে কবে উৎপত্তি ?

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত বৈদিক সভ্যতাই ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হোত। বৈদিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মোটামুটি উন্নতি হয়েছিল তার নিদর্শন বেদের বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই। গণিতের বিশেষ করে সংখ্যা সম্বন্ধীয় কিছু কিছু গণনা বৈদিক সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই গণনা বা গণিত সম্বন্ধীয় যা কিছু উদ্ধৃতি বা উল্লেখ সব কিছুই প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ে। ফলে এ গুলিকে গণিত গ্রন্থ বলা যায় না। ব্রাহ্মণ, সংহিতা, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে গণনা বিজ্ঞানের আলোচনা কিছু কিছু রয়েছে। তবে সে গুলি অধিকাংশই প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে। জৈন আগম গ্রন্থাদিতে গণিতের বহু তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র, বৃহৎক্ষেত্র সমাস, স্থানাঙ্গ সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে দীঘ নিকায়, বিনয় পিটক, মিলিন্দি পানহো প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এগুলির অধিকাংশই জৈন বা বৌদ্ধ দর্শনের অন্তর্গত নানা তত্ত্বের আলোচনায় পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে গণিত নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে শুল্বসূত্রে। ধরতে গেলে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে প্রথম পদ্ধতিগতভাবে লিখিত গণিত গ্রন্থ হচ্ছে এই শুল্ব সূত্র গ্রন্থগুলি। তবে এই গ্রন্থগুলি অধিকাংশই জ্যামিতি বিষয়ক। পঞ্চমশতাব্দীর শেষ পাদে গণিতের জন্য পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয় এবং গণিত বলতে ঠিক যা বোঝায় তাই এই গ্রন্থগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল।

ভারতবর্ষে গাণিতিক চিন্তার সূচনা কি করে হোল তা বলা কঠিন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশের গণিতচর্চার পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল। এবং সেই বৈশিষ্ট্যের জোরেই তাঁরা তাঁদের গণিতচর্চার উন্নতি সাধন করেছিলেন। ব্যাবিলনবাসীরা জ্যোতির্বিদ্যাকে উন্নত করতে গিয়ে গণিতের ব্যাপক চর্চা করেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এধরণের কোন ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে না।

ভারতীয়দের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে যাগযজ্ঞ করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য বলে স্বীকৃত ছিল।[১] তাঁরা এই যাগযজ্ঞ করতে গিয়ে জ্যামিতি তথা গণিতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

---

(১) প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য—পণ্ডিত অমূল্য চরণ বিদ্যাবিনোদ। পৃঃ ১৯

তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলে ধীরে ধীরে গণিত চর্চার ভিত্তি রচিত হতে থাকে। গণিতের যে সব তত্ত্ব এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন হোত তার নির্ভুলতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ যজ্ঞবেদী যদি সঠিক না হয় তাহলে যজ্ঞকারী বা যজমানের অথবা উভয়েরই পাপ হবে স্মরণ রেখে যতদূর সম্ভব এগুলি নিখুঁতভাবে নির্মিত হোত। ফলে গণিতের যে সব তত্ত্বের প্রয়োগ এখানে করা হোত তা নির্ভুলই হোত। বহু পণ্ডিত মনে করেন যাগযজ্ঞ করতে গিয়ে যেটুকু গণিতচর্চার প্রয়োজন সেইটুকুই ভারতীয়রা করতেন, তার বেশী নয়। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত, কারণ ভারতীয়রা সর্বদাই গণিতকে পৃথক মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। উদাহরণস্বরূপ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ থেকে একটি শ্লোক তুলে ধরা হোল ঃ

"যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গ শাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্ধনি স্থিতম্ ॥"

অর্থাৎ ময়ূরের শিখার মত, সাপের মাথার মণির মতো বেদাঙ্গ শাস্ত্রগুলির শীর্ষদেশে গণিতের অবস্থিতি।[১]

তাছাড়া জ্যোতিষের যে মূল্য ছিল সে কথাও কোথাও কোথাও উল্লিখিত আছে। জ্যোতিষের উপর গুরুত্ব দেওয়ার অর্থই গণিতকে মর্যাদা দেওয়া। মুণ্ডকোপনিষদের কোন এক জায়গায় শৌনিক ঋষি অঙ্গিরা ঋষিকে বললেন—"হে ভগবন্ কোন বস্তু সুবিদিত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়।" প্রত্যুত্তরে অঙ্গিরা বললেন—"দুটি বিদ্যা জানিবার আছে। একটি পরা অপরটি অপরবিদ্যা।" প্রসঙ্গ-ক্রমে বলা প্রয়োজন অপরাবিদ্যার অন্তর্গত হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যা। এই প্রসঙ্গে অঙ্গিরা বলেছেন—"তত্রাপরা ঋগ্বেদো, যজুর্বেদঃ সামবেদঽথর্বেদঃ শিক্ষা, কল্পো ব্যাকরণং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।"[২]

অর্থাৎ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সবই অপরাবিদ্যা।

জৈনধর্মের প্রাবল্যের সময় জৈনরা গণিতকে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন। তাঁদের শাস্ত্র মোটামুটি চারটি ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে গণিতানুযোগে একটি বিশেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে সংখ্যা সম্বন্ধীয় আলোচনাই বেশী করা হয়েছে। বৌদ্ধরাও গণিতকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থ বিনয় পিটক, মজহিম নিকায়, কুল্লুনিদ্দেশ প্রভৃতিতে গণনা, সাংখ্যায়ণ, মুদ্রা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন।

---

(১) প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তা—রমাতোষ সরকার, পৃঃ ৬১

(২) উপনিষদ গ্রন্থাবলী (মুণ্ডকোপনিষদ)—স্বামী গম্ভীরানন্দ।

যাইহোক আমরা লক্ষ্য করলাম বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে গণিতের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রত্নতত্ত্বীয় আবিষ্কারের পূর্বে আমাদের গণিতচর্চার আর কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য হস্তগত হয় নাই। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রত্নতত্ত্বীয় আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছে—তখনকার দিনে ভারতীয়রা পড়তে পারতেন, লিখতে পারতেন এবং গণিত চর্চাও করতেন।[১] তার কারণ এখানে বিভিন্ন মাপের বাটখারা এবং বিভিন্ন দৈর্ঘের দাগকাটা পাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই বাটখারাগুলি ঘনকাকৃতি এবং নিখুঁতভাবে তৈরী। পরিমাপের জন্য এ ব্যবস্থা দেখে মনে হয় গণিতজ্ঞান তখনকার দিনে সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় খননকার্যের ফলে যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে সেগুলি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পরীক্ষা করে মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে—৩৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি ভারতবর্ষে গণিতজ্ঞানের সূচনা যত আগে থেকেই শুরু হোক না কেন ৩৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এ জ্ঞানের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ফলে ভারতীয় গণিত অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে কিনা সন্দেহ থাকলেও মিশর ব্যাবিলন বা চীনের থেকে পিছিয়ে ছিল না।

১.৩ ভারতীয় শাস্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তার প্রাচীনত্ব

ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে গণিতের উল্লেখ রয়েছে পূর্বেই বলেছি। সুতরাং ভারতীয় শাস্ত্রাদির কিছুটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।[২] ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এটি আবার চার ভাগে বিভক্ত। যথা (১) ঋগ্বেদ সংহিতা, (২) সামবেদ সংহিতা, (৩) যজুর্বেদ সংহিতা, (৪) অথর্ববেদ সংহিতা।

সংহিতা রচিত হবার কিছু পরে যাগযজ্ঞ করার জন্য গদ্যে রচিত এক প্রকার বিশাল সাহিত্যের উদ্ভব হয়। সাধারণতঃ এগুলিকে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য বলা হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, গোপথ ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণ রচিত হবার পরে এক জাতীয় বিশাল সাহিত্য অরণ্যে রচিত হয়েছিল যার বিবিধ ও বিচিত্র বিষয়বস্তুর মধ্যে বিশ্ব রহস্য অনুসন্ধানের প্রয়াস সূচিত হয়েছিল। এগুলি আরণ্যক নামেই সবিশেষ পরিচিত। ধরতে গেলে আরণ্যক হচ্ছে ব্রাহ্মণের উপসংহার ভাগ। আরণ্যকগুলির মধ্যে ঐতরেয় আরণ্যক, কৌষিতকি আরণ্যক, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, বৃহদারণ্যক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

---

(১) মহেঞ্জোদড়োর লিপি ও সভ্যতা—শ্রীরাজমোহন নাথ।

(২) প্রদীপ কুমার মজুমদার—ভারতীয় জ্যামিতি শাস্ত্রে মহর্ষি বৌধায়ন, বিশ্ববাণী, ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ১৬৪

আরণ্যকের পর উপনিষদ। বেদের সর্বশেষ ভাগ বা অন্তে রচিত বলে এগুলিকে বেদান্ত নামেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। উপনিষদের সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিদ্যারণ্যস্বামীর মতে উপনিষদ বারোখানি। সেগুলি হচ্ছে—ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, মুণ্ডক, প্রশ্ন, কৌষিতকী, মৈত্রায়ণীয়, কঠবল্লী, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক, তলবকার, নৃসিংহোত্তর—তাপনীয়। আবার অনেকে বত্রিশখানি উপনিষদের কথা বলেছেন। সেগুলি হচ্ছে—ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, কৌষিতকী, কঠ, ব্রহ্ম, শ্বেতাশ্বতর, গর্ভ, নারায়ণ, ব্রহ্মা বা অমৃতবিন্দু, অমৃতনাদ, কালাগ্নিরুদ্র, ক্ষুরিকা, ঈশ, বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবাল, মন্ত্রিকা, কেন, ছান্দোগ্য, আরুণি, মৈত্রায়ণী, মৈত্রেয়ী, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য অথর্বশিখা, বৃহজ্জাবাল ও নৃসিংহতাপনী।

ভারতীয়রা বিশ্বাস করতেন—বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ ভগবান কর্তৃক প্রেরিত এবং অন্যান্য সাহিত্য ঋষি প্রণীত। এই ঋষি প্রণীত সাহিত্যের মধ্যে সূত্র সাহিত্য প্রধান।[১] সূত্র সাহিত্য মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত যথা (১) শ্রৌত-সূত্র, (২) গৃহ্যসূত্র, (৩) ধর্মসূত্র। এই তিন ভাগের আবার বহু শাখা উপশাখা আছে। যেমন শ্রৌতসূত্রের মধ্যে আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন, মশক, লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ন, বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব হিরণ্যকেশীন্, কাত্যায়ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ধর্মসূত্রের মধ্যে বাশিষ্ঠ, গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি শাখার নাম উল্লেখযোগ্য। গৃহ্যসূত্রের নানা শাখার মধ্যে সাঙ্খ্যায়ন, আশ্বলায়ন, পারস্কর, গোভিল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অনেকে শ্রৌত সূত্র, ধর্মসূত্র এবং গৃহ্যসূত্রকে একসঙ্গে কল্পসূত্র নামেও অভিহিত করেন। সূত্র সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার এবং উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে বেশ সুষ্ঠভাবে দর্শন্ চিন্তার উন্মেষ হয়। দর্শনগুলির মধ্যে প্রধাণতঃ ছয়টি দর্শনই উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হচ্ছে (১) কপিল প্রণীত সাঙ্খ্যদর্শন, (২) কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শন, (৩) গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শন, (৪) পতঞ্জলি প্রণীত পাতঞ্জল দর্শন (৫) জৈমিনি প্রণীত পূর্বমীমাংসা, (৬) ব্যাস প্রণীত বেদান্ত দর্শন। এছাড়া চার্বাক প্রণীত চার্বাক দর্শন ও আরও কয়েকটি দর্শন আছে।

ভারতীয় সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ এক ধরণের সাহিত্য পরবর্তী কালে গড়ে উঠেছিল। এগুলি স্মৃতি নামেই অধিক পরিচিত। কেউ কেউ অবশ্য এই স্মৃতি সাহিত্যকে ধর্ম সংহিতা নামেও উল্লেখ করেছিল। স্মৃতি বা ধর্মসংহিতা মোটামুটি কুড়িটি ভাগে বিভক্ত। এগুলি হচ্ছে—(১) মনুসংহিতা, (২) অত্রি সংহিতা, (৩) বিষ্ণু সংহিতা, (৪) হারীত সংহিতা, (৫) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, (৬) উশনঃ

(১) পৃথিবীর ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—দুর্গাদাস লাহিড়ী।

সংহিতা, (৭) অঙ্গিরঃ সংহিতা, (৮) যম সংহিতা, (৯) আপস্তম্ব সংহিতা, (১০) সংবর্ত্ত সংহিতা, (১১) কাত্যায়ন সংহিতা, (১২) বৃহস্পতি সংহিতা (১৩) পরাশর সংহিতা, (১৪) ব্যাস সংহিতা, (১৫) শঙ্খ সংহিতা, (১৬) লিখিত সংহিতা, (১৭) দক্ষ সংহিতা, (১৮) গৌতম সংহিতা, (১৯) শাতাতপ সংহিতা (২০). বশিষ্ঠ সংহিতা।

আবার অনেকে কশ্যপ সংহিতা, গর্গ সংহিতা, ও প্রচেতা সংহিতা প্রভৃতির নামও স্মৃতি বা ধর্মসংহিতার সঙ্গে যুক্ত করেন।

স্মৃতি বা ধর্মসংহিতা রচিত হবার পরই পুরাণ নামে এক ধরণের ইতিহাসাশ্রিত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। পুরাণ প্রধানতঃ দুই প্রকার-যথা (১) মহাপুরাণ ও (২) উপপুরাণ। মহাপুরাণ মোটামুটি আঠারোটি ভাগে বিভক্ত। এগুলি হচ্ছে যথা ব্রহ্মপুরাণ, (২) পদ্মপুরাণ (৩) বিষ্ণুপুরাণ, (৪) শিবপুরাণ, (৫) লিঙ্গ পুরাণ, (৬) গরুড় পুরাণ, (৭) নারদীয় পুরাণ, (৮) মৎসপুরাণ, (৯) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, (১০) মার্কণ্ডেয় পুরাণ, (১১) শ্রীমদ্ভাগবত, (১২) অগ্নি পুরাণ, (১৩) স্কন্দপুরাণ, (১৪) ভবিষ্য পুরাণ, (১৫) বামন পুরাণ, (১৬) বরাহ পুরাণ, (১৭) কূর্ম্ম পুরাণ, (১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

উপপুরাণ আবার আঠারোখানি। এগুলি হচ্ছে—(১) সনৎকুমারোক্ত আদ্য, (২) নারসিংহ, (৩) কুমারোক্ত স্কন্দ, (৪) নান্দীশভাষিত শিবধর্ম, (৫) দুর্ব্বাসা, (৬) নারদীয়, (৭) কাপিল, (৮) বামন, (৯) উশনা, (১০) ব্রহ্মাণ্ড, (১১) বারুণ, (১২) কালিকা, (১৩) মাহেশ্বর, (১৪) শাম্ব, (১৫) সৌর, (১৬) পরাশর, (১৭) মারীচ, (১৮) ভার্গব। এছাড়াও অনেকে বায়বীয়, নান্দিকেশ্বর, পাদ্ম, দেবী ও ভাস্কর নামে আরও পাঁচটি উপপুরাণের নাম উল্লেখ করে থাকেন।

যাই হোক বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র ছাড়াও তন্ত্র নামে এক ধরণের সাহিত্য বহু পরে রচিত হয়েছে। তবে সেগুলি সাহিত্য কিনা বা কোন ধরণের সাহিত্য তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণ মহাভারতের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে এবং এ দুটির মধ্যে গণিতশাস্ত্রের অন্তর্গত বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে।

বেদাদি শাস্ত্রের পরিচয় দেবার পরই এদের প্রাচীনত্ব নিয়ে বিতর্ক ওঠে। ইতিহাসবেত্তাগণ বৈদিক সাহিত্যের কাল নির্ণয় করতে গিয়ে রীতিমত বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বিশেষ করে বালগঙ্গাধর তিলক[১,২] মনে করেন—খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০—৮০০০ বর্ষ হিমপ্রলয় হেতু মেরু প্রদেশে মানুষের বাসের অনুপযোগী হ'য়ে ওঠে।

(১) ভারতীয় শাস্ত্রাদির বিবরণ অধিকাংশই দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম খণ্ড থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০—৩০০০ বর্ষ প্রাচীন পঞ্জিকা সংস্কৃত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০—৫০০০ বর্ষ আর্যগণ পূর্বের আবাসস্থান ত্যাগ করে নূতন বাসস্থানের সন্ধান করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০—১৪০০ বর্ষ তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ রচিত হয়। শেষ সময়ে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচিত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০—৫০০ বর্ষ সূত্র সাহিত্য ও ষড়দর্শন রচিত হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক কাল নির্ণয় করতে গিয়ে কিছুটা সময় খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি টেনে এনেছেন। তাঁরা বলেছেন[৩] :

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০—১৪০০ পর্যন্ত বৈদিক কাল। এই কালের প্রবীণ ঘটনা হচ্ছে :

(ক) আর্যগণের সিন্ধু উপত্যকায় বসতি স্থাপন
(খ) ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা
} ২০০০—১৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব

এরপর তাঁরা বলেছেন খ্রীঃ পূঃ ১৪০০—১০০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত কাব্য মহাকাব্যের কাল। এ কালের প্রধান ঘটনা হচ্ছে :

(গ) আর্যগণের গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসতি স্থাপন : ১৪০০—১০০০ খ্রীঃ পূঃ
(ঘ) রাশিচক্র নির্ণয়, জ্যোতিষতত্ত্ব আলোচনা, বেদ সংগ্রহ : ১৪০০—১২০০ খ্রীঃ পূঃ
(ঙ) ব্রাহ্মণ, আরণ্যক গ্রন্থাদি প্রণয়ন : ১৩০০—১১০০ খ্রীঃ পূঃ
(চ) উপনিষদ প্রণয়ন : ১১০০—১০০০ খ্রীঃ পূঃ

উপনিষদ প্রভৃতি প্রণীত হবার পর ১০০০—৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত জ্ঞানোন্নতির কাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ কালের প্রধান ঘটনা হচ্ছে—

(ছ) আর্যগণের সমগ্র ভারত অধিকার : ১০০০—৩২০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ
(জ) যাস্ক : খ্রীষ্ট পূর্ব নবম শতাব্দী
(ঝ) পাণিনি : খ্রীষ্ট পূর্ব অষ্টম শতাব্দী
(ঞ) সূত্র সাহিত্যের অভ্যুদয় কাল : ৮০০—৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ
(ট) শুল্ব সূত্র (জ্যামিতি প্রভৃতি) : খ্রীষ্ট পূর্ব অষ্টম শতাব্দী
(ঠ) সাঙ্খ্যদর্শন : খ্রীষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দী
(ড) অন্যান্য দর্শনের অভ্যুদয় কাল : খ্রীষ্ট পূর্ব ৬০০—১০০ খ্রীষ্টাব্দ

অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রগুলির প্রাচীনত্বের আলোচনা না করে পূর্বোক্ত কয়েকটি গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নিয়ে অন্যান্য পণ্ডিতগণ কি মত ব্যক্ত করেছেন সে সম্পর্কে কিছু

(১) শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়—আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ—পৃঃ ৩৫
(২) **The arctic home in the vedas—B. G. Tilak,**
(৩) পৃথিবীর ইতিহাস-দুর্গাদাস লাহিড়ী পঞ্চম খণ্ড—পৃঃ ১০

আলোচনা করছি। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রাচীনত্ব নিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। মাক্সমূলার মনে করেন বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বে রচিত। বেবর মনে করেন ৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বে এটি রচিত। ডঃ মার্টিন হোগ মনে করেন ১২০০—৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনাকাল।

অনেক পণ্ডিত ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতি ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বের মনে করেন। এবং এই হিসাবে তাঁরা বলেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২৫০০—২০০০ খ্রীষ্টপূর্বের মধ্যে রচিত। শতপথ ব্রাহ্মণ ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বে রচিত। তৈত্তিরীয় সংহিতা ১৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বে রচিত। বিখ্যাত পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ কেইথ তাঁর "Introduction to Taittiriya Samhita" গ্রন্থে যা বলেছেন তা থেকে সহজেই আমরা বলতে পারি [১]—

(১) তৈত্তিরীয় সংহিতার রচনাকাল ঃ	৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ
(২) বৌধায়ন সূত্রের রচনা কাল ঃ	৫০০ "
(৩) মানব সূত্রের রচনা কাল ঃ	৪৫০ "
(৪) আপস্তম্ব সূত্রের রচনা কাল ঃ	৪০০ "
(৫) আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রের রচনা কাল ঃ	৪০০ "
(৬) সাঙ্খ্যায়ন শ্রৌত সূত্রের রচনা কাল ঃ	৪৩০ "
(৭) ভরদ্বাজ সূত্রের রচনা কাল ঃ	৪২০ অথবা ৪৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ
(৮) হিরণ্যকেশী সূত্রের রচনা কাল ঃ	৩৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
(৯) কাত্যায়ন শুল্ব সূত্রের রচনা কাল ঃ	২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

১.৪ গণনা ও সংখ্যা

গণনার জন্য সংখ্যার প্রয়োজন। এবং সেইজন্যই প্রত্যেক দেশে সংখ্যার উদ্ভব হয়েছে। কোন দেশ প্রথম সংখ্যা আবিষ্কার করেছে এবং তা পদ্ধতিগতভাবে কাজে লাগিয়েছে তা বলা কঠিন। তবে ভারতবর্ষে এর প্রচলন বহু পূর্ব থেকেই ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভারতবর্ষে সংখ্যাদি গণনা করা হোত দশ ভিত্তিক। যদিও বিভিন্ন দেশে যেমন ব্যাবিলনে[২] ষাট ভিত্তিক গণনাই প্রচলিত ছিল। বৈদিক-যুগে ভারতবর্ষের লোকেরা অতি বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা গুণতে পারতেন। দেখা গিয়েছে একের পিঠে আঠারটি শূন্য দিলে যে সংখ্যা হয় তার নামকরণ ও ব্যাপক ব্যবহার বৈদিক সাহিত্যে রয়েছে। বৈদিকযুগে বহু মুনি ঋষি এই সমস্ত সংখ্যার সংকলক এবং এঁদের মধ্যে মেধাতিথি, গৌতম, গৃৎসমদ প্রমুখ ঋষির নাম উল্লেখযোগ্য।

(১) আপস্তম্ব শুল্ব সূত্রম—ডঃ সত্যপ্রকাশ ও রামস্বরূপ শর্মা—পৃঃ ৫

(২) **The Exact Sciences in Antiquity—O. Neugebauer. P-32**

অনেকক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে একই নামে বহু ঋষির পরিচয় বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যে রয়েছে। যেমন ধরা যাক মেধাতিথির নাম। ইনি ঋগ্বেদের ৩১৩টি ঋকের সঙ্গে যুক্ত, তাছাড়া অথর্ববেদে ১৭টি ঋকের সঙ্গে এবং যজুর্বেদের বহু জায়গায় এঁর নাম পাওয়া যায়।

এক থেকে দশ এবং দশের গুণিতক প্রভৃতি সংখ্যার উল্লেখ ঋগ্বেদের বিভিন্ন ঋকে দেখতে পাওয়া যায়। যদিও যজুর্বেদে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ও উন্নত পর্যায়ে উল্লেখ রয়েছে। যাই হোক প্রথমে ঋগ্বেদের কয়েকটি ঋকের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করছি।

'শপ্তী চিদ্যা মহুচ্যুতা মিথুনা বহতো রথম্' । ৮।৩৩।১৮
অর্থাৎ সোমাভিমুখে গমনকারী অশ্বমিথুন (অশ্বদ্বয়) ইন্দ্রের রথ বহন করে।
'অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ সাদয়া যোনিষু ত্রিষু। পরিভূষ পিব ঋতুনা' । ১।১৫।৪
অর্থাৎ হে অগ্নি, দেবগণকে এ স্থানে আনয়ন কর, তিনটি যজ্ঞস্থানে তাহাদিগকে অবস্থান করাও। তাহাদিগকে অলংকৃত কর। তুমি ঋতুর সহিত সোমপান কর।
যত্বা তুরীয়মৃতুভির্দ্রবিণোদো যজামহে। অধ স্মা নো দদির্ভব' । ১।১৫।১০
অর্থাৎ হে দ্রবিনোদো, যেহেতু ঋতুদিগের সহিত তোমাকে চতুর্থবার অর্চনা করিতেছি। অতএব নিঃসন্দেহরূপে আমাদিগকে ধন প্রদান কর।
'ইহি ত্রিস্রঃ পরাবত ইহি পঞ্চ জনাঁ অতি। ধেনা ইন্দ্রাবচাকশৎ'। ৮।২২।৩২
অর্থাৎ হে ইন্দ্র, তুমি স্তুতি অবগত হইয়াছ, তুমি দূরদেশ হইতে তিনপথে আগমন কর, তুমি পঞ্চজনকে অতিক্রম করিয়া আগমন কর।
'উতো স মহ্যমিন্দুভিঃ ষড়্যুক্তাঁ অনুসেষিধৎ গোভির্যবং ন চর্কৃষত্। ১।২৩।১৫
অর্থাৎ এই সেই পুষা আমার জন্য সোমের সহিত ছয় ঋতু ক্রমান্বয়ে বারবার আনিয়াছিলেন। কৃষক যেমন গরু দ্বারা পুনঃ পুনঃ যব চাষ করে।
সাত, আট, নয় সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১।২২।১৬, ১।১৬৪।৪১, ঋকগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। আমি এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরছি।
'অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ'। অর্থাৎ বিষ্ণু সপ্তকিরণের সহিত যে ভূ প্রদেশ হইতে পরিক্রমন করিয়াছিলেন সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।
'অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমেন'। অর্থাৎ কখনও অষ্টপদী, কখনও নবপদী হন এবং সহস্রাক্ষরা পরিমিত অন্তরীক্ষের উপর থাকিয়া শব্দ করেন।

ঋগ্বেদে শত, সহস্র, অযুত, প্রভৃতির উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের নবম ঋকটি তুলে ধরছি—

'যে তে সন্তি দশগ্বিনঃ শতিনো যে সহস্রিণঃ

অশ্বাসো যে তে বৃষণো রঘুদ্ধক্রবন্তেভির্নস্তূয়মা গহি'। ৮।১।৯

অর্থাৎ হে ইন্দ্র, তোমার দশ যোজনগামী শত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক অশ্ব আছে, তাহারা সেচনে সমর্থ ও শীঘ্রগামী, সেই অশ্বের সাহায্যে শীঘ্র আগমন কর।

'মহে চন ত্বামদ্রিবঃ পরা শুল্কায় দেয়াম্

ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতামঘ,। ৮।১।৫

অর্থাৎ হে বজ্রবান ইন্দ্র! তোমাকে মহামূল্যেও বিক্রয় করিনা। হে বজ্রহস্ত। সহস্র সংখ্যক ও অযুত সংখ্যক ধনের জন্যেও করিনা এবং হে বহুধন! অপরিমিত ধনের জন্যেও করি না।

'শিক্ষা বিভিন্দো অস্মৈ চত্বার্যযুতা দদৎ। অষ্টা পরঃ সহস্র'। ৮।২।৪১

অর্থাৎ হে বিভিন্দূ, তুমি দাতা, তুমি আমাকে চারি অযুত ধন দান করিয়াছ। পরে আট সহস্র সংখ্যক দান করিয়াছ।

অথর্ববেদেও সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সংখ্যাগুলি সমান্তর শ্রেণীতে সাজান রয়েছে। পরবর্তী কোন একটি অধ্যায়ে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করবো। সংখ্যা সম্বন্ধে সবচেয়ে সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে যজুর্বেদে। এখানে ১ থেকে পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যা গণনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যতদূর মনে হয় মিশর, ব্যাবিলন বা চীন দেশে কেউই এত বড় সংখ্যার কল্পনা করতে পারতেন না। যাই হোক যজুর্বেদের এই শ্লোকটি উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরছি।

'ইমা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বেকা চ দশ চ দশ

শতং চ শতং চ সহস্রং চ সহস্রং চাযুতং চাযুতং

চ নিযুতং চ নিযুতং চ প্রযুতং চার্বুদং চ ন্যর্বুদং চ সমুদ্রশ্চ মধ্যং চান্তশ্চ

পরার্ধশ্চৈতা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বমুত্রামুষ্মিল্লোকে। ১৭।২

অর্থাৎ হে অগ্নি এই ইষ্টকগুলি আমার একটি গাভী, দশটি দশ একটি শত, দশটি শত একটি সহস্র, দশটি সহস্র, একটি অযুত, দশটি অযুত একটি নিযুত, দশটি নিযুত একটি প্রযুত, দশটি প্রযুত একটি অর্বুদ, দশটি অর্বুদ একটি ন্যর্বুদ, দশটি ন্যর্বুদ একটি সমুদ্র, দশটি সমুদ্র একটি মধ্য, দশটি মধ্য একটি অন্ত, দশটি অন্ত একটি পরার্ধ রূপে বর্তমান।

এছাড়াও কাঠক সংহিতা, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি সাহিত্যে সংখ্যার উল্লেখ দেখতে পাই। রামায়ণে বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যখন রাবণ তার চরকে রামের সৈন্য সংখ্যা জেনে আসতে বলেছিলেন তখন চর রামের সৈন্য সংখ্যা জেনে এসে নিম্নলিখিত বিবরণ দেয়ঃ

শতং শতসহস্রাণাং কোটিমাহুর্মনীষিণঃ।

শতং কোটি সহস্রাণাং শঙ্খ ইত্যভিধীয়তে॥

শতং শঙ্খ সহস্রাণাং মহাশঙ্খ ইতিস্মৃতম্।
মহাশঙ্খ সহস্রাণাং শতং বৃন্দ ইতিস্মৃতম্ ॥
শতং বৃন্দ সহস্রাণাং মহাবৃন্দ ইতিস্মৃতম্।
মহাবৃন্দ সহস্রাণাং শতং পদ্মমিবোচ্যতে ॥
শতং পদ্মসহস্রাণাং মহাপদ্মমিতিস্মৃতম্।
মহাপদ্ম সহস্রাণাং শতং খর্বমিবোচ্চতে ॥
শতং খর্ব সহস্রাণাং মহাখর্বমিতিস্মৃতম্।
মহাখর্ব সহস্রাণাং সমুদ্রমভিধীয়তে ॥
শতমোঘ সহস্রাণাং মহৌঘ ইতি বিশ্রুতঃ।

অর্থাৎ এথেকে রামের সৈন্য সংখ্যা পাওয়া যায়ঃ ১০০০০ কোটি+১০০ শঙ্খ+১০০০ মহাশঙ্খ+১০০ বৃন্দ +১০০০ মহাবৃন্দ+১০০ পদ্ম +১০০০ মহাপদ্ম+১০০ খর্ব+১০০ সমুদ্র +১০০ মহৌঘ+১ কোটি মহৌঘ+বিভীষণ ও অন্যান্য ৪ মন্ত্রী।
অর্থাৎ $১০^{১০}+১০^{১৪}+১০^{২০}+১০^{২৪}+১০^{৩০}+১০^{৩৪}+১০^{৪০}+১০^{৪৪}+১০^{৫২}+১০^{৫৭}+১০^{৬২}+৫$; রাবনের সৈন্য সংখ্যা ছিল $১০^{১২}+৩৬.১০^{১৪}+১০^{৫}$ (এটি অবশ্য বালীর স্ত্রী তারার মতানুযায়ী) বলা বাহুল্য রাম বা রাবনের সৈন্য সম্পর্কে যে সংখ্যা আমরা পাই তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থে বহু বড় বড় সংখ্যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ললিতবিস্তারে $১০^{৫৩}$ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। তবে এখানে ১০০ ভিত্তিক গণনা করা হয়েছে। কাচ্চায়ণের পালি ব্যকরণে $১০^{১৪০}$ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে— দশকে দশ দিয়ে গুণ করলে শত, শতকে দশ দিয়ে গুণ করলে সহস্র (সহস্র), সহস্রকে দশ দিয়ে গুণ করলে দশ সহস্র, দশ সহস্রকে দশ দিয়ে গুণ করলে শত সহস্র। শত সহস্রকে দশ দিয়ে গুণ করলে দশ শত সহস্র, দশ শত সহস্রকে দশ দিয়ে গুণ করলে কোটি, শত শত সহস্র কোটির অর্থ প্রাকোটি $=১০^{১৪}$,.. শত শত সহস্র প্রাকোটি হয় কোটিপ্প কোটি, শত শত সহস্র কোটিপ্প কোটি হয় নহুট, শত শত সহস্র নহুট হয় নিন্নহুট, শত শত সহস্র নিন্নহুট হয় অক্খোহিনি, এইভাবে বিন্দু, অব্বুদ, নির্বুদ, অহহ, অবব, অতত, সোগান্ধিক, উপ্পল, কুমুদ, পুণ্ডরীক, পদুম, কথান, মহাকথান, অসঙ্খ্যেয় প্রভৃতি সংখ্যা গণনার কথা বলা হয়েছে। এখানে অসঙ্খ্যেয় $=১০^{১৪০}$।

আনুমানিক একশত খ্রীষ্টপূর্বে রচিত জৈনধর্ম গ্রন্থ অনুযোগদ্বার সূত্রে অনেক বড় বড় সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে যার বিস্তৃতি ২৪ থেকে ২৭টি অংকস্থানের মধ্যে। স্থানাঙ্গ সূত্র (11, 4, 95), জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি (18 সূত্র), সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, অনুযোগদ্বারসূত্র, জীব-

সমাস (V, 113-115) প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায় যে এই সমস্ত গ্রন্থে ১৯৪টি অংকস্থানের কথা বলা হয়েছে। অভয়দেব স্থূরী সমবায় স্থত্রের উপর ভাষ্য দিতে গিয়ে একজায়গায় বলেছেন—

পুব্বতুডিয়াডডাবব হুহুয় তহ উপ্পলে য পউমে য।
নলিণচ্ছিউব অউএ নউএ পউএ য নায়ব্বো॥
চূলিয় সীসপহেলিয় চৌদ্দস নামা উ অংগসংজুত্তা।
অট্টাবিসং টানা ছউণউয়ং হোই ঠান সময়ং॥

অর্থাৎ এখানে সংখ্যাগুলি বলা হয়েছে—

পূর্বাঙ্গ, পূর্ব, ত্রুটিতাঙ্গ, ত্রুটিত, অড়ড়াঙ্গ, অড়ড়, অববাঙ্গ, অবব, হুহুকাঙ্গ, হুহুক, উৎপলাঙ্গ, উৎপল, পদ্মাঙ্গ, পদ্ম, নলিনাঙ্গ, নলিন অর্থনিপুরাঙ্গ, অর্থনিপুর, অযুতাঙ্গ, অযুত, নযুতাঙ্গ, নযুত, প্রযুতাঙ্গ, প্রযুত, চূলিকাঙ্গ, চূলিক, শীর্ষপ্রহেলিকাঙ্গ, এবং শীর্ষপ্রহেলিকা।

এখানে "পূর্ব" বলতে ৭৫৬০০০,০০০,০০০,০০ বৎসর ধরা হয়। জৈন গ্রন্থে নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

পূর্ব, লতাঙ্গ, লতা, মহালতাঙ্গ, মহালতা, নলিনাঙ্গ, নলিন, মহানলিনাঙ্গ, মহা-নলিন, পদ্মাঙ্গ, পদ্ম, মহাপদ্মাঙ্গ, মহাপদ্ম, কমলাঙ্গ, কমল, মহাকমলাঙ্গ, মহাকমল, কুমুদাঙ্গ, কুমুদ, মহাকুমুদাঙ্গ, মহাকুমুদ, ত্রুটিতাঙ্গ, ত্রুটিত, মহাত্রুটিতাঙ্গ, মহাত্রুটিত অড়ড়াঙ্গ, অড়ড়, মহাড়ড়ঙ্গ, মহাড়ড়, উহাঙ্গ, উহা, মহাউহাঙ্গ, মহোহ, শীর্ষ প্রহেলিকাঙ্গ, শীর্ষ প্রহেলিকা। এখানে প্রত্যেকটি সংখ্যা তার পূর্ববর্তী সংখ্যার ৮৪ লক্ষ গুণ। সেইহেতু শীর্ষ প্রহেলিকা = (৮৪০০০,০০)^{৩০} বৎসর। অবশ্য অনেক বলে থাকেন শীর্ষ প্রহেলিকা = (৮৪০০০,০০)^{২৮} বৎসর। যাইহোক এই শীর্ষ প্রহেলিকাকে সংখ্যায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায় ১৮৭, ৯৫৫, ১৭৯, ৫৫০, ১১২, ৫৯৫, ৪১৯, ০০৯, ৬৯৯, ৮১৩, ৪৩০, ৭৭০, ৭৯৭, ৪৬৫, ৪৯৪, ২৬১, ৯৭৭, ৪৭৬, ৫৭২, ৫৭৩, ৪৬৭, ১৮৬, ৮১৬ × ১০^{১৩০} বৎসর। [১]

জৈন চিন্তাধারায় সংখ্যার ধারণা মান শব্দ থেকে উদ্ভূত। এই মানের একটি বিভাগ হচ্ছে 'গণিতমান'।

আমরা জানি গণনার শুরু হচ্ছে এক থেকে। কিন্তু জৈনরা ১'কে সংখ্যা হিসাবে দেখে না। এ সম্পর্কে ত্রিলোকসারের ১৬-তম গাথাতে বলা হয়েছে 'একাদীয়া গণনা বীযাদীয়া হবংতি সংখেজ্জা।' এর অর্থ সুস্পষ্ট। জৈনরা গণিতমানকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হচ্ছে

(১) গণিত তিলক (শ্রীপতিকৃত) এই. আর. কাপাদিয়া সম্পাদিত, পৃঃ **XVII—XIX**

(১) সংখ্যাত (Countable or numerable)
(২) অসংখ্যাত (Countless or inunmerable)
(৩) অনন্ত (Infinity)

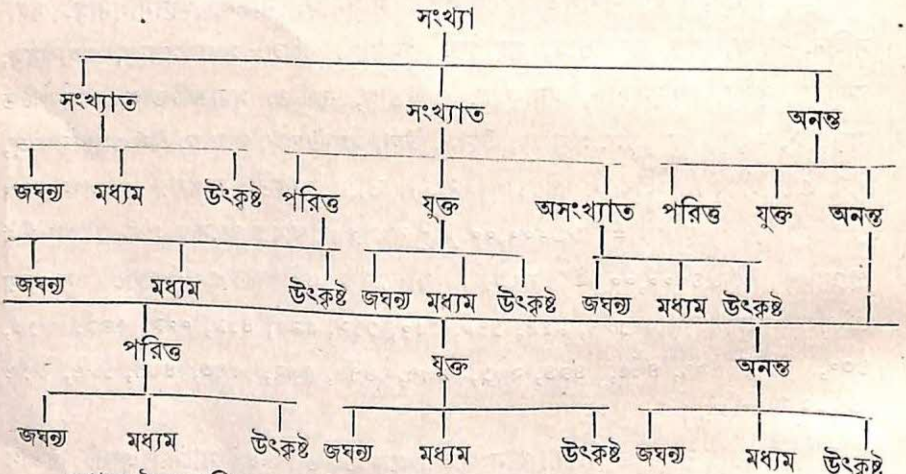
'সংখ্যাত' আবার তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে—

(ক) জঘন্য সংখ্যাত (Minimum Countable)
(খ) মধ্যম সংখ্যাত (Medium Countable)
(গ) উৎকৃষ্ট সংখ্যাত (Maximum Countable)

অসংখ্যাত আবার তিন ভাগে বিভক্ত যথা—

(ক) পরিত্ত অসংখ্যাত (Priliminary Countless)
(খ) যুক্ত অসংখ্যাত (Advanced Countless)
(গ) সংখ্যাতাসংখ্যাত (Infinite Countless)

এগুলির প্রত্যেকটি আবার জঘন্য, মধ্যম এবং উৎকৃষ্ট এই তিনভাগে বিভক্ত। 'অনন্ত' ও তিনভাগে বিভক্ত এবং এগুলি হচ্ছে পরিত্ত, যুক্ত, অনন্ত। এদের আবার প্রত্যেকটি জঘন্য, মধ্যম এবং উৎকৃষ্ট এই তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নীচে এ সম্পর্কে একটি সারণী চিত্র তুলে ধরছি—



এখানে জৈন গণিতগ্রন্থ থেকে কয়েকটি সংখ্যা এখানে তুলে ধরা হোল।

'বিধুণিধিণগণবরবিণভণিধিণয়ণবলদ্ধিণিবিখরাহখি।
ইগিতীসসুণ্ণসহিয়া জংবুএ লদ্ধসিদ্ধথা।' (ত্রিলোকসার ২১ গাথা)

অর্থাৎ ১৯৭,৯১২,০৯২,৯৯৯,৬৮,০০০০০,০০০০০,০০০০০,০০০০০,০০০০০,০০০০০,০
তুবীস চোয়াল স্থন্নট্‌ঠ = ২২৪৪০০০০,০০০০, (বৃহৎক্ষেত্র সমাস ১।৬৯)
ইগবন্না চউবীসং অট্‌ঠ সুন্ন = ৫১২৪০০০০,০০০০ (বৃহৎক্ষেত্র সমাস ১।৭০
বত্তীসং দো সুন্না চউরো সুন্নট্‌ ঠ = ৩২০০৪০০০০,০০০০ (বৃহৎক্ষেত্র সমাস ১।৭১)

অংকস্থান সম্পর্কে পরবর্তীকালে যখন আরও ব্যাপক জ্ঞান হল তখন থেকেই একক অনুযায়ী সংখ্যাগুলিকে সাজান হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমরা প্রথম আর্যভট রচিত আর্যভটীয়, শ্রীধরাচার্যের ত্রিশতিকা, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের লীলাবতী ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি :

প্রথম আর্যভট বলেছেন—(আর্যভটীয় ii, 2)

একং চ দশ চ শতং চ সহস্রং-ত্বযুতনিযুতে তথা প্রযুতম্
কোট্যর্বুদং চ বৃন্দংস্থানাত্ স্থানং দশগুণং স্যাত্ ।

অর্থাৎ এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত কোটি, অর্বুদ, বৃন্দ প্রভৃতি একক পূর্ববর্তী এককের দশগুণ।

শ্রীধরাচার্য ত্রিশতিকায় বলেছেন—

একং দশ শতমস্মাং সহস্রমযুতং ততঃ পরং দক্ষম্ ।
প্রযুতং কোটিমথার্বুদমব্জং থর্বং নিখর্বংচ ।
তস্মামহাসরোজং শঙ্কুং সহিতাং পতিং তত স্বন্ত্যম্ ।
মধ্যং পরার্ধমাহুর্যয়োত্তরং দশগুণা সংজ্ঞা ।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে এখানে সংখ্যাগুলি হচ্ছে—এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, প্রযুত, কোটি, অর্বুদ, অব্জ, থর্ব, নিখর্ব, মহাসরোজ, শঙ্কু, সরিতাপতি, অন্ত, মধ্য, পরার্ধ।

মহাবীর প্রথম অধ্যায়ের ৬৩—৬৮ শ্লোকগুলিতে বলেছেন—

একং তু প্রথম স্থানং দ্বিতীয়ং দশসংজ্ঞিকম্ ।
তৃতীয় শতমিত্যাহুঃ চতুর্থং তু সহস্রকম্ ॥
পঞ্চমং দশসাহস্রং ষষ্ঠং স্যাল্লক্ষমেব চ ।
সপ্তমং দশলক্ষং তু অষ্টমং কোটিরুচ্যতে ॥
নবমং দশকোট্যস্তু দশমং শতকোটয়ঃ ।
অর্বুদং রুদ্রসংযুক্তং ন্যর্বদং দ্বাদশং ভবেত্ ॥
থর্বং ত্রয়োদশস্থানং মহাথর্বং চতুর্দশম্ ।
পদ্মং পঞ্চদশং চৈব মহাপদ্ম তু যোড়শম্ ॥
ক্ষোণী সপ্তদশং চৈব মহাক্ষোণী দশাষ্টকম্ ।
শঙ্খং নবদশং স্থানং মহাশঙ্খং তু বিংশকম্ ॥
ক্ষিত্যৈকবিংশতি স্থানং মহাক্ষিত্যা দ্বিবিংশকম্ ।
ত্রিবিংশকমথ ক্ষোভং মহাক্ষোভং চতুর্নয়ম্ ॥

এ থেকে আমরা যে সমস্ত সংখ্যার সাক্ষাত পাই তা হচ্ছে—

এক, দশ, শত, সহস্র, দশ সহস্র, লক্ষ, দশ লক্ষ, কোটি, দশকোটি, শত কোটি, অর্বুদ, ন্যর্বুদ, খর্ব, মহাখর্ব, পদ্ম, মহাপদ্ম, ক্ষণী, মহাক্ষণী, শঙ্খ, মহাশঙ্খ, ক্ষিতি, মহাক্ষিতি, ক্ষোভ, মহাক্ষোভ।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য লীলাবতীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০-১১ শ্লোকে বলেছেন—"একদশশতসহস্রাযুতলক্ষপ্রযুতকোটয়ঃ ক্রমশঃ। অর্বুদমব্জং খর্বঃ নিখর্বঃ নিখর্বমহাপদ্ম-শঙ্কবস্তস্মাত। জলধিশ্চান্তং মধ্যং পরার্দ্ধমিতি দশগুণ সংজ্ঞা।" এর অর্থ সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ও শ্রীধরাচার্যের বিবৃত অংকস্থানের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীধরাচার্য যে সংখ্যাদ্বয়কে মহাসরোজ ও সরিপতি বলেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য সেই সংখ্যাদুটিকে মহাপদ্ম এবং জলধি বলেছেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন অংকস্থানের নামকরণ নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার দেখা যাক ভাষায় কি করে সংখ্যাগুলি ভারতীয়রা প্রকাশ করতেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এক, দ্বি, ত্রি, চতুঃ, পঞ্চ, ষট্, সপ্ত, অষ্ট, নব সংখ্যাগুলির সাহায্যে বেশ কিছু সংখ্যাকে কখনও বিয়োগাত্মক রীতিতে আবার কখনও গুণাত্মক পদ্ধতির প্রকাশ করা হোত। উদাহরণস্বরূপ তৈত্তিরীয় সংহিতায় উল্লিখিত ১৯ সংখ্যার কথা আমরা বলতে পারি। এখানে ১৯'কে একন বিংশতি বলা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯ = ২০ − ১ (বিয়োগাত্মক পদ্ধতি)
ঋগ্বেদে ৩৩৩৯কে বলা হয়েছে ত্রিনি শতানি ত্রিসহস্রানি ত্রিংশচ নব। গণিতসার সংগ্রহে বলা হয়েছে ১৩৯ = চত্বারিংশ একোন ষটধিক = ৪০ + ১০০ − ১ ; আর্যভট আর্যভটীয়াত ১৮'কে দ্বিনব বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ ১৮ = ২ × ৯এখানে গুণাত্মক পদ্ধতি অনুযায়ী সংখ্যাটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। গণিতসারসংগ্রহের প্রথম অধ্যায়ে ২৮৪৮৩ সংখ্যাটিকে বলা হয়েছে ত্র্যশীতিমিশ্রানি চতুংশতানি চতুশশতানি চতুস্সহস্রঘ্নগান্বিতানি অর্থাৎ ২৮৪৮৩ = ৮৩ + ৪০০ + (৪০০ × ৭)। গণিতসার সংগ্রহে ১২৩৪৫৬৫৪৩২১ সংখ্যাটিকে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ভাবে নামকরণ করা হয়েছে। এটিকে বলা হয়েছে একদিষড়-স্তানি ক্রমেন হীনানী। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সংখ্যার নামকরণ করতে গিয়ে সংখ্যার উত্থান ও পতন ঘটিয়ে বলা হয়েছে।

১'৫ সংখ্যার ব্যুৎপত্তি

এতক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যার নামকরণ এবং এ সম্পর্কে কোন্ গ্রন্থে কি বলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হোল। এবারে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে সংখ্যার ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে কি আলোচনা করা হয়েছে তার উপর কিছুটা আলোকপাত করা হচ্ছে। বিখ্যাত

লেখক যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে এক দুই ইত্যাদি সংখ্যার ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"এক ইতা সংখ্যা, দ্বৌ দ্রুততরা সংখ্যা, ত্রয়স্ত্রীর্ণতমা সংখ্যা, চত্বারশ্চলিততমা সংখ্যা।" অর্থাৎ এক অনুগতা সংখ্যা, দ্বি দ্রুততরা সংখ্যা, তিন উত্তীর্ণতমা সংখ্যা, চার অতিশয় চলনসম্পন্না সংখ্যা। উণাদিখণ্ডে বলা হয়েছে—'এক' শব্দ গত্যর্থক 'ই' ধাতুর উত্তর 'কন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন এবং 'এক' সংখ্যাত্ব প্রাপ্ত অথবা, সমস্ত সংখ্যায় অনুগত—একের বৃদ্ধিতেই দ্বি প্রভৃতি সংখ্যার উদ্ভব, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় বলতে গেলে এরকম হয়—'ইতা অনুগতা উত্তরাং সংখ্যাম্, একত্বপ্রচয়মাত্রং হি দ্বিত্বাদি সংখ্যা।' 'দ্বি' শব্দ গত্যর্থক দ্রু ধাতু হতে নিষ্পন্ন। 'দ্বি' সম্পর্কে বলা হয় "দ্বৌ দ্রুততরা সংখ্যা একস্যা সকাশাৎ" অর্থাৎ 'দুই' একের অপেক্ষায় অধিকতর বেগে গমন করে—সর্বদাই যেন একেই অগ্রগামী। তরণার্থক "তৃ" ধাতুর উত্তর 'ড্রি' প্রত্যয়ে 'ত্রি' শব্দের নিষ্পত্তি। সংস্কৃতে বলা হয়—'ত্রয়স্ত্রীর্ণতমা দ্বাবেকং চাপেক্ষ্য' অর্থাৎ তিন উত্তীর্ণতম অর্থাৎ এক-কে ও দুইকে অতিক্রম করে বর্তমান।

'চতুর্' শব্দ 'চল্' ধাতু ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। সংস্কৃতে বলা হয়েছে—'চত্বারশ্চলিততমাঃ পূর্ব্বাপেক্ষয়া' অর্থাৎ চারি নিরতিশয় চলনসম্পন্ন—এক, দুই, তিন সকলকেই অতিক্রম করে। ঠিক অনুরূপভাবে অন্যান্য সংখ্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ, ছয়, সাত সম্পর্কে এই একই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে। দেখা যাক "অষ্ট" (আট) সম্পর্কে কি বলা হয়েছে। "অষ্টাবশ্নোতেঃ অর্থাৎ অষ্টন্ পদ অশ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। ব্যাপ্তর্থক 'অশ্' ধাতুর উত্তর" কনিন্' প্রত্যয়ে অষ্টন্ শব্দ নিষ্পন্ন। সংস্কৃতে বলা হয়েছে 'তে হি সপ্তসংখ্যাং ব্যাপ্যবর্ত্তন্তো ; ব্যাপ্নোতি হি সা পূর্ব্বাঃ সংখ্যাঃ' অর্থাৎ অষ্ট সংখ্যা ব্যাপক—পূর্ববর্তী সাত সংখ্যাকে ব্যাপ্ত করে আছে।

নয় সংখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে—'নব ন বননীয়া নাবাপ্তা বা' অর্থাৎ নব সংখ্যা সেবনীয়া নহে অথবা দশ সংখ্যাকে প্রাপ্ত নহে। 'নবন্' শব্দ ন+সংভজনার্থক 'বন্' ধাতু হতে অথবা ন+প্রাপ্তার্থক 'অব্' ধাতু হতে বা ন+অব+প্রাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু হতেও নবন্ শব্দের নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। নয় সংখ্যা যে দশ সংখ্যার নীচে সে কথা সংস্কৃত ভাষায় বলা হয়েছে। যথা : নাবাপ্তা বা দশ সংখ্যাং ন প্রাপ্তেত্যর্থঃ অর্থাৎ নব সংখ্যা দশ সংখ্যাকে প্রাপ্ত নহে অর্থাৎ দশ সংখ্যার নিম্নে। দশ সম্পর্কে বলা হয়েছে—'দশ দস্তা দৃষ্টার্থা বা' অর্থাৎ দশ সংখ্যা উপক্ষীণা ; অথবা একাদশাদি সংখ্যায় দশন্ শব্দের অর্থ পরিদৃষ্ট হয়।

উপক্ষয়ার্থক 'দস্' ধাতু হতে দশন্ শব্দের নিষ্পত্তি। এছাড়া বলা হয়েছে

দশান্তেব হি সংখ্যা ভবতি (দ্রঃ); একাদ্যুপচয়েন দশ সংখ্যায়া এবাবৃত্তেরেকাদশাদি সংখ্যোপজনঃ (স্ক স্বাঃ) অর্থাৎ দশ সংখ্যা উপক্ষীণা—বাস্তবিক দশ সংখ্যাতেই শেষ, দশ সংখ্যার সহিত সংখ্যান্তরের যোগে একাদশাদি সংখ্যার উৎপত্তি। তাছাড়াও বলা হয়েছে "দৃষ্টার্থৈব হি দশানামুপরি পুনঃ পুনর্দৃশ্যতে সংখ্যা, তদাযথা একাদশেত্যেবমাদি (দ্রঃ) অর্থাৎ দর্শনার্থক 'দৃশ্' ধাতু হতেও দশন্ শব্দের উৎপত্তি করা যেতে পারে। একাদশাদি সংখ্যায় দশ শব্দের অর্থ দৃষ্ট হয়।

কুড়ি এবং শত সংখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে—বিংশতির্দ্বির্দশতঃ শতং দশদশতঃ অর্থাৎ "বিংশতি সংখ্যা দশ সংখ্যার দ্বিগুন; শত সংখ্যা দশ সংখ্যার দশগুণ"

দশন্+শতিচ=বিংশতি (দ্বৌ দশতৌ পরিমানস্য সংঘস্য বিংশতিঃ)

দশন্+ত=শত (দশ দশতঃ পরিমানস্য সংঘস্য শতম্, পাণিনি।)

হাজার সংখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে—'সহস্রং সহস্বৎ' অর্থাৎ সহস্র সংখ্যা সহস্বৎ। বলবাচক 'সহস্' শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে 'র' প্রত্যয় করে সহস্র শব্দের নিষ্পত্তি।

"অযুতং নিযুতং প্রযুতং তত্তদভ্যস্তম্।" অর্থাৎ অযুত সংখ্যা, নিযুত সংখ্যা, প্রযুত সংখ্যা সহস্রাদি দশবার করে আবৃত্তি করতে হয়।[১]

যাই হোক সংখ্যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে আলোচনা করা গেল। এবারে বিভিন্ন দেশে এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যাকে কি ভাবে উচ্চারণ করতো তার একটি ক্ষুদ্র সারণী তুলে ধরছি।

সারণী

ইংরাজী	সংস্কৃত	গ্রীক	ল্যাটিন	গথিক	এঙ্গলো সাক্সন	জার্মান	ফরাসী
One	এক	Oine	Unus	Ains	An	Ein	Un, une
Two	দ্বা, দ্বি	Dyo	Due	Twai, Twos	Twa	Zwie	Deux
Three	ত্রি	Trei	Tres	Threis	Thri	Drei	Trois
Four	চতুর	Tettares, Tesares	Quatuor	Fidwor	Feower	Vier	Quatre
Five	পঞ্চ	Pente	Quinque	Fimf	Fif	Funf	Cinq
Six	ষষ, ষট	Hex	Sex	Saihs	Six, Seox	Sechs	Six
Seven	সপ্ত	Hepta	Septem	Sibun	Seofan	Sieben	Sept
Eight	অষ্ট	Octo	Okto	Ahtau	Eahta	Acht	Huit
Ten	দশ	Deko	Decem	Taihun	Tien	Zen	Dix
Twenty	বিংশতি	Eikosi	Viginti	Twaitigjus	Twentig	Zwanzig	Vingt
Hundred	শতম্	Hekaton	Centum	Hund	Hund	Hundert	Cent

(Founders of Sciences in ancient India—Satya Prakash, পৃঃ 375 থেকে গৃহীত)

(১) সংখ্যার ব্যুৎপত্তি অংশটি লিখতে গিয়ে অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত যাস্কের "নিরুক্তম্" গ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য নিয়েছি।

১.৬ বর্ণমালার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বর্ণমালার আবিষ্কার একটি ঐতিহাসিক সম্পদ বলে পরিগণিত। মানুষ নিজের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের চিহ্ন বা চিত্র অংকন করতো যেগুলি আমরা সাধারণত, লিপি বা বর্ণমালা বলে স্বীকৃতি দিই। এই বর্ণমালার প্রথম স্তর মৌক্তিক অক্ষর বা বস্তু চিত্র (Hieroglyphics)। এটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত যথা : (১) ভাবচিত্র (Ideographs), (২) শব্দ চিত্র (Phonetics)। ভাবচিত্র আবার দুভাগে বিভক্ত : (ক) সরল ভাবচিত্র (Simple Ideographs), (খ) বহু ভাবচিত্র (Determinative Ideographs)। তবে অনেক পণ্ডিত মৌক্তিক অক্ষরকে প্রধানও পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। তারপর আবার এগুলিকে আরও নানা প্রকার উপভাগে ভাগ করেছেন। প্রধান পাঁচটি ভাগ হচ্ছে (১) মিশর দেশীয় বর্ণমালা, (২) কিউনিফর্ম বা কিলাকার বর্ণমালা, (৩) চীন দেশীয় বর্ণমালা, (৪) মেক্সিকো দেশীয় বর্ণমালা, (৫) হেটাইট বর্ণমালাসমূহ।

মিশর দেশীয় বর্ণমালা পাঁচটি উপভাগে বিভক্ত। এগুলি হচ্ছে : (ক) স্তম্ভ বা স্মৃতি ফলকে অংকিত মৌক্তিক অক্ষর, (খ) কার্সিভ হাইরেটিক, (গ) সেমেটিক বর্ণমালা, (ঘ) কার্সিভ ডেমটিক, (ঙ) কপ্টিক।

কিউনিফর্ম বর্ণমালা নয়টি উপভাগে বিভক্ত। সেগুলি হ'চ্ছে : (ক) ব্যাবিলন দেশীয় রেখাময় মৌক্তিক অক্ষর, (খ) ব্যাবিলন দেশীয় কিলাকার অপ্রচলিত বর্ণমালা, (গ) ব্যাবিলন দেশীয় পুরোহিতদের বর্ণমালা, (ঘ) সুসীয় দেশের শব্দাংশাত্মক বর্ণমালা, (ঙ) আসিরীয় দেশের কিলাকার বর্ণমালা, (চ) আর্মেনীয় দেশের কিলাকার বর্ণমালা, (ছ) তৃতীয় একামেনীয় বর্ণমালা, (জ) দ্বিতীয় একামেনীয় বর্ণমালা, (ঝ) প্রথম একামেনীয় বর্ণমালা।

চীন দেশীয় বর্ণমালাও পাঁচটি উপভাগে বিভক্ত। সেগুলি হচ্ছে ; (ক) কু-ওয়েন মৌক্তিক ভাবচিত্র, (খ) চতুষ্কোণ কিয়াসিস্থ বর্ণমালা, (গ) জাপানদেশীয় কাটাকানা শব্দাংশাত্মক বর্ণমালা, (ঘ' জাপানদেশীয় হেরাকানা শব্দাংশাত্মক বর্ণমালা, (ঙ) চলিত কিলাকার সাউ-স্থ বর্ণমালা।

মেক্সিকো দেশীয় বর্ণমালা দুটি উপভাগে বিভক্ত।

(ক) অ্যাজটেক জাতির মৌক্তিক ভাবচিত্র, (খ) জুকাতান দেশী ময়ার বর্ণমালা। হিটাইট বর্ণমালা চারটি উপভাগে বিভক্ত। এগুলি হ'চ্ছে : (ক) কার্কেমিস্ মৌক্তিক চিত্র, (খ) এশিয়া মাইনরের এক শব্দাংশাত্মক বর্ণমালা, (গ) লিসীয় বর্ণমালা, (ঘ) সাইপ্রিয়ট শব্দাংশাত্মক বর্ণমালা। এতগুলি উপভাগ ছাড়াও উত্তর আমেরিকার

বর্ণমালা, পিকটস বর্ণমালা, ল্যাপল্যাণ্ডজাতির বর্ণমালা, এস্কিমোজাতির বর্ণমালা ইত্যাদি আরও অনেক প্রকার বর্ণমালা আছে। যাই হোক বর্ণমালার বিভাগ সম্পর্কে আর গভীর আলোচনায় না গিয়ে কোথায় প্রথম বর্ণমালা সৃষ্টি হয় তা আলোচনা করা যাক।

বর্ণমালার উৎপত্তি প্রথম কোথায় এবং তা কতকাল পূর্বে হয়েছে সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। কেউ বলেন বর্ণমালা ফিনিসীয় জাতির আবিষ্কার। আবার কেউ বলেন মিশর দেশ বর্ণমালা প্রথম আবিষ্কার করেছে। মিশর দেশ বর্ণমালার আবিষ্কর্তা এ কথা গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, ঐতিহাসিক প্লুটার্ক ও টাসিটার্স বলেছেন। অনেক ইতিহাসবেত্তা মনে করেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০০তে আব্রাহাম মিশর থেকে ইস্রায়েলে যান। মিশরীয় বর্ণমালা সেই সময় থেকে ইস্রায়েলে চলতে থাকে। আবার অনেকে মনে করেন যে ২০৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সেমেটিক জাতি মিশর জয় করার ফলে বহু জ্ঞানী গুণীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন, এবং ফলে মিশরীয় বর্ণমালা তখন থেকে নানা দেশে চালু হয়। ফিনিসীয়রা এই বর্ণমালা কিছুটা উন্নতি করে তাঁদের মধ্যে চালু করেন। আবার বহু পণ্ডিত ক্রীট দ্বীপকে, আবার কেউ ব্যাবিলনদেশকে বর্ণমালার আদিভূমি বলে মনে করেন। বহু পণ্ডিত ভারতবর্ষকে বর্ণমালার আদি ক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেন। তবে এ মতের সমর্থক খুব বেশী নয়।

ভারতীয় বর্ণমালা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নানা মত। জেমস প্রিন্সেপ, অটফ্রায়েড মুলার, এম সেনার্ট ও এম জোসেফ হালেভি প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ মনে করেন যে ভারতীয় বর্ণমালা গ্রীক বর্ণমালার আদর্শে রচিত। স্যার উইলিয়ম জোন্স, লেপসিয়স, বেন্‌ফি, পট, ওয়েষ্টারগার্ড, বুলার, মাক্সমূলার, ফ্রেডারিক মুলার, সেস, হুইটনি এবং লেনারমট প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন ভারতীয় বর্ণমালা সেমেটিক বর্ণমালার সন্ততি। ডক্টর ডিকি. মনে করেন দক্ষিণ সেমেটিক বর্ণমালা থেকে ভারতীয় বর্ণমালা উদ্ভূত। ডক্টর বার্ণেল মনে করেন ভারতীয় বর্ণমালা আরামেন বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। ডক্টর টেলার মনে করেন ফিনিসীয় বর্ণমালা থেকে সরাসরি ভারতীয় বর্ণমালা উদ্ভূত হয় নি। ফিনিসীয় বর্ণমালার একটি বিভাগ সেবীয় বর্ণমালা হতে ইহা উদ্ভূত। যাই হোক আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতীয় বর্ণমালা কোথা থেকে উদ্ভূত পণ্ডিতেরা সে সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত উপনীত হ'তে পারেন নি। তবে যে যাই সিদ্ধান্তে পৌছান না কেন, ভারতীয় বর্ণমালা যে প্রাচীন সে সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। আমাদের শাস্ত্র বিশেষ করে বেদ, পুরাণ

প্রভৃতিতে এ সম্পর্কে ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ আছে। যেমন ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের ৪র্থ ঋকে বলা হয়েছে—

উতত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচমুত ত্ব শৃন্ন্ ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বঃ বি সহস্র জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

অর্থাৎ "কেহ কেহ কথা দেখিয়াও ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারে না, কেহ শুনিয়াও শুনেনা। যেমন প্রেম পরিপূর্ণা সুন্দর পরিচ্ছদ-ধারিণী ভার্যা আপন স্বামীর নিকট দেহ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ বাগ্দেবী কোনও কোনও ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন।"

সুতরাং এই শ্লোক থেকে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঋগ্বেদের সময় লিখিত ভাষার অস্তিত্ব ছিল।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণের কোন একটি উক্তিতে বোঝা যায়—ঐ সময় ভাষা এবং বর্ণমালা ছিল।[১]

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩১৮—৩২০ শ্লোকগুলিতে তৎকালীন যে বর্ণমালা অর্থাৎ লেখার প্রচলন ছিল তা বোঝা যায়। এখানে বলা হয়েছে—

দত্ত্বাভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখঞ্চ কারয়েৎ।
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ॥ ৩১৮

পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্।
অভিলেখ্যাত্মনোবংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ॥ ৩১৯

প্রতিগ্রহপরীমাণং দানাচ্ছেদোপবর্ণনম্।
স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্॥ ৩২০

অর্থাৎ রাজা ভূমিদান বা নিবন্ধ করিলে ভাবী সাধু রাজার পরিজ্ঞানার্থ লেখা করাইবেন। রাজা কার্পাসাদি পটে বা তাম্রফলকে নিজ বংশ, পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের, আপনার ও প্রতিগৃহিতীর নাম, প্রতিগ্রহের পরিমাণ, এবং গ্রাম ক্ষেত্রাদি প্রদত্ত ভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ, এই সকল বিষয় লিখিবেন, উক্ত পত্রে আপন হস্তাক্ষর থাকিবে। কালের উল্লেখ থাকিবে, এবং উহা নিজ মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়া দৃঢ় করিয়া দিবেন। (পৃথিবীর ইতিহাস, ২য়, পৃঃ ৪০৫)

---

(১) পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী পৃঃ ৪০৩,

পথ্যাস্বস্তি রূদীচীং দিশং প্রজানদ্ বাগ্‌ বৈ পথ্যাস্তস্তিস্তস্মাদ উদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।

অতএব যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার সময় বর্ণমালা নিশ্চয়ই ছিল নতুবা লেখার কথা কেন উল্লেখ থাকবে।

সামবেদের অন্তর্গত গোপথ ব্রাহ্মণে অক্ষর ও বর্ণের লক্ষণ লেখা আছে। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণেও অক্ষর ও বর্ণের আভাস পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপনিষদে বর্ণ, স্বর, মাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৪৮ শ্লোকে "লেখিত" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে—

বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্ যচ্চাপি লেখিতম্। সর্ব্বান্ বলকৃতানর্থাকৃতান্ মনুরব্রবীৎ।

অর্থাৎ "বলপূর্বক যাহা কিছু দত্ত হয়। বলপূর্বক যাহা কিছু ভুক্ত হয়। বলপূর্বক যাহা লেখিত হয় সকলই অসিদ্ধ, ইহা মনু বলিয়াছেন।" রামায়ণের সময়েও লিপির প্রচলন ছিল। কারণ সীতার বিশ্বাস জন্মাবার জন্য হনুমান রাম নামাঙ্কিত স্বর্ণাঙ্গুরীয় সীতাকে দেখিয়েছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ব্রাহ্মীলিপির কথা উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডের কোন একজায়গায় বলা হয়েছে :—

"শ্রীতালপত্রলিখিতং দেবলিপ্যন্বিতং শুভম্" অর্থাৎ তালপত্রে দেবাক্ষর লিখিত সুন্দর পুস্তকের পূজা করিবেন। অবশ্য এই দেবলিপির আকৃতি কেমন হ'বে সে কথাও এখানে বেশ ভালভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ পাণিনির গ্রন্থে তাঁর পূর্বে যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়ন, ব্যাস ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা যে গ্রন্থ রচনা করেছেন সে কথা উল্লেখ আছে। পাণিনির ব্যাকরণে 'গ্রন্থ' শব্দটি বহুবার দেখা যায়। যেমন তিনি কোথাও লিখেছেন "কৃতে গ্রন্থে", 'গ্রন্থাতাধিকে', "অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে", 'সমুদ্রাঙভো জনোহগ্রন্থে' প্রভৃতি শব্দ।

যাই হোক বর্ণমালার আবিষ্কার মানুষের জ্ঞানকে বহুদূর এবং অতিদ্রুত উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে গিয়েছে, তবে বর্ণমালার ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে পণ্ডিতেরা নানা প্রকার যুক্তি তর্ক দিয়ে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। আমরা এখানে শুধু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। কারণ সংখ্যা লিখনে বর্ণমালার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ ভারতবর্ষে সংখ্যা লিখন পদ্ধতি

সংখ্যা লিখন পদ্ধতি কবে থেকে এবং কোথায় প্রথম উদ্ভব হয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে একথা ঠিক যে লিপি আবিষ্কৃত হবার বহু পরে সংখ্যালিখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং এথেকে আমরা কখনই ভারতবর্ষে সঠিক কবে থেকে এই সংখ্যা লিখন পদ্ধতি চলে আসছে তার বিবরণ দিতে পারি না। ভারতবর্ষে সংখ্যা লিখন পদ্ধতির প্রচলন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দুটি দল আছে। প্রথম দল মনে করেন ভারতবর্ষ সংখ্যালিখন পদ্ধতি বাইরের কোন দেশ থেকে ধার করে এনেছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে বাইরের কোন দেশের কাছে ভারত ঋণী। এই মতের সমর্থকদের মধ্যে টেলর, বেবর, বুলার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ডব্লিউ ডিকি, আই টেলর প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ মনে করেন যে ভারতীয় লিপিমালা দক্ষিণ সুমেরীয় লিপিমালা থেকে উদ্ভূত। বেবর, বুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ মনে করেন ভারতীয় লিপিমালা হয় ফিনিসীয় না হয় উত্তর সুমেরীয় লিপিমালা থেকে উদ্ভূত। যাই হোক আমরা লক্ষ্য করলাম যে প্রথম দলের মধ্যে আবার বিভিন্ন মত রয়েছে। দ্বিতীয় দলের পণ্ডিতবর্গের ধারণা ভারতবর্ষে সংখ্যা লিখন পদ্ধতি বৈদিক যুগ বা তৎপূর্ববতী যুগেও ছিল। এরা কিন্তু বৈদিক গ্রন্থমালা থেকেই এঁদের যুক্তিতর্ক খাড়া করে থাকেন। বাশিষ্ঠ ধর্মসূত্রের কোন এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে লিখিত দলিলই হচ্ছে আইনতঃ সাক্ষ্য বহন করে। সংখ্যা লিখন পদ্ধতি ঋগ্বেদে ছিল তার প্রমাণ দশম মণ্ডলের ৬২ তম সুক্তের ৭ম ঋকের কথা বলা যায়। এখানে বলা হয়েছে—'সহস্রং মে দদতো অষ্টকর্ণ্যঃ' অর্থ হচ্ছে আমাকে সহস্র সংখ্যক গাভী দাও যাদের কান ৮ম সংখ্যার মত দেখতে। এছাড়াও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৪-তম সুক্তের দ্বিতীয় ঋকের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে বলা হয়েছে—

'নমা মিমেথ ন জিহীল এষা শিবা সখিভ্য উত মহমাসীৎ।
অক্ষস্যাহ মেকপরস্য হো তোরনুব্রতামপ জায়ামরোধম্ ॥

অর্থাৎ—আমার এ রূপবতী পত্নী কখনও আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেনি, কখন আমার নিকট লজ্জিত হয় নি। সে পত্নী আমার নিজের ও আমার বন্ধুবর্গের

বিশেষ সেবাশুশ্রষা করতো। কিন্তু কেবলমাত্র পাশার অনুরোধে আমি সে পরম অনুরাগিণী ভার্যাকে ত্যাগ করলাম।

অথর্ববেদেও সংখ্যা লিখন পদ্ধতির কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ৭ম কাণ্ডের ৪র্থ অনুবাকের ৫ শ্লোকে বলা হয়েছে—

'অজৈষং ত্বা সংলিখিতমজৈষমুত সংরুধম্।

অবিং বৃকো যথা মথদেবা মথ্নামি তে কৃতম্। ৭।৪।৩।৫,

পাণিনির ব্যাকরণে যবনানী, লিপিকার শব্দগুলি দেখে মনে হয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতি তখন ছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা আবিষ্কৃত হওয়ায় আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম। যুক্তিতর্ক দিতে থাকলাম প্রথমোক্ত দলের মতের বিরুদ্ধে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় যে সব লিপি, ফলক ও উৎকীর্ণলিপি পাওয়া গিয়েছে তা থেকে অনুমান করা হয় প্রায় ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বে সংখ্যা লিখন পদ্ধতি ভারতীয়রা জানতেন। এবং এথেকে দেখা যায় যে ব্রাহ্মীলিপি দক্ষিণ সুমেরীয় লিপি থেকে উদ্ভূত এ ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে।

সংখ্যা লিখনের জন্য যে চিহ্ন মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় দেখতে পাওয়া গিয়েছে তা কখনও লম্বা দাঁড়িযুক্ত কখনও বা পাশাপাশি রেখে অথবা একটির নীচে অন্যটি বসিয়ে সংখ্যা লেখা হয়েছে। এইভাবে ১ থেকে ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত লেখা হয়েছে। এই চিহ্নগুলি ছাড়াও সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য অন্যান্য চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সংখ্যা লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে পণ্ডিতেরা যে অভিমত দিয়ে থাকেন তা হচ্ছে "অশোকের উৎকীর্ণ লিপি" থেকে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মহেঞ্জোদারোর কাল থেকে অশোকের রাজত্বকাল পর্যন্ত ২৭০০ বৎসরের তফাৎ। এর মধ্যে সংখ্যা লিখন পদ্ধতি সম্বন্ধে আর কোন লিখিত দলিল পাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং এ থেকে নিশ্চয়ই আমরা অনুমান করতে পারি না যে এর মধ্যে ভারতীয়রা সংখ্যা লিখন পদ্ধতি জানতেন না বা বাইরের কোন দেশ থেকে এই পদ্ধতি ভারতীয়রা ধার করেছেন। যাইহোক এ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা আরও ব্যাপক আলোচনা করবেন।

আমরা লক্ষ্য করছি—প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালার মধ্যে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিমালাই সবচেয়ে বেশী প্রচলন ছিল। এবং এই দুই লিপিমালার সাহায্যে তখনকার দিনে সংখ্যা লেখা হোত। সুতরাং আমরা ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি সম্বন্ধে দু চার কথা বলছি।

খরোষ্ঠী লিপি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হয়ে থাকে। প্রাচীন গান্ধার অধুনা আফগানিস্থানে এই লিপি পাওয়া যায়। অশোকের উৎকীর্ণ লিপিতে এক,

দুই, তিন, চার এই চারিটি সংখ্যা খরোষ্ঠী লিপিতে রয়েছে। এগুলি লম্বা দাড়ির সাহায্যেই লেখা হয়েছে। অবশ্য পরে শক ও পার্থনিয়নদের প্রভাবে পড়ে এগুলির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন খরোষ্ঠী লিপি ভারতবর্ষে আমদানি করা হয়েছে। সম্ভবত সম্রাট দারিয়ুস যখন পাঞ্জাব জয় করেন সেই সময় থেকেই খরোষ্ঠী লিপি আমাদের দেশে প্রচলিত হয়। সংখ্যা লিখন পদ্ধতিতে খরোষ্ঠী লিপির প্রয়োগে কতকগুলি আশ্চর্যজনক চিহ্নের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ খরোষ্ঠী লিপিতে ৪ লেখার জন্য যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে তা আধুনিক কালের গুণের চিহ্নের মতো অবশ্য ব্রাহ্মী লিপিতে চার সংখ্যাটি এখনকার যোগ চিহ্নের মত। ৫ থেকে ৮ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি যোগ পদ্ধতিতে অনুসরণ করে লেখা হয়েছে কিন্তু ৯ সংখ্যাটি কি ভাবে লেখা হোত তার হদিস এখনও পাওয়া যায় নি।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ব্রাহ্মী লিপি এবং সংখ্যা লিখন পদ্ধতি ভারবর্ষের নিজস্ব সম্পদ। মনে হয় এটিই আমাদের জাতীয় লিপি। আনুমানিক ১০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। খরোষ্ঠী লিপিতে যেমন লম্বা দাড়ি দিয়ে এক, দুই, তিন, চার সংখ্যাগুলি লেখা হোত। ব্রাহ্মীলিপিতে কিন্তু সমান্তরাল দাড়ি দিয়ে এগুলি লেখা হোত। শূন্য ও স্থানীয়মান আবিষ্কার করার পূর্বে ও পরে ব্রাহ্মীলিপিতে এক থেকে নয় সংখ্যার লেখার কোন পরিবর্তন হয়নি। ব্রাহ্মীলিপিতে ১, ৪, ৯, ১০, ২০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০, ... প্রভৃতি সংখ্যাগুলিকে প্রকাশ করতে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করা হোত। কিন্তু প্রাচীন খরোষ্ঠী, প্রাচীন সুমেরীয়লিপি হাইরোগ্লিফিক এবং ফিনিসীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতিতে ১, ১০, ২০ এবং ১০০ লেখার জন্য ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করা হোত।

হাইরেটিক ও ডেমটিক লিপিমালাতে সংখ্যা লিখন পদ্ধতিতে ব্রাহ্মীলিপির ১৯টি চিহ্নের সঙ্গে সাদৃশ আছে কিন্তু বাকী চিহ্নগুলির মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকে মনে করেন ভারতীয়রা ব্রাহ্মীলিপি মিশরের কাছ থেকে ধার করে এনেছেন অর্থাৎ হাইরেটিক ও ডেমটিক লিপির নিকট ব্রাহ্মীলিপি ঋণী। ঐতিহাসিকগণ লক্ষ্য করেন যে—মিশরীয়রা প্রথমে এক, দশ, কুড়ি এবং একশ লেখার জন্য মাত্র চারিটি চিহ্ন ব্যবহার করতেন তাহলে হঠাৎ তাঁরা কি করে উনিশটি চিহ্নের ব্যবহার শিখলেন ? নিশ্চয়ই অন্য কোথাও তাঁরা এগুলি পেয়েছিলেন। যাই হোক সংখ্যা লিখন পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেছেন এবং কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছিল সে বিতর্কে না গিয়ে এটুকু বলা যায় যে বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই সংখ্যা লিখন পদ্ধতি ছিল।

খরোষ্ঠী বা ব্রাহ্মীলিপির সাহায্যে ছোট ছোট সংখ্যাকে লিখতে বিশেষ অসুবিধা

হোত না। অসুবিধা হোত বড় সংখ্যাকে লিখতে গিয়ে। মনে হয় বড় সংখ্যাকে লিখতে গিয়ে শূন্য ও দশমিক স্থানীয়মান পদ্ধতির আবিষ্কার হয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি ভারতীয়রা স্থানীয়মান সহকারে অঙ্কপাতন পদ্ধতি ব্যবহার করতে গিয়ে ডান থেকে বাঁদিকে সংখ্যার মান উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধি করতেন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক ৬৬ সংখ্যাটিকে। এককের স্থানে ৬ এর যে মান দশকের স্থানে ৬ এর মান এর দশগুণ বেশী। দশমিক স্থানীয় অঙ্কপাতন পদ্ধতি যদি ভারতীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতিতে না থাকতো তাহলে ভারতীয় পদ্ধতি অন্যান্য দেশের সংখ্যা লিখন পদ্ধতি থেকে শ্রেষ্ঠ হোত না। ভারতীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতিতে শূন্যের ব্যবহার থাকায় এই পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী বিজ্ঞানসম্মত বলে স্থির হয়েছে। এ ব্যাপারে একটু আলোচনা করা যাক। সাতশ দুই এই সংখ্যাটি লওয়া থাক। প্রথমে এককের ঘরে ২ এবং দশকের ঘরে ফাঁকটি ০ রয়েছে। এটি এক অর্থে মূল্যহীন আবার অন্য অর্থে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

স্থানীয় অঙ্কপাতন পদ্ধতি কবে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত বা প্রচলিত হয়েছিল তা বলা কঠিন। মনে হয় কোন মহৎ পণ্ডিত অথবা পণ্ডিতদের মহাসম্মেলনে এই পদ্ধতিটি গৃহীত হয়ে থাকবে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কল্‌হণ বলে গিয়েছেন এই পদ্ধতি ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত গণিত ঐতিহাসিক বি. বি. দত্ত মনে করেন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন এই পদ্ধতি অনেক আগে আবিষ্কৃত হলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেও স্থানীয় অঙ্কপাতন পদ্ধতি ব্যতিরেকেই সংখ্যা লিখতে দেখা যায়। অবশ্য কেন যে এটা চলেছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা সুস্পষ্ট মতামত দিতে পারেন নি।

২.২ ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে দশাঙ্ক সংখ্যা ও স্থানীয়মান তত্ত্ব।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের দিকপাল গবেষকদের অধিকাংশের মত যে ভারতীয় গণিতবিদরাই গণিতে শাস্ত্রে প্রথম দশাঙ্ক সংখ্যার প্রচলন করেন। তবে কোন গণিতবিদ এ ব্যাপারে প্রথম অগ্রসর হয়েছিল তা বলা কঠিন। বায়ুপুরাণের এক-জায়গায় নিম্নোক্ত শ্লোকটি দেখতে পাওয়া যায়—

> "এষা সংখ্যাকৃতা সংখ্যা ঈশ্বরেণ স্বয়ম্ভুবা।
> গণনা বিনিবৃত্তৈষা সংখ্যা ব্রাহ্মী চ মানুষী" ॥ ১০১।২০৮

শ্লোকটির অনুবাদ না করেও বলা যায় যে বায়ুপুরাণের মতে দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালীর আবিষ্কর্তা ব্রহ্মা। দশাঙ্ক সংখ্যা ব্যবহারের প্রমাণ মহাভরতে, পিঙ্গলের ছন্দসূত্রে,

অনুযোগদ্বারসূত্র নামক জৈন আগমসূত্রে, বিষ্ণুপুরাণে, অগ্নিপুরাণে, বায়ুপুরাণে, তিলয় পন্নতি (ত্রিলোক প্রজ্ঞপ্তি) নামক জৈন আগমগ্রন্থে, বাকশালীর পাটীগণিতে, মূল পুলিশসিদ্ধান্তে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, তন্ত্রশাস্ত্রে, বৃহজ্জাতকবিবৃতিতে এবং আরও নানা ভারতীয় গণিত ও ধর্মগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে "অঙ্ক" সংজ্ঞা ৯ খ্যাপন করে। সেইজন্য প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদেরা বলেন—নবৈব যোগো গণনেতি শশ্বৎ—অর্থাৎ গণনাযোগ সর্বদাই নব মাত্র। বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরী উক্ত শ্লোকের টীকাতে বলেছেন "নবৈবাঙ্কাঃ ক্রমভেদেন স্থিত্বা যথেষ্টং সংখ্যাবাচিনো ভবন্তি"। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় গণিত-বিদেরা শূন্য চিহ্নকে ঐ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠ সংখ্যা প্রণালীতে শূন্যকে ধরে মোট দশটি অঙ্ক আছে। সেইহেতু পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই প্রণালীকে দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালী বলেছেন।

মহাভারতের যুগে ভারতীয় গণিতবিদেরা সংখ্যা খ্যাপনার্থে অঙ্ক ব্যবহার করতেন সে নিদর্শন মহাভারতের বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বনপর্বের কথাই ধরা যাক। দুর্যোধন, শকুনি প্রভৃতি পাণ্ডবদের বনবাস কি রকম চলছে তা দেখার জন্য চাতুরী করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—"স্মারণে সময়ঃ প্রাপ্তো বৎসানামপি চাঙ্কনম্"। অর্থাৎ স্মারণের এবং (নূতন) বৎসকূলকে অঙ্কনের সময় হয়েছে। এখানে স্মারণ শব্দটির অর্থ হচ্ছে সংখ্যা পরিগণনা। নীলকণ্ঠ সূরী স্মারণ শব্দটির সংস্কৃত টীকা করতে গিয়ে বলেছেন—"স্মারণে স্মারণহেতৌ কর্ম্মণি গবাং সংখ্যা পূর্ব্বকং বয়োবর্ণজাতিনাম্না লেখনে।" অঙ্কন শব্দটির অর্থ এখানে সংখ্যা স্থাপন বোঝান হয়েছে। পরিষ্কারভাবে এটিকে বোঝানোর জন্য বনপর্বের ২৩৯।৪-৬ শ্লোকগুলি বঙ্গানুবাদ সহ তুলে ধরছি—

দদর্শ স তদা গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অঙ্কৈর্লক্ষৈশ্চ তাঃ সর্ব্বা লক্ষয়ামাস পার্থিবঃ ॥
অঙ্কয়ামাস বৎসাংশ্চ জজ্ঞে চোপসৃতাস্বপি।
বালবৎসাশ্চ যা গাবঃ কা (? ক) লয়ামাস তা অপি ॥
অথ স স্মারণং কৃত্বা লক্ষয়িত্বা ত্রিহায়নান্
বৃতো গোপালকৈঃ প্রীতো ব্যহরৎ কুরুনন্দনঃ ॥

এর অর্থ হচ্ছে—"তখন তিনি শতে শতে ও হাজারে হাজারে গরু দেখিলেন। অঙ্ক (অঙ্কৈঃ) এবং চিহ্ন (লক্ষৈঃ) দ্বারা রাজা সেই সকলের পরিচয় জানিলেন। অনন্তর (নূতন) বৎসমূহকে অঙ্কিত করিলেন। তন্মধ্যে দমনার্হ ও বাল বৎসমূহকে পৃথকভাবে

গণনা করিলেন। তিন বৎসরবয়স্ক গোসমূহের সংখ্যাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন। এইরূপে স্মারণ করিয়া কুরুনন্দন গোপালকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন।”

এখানে অঙ্ক শব্দটির অর্থ সংখ্যাচিহ্ন এবং লক্ষ শব্দটির অর্থ লক্ষ সংখ্যা না বুঝিয়ে গোজাতির বর্ণ ইত্যাদি পরিচয় জ্ঞাপক অপর চিহ্ন বোঝান হয়েছে। সুতরাং আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে মহাভারতে সংখ্যা খ্যাপনার্থ অঙ্ক ব্যবহার রয়েছে।

মহাভারতের একটি আখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহাভারতীয় যুগের পূর্বে ভারতীয়রা দশাঙ্ক সংখ্যা জানতেন। উদাহরণস্বরূপ অষ্টবক্রোপাখ্যানের কথা বলা যেতে পারে। অবশ্য এই উপাখ্যানের গূঢ়ার্থ দুর্বোধ্য। তবে মনে হয় এটি একটি অঙ্কসংজ্ঞা নিঘণ্টু। যাই হোক উপাখ্যানটির কিছু অংশ অনুবাদসহ সংস্কৃত শ্লোকগুলি তুলে ধরছি ঃ

বন্দী উবাচ—

এক এবাগ্নির্ব্বহুধা সমিধ্যতে
একঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বমিদং বিভাতি।
একো বীরো দেবরাজোঽরি হন্তা
যমঃ পিতৄণামীশ্বরশ্চৈক এব ॥ ৮

অর্থাৎ একই অগ্নি বহুপ্রকারে প্রজ্জ্বলিত হয়। এক সূর্য এই সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে ; অরিহন্তা বীর দেবরাজ এক ; পিতৃগণের ঈশ্বর যম এক।

অষ্টাবক্র উবাচ—

দ্বাবিন্দ্রাগ্নী চরতো বৈ সখায়ৌ
দ্বৌ দেবর্ষী নারদ পর্ব্বতৌ চ।
দ্বাবশ্বিনৌ দ্বে রথস্যাপি চক্রে
ভার্য্যাপতী দ্বৌ বিহিতৌ বিধাত্রা ॥ ৯

অর্থাৎ, সহচারী ইন্দ্রাগ্নি দুই ; দেবর্ষি দুই—নারদ এবং পর্ব্বত ; অশ্বিনীকুমার দুই ; রথচক্র দুই এবং বিধির বিধানে ভার্যাপতি দুই।

বন্দী উবাচ—

ত্রিঃ সূয়তে কর্ম্মণা বৈ প্রজেয়ং
ত্রয়ো যুক্তা বাজপেয়ং বহন্তি।
অধ্বর্য্যবস্ত্রিসবনানি তন্বতে
ত্রয়ো লোকাস্ত্রীণি জ্যোতীংষি চাহুঃ ॥ ১০

অর্থাৎ কর্মনিমিত্ত প্রজাজন্ম তিন; ত্রয়ী অনুযায়ী বাজপেয় সম্পন্ন হয়। অধ্বর্যু গণের বিধানানুযায়ী সবন তিন; লোক তিন এবং জ্যোতিও তিন প্রকার।

অষ্টাবক্র উবাচ—

চতুষ্টয়ং ব্রাহ্মণানাং নিকেতং
চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিমং বহন্তি।
দিশশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়ঞ্চ
চতুষ্পদা গৌরপি শশ্বদুক্তা॥ ১১

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের আশ্রম চার, এই যজ্ঞের অধিকারী চার; দিক চার, গো চতুষ্পাৎ, তা সর্ব্বদাই কথিত হয়।

বন্দী উবাচ—

পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চপদা চ পঙ্‌ক্তি
র্যজ্ঞাঃ পঞ্চৈবাপ্যথ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি।
দৃষ্টা বেদে পঞ্চ চূড়াপ্সরাশ্চ
লোকে খ্যাতং পঞ্চনদঞ্চ পুণ্যম্॥ ১২.

৩

অর্থাৎ, অগ্নি পাঁচ; পঙক্তি পাঁচ পদযুক্ত; যজ্ঞ নিশ্চয়ই পাঁচ; ইন্দ্রিয়ও পাঁচ; বেদে দেখা যায়, চূড়া পাঁচ এবং অপ্সরা পাঁচ। পুণ্য-পঞ্চনদ লোকে খ্যাত আছে।

অষ্টাবক্র উবাচ—

ষড়াধানে দক্ষিণামাহুরেকে
ষট্ চৈবেমে ঋতবঃ কালচক্রম্।
ষড়িন্দ্রিয়াণ্যুত ষট্ কৃত্তিকাশ্চ
ষট্ সাদ্যস্কাঃ সর্ব্ববেদেষু দৃষ্টাঃ॥ ১৩

অর্থাৎ, কেউ কেউ বলেন, আধানে দক্ষিণা ছয়; কালচক্রে ঋতু ছয়; ইন্দ্রিয় ছয়; সমস্ত বেদে দেখা যায়, সাদ্যস্কা ছয়।

বন্দী উবাচ—

সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্ত বন্যাঃ
সপ্ত চ্ছন্দাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি।
সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি
সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা॥ ১৪.

অর্থাৎ গ্রাম্য পশু সাত; বন্য পশু সাত; সপ্ত ছন্দ এক যজ্ঞ সম্পন্ন করে; ঋষি সাত; অর্হনা সাত; বীণাতন্ত্রী সাত, তা খ্যাত আছে।

অষ্টাবক্র উবাচ—

অষ্টৌ শাণাঃ শতমানং বহন্তি
তথাষ্টপাদঃ সরভঃ সিংহঘাতী।
অষ্টৌ বস্থন শুশ্রুম দেবতাসু
যূপশ্চাষ্টাস্রির্বিহিতা সর্ব্বযজ্ঞে॥ ১৫

অর্থাৎ অষ্টশান শতমান ধারণ করে; সিংহঘাতী সরভ অষ্টপাৎ; প্রসিদ্ধ আছে—দেবতাদের বসু আট; সর্ব যজ্ঞে বিহিত যূপ অষ্টাস্রি।

বন্দী উবাচ—

নবৈবোক্তাঃ সামিধেন্যঃ পিতৄণাং
তথা প্রাহুর্নবযোগং বিসর্গম্।
নবাক্ষরা বৃহতী সম্পাদিষ্টা
নবৈব যোগো গণনেতি শশ্বৎ॥ ১৬

অর্থাৎ কথিত আছে সামধেনী নয়, বিসর্গ নয় সংযুক্ত বলে বর্ণিত হয়ে থাকে। বৃহতী ছন্দ নবাক্ষরা বলে সমুদিষ্ট। গণনাযোগ সর্বদাই নয় মাত্র। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে তৈত্তিরীয় সংহিতাতে সামধেনী একাদশটি বলা হয়েছে।

অষ্টাবক্র উবাচ—

দিশো দশোক্তাঃ পুরুষস্য লোকে
সহস্রমাহুর্দশপূর্ণং শতানি।
দশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যো
দশৈরেকা দশ দাশা দশার্হাঃ॥ ১৭

অর্থাৎ, দিক দশও উক্ত হয়। লোকে পুরুষের মায়া দশ; তা শত ও সহস্র বলেও কথিত হয়। গর্ভবতী মাত্র দশ মাস গর্ভ ধারণ করে। এরক দশ; দাশ দশ এবং অর্হ দশ।

বন্দী উবাচ—

একাদশৈকাদশিনঃ পশূনা-
মেকাদশৈবাত্র ভবন্তি যূপাঃ।
একাদশ প্রাণভৃতাং বিকারা
একাদশোক্তা দিবি দেবেষু রুদ্রাঃ॥ ১৮

অর্থাৎ, জীবের ইন্দ্রিয়বিষয় একাদশ; পশুযূপ একাদশই; ইন্দ্রিয় বিকার একাদশ। স্বর্গে রুদ্র একাদশ প্রসিদ্ধ আছে।

অষ্টাবক্র উবাচ—

সংবৎসরং দ্বাদশমাসমাহুঃ
জগত্যাঃ পাদো দ্বাদশৈবাক্ষরাণি।
দ্বাদশাহঃ প্রাকৃতযজ্ঞে উক্তো
দ্বাদশাদিত্যান্ কথয়ন্তীহ ধীরাঃ॥ ১৯

অর্থাৎ, সংবৎসরে মাস দ্বাদশ ; জগতীর পদে দ্বাদশ অক্ষর ; প্রাকৃতযজ্ঞে দ্বাদশ দিনে সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞ লোকেরা বলেন আদিত্য দ্বাদশ।

বন্দী উবাচ—

ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা
ত্রয়োদশদ্বীপর্বতী মহী চ।
... ... ॥ ২০

অর্থাৎ, প্রশস্ত তিথি ত্রয়োদশ ; পৃথিবীতে দ্বীপ ত্রয়োদশ। ... ...

অষ্টাবক্র উবাচ—

ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী
ত্রয়োদশাদীন্যতিচ্ছন্দাংসি চাহুঃ॥
... ...
... ... ॥ ২১

অর্থাৎ, কেশী ত্রয়োদশাহ গমন করেন। অতিজাগতি ত্রয়োদশ।

ঠিক এ ধরণের অংক সংজ্ঞা নিঘণ্টু শুক্ল যজুর্বেদে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শুক্ল যজুর্বেদের নবম অধ্যায়ের ৩১-৩৪ শ্লোকগুলি তুলে ধরছি।

অগ্নিরেকাক্ষরেণ প্রাণমুদজয়ত্তমুজ্জেষমশ্বিনৌ দ্ব্যক্ষরেণ দ্বিপদো মনুষ্যানুদজয়তাং তানুজ্জেষং বিষ্ণুস্ত্র্যক্ষরেণ ত্রীল্লোঁকানুদজয়ত্তানুজ্জেষং সোমশ্চতুরক্ষরেণ চতুষ্পদঃ পশূনুদজয়ত্তানুজ্জেষম্।॥ ৩১॥ পূষা পঞ্চাক্ষরেণ পঞ্চ দিশ উদজয়ত্তা উজ্জেষং সবিতা ষড়ক্ষরেণ ষড়্ ঋতূনুদজয়ত্তানুজ্জেষং মরুতঃ সপ্তাক্ষরেণ সপ্ত গ্রামান্। পশূনুদজয়ঁস্তানজ্জেষং বৃহস্পতিরষ্টাক্ষরেণ গায়ত্রীমুদজয়ত্তামুজ্জেষম্। ॥ ৩২॥ মিত্রো নবাক্ষরেণ ত্রিবৃতংস্তোমমুদজয়ত্তমুজ্জেষং বরুণো দশাক্ষরেণ বিরাজমুদজ্জয়ত্তামুজ্জেষমিন্দ্র একাদশাক্ষরেণ ত্রিষ্টুভমুদজয়ত্তামুজ্জেষং বিশ্বে দেবা দ্বাদশাক্ষরেণ জগতীমুদজয়ঁস্তামুজ্জেষম্। ॥ ৩৩॥ বসবস্ত্রয়োদশাক্ষরেণ ত্রয়োদশং স্তোমমুদজয়ংস্তমুজ্জেষং রুদ্রাশ্চতুর্দ শাক্ষরেণ চতুর্দশং স্তোমমুদজয়ংস্তমুজ্জেষমাদিত্যাঃ পঞ্চদশাক্ষরেণ পঞ্চদশং স্তোমমুদজয়ংস্তমুজ্জেষমদিতিঃ ষোড়শাক্ষরেণ

ষোড়শং স্তোমমুদজয়ত্তমুজ্জেষং প্রজাপতিঃ সপ্তদশাক্ষরেণ সপ্তদশং স্তোমমুদজয়ত্ত মুজ্জেষম্। ॥ ৩৪ ॥

এর অর্থ হচ্ছে—অগ্নি একাক্ষর ছন্দে প্রাণ জয় করেছেন, আমিও সেরূপ প্রাণ জয় করবো। অশ্বিদ্বয় দুটি অক্ষর ছন্দে দ্বিপদ বিশিষ্ট মানুষদের জয় করেছেন, আমি তার দ্বারা তাদের জয় করবো। বিষ্ণু তিন অক্ষর ছন্দে তিন লোক জয় করেছেন, আমিও তার দ্বারা ত্রিভুবন জয় করবো। সোম চার অক্ষর ছন্দে চতুষ্পদ পশুগণকে জয় করেছেন, আমি তার দ্বারা তাদের জয় করবো। ৩১

পুষা দেবতা পাচ অক্ষর ছন্দে পাঁচ দিক জয় করেছেন, সেরূপ আমি তা জয় করবো। সবিতা ছয় অক্ষর ছন্দে ছয় ঋতু জয় করেছেন, আমিও তা করবো। মরুৎগণ সাত অক্ষর ছন্দে গরু প্রভৃতি সাতটি গ্রাম্য পশু জয় করেছেন, সেরূপ আমি তাদের জয় করবো। বৃহস্পতি অষ্ট অক্ষরাত্মক ছত্রে গায়ত্রী ছন্দের অভিমানিনী দেবতাকে জয় করেছেন, সেরূপ আমিও তাদশী গায়ত্রীকে জয় করবো। ৩২

মিত্র নয় অক্ষর ছন্দে ত্রিবৃত স্তোম জয় করেছেন, আমিও সেরূপ স্তোম জয় করবো। বরুণ দেব দশ অক্ষর ছন্দে বিরাট ছন্দ অভিমানিনী দেবতা জয় করেছেন, আমিও তাকে জয় করবো। ইন্দ্রকে একাদশ অক্ষর ছন্দে ত্রিষ্টুপ ছন্দ অভিমানিনী দেবতা জয় করেছেন, আমিও তাকে জয় করবো। বিশ্ব দেবগণ দ্বাদশ অক্ষর ছন্দে জগতী অভিমানিনী দেবতা জয় করেছেন, আমিও তাকে জয় করবো। ৩৩

বসুগণ ত্রয়োদশ অক্ষর ছন্দে ত্রোয়োদশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও সে স্তোম জয় করবো। রুদ্রদেবগণ চতুর্দশ অক্ষর ছন্দে চতুর্দশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও তা জয় করবো। আদিত্য দেবগণ পঞ্চদশ অক্ষর ছন্দে পঞ্চদশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও তা জয় করবো। প্রজাপতি সপ্তদশ অক্ষর ছন্দে সপ্তদশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও সে ছন্দে সে স্তোম জয় করবো।[১] ৩৪

মহাভারতের দশাঙ্ক সংখ্যার তৃতীয় উদাহরণের জন্য আদিপর্বের ৬১।৪২-৪৩ শ্লোক দুটি তুলে ধরছি—

স বৈ সংবৎসরং পূর্ণং মাসঞ্চৈকং বনে বসন্ ॥
তাতোঽ গচ্ছদ্ধৃষীকেশং দ্বারাবত্যাং কদাচন।
লব্ধবাংস্তত্র বীভৎসর্ভার্য্যাং রাচীবলোচনাম্ ॥

এইখানে স্থানীয়মান সহকারে নাম সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে। নীলকণ্ঠসূরী পূর্ণ = ১০ ধরেছেন। এখন যদি "সংবৎসরং পূর্ণং মাসঞ্চৈকং'কে অন্বয় করে সংবৎসরং পূর্ণম্

(১) যজুর্বেদ সংহিতা অনুবাদ—শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী, পৃঃ ৬৬—৬৭,

একম্ মাসম্ এবং চ লেখা যায় তাহলে পূর্ণম্ = ০, একম্ = ১, অঙ্কের বামগতি নিয়মানুযায়ী পূর্ণম্ একম্ = ১০

মহাভারতের দশাঙ্ক সংখ্যার চতুর্থ উদাহরণ বনপর্ব্ব থেকে দেওয়া হোল। প্রসঙ্গত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একটি উপাখ্যানে পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে যা বলছেন, তাতে যে সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে কৃষ্ণ কর্তৃক বিবৃত একই উপখ্যানে ভিন্ন সংখ্যা পাওয়া যায়। অথবা ব্যাসদেব যখন ঐ একই উপাখ্যান যুধিষ্ঠিরকে বলছেন তাতেও সংখ্যার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে এই উপাখ্যানের বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্টই বলা যায় দশাঙ্ক সংখ্যা এঁরা প্রত্যেকেই জানতেন। যাই হোক উক্ত তিনজনের উক্তি তিনটি তুলে ধরছি ঃ

পুরোহিত ধৌম্যের উক্তি—"বিংশতিঃ সপ্তচাষ্টৌ চ হয়মেধানুপাহরং"।

নীলকণ্ঠ এটির টীকাতে বলেছেন—"বিংশতিঃ বিংশতিবারমাবর্তিতঃ সপ্ত অষ্টৌ চেতি অষ্টচত্বারিংশদধিকং শতম্। ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং রাজেতি তু শ্রুতিঃ। বিংশতিমিতি পাঠেহন্তহীনসংখ্যত্বাৎ পঞ্চত্রিংশৎ।

যাই হোক সোজা কথায় বলা যায় যে, নীলকণ্ঠ মনে করতেন—

অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের সংখ্যা এক্ষেত্রে ১৪৮ = (২০ × ৭ + ৮) কিন্তু 'বিংশতিঃ' স্থলে বিংশতিং ধরলে এটি হবে ৩৫ = (২০ + ৭ + ৮)।

বেদব্যাসের উক্তি ঃ

সোঽশ্বমেধশতেনেষ্ট্বা যমুনামনু বীর্য্যবান্।

ত্রিশতাশ্বান্ সরস্বাত্যাং গঙ্গামনু চতুঃশতান্ ॥

অর্থাৎ যমুনা নদীর তীরে ১০০, সরস্বতীর তীরে ৩০০ ও গঙ্গাতীরে ৪০টি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

কৃষ্ণের উক্তি ঃ

যো বদ্ধা ত্রিশতং চাশ্বান্ দেবেভ্যো যমুনামনু।

সরস্বতীং বিংশতিঞ্চ গঙ্গামনু চতুর্দ্দশ ॥

অর্থাৎ যমুনাতীরে ১০৩, সরস্বতীতীরে ২০ এবং গঙ্গাতীরে ১৪টি অশ্বমেধ যজ্ঞ ভরত করেছিলেন।

মহাভারত থেকে আর একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। এই গ্রন্থের আদিপর্বের কোন এক স্থানে মহর্ষি বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলছেন ঃ

তদ্বনং পাবকো ধীমন্ দিনানি দশ পঞ্চ চ।

দদাহ কৃষ্ণ পার্থাভ্যাং রক্ষিতঃ পাকশাসনাৎ ॥

অর্থাৎ 'হে ধীমান! কৃষ্ণ ও পার্থ কর্তৃক ইন্দ্র হইতে পরিরক্ষিত হয়ে অগ্নি পনেরো দিনে সেই বন দগ্ধ করেছিলেন।'

দ্বিতীয় একটি শ্লোকে তিনি বলেছেন—

পাবকশ্চ তদা দাবং দগ্ধা সমৃগপক্ষিণম্।
অহানি পঞ্চ চৈকঞ্চ বিররাম সুতর্পিতঃ॥

এখানে পঞ্চচৈকঞ্চ এবং পঞ্চদশ এর অর্থ ১৫ হবে। অর্থাৎ এখানে স্থানীয়মান সহকারে নাম সংখ্যার প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি।

যাই হোক এবার বিভিন্ন পুরাণগুলির মধ্যে দশাঙ্ক সংখ্যার খোঁজ পাওয়া যায় কি না দেখা যাক। আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব যে, বিভিন্ন পুরাণ বিশেষ করে ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণে দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালীর ব্যবহার রয়েছে।

ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে ঃ

স্থানাৎ স্থানং দশগুণমেকৈকং গণ্যতে দ্বিজাঃ।
ততোঽষ্টাদশমে ভাগে পরার্ধমভিধীয়তে॥ ২৩১।৪

অর্থাৎ সংক্ষেপে অর্থ হচ্ছে—স্থান হইতে স্থানান্তরে ১০ গুণ ধরিয়া এগোবার পর অষ্টাদশভাগ পরার্ধ বলে ধরা হয়। অর্থাৎ পরার্ধ কাকে বলে সেই কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে ঃ

স্থানাৎ স্থানং দশগুণমেকস্মাদ্‌গুণ্যতে স্থলে।
ততোঽষ্টদশমে স্থানে পরার্ধমধীয়তে॥ ৬।৩।৪

অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে ঃ

স্থানাৎ স্থানং দশগুণমেকস্মাদ্‌গুণ্যতে স্থলে।
ততোঽষ্টদশমে ভাগে পরার্ধমধীয়তে॥

মৎস্যপুরাণে ১১৮ অধ্যায়ে দশাঙ্ক সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে ঃ

"দ্বে সহস্রে দ্বাপরে তু সন্ধ্যাংশৌ তু চতুঃশতে। সহস্রমেকং বর্ষাণাং দিব্যং কলৌ প্রকীর্ত্তিতম্। দ্বেশতে চ তথান্যে বৈ সংখ্যাতঞ্চ মনীষিভিঃ।

অর্থাৎ দেবপরিমাণের দুই হাজার বৎসরে দ্বাপর যুগ, তার সংখ্যা ঐ পরিমাণে দুই শত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও ঐরূপ দুই শত বৎসর। আবার দেব পরিমাণের এক হাজার বৎসরে কলিযুগ; তাহার সন্ধ্যা ঐ পরিমাণে একশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও ঐরূপ একশত বৎসর।

বায়ুপুরাণে এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রঞ্চৈব সংখ্যয়া
বিজ্ঞেয়মাসহস্রং তু সহস্রাণি দশাযুতম্ ॥
একং শতসহস্রং তু নিযুতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
তথা শত সহস্রাণাং দশকং কোটিরুচ্যতে ॥
অর্বুদং দশ কোট্যস্তু অব্দং কোটিশতং বিদুঃ
... ...
... ...
সমুদ্রং মধ্যমঞ্চৈব পরার্ধমপরং ততঃ
এবমষ্টাদশৈতানি স্থানানি গণনাবিধৌ
শতানীতি বিজানীয়াৎ সংজ্ঞিতানি মহর্ষিভিঃ।

জৈন আগমগ্রন্থে দশাঙ্ক সংখ্যার বহুল ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। বিশেষ করে অনুযোগদ্বার স্থত্র, ত্রিলোক প্রজ্ঞপ্তি, ত্রিলোকসার প্রভৃতি গ্রন্থে এ নিয়ে বেশ কিছু কথা বলা হয়েছে। প্রথমে ধরা যাক তিলোয় পন্নত্তির কথা (ত্রিলোক প্রজ্ঞপ্তি)। এখানে বলা হয়েছে "স্থংণনভগয়ণপণতুপএক্কত্তিয়স্থংণনবনহাস্থণংছক্কেক্ক" = ১৬০০৯০৩০১২৫০০০।

অন্য একটি শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

অংবরপংচেক্কউনবছপণস্থংণণব য সত্তেব
অংককমে জোয়ণয়া জংবুদীবসস্ খেত্তফলং।

অর্থাৎ এখানে সংখ্যাটি হচ্ছে—৭৯০৫৬৯৪১৫০.

নেমীচন্দ্র গোম্মটসারে ৩৪৫তম গাথায় যা বলেছেন তাথেকে আমরা দশাঙ্ক সংখ্যার কথাই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। নেমীচন্দ্র লিখেছেন ঃ

এক্কট্ঠ চ চ য ছস্সত্তয়ং চ চ য স্থণ্ণ সত্তিয়সত্তা
স্থণ্ণং ণব পণ পংচ য এক্কং ছক্কেক্কগো য পণগং চ ॥

অর্থাৎ উদ্দিষ্ট সংখ্যাটি হচ্ছে—১৮৪, ৪৬৭, ৪৪০, ৭৩৭, ০৯৫, ৫১৬, ১১৫.

এছাড়া আরও নানা ধরণের উদাহরণ এই সমস্ত জৈন গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির কোনটি বামাগতি, কোনটি আবার দক্ষিণাগতিতে অংকপাত করা হয়েছে। এবার দেখা যাক বাখ্শালীর পাণ্ডুলিপিতে এধরণের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় কি না। এই পাণ্ডুলিপির ৫৬ (ক) পৃষ্ঠায় দশাংক সংখ্যা প্রণালীর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে বলা হয়েছে—

৮৮০ | ৯৬৪ | গুণিত জাতং | ৮৪৮৩২০ |
৮৪ | ১৬৮ | | ১৪১১২ |

চত্বারিংশপৃথক্স্থানানাং বর্গ | ১৬০০ | এষ উপরা (২) পাত্য

শেষং | ৮৪৬৭২০ | বর্ত্তং জাতং | ৬০ |
| ১৪১১২ |

দ্বিতীয় উদাহরণ ৬৪ (ক) পৃষ্ঠায় দেখা যায় :

৫২৮০ | ৪৪৪০০৪ |
৩৮৭২৪ | ৩৮৭২৪ |

অর্ধং কর্তব্যং (ত) ত (জাতং)

(৪০) ৫২৮০ | ৪৪৪০০৪ |
(৩) ৮৭২৪ | ৭৭৪৪৮ |

সংগুণ্য জাতং অ (ংশ অংশেষু) হরাহরেষু গু (নিতং)

(১) ৭৯৯৪৫৯৪১১২০ |
২৯৯৯০৯৬৩৫২ |

মূল পুলিশ সিদ্ধান্ত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ছন্দসূত্র, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে স্থানীয়মান সহকারে দশাঙ্ক সংখ্যার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

২.৩ অংকের বামদিকে গতি।

গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় কোন কোন জাতি সংখ্যাপাত করতে গিয়ে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ক্রমানুযায়ী লেখেন। আবার অনেক জাতি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে অংকপাত করেন। তাছাড়াও কোন কোন জাতি উর্ধক্রম অনুযায়ীও সংখ্যাপাত করে থাকেন। বর্তমানে সংখ্যাপাত করা হয়ে থাকে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। অনেকে মনে করে এটি হয়তো কাল্ডীয় বা ইহুদীরা আবিষ্কার করেছেন। কারণ হিন্দুরা সব্যক্রমে লেখেন সেই হেতু তাঁরা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে সংখ্যাপাত করেন না। কিন্তু এ ধারণা ভুল। আর্যরা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লিখতেন এবং এই পদ্ধতিকে সব্যক্রম বলা হয়। এবং এই পদ্ধতির বিপরীত পদ্ধতিকে অসব্যক্রম বলা হয়। কিন্তু হিন্দু গণিতশাস্ত্রে অংকপাত করার সময় 'অঙ্কানাং বামতো গতিঃ' পদ্ধতি ব্যবহার করা হোত। বাম শব্দের সঙ্গে তস্ প্রত্যয় করে বামতঃ পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। আমরা জানি তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমীতে তস্ প্রত্যয় হয় কিন্তু পঞ্চমীতে তস্ প্রত্যয় হোলে বাম দিক থেকে গতি ধরা হবে কিন্তু তৃতীয়া হেলো বাম দিকে গতি হবে। সুতরাং 'অঙ্কানাং বামতো গতিঃ' র অর্থই হচ্ছে অঙ্কের বাম দিকে

গতি। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে বাম দিকে গতি এই পদ্ধতির বহু উদাহরণ বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন হিন্দুশাস্ত্রে বাম শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিপরীত'। যেমন বামাচার ইত্যাদি। অঙ্কস্থানের পর্যায়বিন্যাসে এবং সংখ্যা জ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কপাত করতে গিয়ে "বামগতি" বিধির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অঙ্কস্থানের পর্যায়বিন্যাসে যে বামগতি বিধি ব্যবহার করা হয় তা সাধারণ বিধি সুতরাং এই বিধি অবশ্য পালনীয়। কিন্তু সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কপাত করতে গিয়ে বামাগতি অবশ্য পালনীয় নাও হতে পারে। আমরা বায়ুপুরাণে পড়েছি ঃ

এবমষ্টাদশৈতানি স্থানানি গণনা বিধৌ
শতানীতি বিজানীয়াং সংজ্ঞিতানি মহর্ষিভিঃ। ১০১।১০২—৩

অর্থাৎ বায়ুপুরাণে আঠারটি অঙ্কস্থানের কথা বলেছি। তাদের নাম যথাক্রমে একক দশক প্রভৃতি। দশকস্থান একক স্থানের বামে, শতক স্থান দশক স্থানের বামে, এইভাবে পরম্পরা ক্রমে প্রতিটি অঙ্কস্থানের বিন্যাস তার পূর্ব পূর্বটির বাম দিক হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য কোন স্থান স্থিত অঙ্কবিশেষের মান তার ডান দিকে অবস্থিত মানের দশগুণ এবং বাঁদিকে অবস্থিত মানের দশমাংশ।

দশমিক সংখ্যা লিখন পদ্ধতিতে সংখ্যার মান স্থানগুণের উপর নির্ণীত হয়, রূপগুণ বা আকৃতিগুণের উপর নির্ভর করে না। দেখা গিয়েছে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলির রূপগুণ আছে কিন্তু দশ বা ততোধিক সংখ্যাগুলি লিখতে গিয়ে স্থানগুণের উপর নির্ভর করতে হয়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কি সব্যক্রম লিপিক, কি অসব্যক্রম লিপিক বা কি উর্ধক্রম লিপিক সব জাতিই বড় স্থানের অঙ্কটিকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করে এটিকে অপচীয়মান ক্রম বলা হয়। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে অবশ্য মাঝে মাঝে ছোট সংখ্যা আগে লিখে তারপর বড় সংখ্যা লেখা হয়ে থাকে। এটিকে উপচীয়মান ক্রম বলে। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ পাণিনি এ সম্পর্কে বলেছেন 'অল্পচ্ তরম্' অর্থাৎ দ্বন্দ সমাস অল্পতর স্বর নিষ্পন্ন শব্দ আগে বসবে। তার উপর বার্তিকাকার বিশেষ সূত্র করলেন 'সংখ্যায়া অল্পীয়স্যাঃ। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি পঞ্চদশ, চতুর্বিংশ ইত্যাদিংস শ্নাসমূহকে। তবে কখনও কখনও দ্বিপদ সংখ্যার নামকরণে ছোট সংখ্যার উল্লেখ প্রথমে করা হয় তারপর বড় সংখ্যার। যেমন অষ্টাশতং শতানি = ১৮০, অষ্টাত্রিংশতং শতম্ = ১৩৮। এ সম্পর্কে পাণিনি বলেছেন—'তদ্ অস্মিন্ন অধিকম্, ইতি দশান্তড্ ডঃ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শত সহস্রম্ = ১১০০।

পাণিনি অন্য একটি সূত্রে বলেছেন—'শদ্-অন্ত-বিংশতেশ্চ'। এর উদাহরণ ত্রিংশং শতম্ (=১৩০)

পাণিনি আর একটি জায়গায় বলেছেন—"ত্রেস্ ত্রয়ঃ"। এর উদাহরণ অষ্ট সহস্রম্ (=১০০৮)

জৈনগ্রন্থ বৃহৎক্ষেত্রসমাসে জৈনাচার্য জিনভদ্রগণি উপচীয়মানক্রমে সংখ্যার ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন :

"সত্ত হিয়া তিন্নসয়া বারস য সহস্স পংচ লক্‌খা য
এগসত্তরি নব সয় ছপ্পন্ন সহস্ম চউদ্দশ য,
লক্‌খা দু কোড়ি......................। ১।৯১

সংস্কৃত সাহিত্য যদি পাঠ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে মিশ্রক্রমের ব্যবহার বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঋগ্বেদে দেবতার সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে—ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণি.........ত্রিংশচ্চ.........নব চ। বৃহৎদেবতায় বলা হয়েছে—ত্রীণি সহস্রাণি নব ত্রীণি শতানি চ।

সাধারণতঃ জৈন গণিতশাস্ত্রে অঙ্কপাত দক্ষিণাগতিতে করা হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যায় যেমন জিনসেন তাঁর নেমীপুরাণে বলেছেন—

একমষ্টোচ চত্বারি চতুঃষট্ সপ্তভিশ্চতুঃ।
চতুঃশূন্যংচ সপ্তনিসপ্তশূন্যং নবাপি চ ॥
পঞ্চপঞ্চৈকং ষট্ চ তথৈকং পঞ্চ তত্ত্বতঃ।
সমস্তশ্রুতবর্ণানাং প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতং ॥

এখানে উদ্দিষ্ট সংখ্যাটি হচ্ছে : ১৮, ৪৪৬, ৭৪৪, ০৭৩, ৭০৯, ৫৫১, ৬১৪, তাছাড়াও জিনভদ্রগণি বৃহৎক্ষেত্রসমাসে লিখেছেন—

দুবীষ চোয়াল স্থন্নট্ঠ = ২২৪৪,০০০০,০০০০

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নেমীচন্দ্র গোম্মটসারের জীবকাণ্ডের ১৫৮ তম গাথায় বলেছেন :

তললীনমধুগাবিমলং ধমুসিলা গাবিচোরভয়মেরু
তটহরিখঝসা হোংতি হ মানুস পজ্জত্ত সংখ্যকা।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট সংখ্যাটি হচ্ছে—৭৯, ২২৮, ১৬২, ৫১৪, ২৬৪, ৩৩৭, ৫৯৩ ৫৪৩, ৯৫০, ৩৩৬।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে নাম সংখ্যা প্রণালী, অক্ষর সংখ্যা প্রণালী ও কটপয়াদি প্রণালীতে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি উভয় প্রণালীই ব্যবহৃত হয়েছে।

জৈন গণিতগ্রন্থে অক্ষর সংখ্যা প্রণালীতে দক্ষিণাগতি প্রয়োগ করা হয়েছে সে

কথা নেমিচন্দ্র লিখিত ত্রিলোকসারের ৯৮-তম গাথাতে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে :

বটলবণরোচগোনগনজরনগংকাসসসঘধপরকধরং
বিগুণণবস্থন্নসহিদং পল্লস্‌স রোমপরিসংখ্যা।

এখানে উল্লিখিত সংখ্যাটি হচ্ছে—৪১৩, ৪৫২, ৬৩০, ৩০৮, ২০৩, ১৭৭, ৭৪৯, ৫১২, ১৯২, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০।

বিভিন্ন উদাহরণ ও উক্তি থেকে আমরা স্পষ্টই দেখতে পেলাম ভারতীয় গণিত-শাস্ত্রে অঙ্কপাত করা হয় বামাগতিতে এবং জৈনরা দক্ষিণাগতিতে অঙ্কপাত বহুক্ষেত্রে করেছে। জৈনদের গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায় যে অংকট্ঠান পরাহুতা শব্দটি লেখা আছে। এর অর্থ অঙ্কপাত বিপরীতক্রমে অর্থাৎ বামগতিতে লেখা যায়। অনেক পণ্ডিত প্রশ্ন তোলেন যে জৈন গণিতশাস্ত্রে যে কয়েকটিক্ষেত্রে 'বামাগতি' অনুসৃত হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে দক্ষিণাগতি প্রয়োগ করলে ক্ষতি কি? ক্ষতি নিশ্চয়ই আছে। কারণ ঐ সব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে দক্ষিণাগতি ধরে অঙ্কপাত করলে একটি সংশয় ও উদ্ভট সংখ্যার উদ্ভব হয়। যেমন ধরা যাক নেমীচন্দ্র ত্রিলোকসারের একজায়গায় বলেছেন—'খ বার ইগিদালং' বামাগতিতে অঙ্কপাত করলে দাড়ায় ৪১১২০ কিন্তু দক্ষিণাগতিতে অঙ্কপাত করলে প্রথমে ০ বসবে। সুতরাং এক্ষেত্রে দক্ষিণাগতি প্রয়োগ করা চলে না। অবশ্য নেমিচন্দ্র দক্ষিণাগতিতেও অঙ্কপাত করেছেন যেমন তিনি বলেছেন—সত্তরসাং বাণউদীণভনবস্থন্নং' এটিকে দক্ষিণাগতিতে অঙ্কপাত করলে দাঁড়ায় ১৭৯২০৪০।

অঙ্কের বামদিকে গতি সম্পর্কে পরবর্তী কালে বিভিন্ন টীকাকার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে গণেশ দৈবজ্ঞ, নৃসিংহ দৈবজ্ঞ ও মুনীশ্বরের নাম উল্লেখযোগ্য। গণেশ দৈবজ্ঞ বলেছেন :

'গণনাক্রমঃ সর্বত্র সব্যক্রমেণৈব ভাব্যঃ। সর্ব্বাত্রাপসব্যক্রমস্য শিষ্টগর্হিতত্বাদেকাদিসংজ্ঞানাং বামক্রমমন্তরেণ গণনায়াঃ সব্যক্রমো ন সম্ভবতি। যথৈযামঙ্কানাং ১২৩৪ এক সহস্রং দ্বে শতে দশকত্রয়ং চত্বারশ্চেতি সব্যক্রমেণ গণনা স্যাৎ। লোকৈরপ্যনেনৈব ক্রমেণোচ্যতে। ন তু চত্বারিত্রিংশদ্দ্বেশতে সহস্রমেবমিত্যুচ্যতে। অপি চ কাল কীর্ত্তনং প্রয়োগেঽপি পরার্দ্ধকল্পমন্বন্তর-যুগবৎসরাদিকং দেশকীর্ত্তনেঽপি দ্বীপবর্ষখণ্ডাদিকং চ স্থূলসূক্ষ্মমিত্যনেনৈব ক্রমেণোচ্যতে। এবমুচ্যমানে গণনায়াঃ সব্যক্রমস্থানানাং বামক্রমো ভবতি। তস্মাদেকাদিস্থানানাং বামক্রমেণৈককাদিসংজ্ঞেতি সমাচারঃ।'

অর্থাৎ গণনাক্রম সর্বত্র সব্যক্রমেই হওয়া উচিত। যেহেতু অপসব্য ক্রম সর্বদাই শিষ্টগর্হিত। একক-দশকাদি সংখ্যার বামাগতি ব্যতিরেকে গণনায় সব্যক্রম হওয়া

সম্ভব নহে। যেমন ১২৩৪, এই সংখ্যাটিকে এক হাজার দু'শ তিন দশক চার' এই প্রকারে বলাই সব্যক্রমে গণনা; সেইজন্য লোকেও সেই প্রকার করিয়া থাকে। চার তিরিশ দু'শ এক হাজার কেউ বলে না। আরও দেখ কাল বর্ণনা করিতে লোকে পরার্ধ কল্প মন্বন্তর যুগ বৎসরাদিক্রমে করিয়া থাকে, দেশ বর্ণনা করিতে দ্বীপ-বর্ষ খণ্ডাদিক্রমে বলে। অর্থাৎ সর্বত্র বৃহত্তর হইতে ক্ষুদ্রতরের দিকে গতিক্রমেই লোকে (স্বভাবতঃ) বলিয়া থাকে। গণনাও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে, অঙ্কস্থানের বামাগতিই সব্যক্রম হইবে। সেই হেতু বামাগতিতেই অঙ্কস্থানের এককাদি সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে। (অঙ্কানাং বামতো গতিঃ, বিভূতি ভূষণ দত্ত, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃঃ ৭৪)

মুনীশ্বর এ সম্পর্কে বলেছেন—সংখ্যা বস্তুতঃ অনন্ত, সুতরাং স্থানও অনন্ত, সেই হেতু উর্দ্ধতন স্থানের অবধি নাই। যাহার অবধি নাই, তাহা হইতে আরম্ভ হইতে পারে না। সাধারণতঃ একটি অবধি ধরা হয় বটে, কিন্তু উহাও লোকব্যবহারমাত্র। অধিকন্তু তদ্বিষয়েও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অষ্টাদশ স্থান পরার্ধ শেষ অবধি মানেন। অপরে আরও অধিক স্থানের উল্লেখ করেন। সুতরাং শেষ অবধি অনিত্য অপরপক্ষে প্রথমাবধি একক স্থান, নিয়ত। তাই তথা হইতে আরম্ভ করা হয়। সুতরাং অঙ্কে বামাগতি না হইয়া পারে না। (ঐ, পৃঃ ৭৫)

আমাদের আলোচনাতে স্পষ্টই বোঝা গেল প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে হিন্দুরা বামাগতিতেই অঙ্কপাত করতেন। অবশ্য জৈনদের মধ্যে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয় প্রণালীই বিদ্যমান ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে নাম সংখ্যা[১]

ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে অথবা গণিত গ্রন্থে সংখ্যার নামোল্লেখ না করে অথবা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে কোন বস্তুর নামোল্লেখ করা হোত। সাধারণতঃ এই পদ্ধতিকে কোন কোন পণ্ডিত "শব্দ সংখ্যা" বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ আঙ্কিক শব্দ বলেছেন। সুপ্রসিদ্ধ গণিতাচার্য মহাবীর (৭৭৫ শকাব্দ) এই পদ্ধতিকে "সংখ্যা সংজ্ঞা" বলেছেন। মহাভাস্করীয়ের ভাষ্যকার সূর্যদেব যজ্বা নিম্নোক্ত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন :

"অক্ষরসংজ্ঞা জ্ঞেয়া ক্বচিৎ ক্বচিদ্ভূত সংজ্ঞিকা জ্ঞেয়া।
সংখ্যাবস্তূনি যথা সুকরাণ্যুপ পাদয়িতুং তথা বক্ষ্যে ॥"

পদ্ধতির নামকরণে যে যাই বলুন না কেন তবে এই পদ্ধতির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে : (ক) সংখ্যাকে বস্তু দিয়ে নির্দেশ করা, (খ) বস্তুকে সংখ্যা দিয়ে নির্দেশ করা। আমরা সকলেই জানি পৃথিবীর একটি চন্দ্র ছাড়া দ্বিতীয় চন্দ্র নেই সুতরাং এক সংখ্যাকে নির্দেশ করতে "চন্দ্র" শব্দটি উল্লেখ করা হ'য়ে থাকে। ব্রহ্ম "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" সুতরাং এক সংখ্যা বিবক্ষার্থে ব্রহ্ম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। মানুষের দুটি কর এবং দুটি নেত্র সুতরাং দুই সংখ্যা নির্দেশনার্থে কখনও কর কখনও বা নেত্র শব্দ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ঠিক এইভাবে যদি আমরা ভারতীয় শাস্ত্র ও গণিতগ্রন্থ পাঠ করি তাহলে দেখতে পাব যে এক থেকে নয় এবং তার বেশী সংখ্যার নির্দেশনার্থে বিভিন্ন বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূর্যসিদ্ধান্তে বলা হয়েছে বৃহস্পতি গ্রহ এক মহাযুগে প্রদক্ষিণ করে "খদস্রাক্ষিবেদষড়বহ্নি" বার। এখানে খ (=০), দস্র (=২) অক্ষি (=২), বেদ (=৪) ষড় (=৬), বহ্নি (=৩)। এগুলিকে ভারতীয় নিয়ম "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ বিধিতে লিখলে দাঁড়ায় ৩৬৪২২০ ; অতএব বৃহস্পতি এক মহা-যুগে ৩৬৪২২০ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। ঠিক এইভাবে পাওয়া যায় গুণরস=৫৩, শশিযমশর=৫২১, সমুদ্রবসুবিষয়=৫৮৪, খরাম=৩০, রসার্ক=১২৬, খেষব=৫০, খযুগা=৪০, খার্ণব=৪০, খরস=৬০, বেদাগ্নি=৩৪, বাণগুণ=৩৫, বসবাণাক্ষি =২৫৬, খচতুষ্করদার্ণবাঃ=৪০২০০০০,

এই পদ্ধতিতে কি ধরণের সুবিধা এবং অসুবিধা আছে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে

(১) নাম সংখ্যা, বিভূতি ভূষণ দত্ত, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

কৌতূহল আছে। গণিত ঐতিহাসিক বিভূতিভূষণ দত্ত বলেছেন—এই সংখ্যার উল্লেখের পিছনে মূলত তিনটি কারণ আছে। সেগুলি হচ্ছে (ক) এই পদ্ধতি ছন্দের উপযোগী, (খ) এই পদ্ধতিতে কোন বড় সংখ্যাকে ছোট করে লেখা যায়। যেমন ১৪৩৩২৪ একটি বড় সংখ্যা। কিন্তু নাম সংখ্যার দৌলতে এটি লেখা হয় "বেদযুগগুণরামাব্ধি চন্দ্র"। তাছাড়াও সমুদ্ররদহুতাশন মনু অথবা জিনরামমনু প্রভৃতি এই সংখ্যাটির পরিবর্তে লেখা হয়ে থাকে। (গ) সংখ্যার বিশুদ্ধি রক্ষণ করতে এ পদ্ধতি এক আশ্চর্য ফল দেয়। অনেক সময় দেখা যায় পরবর্তী লেখকেরা কখনও সংখ্যা পাতন করতে গিয়ে এক বা একাধিক সংখ্যা চিহ্ন বসাতে ভুলে গিয়েছেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে বসান নাই। কিন্তু নাম সংখ্যা ব্যবহৃত হলে এ ধরণের ভ্রান্তি কম হয়ে থাকে।

অসুবিধার কথা বলতে গেলে প্রধানত একটি অসুবিধার কথাই মনে আসে। সেটি হচ্ছে—এই পদ্ধতিতে একই শব্দের সাহায্যে নানা ধরণের সংখ্যা নির্দেশ করতে পারে। যেমন ধরা যাক "পঙ্‌ক্তি" শব্দটি। এটিতে পাঁচটি পাদ আছে এবং প্রতিটি পাদে ৮টি করে অক্ষর আছে। সুতরাং মোট ৪০টি অক্ষর আছে। অতএব পঙ্‌ক্তি =৪০ ধরা হবে। কিন্তু বেদে পাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে পঙ্‌ক্তি=৫ ধরা হয়ে হয়েছে। আবার পরবর্তী কালে কোথাও কোথাও যেমন পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে পঙ্‌ক্তি =১০ ধরা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে :

অযোধ্যায়াং মহারাজঃ পুরা পঙ্‌ক্তিরথো বলী।
তস্যাত্মজো রামচন্দ্রঃ সর্ব্বশূরশিরমণিঃ ॥

এখানে "পঙ্‌ক্তিরথ" শব্দটির অর্থ দশরথ অর্থাৎ পঙ্‌ক্তি=১০ ধরা হয়েছে। "বিরাট" শব্দটি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ১০ সংখ্যা ধরা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও বিরাট=৩০ উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক এইভাবে "ষটশতং'কে কেউ বলেন ৬০০, আবার কেউ বলেন ১০৬। সেইরূপ 'পঞ্চশতং'কে কেউ বলেন ৫০০, আবার কেউ বলেন ১০৫।

ভারতবর্ষে কবে নাগাদ নাম সংখ্যার প্রচলন হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে রীতিমত বিরোধ রয়েছে। জি. আর. ক্যে মনে করেন খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে "নাম সংখ্যা" ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে প্রবেশ করে। ওয়েবার (বেবর) প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন এই পদ্ধতি ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে অতি প্রাচীনকাল থেকেই আছে। আমরা যদি বেদ, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি ভারতীয় গ্রন্থ পর্যালোচনা করি তাহ'লে এই সব গ্রন্থে নাম সংখ্যার প্রয়োগ ভূরি ভূরি দেখতে পাবো। বেদের মধ্যে নাম সংখ্যার উল্লেখ আছে। এ গুলির কিছু কিছু নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথম উদাহরণ ঋগ্বেদের দশম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ মণ্ডলের পঞ্চম শ্লোকটি তুলে ধরছি। এখানে বলা হয়েছে—"সপ্ত ক্ষরন্তি শিশবে মরুত্বতে পিত্রে·········"

অর্থাৎ, স্তোতৃবর্গ পরিবেষ্টিত ও শংসনীয় পিতার উদ্দেশ্যে সপ্ত (অর্থাৎ সপ্ত সংখ্যক ছন্দ) উচ্চারিত হচ্ছে। এখানে সপ্ত সংজ্ঞার দ্বারা বৈদিক ছন্দকে বোঝান হচ্ছে। সায়নাচার্য ভাষ্য করতে গিয়ে বলেছেন—"সপ্তছন্দাংসি ক্ষরন্তি"। কিন্তু অথর্ববেদে এই শ্লোকটির ভাষ্য করতে গিয়ে সায়ণাচার্য সপ্ত সংখ্যক নদীর কথাই বলেছেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সপ্ত শব্দটি থেকে দুটি নাম সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। এবার ঋগ্বের্দের সপ্তম অধ্যায়ের একশ তিন শ্লোকটির কথা ধরা যাক। এখানে বলা হয়েছে ঃ

"দেবহিতিং জগুপুর্দ্বাদশস্য ঋতুং নরো না প্রমিনংত্যেতে" দ্বাদশ বলতে বৎসরকেই বোঝান হয়েছে। অন্তত এ কথার সমর্থনের জন্য সায়নাচার্যের ভাষ্য তুলে ধরা যেতে পারে। সায়নাচার্য বলেছেন,—"দ্বাদশস্য দ্বাদশমাসাত্মকস্য সংবৎসরস্য"। এবার ঋগ্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ের ছাব্বিস মণ্ডলের অষ্টম ঋকটি তৃতীয় উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরছি। এখানে বলা হয়েছে—"ত্রিভিঃ পবিত্রৈরপুপোদ্ধ্যর্কং" অর্থাৎ (অগ্নি) "পবিত্র তিন দ্বারা অর্চনীয় আত্মাকে পবিত্র করেছিলেন। এছাড়াও নাম সংখ্যার আরও প্রয়োগ ঋগ্বেদের নানা মণ্ডলে দেখতে পাওয়া যায়।

সামবেদেও নাম সংখ্যার প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে—"অয়ং ত্রিঃসপ্ত দদুহান"। এখানে ত্রিঃসপ্ত সংখ্যা দিয়ে ঐ সংখ্যক গুরুকে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য একটি শ্লোক সংখ্যা দিয়ে বস্তুকে বোঝান হয়েছে। যেমন 'ধ্বস্রয়ো পুরুষান্ত্যো বা সহস্রাণি দদ্মহে'। এখানে সহস্র অর্থ সহস্র সংখ্যক ধন বোঝান হয়েছে। অথর্ববেদেও নাম সংখ্যার বহুল ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন কোন এক জায়গায় বলা হয়েছে "অশীতিভিস্তিস্হভিঃ সামগেভিরাদিত্যেভির্বসুভিরঙ্গিরোভিঃ"। এখানে ত্রি অশীতি অর্থাৎ গায়ত্রী, উষ্ণী ও বৃহতী তৃচ বা এর প্রতিপাদ্য ইন্দ্র দেবতাকে বলা হয়েছে। কারণ ঐতরেয় আরণ্যকে বলা হয়েছে "গায়ত্রী তৃচাশীতিঃ ঔষ্ণিহী তৃচাশীতিঃ বার্হতী তৃচাশীতিঃ" অর্থাৎ গায়ত্রী অশীতি সংখ্যক, উষ্ণি অশীতি সংখ্যক, বৃর্হতী অশীতি সংখ্যক। অথর্ববেদে অন্য কোন এক জায়গায় সংখ্যা দিয়ে বস্তুকে নির্দ্দেশ করেছে। যেমন ঃ

নবৈব তা নবতয়ো যা ভূমির্ব্যধূনুত।
প্রজাং হিংসিত্বা ব্রহ্মাণীমসংভব্যং পরাভবন্॥ ৫।১৯।১১.

শ্লোকটির অর্থ সম্পূর্ণভাবে না লিখলেও আমরা বলতে পারি, 'নবনবতি সংখ্যা দিয়ে শম্বরের নবনবতিপুর বিবক্ষিত হয়ে থাকবে'। অথর্ববেদের এমন একটি উদাহরণ

তুলে ধরছি যেখানে একই নাম সংখ্যার বিভিন্ন প্রকারের অর্থ হতে পারে এমন ইঙ্গিত দেওয়া আছে। যেমন এখানে বলা হয়েছে—"ওঁ যে ত্রি সপ্তা পপিষন্তি"। এই ত্রি সপ্ত'র অর্থ করতে গিয়ে সায়নাচার্য তিন ধরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এগুলি হচ্ছে—

(ক) ত্রয়ো বা সপ্ত বা। এখানে ত্রি অর্থ পৃথিবীব্যাপি ত্রিলোক এদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্য ; ত্রিগুণ ; অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। সপ্ত অর্থ সপ্ত ঋষি, সপ্ত গ্রহ, সপ্তলোক অথবা সপ্ত ছন্দ, সপ্ত মরুদগণ,

(খ) ত্রিঃ সপ্ত অর্থাৎ তিনটি সাত, সপ্তদিশ, সপ্ত ঋত্বিজ, সপ্ত আদিত্য অথবা সপ্ত সিন্ধু, সপ্তলোক, সপ্ত দিক। অর্থাৎ এখানে সাতটা বস্তু নিয়ে একটি দল গড়া হচ্ছে এবং এ ধরণের তিনটি দলের কথা বলতে ত্রিঃ সপ্তকে উল্লেখ করা হয়েছে।

(গ) ত্রিগুণিতা সপ্ত সংখ্যা অর্থাৎ ২১, এখানে বার মাস, পাঁচটি ঋতু, তিনটি লোক এবং আদিত্য এই একুশকেই বোঝান হয়েছে। অথবা পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও এক অন্তকরণের কথা ধরা হয়েছে। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম—অথর্ববেদে বস্তুর দ্বারা সংখ্যাকে এবং সংখ্যার দ্বারা বস্তুকে অনেক জায়গায় নির্দ্দেশ করেছে। এবার কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র এবং লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হবে যে, শ্রৌতসূত্রগুলিতেও নাম সংখ্যার বহুল ব্যবহার রয়েছে। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে বলা হয়েছে—"দক্ষিণা গায়ত্রী সম্পন্না ব্রাহ্মনস্য"। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দক্ষিণা গায়ত্রী সম্পন্ন। এখানে গায়ত্রীর অর্থ ২৪, এর কারণ গায়ত্রী একটি বৈদিক ছন্দের নাম। এতে তিনটি পাদ আছে এবং প্রত্যেক পাদে আটটি করে অক্ষর আছে। অতএব ২৪ না বলে গায়ত্রী =(৩×৮) বলা হয়েছে। ঠিক এইভাবে জগতী =৪৮ ধরা হয়েছে। কারণ জগতী ছন্দে চারটি পাদ আছে এবং প্রতিটি পাদে বারোটি করে অক্ষর আছে। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে একই সঙ্গে গায়ত্রী এবং জগতী শব্দ দুটি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে—"গায়ত্রী সম্পন্না দক্ষিণা ব্রাহ্মণো দদ্যাৎ, জগতী সম্পন্না রাজা"। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে গায়ত্রী সম্পন্ন দক্ষিণা দিবে এবং রাজাকে জগতী সম্পন্না দক্ষিণা দিবে।

মহাভারতে নাম সংখ্যা প্রণালীর ব্যবহার বহুল দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ১৬৭।২৭-২৮ শ্লোক দুটি তুলে ধরা যেতে পারে। এখানে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ঃ

অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা ॥

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির'।
ত্রিভাগাশেষং পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি ॥'

নীলকণ্ঠ সূরী এই শ্লোক দুটির ভাষ্যে বলেছেন—অষ্টপঞ্চাশতং এর অর্থ ৪২। অষ্টপঞ্চাশতং = অষ্টপঞ্চ + অশতং = ১০০ − অষ্টপঞ্চ = ১০০ − ৫৮ = ৪২। অবশ্য নীলকণ্ঠ সূরী কোন এক জায়গায় অষ্টপঞ্চাশতং = ৫৮ বলে মত দিয়েছেন। যাই হোক আমরা শ্লোকটিতে নামসংখ্যার ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। মহাভারতের শান্তিপর্বের কোন এক জায়গায় নাম সংখ্যার প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এই শান্তিপর্বে বলা হয়েছে :

"পঞ্চাশতং ষট্ চ কুরুপ্রবীর
শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য
ততঃ শুভৈঃ কর্ম্মফলোদয়ৈস্ত্বং
সমেষ্যসে ভীষ্ম বিমুচ্য দেহম্।

এখানে "পঞ্চাশতং ষট্ চ" এর অর্থে নীলকণ্ঠ সূরী বলেছেন, ৩০।
মহাভারতের একটি জায়গায় মহর্ষি বৈশম্পায়ণ জন্মেজয়কে বলেছেন[১] :

পাণ্ডবানামিহায়ুস্তং শৃণু কৌরবনন্দন।
জগাম হাস্তিনপুরং ষোড়শাব্দো যুধিষ্ঠিরঃ ॥
ভীমসেনঃ পঞ্চদশো বীভৎসুর্বৈ চতুর্দ্দশঃ।
ত্রয়োদশাব্দৌ চ যমৌ জগ্মতুর্নাগসাহ্বয়ম্ ॥
তত্র ত্রয়োদশাব্দানি ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিতাঃ।
ষণ্মাসান্ জাতুষগৃহান্মুক্তা জাতো ঘটোৎকচঃ ॥
ষণ্মাসানেবচক্রায়াং বর্ষং পাঞ্চালকে গৃহে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিত্বা পঞ্চ বর্ষাণি ভারত ! ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্তে ত্রীণি বর্ষাণি বিংশতিম্।
দ্বাদশাব্দানথৈকঞ্চ বভূবুর্দ্যূতনির্জিতাঃ ॥
ভুক্ত্বা ষট্ত্রিংশতং রাজন ! সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্।
মাসৈঃ ষড়্ভির্ম্মহাত্মানঃ সর্বে কৃষ্ণ পরায়ণাঃ ॥
রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য দিষ্টাং গতিমবাপ্নুবন্।
এবং যুধিষ্ঠিরস্যাসীদায়ুরষ্টোত্তরং শতম্ ॥

(১) বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বয়স—বিভূতিভূষণ দত্ত—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। ১৩৪৪,

মর্মার্থ হচ্ছে—যুধিষ্ঠিরের ১৬, বৎসর ভীমের ১৫ বৎসর অর্জুনের ১৪ বৎসর এবং নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর সময়ে তাঁরা শতশৃঙ্গ পাহাড় থেকে হস্তিনাতে গেলেন। সেখানে দুর্যোধন প্রভৃতির সঙ্গে ১৩ বৎসর বাস করলেন। পরে যতুগৃহে ৬ মাস কাটানোর পর বেরিয়ে পড়লেন। পথে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। একচক্রপুরীতে ৬ মাস কাটানোর পর দ্রুপদ রাজার কাছে ১ বৎসর থাকেন। দুর্যোধন প্রভৃতির সঙ্গে ৫ বৎসর থাকার পর ইন্দ্রপ্রস্থে ২৩ বৎসর কাটান। তারপর বনবাস ১২ বৎসর এবং ১ বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। ৩৬ বৎসর রাজত্ব করার পর পরীক্ষিতকে সিংহাসনে বসিয়ে ৬ মাসে যুধিষ্ঠির স্বর্গলোকে উপস্থিত হন। এই হিসাবে যুধিষ্ঠিরের বয়স ১০৮ বৎসর।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঠিক আগে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে অর্জুন সম্বন্ধে বলছেন—

একান্ত বিজয়স্ত্বেব শ্রূয়তে ফাল্গুনস্য চ
ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমাহূয় খাণ্ডবেঽগ্নিমতর্পয়ৎ ॥

মর্মার্থ হচ্ছে—"কিন্তু ফাল্গুনীর কেবল বিজয়ের কথা শোনা যায়। ত্রয়স্ত্রিংশবর্ষ বয়স্ক (ফাল্গুনী) খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিকে আহুতি দিয়ে তৃপ্ত করেছিলেন"। এখানে 'ত্রয়ত্রিংশৎ' এর অর্থ ৩৩। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ লিখেছেন—ত্রয়ত্রিংশদ্‌তি বিভক্তি লোপ আর্ষঃ। দ্বাদশাদিত্যাঃ একাদশ রুদ্রাঃ আষ্টট বসবঃ ধাতা, ইন্দ্রশ্চেতি ত্রয়স্ত্রিংশতং সুরান খাণ্ডবে সমহূয়।" অর্থাৎ ত্রয় স্ত্রিংশৎ = তেত্রিশ দেবতা এই অর্থ সিদ্ধান্ত বাগীশ মশাই বলেছেন। সুতরাং আমরা দেখলাম যে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কথোপকথনে নাম সংখ্যার প্রয়োগ করেছেন। শুধু ধৃতরাষ্ট্র কেন? অর্জুন, গান্ধারী অনেকেই নাম সংখ্যার বহুল ব্যবহার করেছেন। মহাপ্রস্থানিক পর্বে উত্তর গোগৃহের যুদ্ধের আগে অর্জুন উত্তরকে গাণ্ডীর ধনুর কথা যখন বলছিলেন তখন তিনি নাম সংখ্যার ব্যবহার করেন। তিনি বলেছিলেন :

এতদ্ববর্ষসহস্রন্তু ব্রহ্মা পূর্বমধারয়ৎ
ততোঽনন্তরমেবাথ প্রজাপতিরধারয়ৎ ॥
ত্রীণি পঞ্চশতঞ্চৈব শক্রোঽশীতিঞ্চ পঞ্চ বৈ।
সোমঃ পঞ্চশতং রাজা তথৈব বরুণঃ শতম্ ॥
পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ।

অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মা উহা (গাণ্ডীব) সহস্রবর্ষ ধারণ করেছিলেন, তারপর প্রজাপতি ৫০৩ বর্ষ, ইন্দ্র ৮৫ বর্ষ, চন্দ্র ৫০০ বর্ষ, রাজা বরুণ ১০০ বর্ষ এবং শ্বেতবাহন অর্জুন ৬৫ বর্ষ ধারণ করেছিলেন।

মনে হয় বর্ষ শব্দাটি হয়তো দেববর্ষ বোঝান হয়েছে। মানুষের এক সৌর সংবৎসর দেবতাদের একদিন। ৩৬০ সৌর বৎসরে এক দেববর্ষ।[১]

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ দেবার সময় নাম সংখ্যার প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি স্ত্রীপর্বে বলেছেন :

ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষটত্রিংশে মধুসূদন
হত জ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ
কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি।

অর্থাৎ হে মধুসূদন ষট ত্রিংশৎ বৎসর সমুপস্থিত হইলে তুমিও নিশ্চয়ই জ্ঞাতি, অমাত্য এবং পুত্রহারা হইয়া বনচারী হইয়া অতি কুৎসিৎভাবে নিহত হইবে [২]।

যাই হোক, বেদ, বেদান্ত, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে যেসব উদ্ধৃতি আমাদের নজরে এলো তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে নাম সংখ্যার ব্যবহার বহুল পরিমানে ছিল। এবার উৎপল ভট্ট রচিত মূলপুলিশ সিদ্ধান্ত, মহাকবি কালিদাসের জ্যোতির্ব্বিদভরণ এবং শকুন্তলা নাটকের মঙ্গলাচরণের শ্লোকগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। মূলপুলিশ সিদ্ধান্তে নাম সংখ্যা সহকারে যে শ্লোকটি আছে সেটি হচ্ছে :

খখাষ্ট মুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্টশর রাত্রিপাঃ।
ভানাং চতুর্যুগেনৈতে পরিবর্ত্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

এখানে খ (=০) খ (=০) অষ্ট (=৮) মুনি (=৭) রাম (=৩) অশ্বি (=২) নেত্র (=২) অষ্ট (=৮) শব (=৫) এবং রাত্রিপ (=১)

খখাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্টশরাত্রিপাঃ = ১৫৮২২৩৭৮০০

সংখ্যাটি যে স্থানীয় মান সহকারে লিখিত আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কালিদাসের জ্যোতির্বিদ্যাভরনের ২২ অধ্যায়ের ২১-তম শ্লোকে বলা হয়েছে—

বর্ষে সিন্ধুরঃ দর্শনম্বরঃ গুণৈর্যাতে কলৌ সম্মিতে।
মাসে মাধব সংজ্ঞিতে চ বিহিতো গ্রন্থ ক্রিয়োপক্রমঃ॥
নানাকাল বিধানশাস্ত্রগদিতজ্ঞানং বিলোক্যাদরাৎ।
উর্জ্জে গ্রন্থসমাপ্তিরত্র বিহিতা জ্যোতির্ব্বিদাং প্রীতয়ে॥

এখানে সিন্ধুর (=৮), দর্শন (=৬), অম্বর (=০), গুণ (=৩) অঙ্কস্য বামাগতি অনুযায়ী লিখলে সংখ্যাটি হবে ৩০৮৬।

---

(১) নীলকণ্ঠ সুরীর মত।

(২) বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বয়স, বিভূতিভূষণ দত্ত, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বর্ষ ৪৪।

কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্থানীয়মান সহকারে নাম সংখ্যার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে সমবৃত্তা নামে এক ধরণের তুলাদণ্ডের কথা উল্লেখিত আছে। এই লৌহদণ্ডের উপর মান পরিজ্ঞাপক চিহ্ন খোদিত আছে। সর্বপ্রথম চিহ্নটি হচ্ছে কর্ষমান। অন্যান্য চিহ্ন সম্বন্ধে কৌটিল্য বলেছেন ঃ

> ততঃ কর্ষোত্তরং পলং পলোত্তরং দশ পলং, দ্বাদশ পঞ্চদশ বিংশতিরিতি কাররয়েৎ ততঃ আশতাদ্দশোত্তরং কারয়েৎ। অক্ষেস্থ নান্দীপনদ্ধং কারয়েৎ।

অর্থাৎ "তারপর এক এক কর্ষ বৃদ্ধি করিয়া পল (পর্যন্ত), পল পল বৃদ্ধি করিয়া দশ পল (পর্যন্ত), দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও বিংশতি এই চিহ্ন করিবে। অক্ষস্তলাদিতে নান্দী চিহ্ন খোদিত করিবে"। (বিভূতি ভূষণ দত্ত, শব্দ সংখ্যা লিখন প্রণালী, সাহিত পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩৫ পৃঃ ২১)

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন—"অক্ষেস্থ" কথাটির অর্থ ডঃ বি. বি. দত্ত বলেছেন ২৫, ৩৫, ৪৫, ইত্যাদি সংখ্যা কিন্তু ভট্‌স্বামী প্রমুখ পণ্ডিতেরা অক্ষেস্থ শব্দটি ৫, ১০, ১৫ প্রভৃতি ৫ এর গুণিতকের সংখ্যা বলে ধরেছেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে লিখিত বাখ্‌শালীর পাণ্ডুলিপিতে নামসংখ্যা প্রণালীর সাহায্যে কতকগুলি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 58A পৃষ্ঠার শ্লোকটি তুলে ধরছি।

> যড়্‌বিংশচ ত্রিপঞ্চাশ একোনত্রিংশ এব চ
> দ্বাব (ষ্টি) যড়্‌বিংশ চতুঃচত্বারিংশ সপ্ততি ॥
> চতুঃষষ্টি ন (ব)·····················ংশনন্তরম্
> ত্রিরশীতি একবিংশ অষ্ট·················পকং।

এটিকে অঙ্কে পাত করলে হবে—২৬৫৩২৯৬২২৬৪৪৭০৬৪৯৯৪······৮৩২১৮

সাধারণত অঙ্কের বাম দিকে গতি অনুযায়ী অঙ্কপাত করা হয়ে থাকে কিন্তু এ ক্ষেত্রে দক্ষিণাগতিতে অঙ্কপাত করা হয়েছে।

শুধুমাত্র ভারতীয় শাস্ত্র ও পাণ্ডুলিপিতেই নাম সংখ্যার উল্লেখ নেই। ভারতে ও ভারতীয় উপনিবেশগুলিতে বিভিন্ন শিলালেখ ও তাম্রলেখতেও নাম সংখ্যার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী বায়ং নগরীতে ৬০৪ ও ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত দুটি শিলালেখে রশাশ্বিবাণ = ৫২৬ এবং ঋতুসমুদ্রেন্দ্রিয় = ৫৪৬ ধরা হয়েছে।

৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের চালুক্য বংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর সময় কবি রবি-

---

দ্রষ্টব্য ঃ আঙ্কিক শব্দ—যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—৩৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

কীর্ত্তি শিলাফলকের জন্য যে শ্লোকটি লিখেছিলেন তাতে নামসংখ্যার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। শিলালেখে বলা হয়েছে ঃ

ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহ বাদিতঃ।
সপ্তাব্দ শত যুক্তেষু গতেস্বব্দেষু পঞ্চসু ॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূজজাম্‌ ॥

এর মূল অর্থ হচ্ছে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হতে ৩৭৩৫ বছর কেটে যাবার পর এবং ৫৫৬ শকাব্দের পর এই শিলাফলক উৎকীর্ণ হল।

রোটাস শিলাপিপিতে যোগবিধির নিয়মে নামসংখ্যার উল্লেখ আছে। এখানে বলা হয়েছে ঃ

নবতির্নবমুনীন্দ্রের্বাসরাণামধীশৈঃ
পরিকলয়তি সংখ্যাং বৎসরে সাহশাকে ॥

এখানে নবতি (=৯০), নব (=৯), মুনি (=৭), ইন্দ্র (=১৪), বাসরাণামধীশঃ (=১২) ; যোগবিধির সাহায্যে এটি লিখলে হবে ঃ ৯০+৯+৭+১৪+১২=১৩২ অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে রোটাস শিলালিপি ১৩২ শকাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছে। অতএব আমরা দেখতে পেলাম নামসংখ্যার প্রয়োগ ব্যাপক আকারে ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবার জৈন শাস্ত্রে এবং গণিতগ্রন্থের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে জৈন নানা আগমশাস্ত্রে নাম সংখ্যার বহুল ব্যবহার রয়েছে। বিশেষ করে অনুযোগদ্বারসূত্রে, জিনভদ্রগনি লিখিত বৃহৎক্ষেত্রমাসে, নেমীচন্দ্র লিখিত গোম্মটসারে, ত্রিলোকসারে, তিলয়পন্নত্তিতে (ত্রিলোকপ্রজ্ঞপ্তি), ব্যবহার সূত্রে, সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যাপক নাম সংখ্যার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ধরা যাক—

(ক) সুন্নিংদিয়দুগপংচয়ইক্কগতিগ = ৩১৫২৫০ (বৃহৎ ক্ষেত্রসমাস ১।৮৫)
(খ) পণ সত্তগ তিগ পণ তিগ দুগ চউট্‌ঠিক্কো = ১৮৪২৩৫৩৭৫ (ঐ ১।৩৯১)
(গ) নবচদুদুগখত্তিয়দুগচউক্কেক্কক = ১৪২৩০২৪৯
(ঘ) বার খং ছক্কং = ৬০১২ (গোম্মটসার ; ১২৫ গাথা)
(ঙ) অট্ঠছানংসুংণংপঞ্চদুরিগিগয়ণতিনহণবসুংণ
অংবর ছক্কেক্কো হিং অংককাম·········
=১৬০০৯০৩০ ১২৫০০০০০০০০

(চ) পন্নাসমেকাদলংণবছপ্পন্নাসস্তন্নবসদরী
(পঞ্চাশদেকচত্বারিংশন্নবষট্পঞ্চাশচ্ছূন্যং নবসপ্ততি)
= ৭৯০৫৬৯৪১৫০

(ছ) ছাদালস্তন্নসত্তয়বাবন্নং = ৫২৭০৪৬
(ষট্চত্বারিংশচ্ছূন্যসপ্তকদ্বিপঞ্চাশং)

(জ) পণস্তন্নংচউরাসীয় = ৮৪০০০০০

একক, দশক, শতক, সহস্র, কোটি বা ততোধিক অঙ্কস্থানের নাম করতে গেলে হয়তো ভারী হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে রাশির অন্তর্ভুক্ত অঙ্কগুলির নাম ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করার কথা অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বলেছেন—

"অয়ং চ রাশিঃ কোটিকোট্যাদিপ্রকারেণ কেনাপ্যভিধাতুং ন শক্যতে। অতঃ পর্য্যন্তাদারভ্যাঙ্কমানসংগ্রহার্থং গাথাদ্বয়ং।" (অনুযোগদ্বার সূত্র, ১৪২ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।) অর্থাৎ "এই রাশিকে কোটি-কোট্যাদি প্রকার বলিতে কেহই সমর্থ নহেন ; তাই এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্কমান সংগ্রহের জন্য গাথারে (উল্লেখ করা হইল)"।

এখন এই রাশি বলতে তিনি কি বুঝিয়েছিলেন ? প্রাচীন জৈন আগমগ্রন্থের অনুযোগদ্বার সূত্রে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"কোড়াকোড়িও এগুণতীসং টাণাইং তিজমলপয়স্স উবরিং
চউজমলপয়স্স হেট্ঠা অহব ণং ছট্ঠো বগ্গো
পংচমবগ্গপড়ুপ্পোপ্পো, অহব ণং ছন্নউইছেঅণদায়ীরাসী।"

(কোটি কোটয় একোনত্রিংশৎস্থানানি ত্রিযমলপদস্য উপরি চতুর্থমলপদস্য অধস্তাৎ, অথবা নন্থ ষষ্ঠবর্গঃ পকমবর্গপ্রত্যুৎপন্ন অথবা নন্থ যন্নবতিছেদনদায়ী রাশিঃ।)

অর্থাৎ "ঐ রাশি কোটি কোটি প্রভৃতি একোনত্রিংশস্থান (ব্যাপী) ত্রিযমলপদেব উর্ধে এবং চতুর্থযমলপদেব অধে। অথবা পঞ্চগুণিত ষষ্ঠবর্গের (সমান), অথবা উহাকে ছিয়ানব্বই বার (দুই দ্বারা ছেদ করা যায়)।" অঙ্কে লিখলে হবে ঃ

(ষষ্ঠ বর্গ) (প্রথম বর্গ)
= (১৮, ৪৪৬, ৭৪৪, ০৭৩, ৭০৯, ৫৫১, ৬১৬) (৪, ২৯৪, ৯৬৭, ২৯৬)
= ৭৯, ২২৮, ১৬২, ৫১৪, ২৬৪, ৩৩৭, ৫৯৩, ৫৪৩, ৯৫০, ৩৩৬
$= ২^{৬৪} \times ২^{৩২} = ২^{৯৬}$

দ্রষ্টব্য—জৈন সাহিত্যে নাম সংখ্যা—বিভূতিভূষণ দত্ত—সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা—৩৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

হেমচন্দ্র নামসংখ্যার সাহায্যে এত বড় সংখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—

ছত্তিন্নি তিন্নি সুন্নং পংচেব য ণব য তিন্নি চত্তারি।
পংচেব তিন্নি ণব পংচ সত্ত তিন্নেব তিন্নেব।
চউ ছ দো চউ এক্কো পণ দো ছক্কেক্কযো য অট্‌ঠেব।
দো দো নব সত্তেব য অংকট্‌ঠানা পরাহুত্তা।

অর্থাৎ উদ্দিষ্ট সংখ্যাটি হচ্ছে ঃ

৭৯, ২২৮, ১৬২, ৫১৪, ২৬৪, ৩৩৭, ৫৯৩, ৫৪৩, ৯৫০, ৩৩৬।

অবশ্য হেমচন্দ্র, এই গাথাটি কোথা থেকে এসেছে সে কথা উল্লেখ করেন নি। সাধারণতঃ জৈন গণিতশাস্ত্রে বা আগমগ্রন্থে, অঙ্কপাত দক্ষিণাগতিতেই করা হয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত শ্লোকটি যখন অঙ্কপাত করা হয় তখন দক্ষিণাগতি অনুসরণ না করে বামাগতি অনুসরণ করা হয়েছে। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে বামাগতিতে অঙ্কপাত না দেখিয়ে দক্ষিণাগতিতে অঙ্কপাত এক্ষেত্রে করলে ক্ষতি কি ছিল? ক্ষতি নিশ্চয়ই ছিল। কারণ এক্ষেত্রে সরাসরি বামাগতিতে অঙ্কপাত করার কথা বলা হয়েছে। অন্ততঃপক্ষে 'পরাহুত্তা' শব্দটি সে জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে। পরাহুত্তা অর্থাৎ 'বিপরীতমুখী' অর্থাৎ সাধারণতঃ যেভাবে অঙ্কপাত করা হয়ে থাকে (জৈন গণিতশাস্ত্রে) তার বিপরীতমুখী। নামসংখ্যার ব্যবহার জৈন গণিতশাস্ত্রে আরও আছে। যেমন ঃ

"লক্‌খং কোড়াকোড়ি চউরাসীশং ভবে সহস্‌সাইং
চত্তারি অ সত্তট্‌ঠা হুংতি সয়া কোড়ী কোড়ীণং।
চউয়ালং লক্‌খাইং কোড়ীণং সত্ত চেব য সহস্‌সা
তিন্নি চ সয়া চ সত্তরি কোড়ীণং হুংতি নায়ব্বা।
পংচাণউই লক্‌খা এগাবন্নং ভবে সহস্‌সাইং
ছস্‌সোলসোত্তরসয়া এসো ছট্‌ঠো হবই বগ্‌গো।"

অর্থাৎ উদ্দিষ্ট সংখ্যাটি হচ্ছে—১৮, ৪৪৬, ৭৪৪, ০৭৩, ৭০৯, ৫৫১, ৬১৬। এখানে সংখ্যাটিতে ২০টি অঙ্কস্থান আছে।

জৈনাচার্য জিনসেন লিখিত 'নেমীপুরাণে' নামসংখ্যার প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "স্থানক্রমাত্রিকং দ্বে চ ষট্ চত্বারি নব দ্বিকং" অর্থাৎ উল্লিখিত সংখ্যাটি হচ্ছে—২৯৪৬২৩।

যে কয়েকজন জৈন পণ্ডিত নামসংখ্যার উল্লেখ করেন তাঁদের মধ্যে পার্শ্বদেবগণি, শ্রীচন্দ্রসূরী, রত্নপ্রভাকর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পার্শ্বদেবগণি গ্রহরসরুদ্র = ১১৬৯

বলেছেন। এখন গ্রহ = ৯, রস = ৬, রুদ্র = ১১ ধরা হয়েছে। শ্রীচন্দ্রস্থরী করণস্থর্য্য = ১৬২২ বলেছেন। রত্নপ্রভাকর স্থরী বস্থলোকার্ক = ১২৩৮ লিখেছেন। এখানে বস্থ = ৫, লোক = ৩, অর্ক = ১২ ধরা হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে জৈন গণিতগ্রন্থে নামসংখ্যার সাহায্যে, কেন সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। আগেই নেমীচন্দ্রের একটি শ্লোকে এ আভাস দেওয়া হয়েছে। এখন নেমীচন্দ্রের গ্রন্থ ছাড়াও ত্রিলোকসারে এ সম্পর্কে বেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ত্রিলোকসারের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

"ছাদালস্থণ্ণসত্তয়াবাবণ্ণং হোংতি মেরুপহুদীণং
পংচণ্ণং পরিধীত্ত কমেণ অংকক্কমেণেব।"

অর্থাৎ এটির স্থুলার্থ হচ্ছে "অঙ্কক্রমে রাশি বর্ণনাই নাম সংখ্যার মূলধর্ম"। জৈন গণিত গ্রন্থ বা আমাদের শাস্ত্রে নামসংখ্যা সহকারে সংখ্যার উল্লেখ আছে, সে দৃষ্টান্ত প্রচুর পেয়েছি। এবার একটু আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি পঞ্চম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর গণিতবিদদের ব্যবহৃত নামসংখ্যার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

স্থানীয়মান সহযোগে নাম সংখ্যার প্রয়োগ ভাস্করাচার্য (দ্বিতীয়) তাঁর গ্রন্থে করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শ্লোক তুলে ধরা হল ঃ

"অল্পে মহতি চ মণ্ডলে মণ্ডলদ্বাদশভাগো রাশিঃ
ষষ্টিশতত্রয়ভাগো ভাংশঃ খখষট্ঘনভাগো লিপ্তাঃ।"

এখানে খখষট্ ঘন = ২১৬০০।

সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে কল্যাব্দ বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে নামসংখ্যার ব্যবহার ভাস্করাচার্য (দ্বিতীয়) করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"যাতা ষন্মনবো যুগানি ভমিতান্যন্যযুগাঙ্ঘ্রি ত্রয়ং
নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।"

এখানে নন্দাঃ = ৯, অদ্রয়ঃ = ৭, ইন্দুঃ = ১, গুণাঃ = ৩ ; অতএব অঙ্কের বামগতি হেতু নন্দাদ্রীন্দুগুণা = ৩১৭৯। কোন এক প্রসিদ্ধ কবি তাঁর কবিতায় কল্যাব্দ উল্লেখ করতে গিয়ে নাম সংখ্যার প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন

"শাকো নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দগণো যুগস্যা"

এখানে নব = ৯, অগাঃ পর্ব্বতঃ = ৭, ইন্দু = ১, কৃশনব = ৩ ; অঙ্কের বামগতি হেতু উল্লিখিত সংখ্যাটি হচ্ছে ৩১৭৯।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে একই সংখ্যা কিন্তু নাম সংখ্যার প্রয়োগ দুটি ভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। এবং এতে শ্লোকের মাধুর্য্যের বা অর্থের কোন ক্ষতি হয় নি।

কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থে যেমন মেরুতন্ত্র প্রভৃতিতে স্থানীয় মান সহকারে নাম সংখ্যার উল্লেখ আছে। যেমন গোত্রী = ৩৯, একচতুঃ = ৪১, দ্বিচতু = ৪২, বেদবেদ = ৪৪, সায়করুত = ৪৫ প্রভৃতি।

উৎপলভট্ট বৃহজ্জাতকবিবৃতিতে মনিত্থের গ্রন্থ থেকে যে কয়টি উক্তি তুলে ধরেছিলেন তার মধ্যে কিছু উক্তিতে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যার প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন নবরূপা (= ১৯,) শরযমলা (= ২৫,) স্তিতয়ো (= ১৫,) হর্কা (= ১২,) পঞ্চরূপকাঃ (= ১৫,) ক্রমশঃ

রূপযমা (= ২১) কৃতিসংখ্যাঃ সূর্য্যাদীনাং স্বতুঙ্গভেষব্দাঃ।

জীবশর্মার কিছু উক্তিও বৃহজ্জাতকের মধ্যে উৎপলভট্ট উল্লেখ করেছেন। সেখানেও স্থানীয় মান সহকারে নামসংখ্যার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন সপ্তদশৈ (= ১৭) কো (= ১) দ্বিযমৌ (= ২২) বসবো (= ৮) বেদাগ্নয়ো (= ৩৪) গ্রহেন্দ্রানাম।

কখনও কখনও ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে নামসংখ্যা ও শব্দ সংখ্যা একই সঙ্গে উল্লেখিত হতে যায়। যেমন কৃতবস্থনবাষ্টনবনবষটত্রিনবাগেন্দবো = ১৭৯৩৬৯৯৮৯৮৪, সপ্তশূন্যং দ্বয়ং দ্বয়ং পঞ্চৈকঞ্চ প্রতিষ্ঠিতম্ = ১৫২২০৭। ভগ্নাংশকেও অনেক ক্ষেত্রে নাম সংখ্যার সাহায্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন শফ = $\frac{১}{৪}$, কুষ্ঠ = $\frac{১}{১২}$, কলা = $\frac{১}{১৬}$, পাদ = $\frac{১}{৪}$ প্রভৃতি।

৩.২ নামসংখ্যার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ইতিহাস

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র, গণিতগ্রন্থ, কোষ, প্রভৃতি পাঠ করলে নাম সংখ্যার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। অনেক গ্রন্থে অবশ্য নামসংখ্যার নিঘণ্টুও প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্ত্তী কালে যে সমস্ত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত নামসংখ্যার নিঘণ্টু প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ বি. বি. দত্ত, যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি, অমূল্য চরণ বিদ্যাবিনোদ, রঙ্গাচার্য, বার্ণেল, বুলার, শ্লেগেল, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা কোথা থেকে অথবা কোন গ্রন্থে বা কোথায় নিঘণ্টু সংগ্রহ করেছিলেন সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি।

(ক) ডঃ বি. বি. দত্ত পিঙ্গল ছন্দঃ সূত্র, বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, মহাবীরের

গণিত সার সংগ্রহ, ব্রহ্মগুপ্তের ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, ভাস্করাচার্যর লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে নিঘণ্টু সংকলন করেছিলেন।

(খ) সুপ্রসিদ্ধ পার্শী পর্যটক আলবিরূনী তাঁর ভারত গ্রন্থে নাম সংখ্যার নিঘণ্টু দিয়েছেন।

(গ) অমূল্যচরণ বিদ্যাবিনোদ ভারতবর্ষ পত্রিকার প্রথমবর্ষের দ্বিতীয় খণ্ডে সাংকেতিক শব্দ নামক প্রবন্ধে নামসংখ্যার নিঘণ্টু দিয়েছেন।

ঘ) বাগভট্টের অলংকার শাস্ত্রে নাম সংখ্যার নিঘণ্টু দেওয়া আছে।

ঙ) মাদ্রাজ সরকারের পাণ্ডুলিপি আগারে অঙ্ক নিঘণ্টুর সাতখানি পাণ্ডুলিপি আছে।

চ) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের গ্রন্থাগারে "সংখ্যাভিধানম্" নামে একটি পাণ্ডুলিপি আছে।

ছ) আউফ রেখাট'এর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিতে স্বামী রামানন্দ তীর্থ প্রণীত অঙ্কসংজ্ঞা নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

জ) বোম্বেতে মুদ্রিত দুটি অঙ্কসংজ্ঞা নিঘণ্টু আছে।

ঝ) সূর্যসিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের দিয়ে প্লেগেস একটি নামসংজ্ঞা নিঘণ্টু প্রস্তুত করান।

ঞ) তিব্বতীভাষায় নাম সংজ্ঞার নিঘণ্টু আছে।

ট) যবদ্বীপের ভাষায় একটি নামসংজ্ঞার নিঘণ্টু আছে।

ঠ) ফণ হুম্বোল্ট নাম সংখ্যার নিঘণ্টু দেন।

ড) ব্রাউন নাম সংখ্যার নিঘণ্টু দেন।

ঢ) বার্ণেল এলিমেণ্টস অফ্ সাউথ ইণ্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফীতে নাম সংখ্যার নিঘণ্টু দেন।

ণ) বুলার ইণ্ডিশ্চ প্যালাইওগ্রাফিতে নাম সংখ্যার নিঘণ্টু দেন।

ত) গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ নাম সংখ্যার নিঘণ্টু দেন।

থ) রঙ্গাচার্য গণিতসার সংগ্রহের ইংরাজী অনুবাদের শেষে নামসংখ্যার নিঘণ্টু দেন।

দ) যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ৩৬ খণ্ডে নাম সংখ্যার নিঘণ্টু দেন।

দ্রষ্টব্য—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—আঙ্কিক শব্দ—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—৩৬বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

এছাড়া আরও বহু দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা নাম সংখ্যার নিঘণ্টু দিয়েছেন।

নাম সংখ্যার ব্যাখ্যাও বহু দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত দিয়েছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা গিয়েছে। যাই হোক এখানে কয়েকটি নাম সংখ্যার ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করছি।

শূন্য = ০, (বিন্দু) জলবিন্দু যেমন অতিক্ষুদ্র এবং নিরবয়ব। এতই ক্ষুদ্র যে শূন্য মনে হয়। হয়তো এ থেকেই শূন্য অর্থ বিন্দু ধরা হয়ে থাকে। শূন্যের পরিবর্তে দিব, আকাশ, অভাব, খ, অভ্র, নভঃ, ব্যোম, অম্বর, পুষ্কর, অনন্ত, জলধরপথ, গগন, বিয়ং, বিষ্ণুপদ, অন্তরীক্ষ, মরুৎপথ, প্রভৃতি নাম সংখ্যা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে শূন্য ও বিন্দু কথাটির মধ্যে শূন্য কথাটিই প্রাচীন। কারণ শূন্য কথাটি পিঙ্গল ছন্দঃ সূত্রে, বাখ্‌শালীর পাণ্ডুলিপিতে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।

খ শব্দটি অগ্নি পুরাণে পাওয়া যায়। অবশ্য বরাহের বৃহজ্জাতকে খ = ১০ ধরা হয়েছে। গর্গ মুনি খ = ১০ ধরেছেন। শূন্যকে পূর্ণ বলেও লেখা হয়েছে অনেক জায়গায়। হয়তো আকাশ পূর্ণতার প্রতীক বলে শূন্যকে পূর্ণ বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শুক্ল যজুর্বেদের একটি শ্লোক ধরছি :

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

অমর সিংহ এবং হেমচন্দ্রের মতে শূন্যের নাম তুচ্ছ। অবশ্য ঋগ্বেদের এক জায়গায় বলা হয়েছে "তুচ্ছেনাভ্বাপিহিতং"।

এক = ১ চন্দ্র। যেহেতু চন্দ্র একটি অতএব একের পরিবর্তে চন্দ্র শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও একের পরিরর্তে অব্জ, ইন্দু, বিধু শশী, সোম, শশধর, মৃগাঙ্ক, নিশাচর শশাঙ্ক, হিমাংশু, কলানিধি, বসুধা, ক্ষিতি, ক্ষৌণী, ধর, ক্ষ্মাউর্বরা, কু, ইলা, ভূমি, অবনী, রূপ, ক্ষপাকর, কলাধর, চন্দ্রমস, শ্বেত, শশলাঞ্ছন, শশিন, হিমকর, উর্বী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হ'ত। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে উর্বী = ১ আলবিরূণী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

দুই = ২, পক্ষ, পক্ষীর দুটি পক্ষ (পাখা) আছে বলেই পক্ষ = ২ বলা হয়। অনেক সময় অক্ষি = ২ বলা হয়। এই সংজ্ঞার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, মানুষের দুটি চোখ আছে বলেই অক্ষি = ২ ধরা হয়। এছাড়াও দুইএর পরিবর্তে নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়—

কর, হস্ত, অশ্বিন, যম, যমল, যুগ্ম, নেত্র, ইক্ষণ, দৃক্, দৃষ্টি, নয়ন, লোচন, বেলা, কুচ, অন্বক, ইক্ষণ, নয়, রবিকর, রবিচন্দ্র প্রভৃতি।

রবিচন্দ্র কথাটি আলবিরূণীর তালিকায় দেখতে পাওয়া যায়। বেলা, হস্ত, কুচ, শব্দগুলি চম্পালিপিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে নেত্র = ৩ অনেক স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন চম্পালিপিতে নেত্র = ৩ ব্যবহার করা হয়েছে বলে প্রখ্যাত গণিত ঐতিহাসিক ডঃ বি. বি. দত্ত বলেছেন।

তিন = ৩ ; অগ্নি, বৈদিক শাস্ত্রে তিন ধরনের অগ্নি যথা দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যয় অগ্নি, ও আহ্বানীয় অগ্নি'র কথা উল্লেখ থাকাতে অগ্নি = ৩ ধরা হয়। গুণ = ৩ ধরা হয়। কারণ সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ গুণের এই তিনটি দিক থাকায় গুণ = ৩ ধরা হয়। রাম অর্থে ৩ ধরা হয়। কারণ রাম তিনজন ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ধনুর্ধর রাম, পরশুধর রাম ও হলধর রাম।

পুর = ৩, পুরাণে বর্ণিত আছে যে দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে অসুরেরা তিনটি নগরে (পুরে) বাস করতো সেইহেতু পুর = ৩ ধরা হয়।

ভুবন = ৩, বিশ্ব তিনটি ভাগে বিভক্ত যথা উর্ধ, অধ ও মধ্য। সেইহেতু ভুবন = ৩ ধরা হয়।

রত্ন = ৩, জৈনশাস্ত্রে তিনটি সুন্দর জিনিষ আছে সেগুলি হচ্ছে সম্যগ্দর্শন, সম্যজ্ঞান, সম্যকচারিত্র ; এইজন্যই রত্ন = ৩ ধরা হয়।

এছাড়াও ৩-এর পরিবর্তে নিম্নলিখিত নাম সংখ্যাগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বৈশ্বানর, বহ্নি, বীতহোত্র, শিখিন, ধনঞ্জয়, কৃপীটযোনী, জলন, অনল, পাবক, কৃষাণু, বায়ুসখ, হুতুভক, বর্হিম, কৃষ্ণবর্ত্ম ন্ন, জাতবেদস্ বিষ্ণুক্রম, ভাস্কর, লোক, ত্রিকটু হরনেত্র, প্রভৃতি।

লোক = ৩ ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়, ক্রম = ৩ সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে পাওয়া যায়। ত্রিকুট = ৩ আলবিরূণীর তালিকায় পাওয়া যায়। বিষ্ণুক্রম = ৩ পাওয়া যায় মহাভাস্করীয়তে। হরিনেত্র = ৩ গণিতসার সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়।

চার = ৪, (মহা) সাগর ; যেহেতু বিশ্বে চারটি সাগর যথা পূর্ব সাগর, দক্ষিণ সাগর, পশ্চিম সাগর ও উত্তর সাগর আছে সেইজন্যে চারের পরিবর্তে সাগর লেখা হয়।

বেদ = ৪ কারণ আমাদের শাস্ত্রে চারটি বেদ যথা ঋক, সাম, যজু ও অথর্ববেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেইহেতু বেদ = ৪ লেখা হয়।

চার-এর পরিবর্তে নিম্নলিখিত নামসংখ্যাগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কৃত,

অম্বোধ, অম্বোধি, উদধি, কষায়, জলধি, জলনিধি, পয়োধি, অব্জি, পয়োনিধি, বন্ধু, বিষোধি, বিষনিধি, সলিলাকর, সাগর, যুগ প্রভৃতি।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন কষায় = ৪ ধরার কারণ জৈনশাস্ত্রানুযায়ী চারটি জিনিষের সঙ্গে সাধারণত মানুষ জড়িত থাকে সেগুলি হচ্ছে ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ, হয়তো এইজন্যেই কষায় = ৪ ধরা হয়েছে। আবার বন্ধন = ৪ ধরা হয়ে থাকে কারণ এখানেও জৈনশাস্ত্রানুযায়ী চার ধরণের বন্ধনের কথা জানা যায়। সেগুলি হচ্ছে প্রকৃতি, স্থিতি, অনুভাব ও প্রদেশ। বেদ = ৪ পিঙ্গল ছন্দঃ সূত্রে, অগ্নিপুরাণে দেখতে পাওয়া যায়, যুগ = ৪ ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে, লীলাবতীতে, সিদ্ধান্তশিরোমণিতে গণিতসারসংগ্রহে এবং আরও নানা গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।

পাঁচ—৫ ; করণীয় ; জৈন ধর্মশাস্ত্রে ৫টি করণীয় আছে। সেগুলি হচ্ছে অহিংসা, সূনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এ থেকেই করণীয় = ৫ ধরা হয়।

ভাব = ৫, ধরা হয়। কারণ পৃথিবী, অপ্, তেজস্, বায়ু ও আকাশ এই ৫টি ভাব (মৌল) আমরা জানি।

বিষয় = ৫, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ৫ প্রকার যথা গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। সেইহেতু বিষয় = ৫।

ইন্দ্রিয় = ৫, মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথা নাক, কান, জিহ্বা, চোখ ও চর্ম আছে বলেই ইন্দ্রিয় = ৫ ধরা হয়।

ইষু = ৫, মন্মথের ৫টি শর আছে। সেগুলি হচ্ছে—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল। এই কারণে ইষু (শর) = ৫ ধরা হয়।

পাঁচের পরিবর্তে নিম্নলিখিত নামসংখ্যাগুলি ব্যবহার করা হয়। সায়ক, বাণ, শর, শাস্ত্র, ভূত, পর্ব, প্রাণ, পবন, পাণ্ডব, অর্থ, বিরাট, মহাভূত, তত্ত্ব প্রভৃতি।

বিরাট্ = ৫ অথবা ১০ ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে ব্যবহার করা হয়েছে। ভূত = ৫ পিঙ্গলের ছন্দ সূত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

ছয় = ৬ ; অঙ্গ, যেহেতু ষড়বেদাঙ্গ বলতে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয়টিকে বোঝায়, সেইহেতু অঙ্গ = ৬ ধরা হয়।

ঋতু = ৬, যেহেতু বৎসরে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীত এই ছয়টি ঋতু আছে, সেইহেতু ঋতু = ৬ ধরা হয়।

কুমারবদন = ৬, হিন্দু যুদ্ধ দেবতার ছয়টি মুখ আছে সেইজন্য কুমারবদন = ৬ ধরা হয়।

তর্ক = ৬, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছয়টি বিষয় তর্কের অন্তর্ভুক্ত অতএব তর্ক = ৬ ধরা হয়।

দ্রব্য = ৬, জৈন শাস্ত্রানুযায়ী মৌলিক বস্তু ছয়টি। সেগুলি হচ্ছে, জীব, ধর্ম, অধর্ম, পদ্গল, কাল ও আকাশ। সেইহেতু দ্রব্য = ৬ ধরা হয়ে থাকে।

রস = ৬, ছয়টি প্রধান স্বাদ আছে। সেগুলি হচ্ছে মধুর,অম্ল, লবণ, কটুক তিক্ত ও কষায়। এইহেতু রস = ৬ ধরা হয়। এছাড়াও নিম্নলিখিত নামসংখ্যাগুলি ছয়-এর পরিবর্তে ধরা হয়। মাসার্ধ, দর্শন, রাগ, অরি, শাস্ত্র, কারক, লেখ্য, খর, সম্মুখ, কোশ, শিখিমুখপদ প্রভৃতি।

অঙ্গ = ৬, ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে, মহাভাস্করীয়তে, শিষ্যধীবৃদ্ধিতন্ত্রে, গণিতসার সংগ্রহে, সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে, আলবিরুণীর তালিকায় এবং অন্যান্য গ্রন্থে।

তর্ক = ৬, ব্যবহার করা হয়েছে গণিতসার সংগ্রহে।

কোশ = ৬, ব্যবহার করা হয়েছে চম্পালিপিতে। যেমন, বলা যেতে পারে এখানে কোশখভূধর = ৭০৬, কোশনবর্ত্তু = ৬৯৬ এবং কোশগমুনি = ৭৭৬ ধরা হয়েছে।

আনন্দ = ৬, চম্পালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়।

সাত = ৭, শৈল ; পুরাণে মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিপাদ্র নামে সাতটি পর্ব্বতের কথা বলা হয়েছে। সেইজন্য শৈল = ৭ ধরা হয়।

মুনি = ৭, ধরা হয়। কারণ আমাদের শাস্ত্রে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ট নামে সপ্ত ঋষির উল্লেখ আছে। অবশ্য কেউ কেউ সপ্ত ঋষি বলতে কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজের কথাই বলে থাকেন। যাই হোক সপ্তঋষি বা মুনি থেকেই মুনি = ৭ ধরা হয়ে থাকে।

সূর্যরথে সাতটি ঘোড়া সংযোজন থাকে বলে অশ্ব = ৭ ধরা হয়। জৈনরা জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জর ও মোক্ষ এই সাতটি নীতি মেনে চলেন বলে তত্ত্ব = ৭ ধরা হয়ে থাকে। পুরাণে পৃথিবীকে জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পৌষ্কর এই সাতটি ভাগে ভাগ করার জন্য দ্বীপ = ৭ ধরা হয়ে থাকে। মানবদেহে প্রধান আকর সাতটি। সেইজন্য ধাতু = ৭ ধরা হয়ে থাকে। রাজারা সাতটি আসক্তিকে ঘৃণা করবেন বলে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সেইহেতু ব্যসন = ৭ ধরা হয়।

তন্ত্রী ও কণ্ঠ থেকে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ নামে সাতটি স্বর উত্থিত হয় বলে স্বর = ৭ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

এগুলি ছাড়াও সাতের পরিবর্তে নিম্নলিখিত নাম সংখ্যাগুলি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

হয় (ঘোড়া), যতি (মুনি), মাতৃকা, মহীধ্র, ভূধ্র, ভয়, পন্নগ, নগ, গিরি, অশ্বিন, অচল, লোক, অদ্রি, স্বর, ধাতু মুনি, দ্বীপ, গ্রহ, সমিধ, অগ্নি প্রভৃতি। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন শেষের নয়টি শব্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এদের সাতটি করে জিহ্বা আছে সেই হেতু এগুলির প্রত্যেকটির পরিবর্তে সাত ধরা যেতে পারে। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়। শ্লোকটি হচ্ছে ঃ

"লোকানদ্রীন্ স্বরান ধাতুন্ মুনীন্ দ্বীপান্ গ্রহানপি।
সমিধঃ সপ্তসংখ্যাতাঃ সপ্তজিহ্বা হবির্ভুজঃ ॥"

আট = ৮, পিঙ্গলাচার্য বলেছেন, "অষ্টৌ বসব ইতি" অর্থাৎ 'বসু সংখ্যা দ্বারা আট বুঝিবে।' সুতরাং বসু = ৮ ধরা হয়ে থাকে। অমরকোষে বলা হয়েছে ঃ

আদিত্যা বিশ্ববসবস্তুষিতা ভাস্করানিলাঃ।
মহারাজিকসাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ গণদেবতাঃ ॥

ক্ষীরস্বামী এই শ্লোকটির অর্থ করেছেন ঃ "আদিত্য দ্বাদশ, বিশ্বদেব ত্রয়োদশ, বসু আট, তুষিত ষটত্রিংশৎ, আভাস্বর চতুষষ্ঠি, অনিল উনপঞ্চাশ, মহারাজক দ্বিশতষট ত্রিংশত, সাধ্য দ্বাদশ ও রুদ্র একাদশ।" পৃথিবীর আটটি দ্বার। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদণ্ড, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক এই আটটি হাতি রক্ষা করছে বলে ইভ = ৮ ধরা হয়।

জ্ঞানাবরনীয়, দর্শনাবরনীয়, মোহনীয়, অন্তরায়, বেদনীয়, নমিক, গোত্রিক ও আয়ষ্ক এই আটটি কর্ম জৈন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সেইজন্য কর্মণ = ৮ ধরা হয়।

পৃথিবী, অপ, তেজস্, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও যজমান এই আটটি পদার্থের সাহায্যে শিবকে তৈরী করা হয়েছে। সেইজন্য তনু = ৮ ধরা হয়।

পত্তি, সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমূ ও অনীকিনী এই আটটি সৈন্যদল ভারতবর্ষে ছিল। সেইহেতু অনীক = ৮ ধরা হয়।

সর্প = ৮ ধরা হয়। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়। শ্লোকটি হচ্ছে ঃ

অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ
কুলীরঃ কর্কট শঙ্খো অষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে নাগ = ৭ অনেকক্ষেত্রে ধরা হয়ে থাকে। আট এর পরিবর্তে নিম্নলিখিত নামসংখ্যাগুলি ধরা হয়ে থাকে।

দন্তি, হস্তিন, দ্বীপ, মতঙ্গজ, মাতঙ্গ, নাগ, কুঞ্জর, সিন্ধুর, বারণ, করী, সামজ, স্তম্বেরম, মঙ্গল, দ্বিরদ, দূরিত, দিক, ভুজঙ্গ, মদ, প্রভৃতি।

মঙ্গল = ৮, দেখতে পাওয়া আলবিরূণীয় তালিকায়, প্রাচীন চম্পালিপি প্রভৃতিতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, চম্পালিপির এক জায়গায় শশিরূপমঙ্গল (৮১১), গগণদ্বি-মঙ্গল (৮২০) লেখা আছে। ভুজঙ্গ ও গজ = ৮ ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে দেখতে পাওয়া যায়।

তনু ও অঙ্গ = ৮ চম্পালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়।

নয় = ৯, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব এই নয়টি ধনভাণ্ডার কুবের ছিল সেইহেতু নিধ (ধন) = ৯ ধরা হয়। বজ্র, বৈদূর্য, গোমেদ, পুষ্পরাগ, পদ্মরাগ, মরতক, নীল, মুক্তা ও প্রবাল এই নয়টি রত্নের কথা প্রাচীন শাস্ত্রকাররা জানতেন বলে রত্ন = ৯ ধরতেন। অবশ্য আগেই বলেছি জৈনশাস্ত্রে রত্ন = ৩ ধরা হয়। মগধরাজে নয়জন নন্দ বাস করতেন। সেইজন্য নন্দ = ৯ ধরা হয়। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, সূর্য, ও চন্দ্র এই নয়টি গ্রহের কথা প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলে গিয়েছেন। সেইজন্য গ্রহ = ৯ ধরা হয়। বিষ্ণু নয়জন ছিলেন সেইজন্য বিষ্ণু = ৯ ধরা হয়। জৈনরা পদার্থের নয়টি শ্রেণী বিভাগ করেছেন। সেইহেতু তাঁরা নয় এর পরিবর্তে পদার্থ লিখে থাকেন। শ্রুতি ও পুরাণে স্বর্গের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। তবে তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—"নব স্বর্গ লোকাঃ"। অর্থাৎ স্বর্গলোক নয়টি। স্বর্গের বিপরীত হচ্ছে নরক। হয়তো এটির উপর ভিত্তি করে নরক = ৯ অনেকক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। শরীরের নয়টি ছিদ্র থাকায় রন্ধ্র = ৯ ধরা হয়।

অনন্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান, ক্ষায়কসম্য, কত্বক্ষায়কচরিত্র, অনন্তদান, অনন্তলাভ, অনন্তভোগ, অনন্তপভোগ এবং অনন্তবীর্য এই নয়টি শক্তির কথা জৈনশাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সেইজন্য লব্ধ = ৯ ধরা হয়।

এ ছাড়াও ৯, এর পরিবর্তে নিম্নলিখিত নাম সংখ্যাগুলি ধরা হয়ঃ অঙ্ক, ছিদ্র, দ্বার, গো, উপেন্দ্র, কেশব, দুর্গা, তার্ক্ষ্যধ্বজ, লব্ধি প্রভৃতি।

গ্রহ = ৯ প্রয়োগ করা হয়েছে গণিতসারসংগ্রহে, গো = ৯ ব্যবহৃত হয়েছে ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে। এছাড়া অন্যান্য নামসংখ্যাগুলি ভারতীয় শাস্ত্রে এবং গণিতগ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে যদিও অঙ্ক ...টি কিন্তু শূন্যকে বাদ দিয়ে অঙ্ক নয়টি হওয়ায় অঙ্ক = ৯ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

দশ = ১০, দশের পরিবর্তে নিম্নলিখিত নাম সংখ্যগুলি ব্যবহার করা হয়। দিশ, দিক, আশা, অঙ্গুলি, পংক্তি, রাবণশির, মহাদেব প্রভৃতি। রাবণশির

ব্যবহার করার পিছনে রাবণের দশটা মাথা থাকায় রাবণশির = ১০ ধরা হতে
পারে।

এগার = ১১, এগারোর পরিবর্তে নিম্নলিখিত নামসংখ্যাগুলি প্রয়োগ করা হয়ে
থাকে ঃ রুদ্র, ঈশ্বর, মৃড়, হর, ভব, বর্গ, মহাদেব, অক্ষৌহিণী, গর্ভ প্রভৃতি।
"অক্ষৌহিণী" কথাটি আলবিরুণীর তালিকায় দেখতে পাওয়া যায়। গর্ভ শব্দটি
সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে দেখতে পাওয়া যায়। অন্যান্য নাম সংখ্যাগুলি বিভিন্ন কবির
কবিতায় অথবা গণিতগ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়।

বার = ১২, ধাতৃ, মিত্র, অর্যমন, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বত, পূষন, সবিতৃ,
তষ্টৃ ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ সূর্যের কথা আমাদের শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সেইহেতু
ইন (সূর্য) = ১২ ধরা হয়। এছাড়া ভানু, সূর্য, রবি, অর্ক, দিবাকর প্রভৃতি শব্দকেও
১২ বলে ধরা হয়।

তের = ১৩, বিশ্ব, অতিদ্বাদশ, কাম, অতিজাগতী, অঘোষ প্রভৃতিকে ১৩'র পরিবর্তে
ধরা হয়। অতিদ্বাদশ শব্দটি গণিতসার সংগ্রহে বেশী ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

চৌদ্দ = ১৪, চৌদ্দটি মন্বন্তরে চৌদ্দজন ইন্দ্র ছিলেন সেইজন ইন্দ্র = ১৪ ধরা হয়। অবশ্য
এটির ব্যবহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকাতেই দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া বিদ্যা, মনু, শক্র,
লোক প্রভৃতি শব্দ ১৪এর পরিবর্তে ধরা হয়।

পনের = ১৫ ; তিথি, দিন, অহুন, পক্ষ প্রভৃতি নামসংখ্যা ১৫'র পরিবর্তে
ধরা হয়।

ষোল = ১৬, নৃপ, ভূগ, ভূপতি, অষ্টি, কলা প্রভৃতি নামসংখ্যা ষোল'র পরিবর্তে
ব্যবহার করা হয়। মরুত্ত, সুহোত্র, পৌরব, শিবি, দাশরথি, রাম, ভগীরথী, দিলীপ,
মান্ধাতা, যযাতি, অম্বরীষ, শশবিন্দু, গয়, রন্তিদেব, ভরত, পৃথু ও পরশুরাম এই ১৬ জন
রাজার উপাখ্যান যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব শুনিয়েছিলেন। সেইথেকে নৃপ = ১৬ বহু
গ্রন্থে ধরা হচ্ছে।

সতের = ১৭, সতেরোর পরিবর্তে অত্যষ্টি, মৈত্র, ঘন প্রভৃতি নাম সংখ্যা ব্যবহার
করা হয়। অবশ্য, পুরাণ প্রভৃতিতে ধৃতি = ১৭ বলা হয়েছে।

উনিশ = ১৯, অতিধৃতি প্রভৃতি।

কুড়ি = ২০, নখ, কৃতি।

একুশ = ২১, স্বর্গ, অবশ্য শ্রুতিতে আদিত্য = ২১ ধরা হয়েছে। এখানে বলা
হয়েছে "এক বিংশো বা ইতোহসাবাদিত্যঃ অর্থাৎ এই হেতু আদিত্য একবিংশ।
পণ্ডিতেরা এই হেতুটি নির্দিষ্ট করে গেছেন। তাঁরা বলেছেন "দ্বাদশমাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয়

ইমে লোকা অসবাদিত্য একবিংশঃ"। অর্থাৎ দ্বাদশ মাস, পঞ্চঋতু, এই তিন লোক এবং ঐ আদিত্য—এইরূপে আদিত্য একবিংশ।

বাইশ = ২২, আকৃতি প্রভৃতি নামসংখ্যা

তেইশ = ২৩, বিকৃতি প্রভৃতি নামসংখ্যা।

চব্বিশ = ২৪, জিন ; যেহেতু জৈন তীর্থঙ্কর চব্বিশজন ছিলেন সেইহেতু জিন = ২৪ ধরা হয়।

পঁচিশ = ২৫, ঐতরেয় আরণ্যকে পুরুষ = ২৫ ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে "পঞ্চবিংশোহয়ং পুরুযো দশ হস্তা অঙ্গুলয়ো দশ পাদ্যা দ্বা উরূ বাহূ, আত্মৈব পঞ্চবিংশস্তমিমাত্মানং পঞ্চবিংশং সংস্কুরুতে।" অর্থাৎ পুরুষ, পঞ্চবিংশ, তাহার দশটি হস্তাঙ্গুল, দুই উরু, দুই বাহু ও এক আত্মা একুনে পঁচিশ। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে পুরুষ সংজ্ঞাটি পরবর্তীকালে লোপ পায়।

ছাব্বিশ = ২৬, গণিত সার সংগ্রহে উৎকৃতি = ২৬ ধরা হয়েছে।

সাতাশ = ২৭, ভং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ভ = ২৭ বলা হয়েছে। যেমন একজায়গায় বলা হয়েছে "বিভজ্য ভসমূহেন।" তাছাড়া "শ্রবিষ্ঠাভ্যো গণাভ্যস্তান" অংশটি দেখা আছে। এখানে গণ = ভগণ = ২৭, এছাড়াও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে ভ = ২৭ ধরা হয়েছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন ৪২৭ শকের পূর্বে ভ = ২৭ ব্যবহৃত হয় নাই। তবে এ মত খুব একটা জোরাল নয়।

বত্রিশ = ৩২, দন্ত, রদ প্রভৃতি।

তেত্রিশ = ৩৩, দেব, অমর, সুর, নির্জর প্রভৃতি।

উনপঞ্চাশ = ৪৯, মরুত, বাত, মারুত, সমীরণ, তান প্রভৃতি।

তিনশ যাট = ৩৬০, ভাংশ, চক্রাংশ প্রভৃতি।

নাম সংখ্যার প্রয়োগ ও অর্থ নিয়ে আলোচনা যেটুকু করা হ'ল এর মধ্যে অনেক গুলি বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া একই নাম সংখ্যায় বিভিন্ন সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে কখনও কখনও একই সময়ে ধরা হ'ত। যেমন ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে গায়ত্রী কখনও ৮ কখনও ১২ ধরা হয়েছে। জগতী কখনো ১২ কখনও ৮ ধরা হয়েছে। বিরাট্ কখনও ৫ কখনও ১০ ধরা হয়েছে। জৈন গ্রন্থে তত্ত্ব = ৭ ধরা হয়েছে কিন্তু অনেক জায়গায় তত্ত্ব = ২৫ ধরা হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার মহৎ, প্রকৃতি, পুরুষ লইয়াই তত্ত্ব = ২৫।

এছাড়াও আরও অনেক নাম সংখ্যার প্রয়োগ ও অর্থ নিয়ে মতদ্বৈততা আছে।

৩.৩ অক্ষর সংখ্যা প্রণালী[১]

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে নাম সংখ্যার ব্যাপক প্রচলন আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। এছাড়াও সংখ্যাকে খ্যাপন করার জন্য বর্ণমালার প্রয়োগও ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়।

সংখ্যা খ্যাপন নিমিত্ত এই পদ্ধতির প্রয়োগ প্রথম কোথায় হয়েছিল সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা যায় না। বহু পণ্ডিত মনে করেন এই পদ্ধতি কোন সেমেটিক জাতি আবিষ্কার করেছিল। ফিনিসীয় ব্যাবিলনীয়, কাল্ডীয় ও আসুরীয়দের নিকট হ'তে অন্যান্য সভ্য জাতিরা শিক্ষা ও সভ্যতার অনেক কিছু গ্রহণ করেছে। তাছাড়া গ্রীক বর্ণমালা ফিনিসীয় বর্ণমালার কাছে ঋণী। সুতরাং এ সব বিচার বিশ্লেষণ করে ক্যাণ্টর, নেমেলম্যান প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে গ্রীক অক্ষর সংখ্যা প্রণালী ফিনিসীয়দের কাছ থেকে লওয়া হয়েছে। গাউ, টি. এল হীথ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে গ্রীকেরাই অক্ষর সংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবক। হলিকর্ণসাসে প্রাপ্ত একটি শিলালেখ ও অন্যান্য নিদর্শন দেখে লার্ফিল্ড অনুমান করেন খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে গ্রীসে অক্ষর সংখ্যা প্রণালী ছিল। কীল মনে করেন ৫৫০-৪২৫ খ্রীষ্টপূর্বে গ্রীসে এই পদ্ধতি চালু ছিল। ডঃ বি. বি. দত্ত প্রমুখ প্রখ্যাত গণিত ঐতিহাসিকেরা পাণিনির ব্যবহৃত অক্ষর সংখ্যা প্রণালীর কথা তুলে ধরে বলেছেন এ ব্যাপারে ভারতবর্ষ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে। যাইহোক এ বিতর্ক ঐতিহাসিক পর্যায়ে হলেও আমরা পরবর্তী কালে আর্যভটের গ্রন্থে অক্ষর সংখ্যা প্রণালীর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করি। তবে এই প্রণালী বিভিন্ন জাতি এক সময় ব্যাপক হারে ব্যবহার করতেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত এবং সমস্ত জাতির মধ্যে ভারতীয় পদ্ধতি, সেমেটিক পদ্ধতি, গিমাত্রিয় পদ্ধতি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রীক ভাষায় বর্ণ সংখ্যা ২৪টি। অক্ষর সংখ্যা প্রণালী গঠনোদ্দেশে গ্রীকেরা আরও তিনটি বর্ণ সংগ্রহ করে। এর মধ্যে Ϙ এবং ϡ ফিনিসীয় জাতির কাছ থেকে লওয়া হয়েছে। মোট ২৭টি বর্ণকে এঁরা তিনভাগে ভাগ করে ১ থেকে ৯৯৯ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা খ্যাপন করতেন।

---

(১) আমি ডঃ বিভূতিভূষণ দত্ত রচিত অক্ষর সংখ্যা প্রণালী (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩৬) প্রবন্ধ থেকে প্রায় সমস্ত আলোচনাংশটি এখানে গ্রহণ করেছি। এইজন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী।

দ্রষ্টব্য :—Was Aryathata indebted to the Greeks for his Alphabetic system? Sarada Kanta Ganguli, Bul. cal. Math. Soc (1926), Vol 17,

যে কোন সংখ্যা খ্যাপন করতো।

α = ১	ι = ১০	ρ = ১০০
β = ২	κ = ২০	σ = ২০০
γ = ৩	λ = ৩০	τ = ৩০০
δ = ৪	μ = ৪০	υ = ৪০০
ϵ = ৫	ν = ৫০	ϕ = ৫০০
S = ৬	ξ = ৬০	χ = ৬০০
ζ = ৭	O = ৭০	ψ = ৭০০
η = ৮	π = ৮০	ω = ৮০০
θ = ৯	O͵ = ৯০	ϡ = ৯০০

প্রথম নয়টি বর্ণ ১ থেকে পর পর্যন্ত সংখ্যা নির্দেশ করে। পরের নয়টি বর্ণ এদের দশগুণ সংখ্যা নির্দেশ করে এবং এর পরবর্তী নয়টি বর্ণ একশগুণ সংখ্যা নির্দেশ করে। হাজার বা তার বেশী সংখ্যা খ্যাপন করতে গিয়ে গ্রীকেরা ঐ সমস্ত অক্ষরের পশ্চাতে একটি দাঁড়ি দিতেন। যেমন ধরা যাক /δ = ৪০০০, /η = ৮০০০০

দশ হাজার বা ততোধিক সংখ্যা লিখতে গিয়ে তাঁরা যে কোন সংখ্যার সঙ্গে M যুক্ত করতেন ফলে এর শক্তি দশহাজার গুণ বেশী হ'ত। যেমন ধরা যাক γM বা Mγ = ৩০,০০০ অবশ্য গ্রীকেরা এ পদ্ধতি প্রথম থেকে ব্যবহার করতেন না। কারণ প্রথমে তাদের বর্ণসংখ্যা ২৪টি থাকায় তাঁরা বর্ণমালার আদ্যাক্ষর αকে ২৪ এর প্রতীকরূপে ব্যবহার করতেন। যেমন $\alpha\theta$ = ২৪ + ৯ = ৩৩ অবশ্য পদ্ধতি ত্রুটিযুক্ত ছিল কারণ $\alpha\theta$ = ১ + ৯ = ১০ হতে পারে।

গ্রীকদের মত হিব্রুগণ ও আরবজাতি বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা খ্যাপন করতেন। যাই হোক এবার ভারতীয় পদ্ধতিতে অক্ষর সংখ্যা প্রণালীর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ভারতীয় ৪২টি বর্ণমালাকে ২টী প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৩টী ব্যঞ্জনবর্ণ ও ৯টী স্বরবর্ণ। বিখ্যাত গণিতবিদ প্রথম আর্যভটের মতে অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে অঙ্ক খ্যাপন শক্তি এইরূপ—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্	চ্	ছ্	জ	ঝ্	ঞ্
		য্	র্	ল্	ব্	শ্	ষ্	স্	হ্
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্	ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
২১	২২	২৩	২৪	২৫					
প্	ফ্	ব্	ভ্	ম					

আর্যভট (১ম) বলেছেন 'দীর্ঘ স্বরবর্ণ এবং হ্রস্ব স্বরবর্ণকে সমশক্তি বলে ধরা হবে। অসম্পৃক্ত স্বরবর্ণের সংখ্যা খ্যাপনের অধিকার নেই। এরা শুধু অঙ্কস্থান এবং বর্গ ও অবর্গ স্থান নির্দেশের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।' প্রথম বর্গ ও অবর্গ স্থানের জন্য 'অ' ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় বর্গ ও অবর্গ স্থানের জন্য 'ই' বর্ণ ব্যবহার করেছেন। এইভাবে অন্যান্য স্বরবর্ণের ব্যবহার আর্যভট করেছেন।

অর্থাৎ একক, দশক = অ ; শতক, সহস্রক = ই ; অযুত, লক্ষ = উ ; নিযুত, কোটি = ঋ ; অর্বুদ, বৃন্দ = ঌ ; খর্ব, নিখর্ব = এ ; মহাপদ্ম, শঙ্খ = ঐ ; সমুদ্র, অন্ত = ও ; মধ্য, পরার্ধ = ঔ। আর্যভটের মতে অসম্পৃক্ত স্বরবর্ণ কোন সংখ্যা খ্যাপন না করলেও কোন ব্যঞ্জনবর্ণে সম্পৃক্ত হলে স্বরবর্ণটি নিজের দিকে টেনে নেয়। কিন্তু ব্যঞ্জনবোধিত অঙ্কটি কোথায় বসবে ? এ সম্পর্কে তিনি বর্গ ও অবর্গের সংজ্ঞা দিয়ে কোথায় বসবে এবং কোথায় বসবে না সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন—

বর্গাক্ষরাণি বর্গেঽবর্গেঽবর্গাক্ষরাণি কাৎ ঙ্মৌ যঃ।
খ দ্বিনবকে স্বরা নব বর্গেঽবর্গে নবান্ত্যবর্গে বা॥

অর্থাৎ ক থেকে বর্গাক্ষরবর্গ (স্থান), (য থেকে) অবর্গাক্ষর অবর্গ (স্থানে বসবে যাতে) ঙ্ ও ম মিলে য (হয়)। নয়টি বর্গ ও নয়টি অবর্গ (মিলে) শূন্যোপলক্ষিত আঠারটি স্থানে স্বরবর্ণ থাকবে। পরের স্থানগুলি এই প্রকার।

দেখা যাক "য" এর মান কত ? "ঙ্" বোধিত অঙ্ক ও "ম" বোধিত অঙ্ক একত্রে য বোধিত অঙ্কের সমান। সেইহেতু য = ৩০ কিন্তু অসম্পৃক্ত য্ = ৩। এ সম্পর্কে একাদশ খ্রীষ্টাব্দের অন্যতম বিশিষ্ট টীকাকার সূর্যদেব যজ্বা বলেছেন—

বর্গস্থানাপেক্ষয়া ত্রিংশৎসংখ্যো য কারঃ, স্বস্থানাপেক্ষয়া ত্রিসংখ্যোঃ। এবং য কারস্য ত্রিত্ববিধানাৎ তদুত্তরেষাং রেফাদীনাং তু চতুরাদিসংখত্বং সিদ্ধং।"......

অর্থাৎ বর্গস্থানাপেক্ষয়া য-কার ৩০ সংখ্যা খ্যাপন করে। কিন্তু স্বস্থানে ৩ সংখ্যা খ্যাপন করে। এইভাবে য্-কার ৩ বলে নির্দ্ধারিত হয়েছে। এইভাবে র্ কার ৪ নির্দ্ধারিত হয়েছে। অন্যান্যগুলিও এই সূত্রানুযায়ী সিদ্ধ হবে। বিখ্যাত টীকাকার পরমেশ্বর এ সম্পর্কে সুন্দর টীকা দিয়েছেন। যাই হোক উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি :

ম = ২৫, মি = ২৫০০, মু = ২৫০০০০, যি = ৩০০০, যু = ৩০০০০, খ্যুঘৃ = ৪৩২০,০০০, ঞিষ্টুভ = ৩৬৪২২৪, ক্রিলা = ১০৫০, বফিনচ = ২৩২২২৬

দ্রষ্টব্য—শব্দ সংখ্যা প্রণালী—প্রদীপ কুমার মজুমদার, আনন্দবাজার পত্রিকা। ১২।১১।১৩৭৪

বিখ্যাত পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী[১] খ্যুঘৃ = ৪৩২০,০০০ ধরেছেন এবং তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অনেকের সঙ্গে মতপার্থক্য হয়। তিনি বলেছেন খ্যু শব্দের মধ্যে খ্‌+উ এবং য্‌+উ আছে এবং "ঘৃ" শব্দের মধ্যে ঘ+ঋ আছে। খ = ২, উ = ১০০০, সুতরাং খু = ২০০০০ (এখানকার উ বর্গ-উ হিসাবে ধরা হ'ল)। যু শব্দে য+উ = ৩ × ১০০০০০ = ৩০০,০০০। ঘৃ শব্দে ঘ + ঋ = ৪ × ১০০০,০০০ বা ৪০০০,০০০

অতএব খ্যুঘৃ = ২০০০+৩০০,০০০+৪০০০,০০০ বা ৪৩২০০০০।

ডঃ দত্ত এই প্রকার অক্ষর সংখ্যা প্রণালীকে আর্যভটের অক্ষর সংখ্যা প্রণালী বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সুধাকর দ্বিবেদী, ফ্লীট, ক্যে প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ মনে করেন আর্যভটের এই প্রণালীতে গ্রীক প্রণালীর প্রভাব আছে।

ফ্লীট মনে করতেন আর্যভটীয়তে জ্যোতিষের যে আলোচনা আছে তা গ্রীক প্রভাবযুক্ত এবং হয়তো এই কারণে গণনা পদ্ধতিও গ্রীক প্রভাব থাকা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর কোন এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে আর্যভটীয়তে যে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা গ্রীক প্রভাবমুক্ত।[২] যাঁরা গ্রীক প্রভাবযুক্ত বলেন তাঁরা হয়তো গ্রীক প্রণালী

$\alpha, \beta, \gamma \cdots \cdots \cdots =$ ১, ২, ৩,... ... ... এবং $\gamma M =$ ৩ × ১০০০ ও ভারতীয় প্রণালী (আর্যভটীয়তে) ক, খ, গ, ... = ১, ২, ৩,... ... ... ও গু = ৩ × ১০০০'এর মধ্যে সাদৃশ দেখে মত দেন। কিন্তু এই সামান্য সাদৃশ থাকলেও অসাদৃশ রয়েছে প্রচুর।

গ্রীক অক্ষর সংখ্যা প্রণালীতে স্থানীয়মান তত্ত্বের সাহায্যে সংখ্যা খ্যাপন করতে দেখা যায় না। কিন্তু আর্যভটীয়তে স্থানীয়মান সহকারে সংখ্যা খ্যাপন করতে দেখা যায়। গ্রীকেরা প্রথম নয়টি অক্ষর দিয়ে ১ থেকে ৯ সংখ্যা ও তারপরের নয়টি অক্ষর দিয়ে এদের দশগুণ সংখ্যা খ্যাপন করতেন। আর্যভট এ প্রকারে সংখ্যা খ্যাপন করেন নি। আর্যভটের অক্ষর সংখ্যা প্রণালীতে স্বরবর্ণের কোন সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি নেই, তারা শুধু অঙ্ক স্থানকে নির্দেশ করে। অনেকে একমাত্র বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রীকদের সঙ্গে সাদৃশ দেখান। আর্যভটীয়ের পদ্ধতিতে বর্গীয় ও অবর্গীয় উভয় প্রকার ব্যঞ্জনবর্ণ মিশ্রিত করে দেখলে এ ভ্রম তাদের হোত না।

(১) দুর্গাদাস লাহিড়ী-পৃথিবীর ইতিহাস (ভারতবর্ষ) তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৩২-৩৩৪।

(২) P. C. Sengupta, Aryabhata, the father of Indian epicyclic Astronomy. Journal of the department of letters, Calcutta University, 1928, Page 1—56

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন আর্যভট অক্ষর সংখ্যা প্রণালীর জন্য পাণিণিকে অনুসরণ করেছেন। অবশ্য উভয়েই আবার শিবসূত্রের কাছে ঋণী।

ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা করে বলেছেন যে স্থানীয়মান তত্ত্ব ও দশাংক সংখ্যা প্রচলিত হবার অনেক পরে ভারতবর্ষে অক্ষরসংখ্যা প্রণালী প্রচলিত হয়েছিল। তাহলে কেন ভারতীয়রা দশমিক প্রণালী বাদ দিয়ে অক্ষর সংখ্যা প্রণালীর ব্যবহার করেছিলেন ? এর পিছনে ঐতিহাসিকেরা নানা যুক্তি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যুক্তি তুলে ধরা হোল।

১) অক্ষর সংখ্যা প্রণালীর সাহায্যে বড় সংখ্যাকে ছোট করে প্রকাশ করা যায়।

২) এই প্রণালীতে যে সংখ্যা খ্যাপন করা যায় সেই একই সংখ্যা ইচ্ছামত নানা উপায়ে প্রকাশ করে ছন্দোপোযোগী করা যায়।

৩) দশমিক প্রণালী মতে লিখিত সংখ্যার অঙ্কচিহ্নের স্থান বিনিময় করলে সংখ্যাটি বিকৃত হয়। কিন্তু অক্ষর সংখ্যা প্রণালীতে লিখে স্থান পরিবর্তন করলেও সংখ্যাটি ঠিক থাকে। যেমন গকি ও কিগ।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন এই প্রণালী সংখ্যা খ্যাপনে সুবিধা যেমন আছে সেরূপ অসুবিধাও আছে।

কটপযাদি প্রণালী ঃ ভারতবর্ষে কটপযাদি প্রণালী নামে অন্য এক প্রকার অক্ষর সংখ্যা প্রণালী বহুদিন পূর্বে প্রচলিত ছিল। অনেকে মনে করেন কটপযাদি প্রণালী বররুচি আবিষ্কার করেছেন। কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে নীলকণ্ঠ স্থরী প্রমুখ টীকাকারগণ "কাদিনব টাদিনব পাদিপঞ্চ যাদ্যষ্টৌ"—শ্লোকটি বররুচির বলে মনে করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বররুচি কে ? বার্তিকাকার কাত্যায়নের অন্য নাম বররুচি এবং ইনিই যদি হন তাহলে আমরা বলতে পারি শকপূর্ব পাঁচ শতকে কটপযাদি প্রণালী ছিল। যাই হোক প্রাচীনত্ব ও অন্যান্য ঐতিহাসিক বিষয়গুলি ঐতিহাসিকের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা মূল কটপযাদি প্রণালী নিয়ে আলোচনা করছি। ভারতবর্ষে চার ধরণের কট পযাদি প্রণালী প্রচলিত ছিল। এক এক করে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি।

(ক) দ্বিতীয় আর্যভট (৯৫০ খ্রীঃ) এই প্রণালী সম্পর্কে তাঁর মহাসিদ্ধান্ত গ্রন্থে বলেছেন—

"রূপাৎ কটপযপূর্বা বর্ণা বর্ণক্রমাদ্ভবন্ত্যঙ্কাঃ।
ঞ নৌ শূন্যং প্রথমার্থে আ ছেদে এ তৃতীয়ার্থে ॥"

অর্থাৎ "ক, ট, প, য হইতে আরম্ভ বর্ণক্রমে ১ হইতে (উর্ধতন) অঙ্ক হয়। ঞ ও ন শূন্য হয়। পদবিগ্রহে প্রথমা বিভক্তিতে আ ও তৃতীয়া বিভক্তিতে ঐ (হইবে)।" যাই হোক এই প্রণালীতে অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা খ্যাপিকা শক্তি এইরূপ—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্	চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ্
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্	ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
প্	ফ্	ব্	ভ্	ম্					
য	র	ল্	ব	শ	ষ	স	হ	ল	

এই প্রণালীতে সংখ্যা জ্ঞাপনে যেমন সুবিধা আছে সেরূপ নানাবিধ অসুবিধাও রয়েছে। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা নানারূপ বিতর্কের ঝড় তুলেছেন। এবং এখনও এ সমস্ত বিতর্কের কিছু কিছু অমিমাংসিত রয়েছে। যাই হ'ক এই প্রণালীর কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হ'ল এবং এ সম্পর্কে কিছু আলোচনাও করছি।

কসধগসনমঘচসিয়া = ১৭৯৩৭০৫৪৬৭১, ঢজহেকুনহেৎসভা = ৪৮৮১০৮৬৭৪

খগোস্ত্যাম্নেযাপ = ১৫৬৫১৩২ গুণগগগরং = ২৩৫৩

স্বরবর্ণের অঙ্কখ্যাপনে কোন প্রকার শক্তি নেই। তারা ব্যঞ্জনসম্পৃক্ত ব্যতীত অসম্পৃক্ত অবস্থায় সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে অবস্থান করতে পারে না। আবার যে কোন স্বরবর্ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও ব্যঞ্জনবর্ণ বিশেষের স্বনিহিত অঙ্কজ্ঞাপিকা শক্তির বিপর্যয় হয় না। সুতরাং ঘ্, ঘ, ঘা, ঘি, ঘী ইত্যাদি সকলে একই অঙ্ক ৪ জ্ঞাপন করে।

সংযুক্ত বর্ণের প্রত্যেকটি স্বনির্দিষ্ট অঙ্ক জ্ঞাপন করে। কোন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করতে হোলে দক্ষিণাগতি অনুসরণ করতে হবে।

(খ) স্বরবর্ণ অসম্পৃক্ত অবস্থায় শূন্য জ্ঞাপন করে। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে তাদের কোন প্রকার শক্তি থাকে না।

সংযুক্ত বর্ণের শেষ বর্ণই সংখ্যাখ্যাপন করতে পারে, অপরগুলি নিরর্থক।

অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনের অঙ্কখ্যাপণ শক্তি থাকে না। আবার যে কোন স্বরবর্ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও ব্যঞ্জনবিশেষের অঙ্কখ্যাপনশক্তি অবিকৃত থাকে। অনুস্বার ও বিসর্গের অঙ্কখ্যাপিকা শক্তি নাই।

যে কোন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে পাত করতে হলে বামাগতি নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

দ্বিতীয় বিভেদের মূল কোথায় তা ঐতিহাসিক বিতর্কের মধ্যে স্থান নিয়েছে। তবে সদরত্নমালাতে দেখা যায়—

নঞাবচশ্চ শূন্যানি সঙ্খ্যা কটপযাদয়ঃ।
মিশ্রে তূপান্ত্যহল্ সংখ্যা ন চ চিন্ত্যো হলস্বরঃ।

অর্থাৎ "ন, ঞ ও স্বরবর্ণ শূন্য, ক, ট, প, য আদি করিয়া সংখ্যা। সংযুক্ত বর্ণের শেষ বর্ণই সংখ্যা। অস্বরব্যঞ্জন চিন্তনীয় নহে।' নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ এক জায়গায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন এইরূপ—

"কটপযবর্গভবৈরিহ পিণ্ডান্তৈরক্ষরৈরঙ্কাঃ।
নঞি চ শূন্যং জ্ঞেয়ং তথা স্বরে কেবলে কথিতম্॥"

(গ) এই বিভেদ পালি গ্রন্থে দেখা যায়। পালি ভাষায় সকার একটি। সেইজন্য কটপযাদি প্রণালীতে য-বর্গ অক্ষরের সংখ্যাখ্যাপিকা শক্তির কিছু পরিবর্তন করতে হয় যেমন—য্ = ১, র্ = ২, ল্ = ৩, ব = ৪, স্ = ৫, হ্ = ৬।

অন্যান্য বিষয় (খ) পদ্ধতির মত। এই প্রণালীর দু-একটা উদাহরণ তুলে ধরছি। গুণগ্গরং = ২৩৫৩, ভানুবক্খর = ২৪০৪।

অক্ষর সংখ্যা প্রণালীর আরও কতকগুলি নিয়ম দেখা যায়। এদের মধ্যে তিনটি প্রণালীর উল্লেখ করছি।

(ক) এই প্রণালীকে সাংকেতিক ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়—

$$N = 34(x-1) + y$$

এখানে $x = 1, 2, 3, \cdots\cdots, 16$ এবং $y = 1, 2, \cdots\cdots, 34$

অর্থাৎ x হচ্ছে অ, আ, ই, ঈ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এই ষোলটি স্বরবর্ণ। এবং y হচ্ছে ক থেকে হ এবং ল বা ক্ষ।

এই পদ্ধতিতে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ অসম্পৃক্ত অবস্থায় কোন সংখ্যা জ্ঞাপন করে না।

(খ) $N = 16(y-1) + x$ এই সাংকেতিক ভাষায় একটি নূতন অক্ষর সংখ্যা প্রণালী ভারতবর্ষে চালু ছিল। এখানে স্বরবর্ণের মূখ্য ভূমিকা।

(গ) এটি একটি নূতন প্রণালী। সাংকেতিক ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়ঃ

$$N = 12(y-1) + x$$

এখানে স্বরবর্ণ বারটি, অর্থাৎ ঋ, ৠ, ঌ, ৡ ধরা হয় না। ক কার সম্পৃক্ত হয়ে ঐ বারটি স্বর যথাক্রমে ১ থেকে ১২ সংখ্যা নির্দেশ করে। খ কার সম্পৃক্ত হয়ে ১৩ থেকে ২৪ সংখ্যা খ্যাপন করে। প্রকৃতপক্ষে এখানে—

$$x = 1, 2, \cdots\cdots, 12\ ;\ y = 1, 2, \cdots\cdots, 34$$

এছাড়া আরও দুই প্রকার অক্ষর সংখ্যা প্রণালী ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।

ভারতীয় জ্যোতিষগ্রন্থে আর এক প্রকার অক্ষর সংখ্যা প্রচলিত আছে। স্বরোদয় শাস্ত্রে জীবস্বর গণনার নিয়ম আছে,—

যোড়শাক্ষরকোঽবর্গঃ স্যাৎ কাদিবর্গস্তু পঞ্চকাঃ
চতুর্ব্বর্ণৌ যশৌ বর্গৌ সংখ্যা বর্গেষু কীর্ত্তিতাঃ
নাম্নো বর্ণাঃ স্বরগ্রাহ্যা বর্গাণাং বর্ণসংখ্যয়া।
পিণ্ডিতা পঞ্চভির্ভক্তা শেষং জীবস্বরংবিদুঃ ॥

অর্থাৎ অ, আ,........, অং, অঃ যথাক্রমে ১, ২,........, ১৫, ১৬ সংখ্যা নির্দেশ করে এবং

১	২	৩	৪	৫
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	
শ	ষ	স	হ	

ভারতীয় গণিতগ্রন্থে কিছু কিছু নীতিপূর্ণ বাক্যও সংখ্যাখ্যাপনার্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন—জ্ঞানী নীতি ধারক = ১২৯৬০০০, জ্ঞানী নুনং ভীষ্মক = ১৫৪০০০০ প্রভৃতি।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ ভারতীয় সংখ্যা সম্পর্কে আরবীয় গণিতবিদদের উল্লেখযোগ্য অলোচনা।

দশমিক সংখ্যাপাতন এবং এ সম্পর্কে নানা তথ্য নিয়ে আলোচনা দেশী এবং বিদেশী ঐতিহাসিকগণ করেছেন। রেনউড (Reinaud) উপেক (Woepecke), রসেন (Rosen), স্ট্রাচী, টেলর প্রমুখেরা মনে করেন দশমিক স্থানীয়মান ভারতীয়দের আবিষ্কার করে। আবার, ক্যে, কারা দি ভ্যো প্রমুখেরা এ মতের বিরুদ্ধে। এ মত-দ্বৈততার কারণ হচ্ছে হিন্দ, হিন্দাসী প্রভৃতি শব্দগুলি নিয়ে। প্রথমোক্ত দল মনে করেন উপরোক্ত শব্দগুলি হিন্দু বা হিন্দু বিজ্ঞানকে লক্ষ্য করেই আরবীয়রা (বা পারসীকরা) ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় দল এ মতে বিশ্বাসী নয়। এখানে এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

আরব জগতের আধুনিক অঙ্কবোধক চিহ্নের আদি সাক্ষ্য খুঁজতে গেলে দার্শনিক জাহিজের (Djahig) কথাই প্রথম মনে আসে। তিনি অঙ্কবোধক চিহ্ন সম্পর্কে বলেছেন "এগুলি হিন্দের হিহ্ন, এই সমস্ত অঙ্কবোধক চিহ্নের সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা লেখা যায়।" হিন্দু অঙ্কবোধক চিহ্নগুলি কে আবিষ্কার করেছিলেন, অর্কন্দ ও সিন্দ হিন্দের গ্রন্থকার এবং শূন্য কে আবিষ্কার করেছিলেন তা তিনি জানেন না। এথেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় তিনি ভারতীয় গণিতবিদ সম্বন্ধে খুব বেশী জানতেন না।

৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আরবীয় গণিতবিদ এবং লেখক ইবন ওয়াসিয়া তার গ্রন্থে হিন্দুদের প্রচলিত তিন ধরণের অঙ্কবোধক চিহ্নের কথা বলেছেন।

দশম শতাব্দীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল হাসান আলমাসুদি (৯৪৩ খ্রীঃ) বলেছেন ভারতীয় ঋষিদের সম্মেলনে স্রষ্টা ব্রহ্মার অনুরোধে ঋষিরা নয়টি অঙ্কবোধক চিহ্ন আবিষ্কার করেন। মাসুদির কথা বিশ্বাসযোগ্য। কারণ তিনি মূলতান, কাম্বে, পারস্য, সিরিয়া প্যালেষ্টাইন, চীন প্রভৃতি দেশ ভ্রমন করেছিলেন। সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক। মাসুদির মন্তব্যে রেনউড বলেছেন এ থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষে অঙ্কবোধক চিহ্নের ব্যবহার কত প্রাচীন।

উত্তর আফ্রিকার টিউনীসের একটি গ্রাম কারবানের অধিবাসী আর সাহল ইবন তামিন (৯৫০ খ্রীঃ) তার সিফর য়েশিরা (Séfer yesirah) গ্রন্থে বলেছেন "হিন্দুরা

নয়টি চিহ্নের সাহায্যে তাদের এককগুলি প্রকাশ করতো। আমি হিসাব অল গোবরে এনিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।"

অল নাদিম (৯৮৭ খ্রীঃ) লিখিত আরবীয় সংস্কৃতির ইতিহাস "কিতাব অল ফিরিস্ত" এ বলেছেন ভারতবর্ষে প্রায় দুইশত অঙ্কবোধক চিহ্নের ব্যবহার ছিল। ভারতীয়রা দশ, শত প্রভৃতি লিখবার জন্য শূন্যের ব্যবহার করতেন এবং এগুলি অঙ্ক-বোধক চিহ্নের ঠিক নীচে বসান হত। এই অঙ্কবোধক চিহ্নগুলিই হিন্দ বা হিন্দিয়া নামে আরব জগতে পরিচিত।

অঙ্কবোধক চিহ্ন সম্পর্কে আবু রৈহান মহম্মদ ইবন আহমদ আল বিরুণীর[১] লেখা গ্রন্থ পাঠ করলে অনেক কিছু আমরা জানতে পারি। আলবিরুণী আরবী, পারসী, সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। আবার গণিত, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি বিষয়েও সম্যক জ্ঞান ছিল। তিনি "কিতাব অল অরকম্" এবং "তজকীরা ফি অল হিসাব ওয়াল মদ বি অল অরকম অল সিন্দ ওয়াল হিন্দ" নামে সংখ্যার উপর দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লিখিত অথার অল বাকিয়াতে তিনি সংখ্যাকে অল অরকম অল হিন্দ বলেছেন। এবং অক্ষর সংখ্যা থেকে এগুলি ভিন্ন সে কথাও উল্লেখ করেছেন (হারুফ অল জুম্মল বা হিসাব অল জুম্মল)। আরবীয় সংখ্যা চিহ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তার গ্রন্থ "তারিক অল হিন্দ" এ বলেছেন "বর্ণমালাগুলি বিভিন্ন আকৃতির, সংখ্যা বোধক চিহ্নগুলিও সেইরূপ। এগুলিকে অঙ্ক নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যে সংখ্যাবোধক চিহ্নগুলি আমরা ব্যবহার করি সেগুলির আদি হিন্দু চিহ্ন।" অন্যত্র আলবিরূণী বলেছেন। "আমরা যেভাবে অঙ্কবোধক চিহ্ন ব্যবহার করি। হিন্দুরা এ ব্যাপারে কতটা অগ্রসর হয়েছে সে সম্পর্কে আমি (আলবিরূণী) একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছি।"

আলি বিন আবুল রিগ্যাল আবুল হাসান (১০৪৮ খ্রীঃ) তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা গ্রন্থের মুখবন্ধের একজায়গায় বলেছেন "গণনার জন্য যে নয়টি চিহ্ন প্রয়োজন তা ভারতীয় দার্শনিকদের দ্বারা আবিষ্কৃত।"

তলখীসের উপর ভাষা লিখতে গিয়ে ইবন আলবান্না (১২৬০—১৩৪০ খ্রীঃ) এবং আবুল হাসান আলি অল কলসাদী বলেছেন "স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় যে নয়টি অঙ্কবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে তার নাম গোবর চিহ্ন। এগুলির উৎপত্তি ভারতবর্ষে"।

বেহা এদ্দিন (১৬০০ খ্রীঃ) বলেছেন হিন্দুরাই নয়টি অঙ্কবোধক চিহ্নের আবিষ্কর্তা।

এই সমস্ত চিহ্নগুলি হিন্দুদের দ্বারা আবিষ্কৃত এ কথা বলেছেন হোসেন ইবন মোহাম্মদ অল মহল্লী।

আল আন্সারী বলেছেন নয়টি হিন্দু অঙ্কবোধক চিহ্ন এইরূপ (.........)

এডোয়ার্ড স্ট্রাচে বলেছেন অঙ্কবোধক চিহ্ন হিন্দুদের আবিষ্কার একথা প্রায় প্রতিটি আরবী ও পারসী গ্রন্থে দেখা যায়।

বিখ্যাত গণিত ঐতিহাসিক রোসেন "আল হিসাব মতনন নিজা ফি ইলম" এর এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন সাইফার (chipher) হিন্দু চিহ্ন (অল আসরুল অল হিন্দি) এ কথা এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য বহু আরবীও পারসী গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

জ্যামিতি ও হিন্দুদের চিহ্ন সাইফর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মহম্মদ বিন কাজিদ "ফি অল হান্দাসা ওয়াল অল অরকম্" নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আল মার্দিনী এবং অল ইয়াকুব লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে হিন্দু অঙ্কবোধক চিহ্ন নিয়ে ব্যপক আলোচনা করা হয়েছে।

আরবীয় শব্দকোষ প্রণেতা হাজী খালফা তার গ্রন্থের একজায়গায় বলেছেন "মিফতা অল সাদাত" গ্রন্থের লেখক অঙ্কবোধক চিহ্নের আবিষ্কর্তা হিসাবে হিন্দুদের নাম করেছেন। বলাবাহুল্য হাজী সাহেব এনিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনা তাঁর গ্রন্থে করেছেন।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে আরবীয় ও পারসীয় গণিত-বিদেরা অঙ্কবোধক চিহ্নকে হিন্দের চিহ্ন বা হিন্দি চিহ্ন বলে উল্লেখ করেছে। কেউ কেউ অবশ্য এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ না করলেও এগুলির আবিষ্কর্তা হিন্দের লোক বলে মনে করেন। সবচেয়ে বড় কথা এ ব্যাপারে যা কিছু বিতর্ক তা হচ্ছে হান্দাসা এবং হিন্দাসী শব্দগুলি নিয়ে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন হিন্দ, হিন্দি, হান্দাসা এবং হিন্দাসী শব্দগুলি হিন্দু বা হিন্দুদের দেশ বা ভাষাকে লক্ষ্য করেই ব্যবহৃত হয়েছে। উপেক এ মতের জোর সমর্থক। তাঁর সমর্থক যত বিরুদ্ধবাদীও তত না হলেও নেহাৎ কম নয়। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কারা দি ভো'র নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা বলেন হিন্দাসী শব্দটি লেখবার সময় গোলমালে হিন্দ হয়ে গেছে। কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন হিন্দাসীতে আরবীয় অক্ষর সিনকে ভুল করে ইয়া পড়াবার ফলে হিন্দাসী শব্দটি হিন্দ হয়েছে। যাই হোক এখানে হিন্দ, হিন্দি, হিন্দিয়া, হান্দসা, হিন্দাসা বা হিন্দিসা নিয়ে কিছু আলোচনা করা থাক।

হিন্দ : আরবীয় এবং পারসীকরা ভারতবর্ষকে উল্লেখ করতে গিয়ে হিন্দ শব্দটি

প্রয়োগ করেছেন। অবশ্য প্রথমদিকে হিন্দ এবং সিন্দ শব্দ দুটির মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হয়। আল মাসুদি, ইবন হাউকল, আলবিরুণী সিন্দ বলতে ইন্দাস এবং মিরান (Mihran) মধ্যস্থ জায়গাকে বুঝিয়েছেন এবং এছাড়া সমস্ত দেশকে হিন্দ বলেছেন।

ইষ্টারী (৯২১ খৃঃ) হিন্দ বলতে সমগ্র ভারতবর্ষকে বুঝিয়েছেন। সাহানামাতে ফেরদৌসী সিন্দ বলতে নদী ও তৎসংলগ্ন দেশকে বুঝিয়েছেন এবং হিন্দ বলতে সমগ্র ভারতবর্ষকে বুঝিয়েছেন। ইবন সীদ, ফিরোজাবাদী, এল্ জওয়ারী, হাজী খালফা প্রমুখেরা অলহিন্দ বলতে সমগ্র ভারতীয় বা সমগ্র ভারতবর্ষকে বুঝিয়েছেন। আওরঙ্গজেবের সময় মির্জা খান ইবন ফকরুদ্দিন মহম্মদ হিন্দু শিল্প বিজ্ঞান নিয়ে "তুফাৎ অল হিন্দ" নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আবেস্তার মধ্যে হিন্দ শব্দটি দেখে মনে হয় শব্দটি অত্যন্ত প্রাচীন। তাছাড়া দারায়ুস Hystaspes' এর কিউনিফর্ম লিপিতে ও পহ্লবীদের সাহিত্যে এই শব্দটি পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেখে স্পষ্টই বলা যায় যে হিন্দ শব্দটি ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করেই উল্লেখিত হয়েছে।

হিন্দি এবং হিন্দিয়া : হিন্দি শব্দটি হিন্দ থেকে উৎপত্তি এবং হিন্দ বা ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা ভারতে অবস্থিত সব কিছুকে হিন্দি বলা হত। অবশ্য পরবর্তীকালে ভারতীয় ভাষাকেই হিন্দি বলা হত। আমীর খসরু লিখিত নুহ সেফির (Nuh Sephir) এবং সাহিক বিজরু-কা মুস্তাফীর লিখিত ওয়াকরাত ই মুস্তাকীতে ভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দি উল্লেখিত আছে। এডোয়ার্ড সাকাউ একজায়গায় বলেছেন আলবিরুণী সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষাকে ভারতীয়ের ভাষা হিসাবে উল্লেখ করেন নাই। তিনি যখনই ভাষা সম্পর্কে বলেছেন তখনই হিন্দি বা হিন্দিয়াকে উল্লেখ করেছেন। তবে গ্রন্থের ভাষা এবং কথ্য ভাষা যে একছিল না সে কথা কিন্তু উল্লেখ করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত, বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতি পারসী অনুবাদে হিন্দি শব্দটি দেখা যায়। অবশ্য অনেকেক্ষেত্রে হিন্দি বলতে হিন্দের (ভারতের) লোক বোঝান হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফেরদৌসীর সাহানামাতে এ ব্যাপারে উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। কঙ্ক অল হিন্দ বলতে

দ্রষ্টব্য—D. E. Smith and J. Ginsburg—Rabi Ben Ezra and Hindu Arabic Problem—Amer. Math. Monthly, Vol 25

দ্রষ্টব্য—Sachau, E. C—Albiruni's India.

দ্রষ্টব্য—L. C. Karpinski—Hindu numerals among the Arabs. Bibl. Math. Vol. 13

দ্রষ্টব্য—The Science of Calculation by the Board—Datta, B. B., Amer. Math. Monthly Vol 35 (1925)

হিন্দু দার্শনিক ও গণিতবিদ কঙ্ককেই বোঝান হয়েছে। এ ছাড়াও আরও নানা জায়গায় এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হান্দাসা, হিন্দাসা (হিন্দিসা) প্রভৃতি ঃ আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষজ্ঞ কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে আরবী ও পারসী ভাষায় কয়েকটি শব্দের উচ্চারণ নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। এই শব্দগুলির একটিকে ফ্লুগেল বলেছেন "হেন্দেসেত" যার অর্থ জ্যামিতি। রসেন, ম্যারী প্রমুখেরা এটিকে 'হান্দাসা' বলেছেন। আবার অনেকে "হিন্দাসা"ও বলেছেন। এটির বিশেষণ হিন্দাসী। ফিরোজাবাদীর মতে হান্দাজা বা হিন্দাজার আরবীয় শব্দ হান্দাসা বা হিন্দাসা। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে আরবীয় "দাল" অক্ষরের পর "যে" অক্ষর নেই। সেইহেতু "যে" অক্ষরটি সীন হয়েছে। আবার এটি পারসীক শব্দ অন্দাজা (andaza) থেকে নীত। অন্দাজা শব্দের অর্থ পরিমাপ। অতএব হান্দাসা বা হিন্দাসা শব্দটির অর্থ মাপ বা পরিমাপ। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে আরবীতে জ্যামিতিবিদদের অলমহান্দিস বা অলমহান্দাস বলা হয়। যাই হোক এব্যাপারে এবার আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করবো।

টেলর হিন্দাসা বা হান্দাসা এবং হিন্দাসী শব্দগুলির উপর দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন এগুলির উৎপত্তি হিন্দু গণিত থেকে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন দশমিক স্থানীয় মানের পাটীগণিতকে আরবীয়রা হিন্দাসী বা ভারতীয় পাটীগণিত বলতো। যাই হোক টেলারের তত্ত্বটি বিশেষভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় তার তত্ত্বে সামান্য কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। তিনি উপর্যুক্ত শব্দগুলি আরবীয় শব্দে বলেছেন কিন্তু আসলে এগুলি পারসীক শব্দ। আরবীয়রা সাধারণত হিন্দু-গণিতকে হিসাব অল-হিন্দ বলতেন।

টেলরের পরেই রোসেনের নাম করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে রোসেন টেলরের কথাই পুনরুক্তি করেছেন। পারসীক শব্দ হিন্দিসাই আরবী শব্দ হান্দাসা যার অর্থ জ্যামিতি। এবং এটি হিন্দু সংখ্যা সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে। যতদূর মনে হয় রোসেন এ মন্তব্য মহম্মদ ইবন মুসা অল খারেজমীর লেখা দেখে করেছেন। খারেজমী এক জায়গায় বলেছেন "বৃত্তের ব্যাসকে ৩$\frac{১}{৭}$ দিয়ে গুণ করলে বৃত্তের পরিধি পাওয়া যাবে। অবশ্য এটি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হলেও এটি সূক্ষ্ম মান নয়। জ্যামিতিবিদ্‌গণ (আহল অল হান্দাসা) আরও দুটি পদ্ধতি জানেন। তাদের মধ্যে

দ্রষ্টব্য—Bibhuti Bhusan Datta—The Hindu method of Testing operation—Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol 23. (1927)

একটি হচ্ছে ব্যাসকে ব্যাস দিয়ে গুণ করে ঐ ফলকে দশ দিয়ে গুণ করে মূল নিলে বৃত্তের পরিধি পাওয়া যাবে। অন্য পদ্ধতি হচ্ছে ব্যাসকে ৬২৮৩২০/২০০০০ দিয়ে গুণ করলে বৃত্তের পরিধি পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে খোয়ারজমী ওয়াল আল-নাজুম মিনহাম এবং আহল অল হান্দাসা শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। এথেকে অনেকে মনে করেন ওয়াল-অল-নাজুম মিনহাম বলতে খোয়ারজমী জ্যামিতিবিদদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ কথাটি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু রোসেন মনে করেন বাগদাদের সভায় যে জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ এসেছিলেন তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি এ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। রোসেন তাঁর এই অনুমানের পিছনে যে যুক্তিটি খাড়া করেছেন সেটি হ'ল আহল অল হান্দাসা এবং ওয়াল অল নাজুম মিনহাম সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি বা ঐ জাতের কিছু ভারতীয় গণিত গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি বলেছেন এ ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন পদ্ধতি ভারতীয় গ্রন্থে ছিল না। তা ছাড়াও রোসেন আরও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে হান্দাসা বা হিন্দিসা ভারতীয় গণিত বা ভারতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শব্দকেই বোঝান হয়ে থাকে।

টেলর এবং রোসেনের মতকেই জোরালো সমর্থন করেন উপেক। তিনি বলেছেন হিন্দ বা হিন্দি শব্দদ্বয় ভারতকেই বোঝান হয়ে থাকে। হান্দাসা বা হিন্দাসা হিন্দু-বিজ্ঞান, হিন্দু আর্ট বা হিন্দু পদ্ধতিকে বোঝায়। যদি এগুলি আরবীয় জ্যামিতি বা পারসীয় দশমিক সংখ্যাপাতন (decimal numerals) বোঝায় তাহলেও এগুলির উৎপত্তিস্থল হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষ। আরবীয় গণিতজ্ঞ ইবনে সীনা বর্গ এবং ঘন পদ্ধতির সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ফি অল তারিখ অল হিন্দাসী এবং অল হিসাব অল হিন্দাসী শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছেন। ইবন আলবান্না double false posotion'কে বলেছেন অল সিনা অল হিন্দাসিয়া। যেহেতু এগুলির বৈশিষ্ট পাটীগণিতীয় ধাঁচে অতএব কি করে হিন্দাসিয়াকে জ্যামিতিক বলা হবে? সুতরাং এই শব্দটির অর্থ "হিন্দু পদ্ধতি" বলা যেতে পারে। এছাড়াও উপেক আরও নানা যুক্তি তর্ক উপস্থিত করে টেলর ও রোসেনের মতকেই প্রতিষ্ঠিত করেন।

ক্যে এবং কারা ডি ভো নানা যুক্তি দিয়ে টেলর, রোসেন, উপেক প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মত খণ্ডন করেন।

ক্যে হিন্দি বলতে ভারতকে বোঝায় সে কথা স্বীকার করে নিয়েও ফিরেজাবাদীর একটি বিশেষ শব্দ নিয়ে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করেন। প্রকৃতপক্ষে তার যুক্তি প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(এক), হিন্দু শব্দটি শুধুমাত্র ভারতকে বোঝায় না এটি সমগ্র প্রাচ্যকে বোঝায়।

(দুই), হিন্দাসী শব্দটি গোলমালে হিন্দি হয়েছে।

ডঃ বিভূতি ভূষণ দত্ত[১] ক্যে'র যুক্তিগুলি অতি সুন্দর ভাবে খণ্ডন করেছেন। এবং রোসেন প্রমুখের মত কিছুটা পরিবর্তন করে নূতন মত প্রতিষ্ঠিত করেন।

এ প্রসঙ্গে কারা ডি ভো সে সব যুক্তি উপস্থিত করেছেন তা অধিকাংশই কল্পনা প্রসূত। তাঁর প্রথম যুক্তি হিন্দ শব্দটিকে নিয়ে। তিনি বলেছেন হিন্দ বলতে ভারতকে বোঝায় না। একটি এণ্ড (বা হেন্দ) যার অর্থ পরিমাপ, পাটীগণিত বা জ্যামিতিকে বোঝায়। সুতরাং হিন্দের চিহ্ন অর্থ ভারতীয় চিহ্ন নয় পাটীগণিতীয় চিহ্ন। দ্বিতীয় যুক্তি হিন্দাসী শব্দের উপর ভিত্তি করে উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেছেন হিন্দাসীর পরিবর্তে হিন্দি শব্দটিই প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন পের্গার এ্যাপোলনিয়সকে অল হিন্দ বলা হোত বলে জনৈক আরবীয় গণিতজ্ঞ উল্লেখ করেছেন।

তাঁর (কারা ডি ভো'র) তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে আল মাসুদি হিন্দু সংখ্যার উৎপত্তি সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা ভারতীয় কল্প কাহিনী উপর ভিত্তি করে বলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন কারা দি ভো আল নাদিম, আলবিরূণী, হাজী খালফা প্রমুখের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দিয়েছেন তার যথার্থতা প্রমাণ করবার জন্য ক্যে'র মত কোন প্রকৃত দলিল উপস্থিত করতে পারেন নাই। হেন্দ বা এণ্ড শব্দ সম্পর্কে যা বলেছেন সেটিও গ্রাহ্য নয় কারণ আরবীয় শব্দকোষ লক্ষ্য করলে দেখা যায় হিন্দি হেন্দ শব্দ থেকে উদ্ভূত নয়। মাসুদি এ ব্যাপারে যা বলেছেন তা উদ্ভট বলে ঐতিহাসিকগণ মত দিয়েছেন।

হিষ্ট্রী অব ম্যাথেমেটিকসের কোন এক জায়গায় স্মীথ বলেছেন হিন্দাসী বলতে হিন্দুকে বা হিন্দু সম্পর্কিত বিষয়কেই বোঝায়। ভারতবর্ষে এবং আরব জগতে গুণ করার একটি কৌশল প্রচলিত ছিল। এবং এর সঙ্গে জড়িত numerical' কেই হিন্দাসি বলা হয়ে থাকে।

যাই হোক আমরা লক্ষ্য করলাম জাহিজ ইবন ওয়াসিয়া, আলবিরূণী, শরাফ এদ্দিন প্রমুখেরা অঙ্ক বোধক চিহ্নকে হিন্দের চিহ্ন বলেছেন। এবং ক্যে প্রমুখের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে একেবারেই খাটে না। কারণ স্পষ্টই বোঝা যায় তাজকির ফি অল-হিসাব ওয়াল মাদ বি আল অরকম অল সিন্দ ওয়াল হিন্দ, অল অরকম অল হিন্দ, অল

[১] Bibhuti Bhusan Datta—Testimany of early Arab writers on the origin of our numerals—Bull. cal. math. Soc. Vol—24 (1932)

অরকম অল সিন্দ প্রভৃতি শব্দ হিন্দু সংখ্যা চিহ্ন বা হিন্দু সম্পর্কিত বিষয়কেই বোঝাচ্ছে।

আধুনিক আরবী অঙ্কবোধক চিহ্ন এবং ভারতীয় অঙ্কবোধক চিহ্ন থেকে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এটা স্বাভাবিক যে কোন দেশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হলে তার অঙ্কবোধক চিহ্নগুলিও কিছুটা পরিবর্তন হয় এবং এই কারণেই আল-বিরূণীর সময়ে ভারতে যে নানা প্রকার অঙ্কবোধক চিহ্ন ছিল আজ তার পরিবর্তন হয়েছে এবং এরই ফলে আরব জগতে এবং ভারতবর্ষে অঙ্কবোধক চিহ্নের পার্থক্য লক্ষিত হয়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে আরবের দুই ও তিন সংখ্যাদ্বয় সংস্কৃত দুই ও তিন সংখ্যাদ্বয় থেকে খুব বেশী একটা পার্থক্য নেই। এবং দশমশতাব্দীতে এই দুই অঙ্কবোধক চিহ্ন একই ছিল। ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে তখনকার দিনে প্রচলিত দেবনগরী অক্ষর মোতাহার ইবন তাহিরের গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই দেবনগরী অঙ্কবোধক চিহ্নগুলি জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত ছিল না। আল-বিরূণী অবশ্য তার গ্রন্থে স্পষ্টই বলে গিয়েছেন আরবীয় অঙ্কবোধক চিহ্ন ভারতীয় অঙ্ক-বোধক চিহ্ন থেকে উদ্ভূত।

দশম শতাব্দীর কিছু আগে বা পরে আরবজগতে অঙ্কবোধক চিহ্ন ব্যবহার করার জন্য দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা যায়। একদল হিন্দু অঙ্কবোধক চিহ্ন এবং অঙ্ক পাতন পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ষপাতী। অন্যদল প্রাচীন মতের পক্ষপাতী। প্রথমোক্ত দলের সমর্থনকারীদের মধ্যে আল খারেজমী, অলকিন্দি, সেনেদ ইবন আলি, আল করাবীসী, ইবন অল হাইথম্, অল নশিবী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই তাদের গ্রন্থে হিন্দি শব্দটি জুড়ে দিয়েছিলেন। যেমন অল হিসাব অল হিন্দি, কিতাব রিসালত ফি এষ্টেমাল অল হিসাব অল হিন্দি আরব মোকালাৎ, কিতাব অল হিসাব অল হিন্দি, মোকালাৎ ফি ইলা অল হিন্দি, অল কুকনী ফি-ল হিসাব অল হিন্দি প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। অবশ্য পূর্বদেশীয় মুসল-মানরা (ভারতের পশ্চিমে) হিন্দি শব্দের সঙ্গে তকত্ শব্দটি ব্যবহার করতেন। যেমন অল অণ্টকী'র লিখিত "অল তকত্ অল কবীর ফিল হিসাব অল হিন্দি", অল কালওয়াদানী লিখিত "কিতাব অল তকত্ ফিল হিসাব অল হিন্দি, সীনান ইবন ফতে লিখিত "ইলম্ হিসাব অল তকত্" প্রভৃতি গ্রন্থগুলির নাম করা যায়। এখানে তকত্ শব্দটির অর্থ ফলক।

সমস্ত কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ঐতিহাসিকগণ বলেন আরবীয় সংখ্যা প্রাণালী-তে ভারতীয় প্রভাব স্পষ্ট। এ সম্পর্কে আরবীয় ও পারসীয় লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থেই উল্লেখ থাকতে দেখা যায়।

৪.২ ইউরোপে ভারতীয় সংখ্যা প্রণালী

সংখ্যা প্রতীক কে কবে আবিষ্কার করেছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিধা এবং দ্বন্দ রয়েছে তা পূর্বেই আমরা জেনেছি। এ সম্পর্কে ছুটি প্রধান তত্ত্ব আছে। (১) অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে মুর কর্তৃক এ প্রণালী স্পেনে নীতি হয় এবং তৎপর সমগ্র ইউরোপ ছড়িয়ে পরে। (২) দ্বিতীয় মতটি উপেক দেন। তিনি বলেন এটি মুর কর্তৃক স্পেনে নীতি হয় নাই। এটি আরবরা যখন স্পেনে যায় সেই সময় থেকে ছিল। এই দ্বিতীয় সতের সমর্থনে বলা যায়—এই যে সংখ্যা প্রতীকগুলি লিওনার্দো অব পীসা'র সংখ্যা প্রতীকগুলি থেকে ভিন্ন। এবং বোয়েথিয়াস ভারতীয় সংখ্যা প্রণালী জানতেন।

বোয়েথিয়াসের জ্যামিতিতে হিন্দু সংখ্যা প্রণালীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তবে অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন এই গ্রন্থটি জাল। এর পিছনে যুক্তি হচ্ছে (ক) বোয়েথিয়াস তার গ্রন্থে হিন্দু সংখ্যা বা সংখ্যা প্রণালীর উল্লেখ করেন নাই। এবং এটি গ্রীক গণিতবিদ নিকেমেকাসের অনুকরণে রচিত। (খ) বোয়েথিয়াসের সমসাময়িক কেউই হিন্দু সংখ্যা প্রণালীর উল্লেখ করেন নাই। (গ) সংখ্যার ছাঁচগুলি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরকম। এবং ডানদিক থেকে বাঁদিকে আরবদের মত সাজানো। (ঘ) যেখানে সেখানে সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক। (ঙ) মধ্যযুগে গ্রন্থ জালিয়াতি ছিল এবং লিপিকারদের ইচ্ছামত বিষয়বস্তু সংযোজন অথবা বাদ দেওয়ার প্রবণতা ছিল।

যাই হোক এতসব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিতেরা মনে করেন বোয়েথিয়াস হিন্দু সংখ্যা প্রণালী জানতেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বোয়েথিয়াস এ প্রণালী কি করে জানলেন ? আমরা জানি ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মধ্যে চিন্তাধারার আদান-প্রদান ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য অনেক কিছু এ দেশ থেকে সে দেশে এবং সে দেশ থেকে এদেশে প্রসারলাভ করেছিল। পণ্ডিতদের যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্য হেতু পাশ্চাত্যে এই প্রণালী প্রসার লাভ করে। মনে হয় বোয়েথিয়াস এই প্রণালী কোন শ্রেষ্ঠী বা পর্যটকের কাছ থেকে আয়ত্ব করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে সুদূর প্রাচ্য এবং মধ্য ইউরোপের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কতটা ছিল তার সঠিক এবং সম্ভাব্য নথিপত্র আমাদের কাছে খুব বেশী না থাকলেও পণ্ডিতেরা এই প্রণালীর প্রসারলাভের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদান প্রদানের উপরই জোর দিয়ে থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠী এবং পর্যটকেরাই এই প্রণালী ইউরোপে প্রসারলাভে সহায়তা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ইবনে সীনা ভারতীয়

সংখ্যা গণনা পদ্ধতি জানবার জন্য একজন তৈল ব্যবসায়ীর দ্বারস্থ হন এবং পরে এই ব্যাপারে সাফল্যলাভ করেন। লিওনার্দো অব পীসার ক্ষেত্রে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। পাশ্চাত্য জগতে এই প্রণালী বিস্তার লাভের পিছনে নিম্নোক্ত কারণগুলি, স্মীথ ও কারপিনস্কি বলেছেন। এখানে তাঁদের ভাষায় উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল।[১]

(1) Commerce, and travel for travel's sake, never died out between the East and the west, (2) merchants had every opportunity of knowing, and would have been unreasonaly stupid if they had not known, the elementary number systems of the peoples with whom they are trading, but they would not have put this knowledge in permanent written from ; (3) Wandering scholars would have known many and strange things about the peoples they met, but they too were not as a class, writers ; (4) There is every reason a priori for believing that the gobār numerals would have been known to merchants, and probably to some of the wandering scholars, long before the Arab conquered northen Africa ; (5) The wonder is out the Hindu-Arabic numerals were not known about 1000 A. D. amd that they were the subject to an elaborate work in 1202 by Fibbonacci,………

ভারতীয় অঙ্কপাতন পদ্ধতির ইউরোপে প্রথম প্রচারক হিসাবে আদেলাদ অব বাথের নাম করা যায়। ইনি আল খোয়ারজমীর পাটীগণিতটি ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। এবং এরই ফলে ইউরোপ ভারতীয় অঙ্কপাতন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়। এরপর ফিবোনাচ্চির নাম উল্লেখ করতে হয়। বলতে গেলে ফিবোনাচ্চিই ইউরোপে প্রথম পাটীগণিতের প্রবর্তন করে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Liber abaci'তে ভারতীয় সংখ্যা সম্বন্ধে সুশৃঙ্খলরূপে আলোচনা করা হয়েছে। মনে হয় ফিবোনাচ্চি কোন মুসলমানের কাছ থেকে দশমিক সংখ্যাপাতন পদ্ধতি শিখেছিলেন। দশমিক স্থানীয় মান পদ্ধতি আবার সাক্রোবস্কো ও ভিলদিউ ব্যাপক আকারে প্রচার করেন। অবশ্য সাক্রোবস্কো'র লেখায় দশমিক পদ্ধতির আবিষ্কারক হিসাবে আরবদের নাম উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে সমস্ত জগতের এ ভ্রান্তি বিদূরিত হয়েছিল। ইউরোপে যে ভারতীয় সংখ্যা প্রণালী যে ব্যাপক প্রসারলাভ করেছিল সে কথা আজ কারও নিকট অবিদিত নয়। তবুও যাঁরা এ ব্যাপারে উৎসাহী তাঁরা স্মীথ ও কারাস্পিনস্কী লিখিত "হিন্দু আরবীয় নিউমেরালস্" গ্রন্থটি দেখতে পারেন। এতে এ সম্পর্কে ব্যাপক অথচ সুশৃংখলভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(১) Smith and Karpinski—The Hindu Arabic Numerals, Page-90

৫.১ পাটীগণিতের উৎপত্তি ও গণনা ফলক

পাটীগণিতের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই "পাটী" শব্দটি সম্পর্কে নানা কথা মনে উঁকি দেয়। এটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তার কারণ প্রাচীন ভারতের কোন সাহিত্যে "পাটী" শব্দটি দেখতে পাওয়া যায় না। এমন কি নিরুক্ত, অমরকোষ বা হলায়ুধের অভিধান রত্নমালাতেও দেখতে পাওয়া যায় না। বিখ্যাত ভারতীয় গণিতবিদ গণেশ (১৫৪৫ খ্রীঃ) পাটী শব্দটি সম্পর্কে বলেছেন 'যোগ প্রভৃতি প্রকরণের ক্রম প্রকাশকে পাটী বলে।' মুনীশ্বর পাটী শব্দটির অর্থ পরিপাটী বলেছেন। অবশ্য পরিপাটী শব্দটি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত শব্দ এবং এটি অমরকোষে দেখতে পাওয়া যায়। চলতি কথায় পাটী শব্দটির অর্থ ফলক এবং মনে হয় পাট্ট শব্দটির অপভ্রংশ থেকে "পাটী" শব্দটি এসেছে।

পাঁচ শত খ্রীষ্টপূর্বে 'লেখবার জন্য ফলক' কথাটি বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যে উল্লেখিত হতে দেখা যায়। অন্ততপক্ষে বৌদ্ধ শাস্ত্র বিনয়পিটক, জাতক, ললিতবিস্তার প্রভৃতি গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা দুরূহ সমস্যা অঙ্কনের সাহায্যে সমাধানের জন্য ফলকের উপর ধূলো ছড়িয়ে দিয়ে আঁক জোক করতেন। তাছাড়াও আমরা জানি যে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ফলকের (board) উপর ধূলো ছড়িয়ে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে সংখ্যা এবং তৎসংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান করা হোত। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, হয়তো তখনকার দিনে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ছিল বলেই এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। ভারতীয় গণিত-শাস্ত্রে অবশ্য কেউ কেউ যেমন ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা এই পদ্ধতিকে ধূলিকর্মা বলেছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের দশম অধ্যায়ের ৬২ তম শ্লোকে বলেছেন :

"নাবার্যো জ্ঞাতৈরপি তন্দ্রৈরার্যভট বিষ্ণুচন্দ্রাদৈঃ।
যো ব্রাহ্ম ধূলিকর্ম বিদাচার্যত্বং ভবন্তি তস্য ॥" [১]

দ্রষ্টব্য—The use of Abacus in ancient India—G. R. Kaye. Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal (New Series), Vol (IV) 1908. Page 293.

(১) ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত—দশম অধ্যায়, ৬২ তম শ্লোক।

অর্থাৎ মমার্থ হচ্ছে—যে পণ্ডিত আর্যভট, বিষ্ণুচন্দ্র প্রভৃতির গণনাশিক্ষা করেছেন সেগুলি অপেক্ষা যিনি ব্রহ্মগুপ্ত লিখিত ধূলিকর্মা পাঠ করবেন তিনি অধিক জানবেন।

ব্রহ্মগুপ্ত ধূলিকর্মাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি বলে মনে করতেন এবং সেইহেতু ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের দশম অধ্যায়ে ৬৭-তম শ্লোকে বলেছেন ঃ

গুরুণা ন ধূলিকর্ম প্রতিকঞ্চুককারিণে প্রদাতব্যম্।
তস্য স্কৃত প্রণাশঃ কুরুতে প্রতিকঞ্চুকং যঽস্য ॥ [১]

মমার্থ হচ্ছে—যিনি ধূলিকর্মা পদ্ধতি প্রয়োগ করেন না তিনি নিন্দার যোগ্য এবং তাঁর যশ অবলুপ্ত হতে পারে।

উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য নানা সুযোগ সুবিধা গণনার ক্ষেত্রে এবং লেখবার ক্ষেত্রে দেখা দেওয়ার ফলে এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

ইংরাজীতে যাকে "এরিথমেটিক" বলে ভারতীয় গণিতবিদগণ তাকে পাটীগণিত বলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীধরাচার্য তাঁর গ্রন্থটির নাম রেখেছেন "পাটীগণিতসার।" অবশ্য এটি ত্রিশতিকা নামেও ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে উল্লেখিত আছে। ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় আর্যভট প্রমুখেরা তাঁদের গ্রন্থে গণিতাধ্যায় নামে একটি পরিচ্ছেদ রেখেছেন। নারায়ণ তার গ্রন্থটিকে "পাটীগণিত কৌমূদি" বলেছেন। মুনীশ্বর তাঁর গণিত গ্রন্থটিকে "পাটীসার" নাম দিয়েছেন।

"ফলক" বা "পাটী" শব্দটি নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত দেখতে পাওয়া যায়। বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মনে করেন ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ-জ্যোতির্বিজ্ঞানে কাঠের ফলক ব্যবহার করতেন বলেই হয়তো "ফলক" শব্দটি ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে এসেছে। বেইলী, ফ্লীট প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ মনে করেন ফলককে এ্যাবাকাস রূপে ভারতীয়রা ব্যবহার করতো বলেই পাটী শব্দটি ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে অনুপ্রবেশ করেছে। ডঃ বি. বি. দত্ত [২] বলেছেন পাটীগণিত শব্দটি সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় গণিতে দেখা যায় এবং তার বহু পূর্বে ভারতীয় এ্যাবাকাস লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যদি ফলক এ্যাবাকাস বলে কোন কিছুর ব্যবহার থাকতো তা হলে তা পাটী না বলে ফলক গণিত বা পাট্ট গণিত নামে প্রচলিত হোত। ডঃ দত্ত তাছাড়াও মনে করেন ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে এ্যাবাকাসের প্রচলন ছিল না। যাই হোক এটি একটি ঐতিহাসিক বিতর্কিত বিষয়, আমরা এ ব্যাপারে খুব গভীরে আলোচনা করতে চাইনা।

(১) ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত—দশম অধ্যায় ৬৭ তম শ্লোক।

(২) The Science of Calculation by the board—B. B. Dutta. American mathematical monthly, Vol. (35), 1928, Page 520.

বৌদ্ধ সাহিত্যে মুদ্রা, গণনা এবং সংখ্যায়ন এই তিন ধরণের গণিতের উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। মুদ্রা হচ্ছে আঙুলের সাহায্যে গণনা করা, গণনা হচ্ছে আঙুলের সাহায্য ব্যতিরেকে গণনা করা এবং সংখ্যায়ন হচ্ছে উচ্চতর গণিত। সাধারণত এইগুলি দীঘনিকায়, বিনয়পিটক, দিব্যাধান ও মিলিন্দাপানহোতে দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে অবশ্য প্রথমদিকে এই তিন ধরণের গণিতের ভাগ দেখতে পাওয়া যায় না। হাতিগুম্ফাতে লেখা ও রূপের সাহায্যে গণনার কথা উল্লিখিত আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সংখ্যায়নের কথা বলা হয়েছে। অমরকোষে গণিত ও সংখ্যায়ন পাশাপাশি উল্লেখিত আছে। যাই হোক সমস্ত কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পণ্ডিতেরা মনে করেন পাটীগণিত শব্দটি অসংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ভূত এবং সপ্তম শতাব্দীতে এটি সংস্কৃত সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করে। পাটী শব্দটি আরবীয় গণিত শাস্ত্রে প্রভাব বিস্তার করে এবং সেখানেও এ্যাবাকাসের প্রচলন ছিল সে কথা পণ্ডিতেরা বলে থাকেন। সুতরাং আরবীয় এ্যাবাকাস এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন।

আমরা পূর্বেই বলেছি স্থানীয়মান সহকারে সংখ্যাপাতন পদ্ধতি নিঃসন্দেহে মানবজাতির একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। তবে এটি কে, কবে এবং কোন জাতি আবিষ্কার করেছিলেন তা নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে কিছুটা অন্ধকারে রয়েছি। যাই হোক, যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি তা থেকে বলা যায় এই পদ্ধতিটি হিন্দু আরবীয় সংখ্যাপাতন পদ্ধতি এবং এই সূত্র থেকেই বলা যায় এটি ভারতীয় এবং আরবীয়রাই আবিষ্কার করেছেন।[১] তবে এ মত সকলের নয়। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন ভারতীয়রা এ পদ্ধতি একদিনে বের করেননি অথবা কোন একজন নির্দিষ্ট ভারতীয় গণিতবিদ এটি আবিষ্কার করেননি। এটি বহু শতাব্দী ধরে বহু গণিতবিদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে উদ্ভূত। গাঁজ (Gandz) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন সম্ভবতঃ গণনা ফলকের (Abacus) এর লম্বসারির (বা স্তম্ভ বা Column) ধারনা থেকে ভারতীয়রা দশ এবং দশগুণোত্তর রাশির নামকরণ করেছিলেন। বুবনভ ও ক্যে কিছুতেই প্রথম আবিষ্কর্তা হিসাবে ভারতীয়দের স্থান দিতে নারাজ এবং এক্ষেত্রে ইউরোপকে আবিষ্কর্তার আসনে বসাতে চান। কিন্তু সুখের কথা ক্যে প্রমুখের মত পরবর্তীকালে গ্রাহ্য হয় নি পরন্তু ভারতীয়রাই এই পদ্ধতির আবিষ্কারক বলে পরবর্তীকালে সুদৃঢ় মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

(১) Did the Arabs know the Abacus—Solomon Gandz, American mathematical monthly, Vol (34), 1927. Page 308

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভারতবর্ষে গণনা ফলক ছিল এ কথা বহু ঐতিহাসিক শুধু মনেই করেন না তাঁরা এছাড়াও বলেন গণনা ফলকের আদি গৃহ হচ্ছে ভারতবর্ষ। ভারতীয় সংখ্যাপাতন পদ্ধতি আরবজগতে প্রসারলাভ করায় অনেকে মনে করেন আরবীয়রা এ্যাবাকাস সম্পর্কে কিছু জানতেন। তবে এ ব্যাপারেও মতদ্বৈততা আছে। উপেক বলেছেন আরবরা লম্বসারী গণনাফলক (স্তম্ভসারী গণনা ফলক বা Column Abacus) জানতেন। হ্যাঙ্কেল কিন্তু বলেছেন আরবরা এ্যাবাকাস সম্পর্কে জানতেন সে নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না। ট্রেউটলীন বলেছেন লম্বসারী এ্যাবাকাস সম্পর্কে আরবরা কিছুই জানতেন না। ভিসেনবর্ণ মনে করেন আরবরা এ্যাবাকাস সম্পর্কে জানতেন। তিনি একজন ইংরাজ লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন গেরবার্ট এ্যাবাকাস সম্পর্কে জানতেন এবং এটি হয় আরবদের কাছ থেকে না হয় স্বাধীনভাবে নিজেই আবিষ্কার করেছেন। এর পরেই তিনি বলেছেন আরবরা তাঁদের লেখার মধ্যে এ্যাবাকাসের কথা উল্লেখ না করলেও তাঁরা এ ব্যাপারে কিছু জানতেন না এ ধারনা ঠিক নয়। ডি. ই. স্মীথ, এল. সি. কারপিনসকি প্রমুখেরা এ মতের সমর্থক।[১] কিন্তু ভিসেনকর্ম এ মতের তীব্র সমালোচনা করেছেন। স্মীথ বলেছেন মধ্যযুগে আরব জগতে ধূলি গণনাফলকের উপর গোবর সংখ্যা লেখা হোত। স্মীথ এ মন্তব্য করার পরেই বলছেন পূর্ব আরব এবং পশ্চিম আরবদের জন্য এ্যাবাকাসের দুটি পরিভাষাও আরবীয়রা করেছিলেন।

বহু গণিত ঐতিহাসিক এ্যাবাকাস এরিথমেটিককে হিন্দু এরিথমেটিক বলে মনে করেন। হুম্বল্ট, সাল, প্রমুখেরা মনে করেন এ্যাবাকাস ভারতবর্ষে ছিল এবং এটি ভারতীয় সংখ্যা প্রণালীর সঙ্গে জড়িত ছিল। নট বলেছেন বর্তমান শূন্য সহ প্রতীক চিহ্ন এ্যাবাকাসের নিকট ঋণী এবং এ্যাবাকাসের আদি গৃহ হচ্ছে ভারতবর্ষ। এ মতের সমর্থকদের মধ্যে বেইলী, টেলর, বার্ণাল, রডেট প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নাম উল্লেখযোগ্য। আরবীয় গণিতবিদদের মধ্যে অনেকেই "কিতাব অল তকত" লিখতে গিয়ে হিন্দু এরিথমেটিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। "তকত" শব্দটি এ্যাবাকাস শব্দটির আরবীয় ও পারসীয় অনুবাদ। আলি ইবন আহমেদ, আবুল কাশীম, অল অণ্টাকী এবং অল মুজতবা "কিতাব অল তকত" নামে এরিথমেটিকের কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থগুলি হচ্ছে।

১ The dust numerals among the Ancient Arabs—David Eugent Smith and Salih Mourad—Bull. Amer. math. Soc Sol 34 1927. p-258.

দ্রষ্টব্য—The use of Abacus in India—Fleet, Journal of the Royal Asiatic Society—1911.

(ক) কিতাব অল তকত্ অল কবীর ফিল হিসাব হিন্দি (The great book of the board on Hindu arithmetic)

(খ) কিতাব ফিল হিসাব অলাল তকত্ বিলা মাহউ (The book on arithmetic on the board without erasing)

(গ) কিতাব অল হিসাব বিল তকত্ বল্ বিল য়্যাদ (The book on arithmefc with the hand without the board.)

মহম্মদ ইবন আবদাল্লা, আবু নাশর এবং অল কাওয়াদনী প্রমুখেরা কিতাব অল ফি'ল হিসাব অল হিন্দি নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হারানের অধিবাসী এবং প্রখ্যাত গণিতবিদ অল ফতে "ইলম হিসাব অল তকত" নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অল রজি "কিতাব অল তকত" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার হিসাবে আমাদের নিকট সুপরিচিত। একটু লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বোঝা যায় অল মুজতবার আগেও "কিতাব অল তকত" লেখা হয়েছে এবং এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে অল মুজতবার পূর্বে কিতাব অল তকত জনপ্রিয় ছিল। কয়েকটি গ্রন্থ পড়ে মনে হয় এ্যাবাকাস এবং তকত শব্দ দুটি সমার্থক। বিশেষ করে আমীন অল দীন এবং অল অভরী কর্তৃক লিখিত "কাফিয় ফি হিসাব অল তকত ওয়াল মীল" এবং আবু আবদাল্লা লিখিত" জওয়ামী অল হিসাব বিল তকত্ ওয়াল তুরাব" গ্রন্থগুলি পড়লে এ ধারণাকেই সুদৃঢ় করে। তাছাড়া হাজী খলিফা এক স্থানে লিখেছেন,—এরিথমেটিকের বিভিন্ন ভাগ আছে ; তার মধ্যে ফলকের উপর এরিথমেটিক (arithmetic on board) একটি বিভাগ। এটিকে অল তকত ওয়াল মিল নামে অভিহিত করা হয়। এটির মধ্যে এরিথমেটিকের এক প্রভৃতি সংখ্যার বিভিন্ন নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে। সমস্ত প্রতীক চিহ্ন হিন্দুদের দান। এ ধরণের এরিথমেটিককে "অল তকত ওয়াল তুরাব" বলা হয়। এ থেকে স্পষ্টই বলা যায় ধূলি এবং ফলকের সাহায্যে স্থানীয় মান সহকারে হিন্দু সংখ্যা গণনা করা হোত।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন আরবরা শুধু এ্যাবাকাসই জানতেন না, তাঁরা গ্রীক শব্দ এ্যাবাকিয়ন (abakion) এবং হিব্রু শব্দ অ্যাবাক' এর আরবীয় অনুবাদ করেছিলেন। পূর্ব আরব জগতে পারসী শব্দ "তকত্" এবং পশ্চিম আরবজগতে "গোবার" শব্দ প্রচলিত। অনেক পণ্ডিত মনে করেন "গোবার শব্দটি সব সময় ধূলি ফলককেই বোঝায় এ কথা ঠিক নয়, এটি শুধুমাত্র এ্যাবাকাসের অনুবাদও বলা যেতে পারে।

আগেই লক্ষ্য করা গিয়েছে যে পাটী শব্দটি অরবীয় গণিতশাস্ত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ ভারতীয় পাটীগণিত ও ভারতীয় আঙ্কিক চিহ্ন আরবজগতে হিসাব অল গোবার

এবং হারুফ অল তকত্ নামে পরিচিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন ভারতীয় শব্দ "ধূলিকর্ম" আরবীয় অনুবাদ অনুযায়ী "হিসাব গোবর" রাখা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে অরবীয়রা ভারতীয় পাটীগণিত অনুবাদ করতে গিয়ে যে সব শব্দ প্রয়োগ করেছেন তাতে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা যায়। যাই হোক এ প্রসঙ্গ না তুলে আমরা ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদে আরবরা কি কি শব্দ ব্যবহার করেছিল তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করছি। ভারতীয় গণিতগ্রন্থ পাটীসারকে আরবীয়রা কিতাব অল তকত্ নামকরণ করেছিলেন। আল কাওল ওয়াদানীর এরিথমেটিক "কিতাব অল তকত ফি-ল হিসাব অল হিন্দ" হিন্দু পাটীগণিতের অনুবাদ। ভারতীয় বৃহৎ পাটীগণিতের আরবীয় সংস্করণকে কিতাব এল তকত্ অল কবীর ফিল হিসাব হিন্দি বলা হয়। প্রখ্যাত গণিত ঐতিহাসিক এইচ স্থটার Die mathematiker und Astronomer der Arber ihre werke (Leipzig) এ বলেছেন ভারতীয় পাটীগণিত আরবীয় সংস্করণে "তকত" শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে পাটীগণিত ও মুদ্রা নামে দুটি ভাগ ছিল। আরবীয় গণিতবিদ অল অণ্টাকীর গণিত গ্রন্থগুলিতে ঠিক এ ধরণের বিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তার গ্রন্থগুলির মধ্যে হিসাব অল তকত্ এবং কিতাব অল হিসাব বি-লা তকত্ বিলয়াদ নামে দুটি গ্রন্থে দেখতে পাওয়া এবং এ থেকে উপরোক্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়।

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে স্পেনে হিসাব অল গোবরকে হিসাব অল হিন্দি এবং প্রাচ্যে হিসাব অল-ল তকত্ কেন বলা হোত। তাছাড়া কেন হিসাব অল হাওয়াইব হিসাব অল গোবার এবং ইলম অল গোবার ও ইলম অল তুরাবকে ইলম অল তকত্ বলা হোত।

আলবিরূণী একজায়গায় বলেছেন "ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা প্রতীক ব্যবহার করা হোত। আমরা যে সংখ্যা প্রতীক ব্যবহার করি তা হিন্দুদের সর্বোৎকৃষ্ট সংখ্যা প্রতীক কিন্তু কাশ্মীরের অধিবাসীরা চীনা ধাঁচে সংখ্যা প্রতীক ব্যবহার করতেন তবে তাঁরা যখন বালুকার উপর গণনা করতেন এ প্রতীক ব্যবহার করতেন না।" এ থেকেই স্পষ্টই বোঝা যায় হিন্দুরা বালুকার উপর গণনা করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এডোয়ার্ড সাচাউ এবং উপেক ওয়াল তষ্ট মাল ফিল হিসাব অল-ল তুরব এর অর্থ "এবং তারা গণনা ফলকের ব্যবহার জানতো না" করেছেন।" এটি ভ্রমাত্মক এবং এই ভ্রম থেকেই পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতদ্বৈততা দেখা যায়। যাই হোক সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পণ্ডিতেরা মনে করেন আরবীয় গণিতশাস্ত্রে ভারতীয় "পাটী" শব্দটির আরবীয় অনুবাদ প্রচলিত ছিল।

৫·২ ভারতীয় গণিত গ্রন্থাদি ও পাটীগণিতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সূচী

একথা সত্য যে প্রথম আর্যভটের পূর্বে গণিত গ্রন্থ বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। অধিকাংশই জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বলিত পুস্তকই দেখা যায়। অবশ্য এই সব জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থে গণিত নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করতে দেখা যায়। তবে জ্যামিতিশাস্ত্রের জন্য পৃথক গ্রন্থ প্রাক আর্যভটীয় (৪৯৯ খ্রীঃ) যুগে দেখা যায়। বাকশালীর পাণ্ডুলিপি, বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, সূর্য সিদ্ধান্ত, ভৃগু সংহিতা, পরাশর সংহিতা, বৌদ্ধ গ্রন্থ, জৈন গ্রন্থ, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য প্রভৃতিতে গণিতের কিছু উল্লেখ থাকলেও অনেকক্ষেত্রে এগুলিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ গণিত গ্রন্থ বলা যায় না। স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পদ্ধতিগত ভাবে গণিত গ্রন্থ লেখা হয় প্রথম আর্যভটের সময় থেকে এবং এ ধারা তারপর থেকে অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। অবশ্য মৌলিক গণিত গ্রন্থ বা তৎসম্পর্কিত অধ্যায় প্রথম আর্যভট থেকে নারায়ণের কাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছে। নারায়ণের পর থেকে অধিকাংশ গ্রন্থই হয় টীকা সহকারে ব্যাখ্যা না হয় সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে লেখা হয়েছে। অবশ্য এই সময়ে কিছু কিছু মৌলিক গণিত গ্রন্থ লেখা হয়েছে তবে সেটা অত্যন্ত নগন্য পর্যায়ে পড়ে। বহু পণ্ডিত অবশ্য গণিতগ্রন্থকার হিসাবে প্রথম আর্যভটের নাম নিয়ে বিতর্ক তোলেন। আমরা পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করবো। প্রথম আর্যভট থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অন্যূন পঁচাত্তরটি গণিত এবং গণিত সংক্রান্ত (জ্যোতিষ, জ্যামিতি, পাটীগণিত, বীজগণিত প্রভৃতি) গ্রন্থ ভারতীয়রা রচনা করেন। তবে এদের মধ্যে অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষাতেও লেখা হয়েছে। যাই হক আমরা যতগুলি গ্রন্থের নাম জানতে পেরেছি সেগুলি এখানে উল্লেখ করছি।[১] (অবশ্য প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলিই একমাত্র উল্লেখ করা হল। এছাড়াও আরও নানা গ্রন্থ থাকতে পারে তা আমরা সেগুলিকে উল্লেখ করছি না)

ক্রমিক সংখ্যা ১	গ্রন্থকার, তারিখ প্রভৃতি ২	গ্রন্থের নাম ৩	গ্রন্থের বিষয়বস্তু, ভাষ্যকার, ভাষ্যের প্রকৃতি প্রভৃতি ৪
১.	প্রথম আর্যভট (৪৭৬ খ্রীঃ)	আর্যভটীয় (৪৯৮ খ্রীঃ)	মোট ১১৮টি শ্লোক (?) চারটি ভাগে বিভক্ত। এগুলি হচ্ছে (ক) দশগীতিকা, (খ) গোল, (গ) কালক্রিয়া, (ঘ) গণিত।

১ A Consolidated list of Hindu Mathematical works- K. Balagangadharan The Math. Student. Vol 15. 1974, Page 55.

১	২	৩	৪
			প্রথম ভাস্করাচার্য, সূর্যদেব যজ্জা (আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে, আর্যভট সূত্রার্থ প্রকাশিকা) পরমেশ্বর (ভট দীপিকা) নীলকণ্ঠ (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ, নীলকণ্ঠীয়া) যল্লয্য (শ্রীধরের পুত্র, তাতপাব্য ব্যাখ্যায়নি) প্রমুখেরা ভাষ্য করেন।
২	প্রথম ভাস্কর (প্রথম আর্যভটের ছাত্র ?)	(ক) লঘু ভাস্করীয়	(ক) আটটি অধ্যায়ে মোট ২১৫টি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতবিষয়ক শ্লোক আছে। পরমেশ্বর (সুন্দরী) প্রভাকর (তন্ত্র প্রদীপ), শঙ্কর (নারায়ণের পুত্র, ভাস্করীয় বিবরণম) প্রমুখেরা ভাষ্য ও টীকা করেন।
		(খ) মহাভাস্করীয়	(খ) পরমেশ্বর (কর্ম দীপিকা, সিদ্ধান্ত দীপিকা), ভাস্কর, গোবিন্দস্বামী (প্রয়োগ রচনা) মক্ষীভট্ট (গণিতবিলাস) শ্রীকণ্ঠ প্রমুখেরা ভাষ্য ও টীকা করেন।
৩	বরাহমিহির (৫২৫ খৃঃ)	(ক) বৃহৎ সংহিতা	(ক) জ্যোতির্বিজ্ঞানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে
		(খ) পঞ্চসিদ্ধান্তিকা	(খ) সূর্য সিদ্ধান্ত, পৌলিশ সিদ্ধান্ত, রোমক সিদ্ধান্ত, বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত, এই পাঁচখানি গ্রন্থের সংকলন।
৪	ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮ খ্রীঃ)	(ক) ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত (৬২৮ খ্রীঃ)	জ্যোতির্বিজ্ঞান, পাটীগণিত, বীজগণিত জ্যামিতি, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা। পৃথুডকস্বামী, ভট্টোৎপল, সোমেশ্বর, আমরাজ প্রমুখেরা ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি করেন।
		(খ) খণ্ডখাদ্যক (৬৬৫ খ্রীঃ)	(খ) জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত।

১	২	৩	৪
৫	লল্ল (ত্রিবিক্রম ভটের পুত্র)	(ক) শিষ্যধীবৃদ্ধিদ্ (খ) পাটীগণিতম্	আর্যভটের (প্রথম) মতানুযায়ী লেখা।
৬	মহাবীর	গণিতসার সংগ্রহ	পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত।
৭	শ্রীধরাচার্য	ত্রিশতিকা	পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনশত শ্লোক অন্তর্ভুক্ত।
৮	বিট্টেশ্বর	করণসার	
৯	মুঞ্জাল (৯৩২ খ্রীঃ)	(ক) লঘু মানস (খ) বৃহন্মানস	(ক) ৬০টি শ্লোক আছে।
১০	বিজয়নন্দী	করণতিলক	
১১	দ্বিতীয় আর্যভট	মহাসিদ্ধান্ত	জ্যোতির্বিজ্ঞান, পাটীগণিত, বীজগণিত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা।
১২	অজ্ঞাতপরিচয় গণিতবিদ	সূর্যসিদ্ধান্ত	জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ, শ্রীকণ্ঠ, রঙ্গনাথ, নৃসিংহ, বিশ্বনাথ, ভৈরব, ভূধর প্রমুখ টীকা করেন।
১৩	শ্রীপতি	(ক) সিদ্ধান্তশেখর	(ক) ২০টি অধ্যায়ে ৯০০টি শ্লোক আছে। মক্ষীভট্ট ভাষ্য এবং টীকা করেন।
		(খ) গণিত তিলক	(খ) ১০৫টি শ্লোক বা স্তবক আছে।
		(গ) ধ্রুবমানস	(গ) গ্রহণ সম্পর্কে ২০টি শ্লোক আছে।
		(ঘ) ধী কোটিদ করণম্	
১৪	ভানুভট্ট (১০৪০ খ্রীঃ)	(ক) করণ পরতিলক (খ) আদিত্য প্রতাপ সিদ্ধান্ত	
১৫	ভোজরাজ	রাজমৃগাঙ্ক	
১৬	দশবল (১০৫৮ খ্রীঃ)	করণ কমল মার্তণ্ড	

১	২	৩	৪
১৭	ব্রহ্মদেব (১১১২ খ্রীঃ)	করণ প্রকাশ	
১৮	শতানন্দ (১০৯৯ খৃঃ) (শঙ্করের পুত্র)	(ক) ভাস্বতী করণ (খ) করণথম (Karanothama) (গ) অভিলাশিতর্থ চিন্তামণি।	
১৯	মাধব (১১০০ খ্রীঃ)	Vēnvāroh বেনবারহ	
২০	দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য	(ক) বীজ পত্ম (১১৫৬ খ্রীঃ)	(ক) চক্রধর, কৃপরাম (১৪৯৮খ্রী) রাম (১৬২৮ খ্রীঃ) দিনকর (১৬৪৮খ্রীঃ) প্রমুখেরা ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি করেন।
		(খ) করণকুতূহল	(খ) বিশ্বনাথ (১৪৪১খ্রীঃ), শোধল (১৪৬৩ খ্রীঃ) সুমতিহর্ষ (১৬১৯খ্রীঃ) পদ্মনাভ (১৭৩৯ খ্রীঃ) প্রমুখেরা ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি করেন।
		(গ) সিদ্ধান্ত শিরোমণি	চারিটি ভাগে বিভক্ত, (১) লীলাবতী এতে পাটীগণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভাষ্যকার হিসাবে রামকৃষ্ণ, লক্ষীদাস, গোবর্ধন, শ্রীকণ্ঠ, মশদেব, পরমেশ্বর, রঙ্গনাথ, শ্রীধর, নারায়ণ, গণেশ (ধুন্ধি-রাজের পুত্র), গণেশ্বর, মুনীশ্বর (রঙ্গ-নাথের পুত্র), সূর্যদাস, গঙ্গাধর, মহী-দাস, গণেশ (কেশবের পুত্র), রঙ্গনাথ (নৃসিংহের পুত্র), গিরিধর, সেমিসাধু, উদয়রাম, মক্ষদেব প্রমুখেরা পরিচিত। (২) বীজগণিত। ভাষ্য এবং টীকা-কারদের মধ্যে সূর্যদাস, কৃষ্ণদৈবজ্ঞ,

১	২	৩	৪
			জনার্দন, হরিদাস, কৃপারাম মিশ্র প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। (৩) গণিতাধ্যায়। টীকাকারদের মধ্যে গোপীনাথ, মুনীশ্বর, লক্ষীদাস, নৃসিংহ, রঙ্গনাথ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। (৪) গোলধ্যায় ; মনীশ্বর, লক্ষীদাস, নৃসিংহ প্রমুখ টীকা করেন।
২১	বল্লালসেন (১১৬০ খ্রীঃ)	অদ্ভুত সাগরম	
২২	অনন্তদেব (১১৯২ খ্রীঃ)	(?)	
২৩	শ্রীধরাচার্য (?)	লঘুখেচর সিদ্ধি	
২৪	গোবিন্দভট্ট	দশধ্যায়ী	
২৫	প্রথম মহাদেব (১২৭৮ খ্রীঃ)	(ক) গ্রহসিদ্ধি (খ) সারণী, (গ) মহাদেবী	
১৬	নারায়ণ (নৃসিংহের পুত্র)	(ক) গণিত কৌমুদি (খ) বীজগণিত	
২৭	মহেন্দ্রসূরী (১৩২০ খ্রীঃ)	যন্ত্ররাজ	১৮২টি শ্লোক আছে। মলয়েন্দ্র সূরী ও যজ্ঞেশ্বর টীকা করেন।
২৮	অনন্ত (১৩৫৭খ্রীঃ)	(?)	
২৯	দ্বিতীয় মহাদেব	কামধেনু করণম্।	অনন্ত দৈবজ্ঞ ভাষ্য ও টীকা করেন।
৩০	অজ্ঞাত	নারমদম্	
৩১	পদ্মনাভ (১২৯৮ খ্রীঃ)		
৩২	পরমেশ্বর	দৃগ্‌গণিততন্ত্র, গোলদীপিকা, কর্ম দীপিকা, লীলাবতী ব্যাখ্যা, ভটদীপিকা, লঘুভাস্করীয় ব্যাখ্যা।	

১	২	৩	৪
৩৩	(?)	করণ পদ্ধতি	
৩৪	অচ্যুৎপিশারতি	ক্রিয়াকর্ম	
৩৫	সূর্যদেব যজ্বা	আর্যভট সূত্রার্থ প্রকাশিকা, লঘুমানস ব্যাখ্যা।	
৩৬	দামোদর(১৪৫৭খ্রীঃ)	মূহুর্ত ভদ্রদীপিকা	
৩৭	গঙ্গাধর(১৪৩৪খ্রীঃ)	চন্দ্রমান	
৩৮	মকরন্দ(১৪৩৮খ্রীঃ)	মকরন্দ	
৩৯	কেশব(১৪৫৬খ্রীঃ)	গ্রহ কৌতূকম, বর্ষ-গ্রহ সিদ্ধ, তিথিসিদ্ধ, গণিত দীপিকা, সিদ্ধান্ত বাসনাপথ	
৪০	বিহন(১৪৫৬খ্রীঃ)	বার্ষিক তন্ত্র ব্যাখ্যা করন।	
৪১	?	?	
৪২	নীলকণ্ঠ (১৫০০খ্রীঃ)	আর্যভটীয় ভাষ্য, তন্ত্র সংগ্রহ, গোলসার, সিদ্ধান্ত দর্পন।	
৪৩	লক্ষীদাস(১৫০০খ্রীঃ	গণিততন্ত্র চিন্তামণি	
৪৪	জ্ঞানরাজ	সিদ্ধান্ত সুন্দরম্, বীজগণিত।	
৪৫	গণেশ(১৫০৭খ্রীঃ)	গ্রহলাঘব, লঘুতিথি চিন্তামণি, বৃহৎতিথি চিন্তামণি, লীলাবতী টীকা, সিদ্ধান্ত শিরো-মণি টীকা।	
৪৬	প্রথম অনন্ত দৈবজ্ঞ(১৫২৫খ্রীঃ)	অনন্ত সুধারস	

১	২	৩	৪
৪৭	দ্বিতীয় অনন্ত দৈবজ্ঞ(১৫৩৭খ্রীঃ)	কামধেনু টীকা	
৪৮	শঙ্কর(১৫৩৬খ্রীঃ)	কালদীপকম্, লঘু-ভাস্করীয়ম্। গণিত সার, চন্দ্রগণিত কর্ম, প্রশ্নসার, পঞ্চবোধ দর্পনম্, পঞ্চবোধম্, মূহুর্ত পদবী।	
৪৯	বিষ্ণু(১৫৫৬খ্রীঃ)	বিষ্ণুকরণম্।	
৫০	সূর্যদাস (১৫৪১ খ্রীঃ)	গণিত কৌপিক (?) বীজপ্রকোশ	
৫১	নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ(১৫৫৭খ্রীঃ)	নীলকণ্ঠী	
৫২	কৃষ্ণদৈবজ্ঞ (১৫৬৫ খ্রীঃ)	নবাঙ্কুর	
৫৩	লঘুনাথ (১৫৬৫ খ্রীঃ)	মনি প্রদীপম্	
৫৪	রাজদৈবজ্ঞ (১৫৬৫ খ্রীঃ)	রামকৃষ্ণ, যন্ত্র প্রকাশ, মূহুর্ত চিন্তামণি।	
৫৫	গোবিন্দ দৈবজ্ঞ (১৫৬৯ খ্রীঃ)	পীযুষধার	
৫৬	বিশ্বনাথ	??	
৫৭	নৃসিংহ (১৫৮৬ খ্রীঃ)	??	
৫৮	নারায়ণ (মুনীশ্বরের গুরু) (১৫৮৮ খ্রীঃ)	নারায়ণী বীজ	
৫৯	শিব (১৫৯১খৃঃ)	অনন্তসুধাবৃত্তি	

১	২	৩	৪	৫
৬০	শ্রীনাথ (১৫৯২ খ্রীঃ)	??		
৬১	সোমদৈবজ্ঞ (১৬০২ খ্রীঃ)	কল্পলতা		
৬২	মুনীশ্বর (১৬০৩ খ্রীঃ)	সিদ্ধান্ত সার্বভৌম, লীলাবতী টীকা, স্পষ্টীকরণভঙ্গী		
৬৩	দিবাকর (১৬০৩ খ্রীঃ)	মকরন্দ পদ্ধতি		
৬৪	কমলাকর (১৬১৩ খ্রীঃ)	সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিবেক		
৬৫	শঙ্কর (১৬০৭ খ্রীঃ)	বৈষ্ণবকরণম (?)		
৬৬	জটাধর (১৬১৪ খ্রীঃ)	ফথেসা প্রকাশ (Phathesaha)		
৬৭	নাগেশ (১৬১৮ খ্রীঃ)	গৃহ প্রবোদ্ধ		
৬৮	ব্রহ্মদত্ত (১৬৩৯ খ্রীঃ)	যুক্তিভাষা		
৬৯	নিত্যানন্দ (১৬৩৯ খ্রীঃ)	সিদ্ধান্ত রাজ		
৭০	রঙ্গনাথ (১৬৪৩ খ্রীঃ)	লঘুভঙ্গি বিভঙ্গি, প্রভৃতি		
৭১	জগন্নাথ (১৬৫৯ খ্রীঃ)	সিদ্ধান্ত সম্রাট, রেখা গণিত।		
৭২	কৃষ্ণ (১৬৫৬ খ্রীঃ)	করণ কোস্তভ।		
৭৩	রত্নকান্ত (১৬৫৮ খ্রীঃ)	পঞ্চাঙ্গ কৌতুক		
৭৪	??	গ্রহ তরঙ্গিণী		
৭৫	??	সিদ্ধান্ত মঞ্জরী		

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে কুড়িটি পরিকর্ম ও আটটি ব্যবহার নিয়েই আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ব্রহ্মগুপ্ত গণিঅধ্যায়ের দ্বাদশতম শ্লোকে বলেছেন:

পরিকর্ম বিংশতিং যঃ সঙ্কলিতাদ্যাং পৃথক বিজানাতি।
অষ্টৌ চ ব্যবহারান্ ছায়ান্তান্ ভবতি গনকঃ সঃ॥

অর্থাৎ যিনি কুড়িটি পরিকর্ম ও ছায়াসহ আটটি ব্যবহার জানবেন তিনিই গণিতজ্ঞ হবেন।' এই ২০টি পরিকর্ম হচ্ছে:

(১) সংকলিত (২) ব্যবকলিত, (৩) গুণন, (৪) ভাগ, (৫) বর্গ, (৬) বর্গমূল, (৭) ঘন, (৮) ঘনমূল, (৯-১৩) পঞ্চজাতি, (১৪) ত্রৈরাশিক, (১৫) ব্যস্ত ত্রৈরাশিক, (১৬) পঞ্চরাশি, (১৭) সপ্তরাশি, (১৮) নবরাশি, (১৯) একাদশ রাশি, (২০) বন্দ-প্রতিবন্দ।

আটটি ব্যবহার হচ্ছে:

(১) মিশ্রক, (২) শ্রেঢ়ী, (৩) ক্ষেত্র, (৪) খাট, (৫) চিতি, (৬) ক্রাকশিক, (৭) রাশি, (৮) ছায়া।

কোন কোন গণিতবিদ উপর্যুক্ত সবগুলিকেই যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কতকগুলি বিষয় অত্যন্ত সহজ হওয়ায় তাঁরা (গণিতবিদেরা) এড়িয়ে গিয়েছেন। যাই হোক এবার এক এক করে উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। অবশ্য এর পূর্বে প্রথম আর্যভট গণিত গ্রন্থকার হিসাবে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করছি।

৫.৩ আর্যভট "গণিত" অধ্যায়টির গ্রন্থকার

আমরা পূর্বেই বলেছি যে পদ্ধতিগত ভাবে এবং সুশৃংখল ভাবে গণিতের উপর প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন প্রথম আর্যভট। কিন্তু কেউ কেউ এনিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। অনেকেই জানেন আর্যভটীয়ের একটি অধ্যায় "গণিত" নামে পরিচিত। আর্যভটীয় মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটির নাম দশগীতিকা অর্থাৎ এর মধ্যে দশটি স্তবক আছে। দ্বিতীয় ভাগটি আবার গণিত, কালক্রিয়া এবং গোল এই তিনটি নামে ভাগে বিভক্ত। গণিতে তেত্রিশটি শ্লোক আছে, কালক্রিয়ায় আছে পঁচিশটি শ্লোক এবং গোলধ্যায়ে আছে পঞ্চাশটি শ্লোক। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় ভাগটিতে একশ আটটি শ্লোক আছে এবং সেইহেতু এটিকে কখনও কখনও আর্যাষ্টশত নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন ব্রহ্মগুপ্ত এবং পরবর্তীকালে কোন কোন ভারতীয় গণিতবিদ এটিকে আর্য সিদ্ধান্ত বা লঘু

সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয় আর্যভট রচিত গ্রন্থটি মহা আর্যসিদ্ধান্ত বা মহাসিদ্ধান্ত নামে প্রচলিত। প্রথম আর্যভট ও দ্বিতীয় আর্যভটের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বহুশতাব্দীর। প্রথম আর্যভট জন্মগ্রহণ করেন ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় আর্যভট দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের পূর্বসুরী। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, সোয়েল প্রমুখেরা মনে করেন যে দ্বিতীয় আর্যভট ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অনেকে আবার মনে করেন দ্বিতীয় আর্যভট ৯৯১—১১১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বেণ্টলী প্রমুখেরা দ্বিতীয় আর্যভটকে চতুর্দশ শতাব্দীর লোক বলে মনে করেন। তবে এ সমর্থক খুব বেশী নেই। ক্যে অবশ্য মনে করেন ইনি দশম শতাব্দীর লোক।[১]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে "গণিত" এর লেখক কে? ক্যে অনুমান করেন আলবিরূণী কুসুমপুরের যে আর্যভটের উল্লেখ করেছেন তিনিই এটির প্রকৃত লেখক। কার্ণ, বেবর, রডেট, থিবো, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, সুধাকর দ্বিবেদী প্রমুখেরা এমতের সমর্থক নন। অবশ্য ক্যে মনে করেণ আর্যভটীয়ের বাকী সব কিছু সেই আর্যভটের লেখা যাঁর নামোল্লেখ পরবর্তী প্রায় সব ভারতীয় গণিতবিদরাই করেছেন। ক্যে'র অনুমানের পিছনে এই যুক্তিগুলি থাকতে পারে ঃ

(১) আলবিরূণী দুজন আর্যভটের নামোল্লেখ করেছেন। একজন বৃদ্ধ আর্যভট ও দ্বিতীয়জন কুসুমপুরের আর্যভট। কুসুমপুরের আর্যভট বৃদ্ধ আর্যভটের অনুসরণকারী।

(২) মহাসিদ্ধান্তের আর্যভট তাঁর গ্রন্থে বৃদ্ধ আর্যভটের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন।

(৩) গণিতের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে এটি কুসুমপুরের আর্যভট কর্তৃক লিখিত। [আর্যভটস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানম্। এটির দুটি অর্থ হতে পারে (ক) আর্যভট তাঁর গ্রন্থটি কুসুমপুরে লেখেন অথবা (খ) কুসুমপুরে যে জ্ঞান তিনি পেয়েছেন সেটিই এই গ্রন্থে লিখেছেন।]

(৪) ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা আর্যভটের লেখা থেকে উদ্ধৃতি বা উল্লেখ করেছেন কিন্তু "গণিত" থেকে কোন কিছু উল্লেখ করেন নাই।

এছাড়াও আরও নানা যুক্তি দিয়ে ক্যে বলতে চেয়েছেন গণিত 'এর লেখক এবং মহাসিদ্ধান্তের লেখক একই ব্যক্তি। ক্যে'র এ অনুমান কতটা যুক্তি সঙ্গত তা ঐতিহাসিকেরাই বলতে পারেন তবে আমরা লক্ষ্য করেছি ঃ

Aryabhata, the author of Ganita—B. B. Dutta. Bull. cal. math. Soc (1927) Vol XVIII Page 5—(ডঃ দত্তের এই প্রবন্ধটির ছায়া অবলম্বনে এটি লিখিত)

(১) আলবিরুণী তাঁর গ্রন্থে কুসুমপুরের আর্যভটের গণিত থেকে কোন উদ্ধৃতি দেন নাই। তিনি অল্প বিস্তর আর্যভটীয় থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

(২) আর্যভটীয় এবং মহাসিদ্ধান্তের মধ্যে গরমিলই বেশী দেখা যায় এবং পরস্পর বিরোধীতায় দুটি গ্রন্থ সমুজ্জ্বল লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে স্পষ্টই বলা যায় যে বৃদ্ধ আর্যভটের নিকট ঋণ স্বীকার কালে মহাসিদ্ধান্তের লেখকের মনে এ বিষয়ে কোন কিছু উদয় হয়েছিল কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রাখে।

(৩) কুসুমপুরে মহাসিদ্ধান্তের লেখক কোন কিছু করেছিলেন সে কথা মহা-সিদ্ধান্তের লেখক কোথাও উল্লেখ করেননি।

(৪) ব্রহ্মগুপ্ত আর্যভটের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন "গণিত" আর্যভটের লেখার একটি অংশ।

(৫) আলবিরুণী কুসুমপুরের আর্যভট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ইনি অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে ছিলেন। সম্ভবতঃ ব্রহ্মগুপ্তের পূর্বসূরী।

(৬) আলবিরুণী এবং অন্যান্য ভারতীয়রা দুই আর্যভট সম্বন্ধে যে সব তথ্যের সাহায্য নিয়েছেন সেগুলি অনেকক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য করেনি। এবং এঁরা প্রকৃত গ্রন্থকারের মূল গ্রন্থগুলি না দেখায় অনেকক্ষেত্রে রীতিমত বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন।

(৭) অনেকক্ষেত্রে আলবিরুণীর লেখার সত্য উদঘাটিত হয়নি।

ঐতিহাসিকেরা কিন্তু ক্যে'র সমালোচনাকে অসঙ্গত মনে করেন এবং তাঁর সমালোচনাকে তীব্র কষাঘাতও করেছেন। কোলেব্রুক সাহেবের গ্রন্থ বা প্রবন্ধ দেখে ক্যে এক জায়গায় বলেছেন—দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য পূর্ব সূরীদের যে নামোল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আর্যভটের নাম নেই। মনে হয় ক্যে কোলেব্রুক সাহেবের লেখা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নাই। কোলেব্রুক বলেছেন দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য তাঁর বীজগণিত গ্রন্থে তিনজন পূর্বসূরীর নাম উল্লেখ করেছেন। ক্যে হয়তো এ থেকেই তাঁর উক্ত মত প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে বেশ কিছু জায়গায় ভাস্করাচার্য আর্যভটের কাজের বা আর্যভটের আবিষ্কৃত কোন কোন ফলের উল্লেখ করেছেন। যেমন ধরা যাক বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসের অনুপাত উল্লেখ করতে গিয়ে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য সিদ্ধান্ত শিরোমণির গোলধ্যায়ের ভুবনকোশের ৫২ তম শ্লোকে বলেছেন :

"পৃষ্ঠক্ষেত্রফলং তথা যুগগুণত্রিংশচ্ছরাষ্টাদয়ো
ভূমেঃ কন্দুক জালবৎ কু-পরিধি ব্যাসাহতেঃ প্রস্ফুটম্ ॥"

অর্থাৎ 'কথিত আছে কু-পরিধি ৪৯৬৭ যোজন, তাহার ব্যাস ১৫৮১$\frac{১}{২৪}$, তাহার

পৃষ্ঠ ক্ষেত্রফল ৭৮৪৩০৩৪ বর্গযোজন, শেষোক্ত কন্দুকজালের ন্যায়। কু-পরিধিকে ব্যাস দ্বারা গুণ করিলে প্রস্ফুটিত হইবে।'

এখানে আর্যভট π'এর যে মান দিয়েছেন অর্থাৎ π = ৬২৮৩২/২০০০, ভাস্করাচার্য সেই মান এখানে ধরেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য গোলকের আয়তন বের করতে গিয়ে আর্যভটের গণিতপাদের সপ্তম শ্লোকটির সাহায্য নিয়েছেন। গণিতপাদের সপ্তম শ্লোকটি হচ্ছে :

"সমপরিণাহস্যার্ধং বিষ্কম্ভার্ধহতমেব বৃত্তফলম্।
তন্নিজমূলেন হতং ঘন গোল ফলং নিরবশেষম্॥

অর্থাৎ পরিধির অর্ধকে ব্যাসার্ধ দিয়ে গুণ করলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় এবং তাকে এর বর্গমূল দিয়ে গুণ করলে গোলকের আয়তন পাওয়া যায়।

ক্যে'র ধারণা ছিল আর্যভট π'এর যে মান দিয়েছেন সেটি অন্ততপক্ষে দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত কেউ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রথম আর্যভটের π'এর মান ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়াও বরাহমিহির, লল্ল প্রমুখ ভারতীয়রা আর্যভটের π'এর মান ব্যবহার করেছেন। যেহেতু π'এর মান গণিতপাদে দেওয়া আছে, অতএব আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি গণিতপাদ আর্যভটীয়ের একটি অংশ। স্থতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ক্যে'র সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক।

আর্যভট গণিতপাদের ১৭তম শ্লোকে বলেছেন :

বৃত্তে শর সংবর্গোঽর্ধজ্যাবর্গঃ স খলু ধনুষোঃ॥

অর্থাৎ কোন জ্যা কোন বৃত্তকে দুটি চাপে বিভক্ত করে তাহলে চাপের দুটি শরের গুণফল জ্যার্ধের ফলের সমান। ক্যে মনে করেন এটি গণিতপাদের প্রথম গাণিতিক উদ্ধৃতি এবং ধারণা করেন এটি দশম শতাব্দীর। কিন্তু এই সময়ে ক্যে যে আর্যভটের কথা বলেছেন, তিনি নিশ্চয়ই পৃথুডকস্বামী কর্তৃক উল্লিখিত আর্যভট নন। গণিতপাদের গ্রন্থকার ছাড়া অন্যান্য ভারতীয়রা অধিকাংশই

জ্যা = $\sqrt{4(\text{ব্যাস} - \text{শর})\times\text{শর}}$ বলেছেন।

পৃথুডকস্বামী তাঁর ভাষ্যে গণিতপাদে উল্লিখিত ঘন এবং গোলকের আয়তন সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে সেগুলি উল্লেখ করেছেন। এবং এদুটি স্থত্র মহাসিদ্ধান্তে যা বলা হয়েছে তা থেকে বেশ পৃথক। যাই হোক সমস্ত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বলা যেতে পারে—ক্যে-র মন্তব্য অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক এবং তিনি ভারতীয়দের খাটো করে দেখানোর জন্যই এ সব কু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

এবার আমরা যুক্তি-তর্কের সাহায্যে দেখাবো গণিতপাদ আর্যভটীয়ের একটি অংশ। আমরা প্রত্যেকেই জানি সংস্কৃত সাহিত্যে বা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ইষ্টদেবতার মঙ্গলাচরণ করা হয়ে থাকে এবং লেখক যে মতাবলম্বী তিনি সেই মতাবলম্বীর উপাস্য দেবতার নামে মঙ্গলাচরণ করে থাকেন। এদিক দিয়ে প্রথম আর্যভট বৈদান্তিক, ব্রহ্মগুপ্ত, লল্ল, শ্রীধর শৈব, মহাবীর জৈন ছিলেন। গণিতপাদের প্রথম শ্লোকে প্রথম আর্যভট বলেছেন ঃ

"ব্রহ্মকুশশিবুধভৃগুরবিকুজগুরুকোণ ভগণান্ নমস্কৃত্য
আর্যভটস্থিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যচিতং জ্ঞানম্ ॥

এখন যদি এই শ্লোকটি, আর্যভটীয়ের প্রথম শ্লোক এবং দশগীতিকার শেষোক্ত শ্লোক নিয়ে পরীক্ষা করা যায় তাহলে স্পষ্টই বলা যেতে পারে এই তিনটি শ্লোক একই লেখকের।

"আর্যভটস্ত্রীণি গদতি গণিতং কালক্রিয়াং গোলম্।" এই শ্লোকটি থেকে বলা যেতে পারে গণিত আর্যভটীয়ের একটি অংশ।

অঙ্ক পাতনের জন্য যে অক্ষর সংখ্যা প্রণালী তিনি বলেছেন তা কোন একটি অধ্যায়েই সম্পূর্ণরূপে বলেন নাই। দ্বিতীয় ভূমিকা শ্লোকে অক্ষর সংখ্যাকে বর্গ ও অবর্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং এ দুটি ভাগ সম্পর্কে জানতে গেলে গণিতাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক পড়া দরকার। স্থানীয়মান সহকারে গণনা সম্পর্কে দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন। অর্থাৎ এ তিনটি শ্লোকের মধ্যে এত সুন্দর সম্পর্ক বর্তমান যা থেকে স্পষ্ট বলা যায় গণিতপাদ আর্যভটীয়ের একটি অংশ।

দশগীতিকার দশম শ্লোকে $\text{Sin}\left(\frac{n\pi}{48}\right)$, $n=1, 2, \cdots\cdots, 24$ এর মান দেওয়া আছে কিন্তু $\frac{\pi}{2}$'কে কি করে চব্বিশ ভাগ করতে হবে তা গণিতপাদের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি একশ আটটি শ্লোক হেতু আর্যভটীয়ের দ্বিতীয় ভাগটির নাম হয় "আর্যাষ্টশত"। কিন্তু ক্যে'র মতানুযায়ী গণিতপাদ প্রথম আর্যভটের না হলে গণিতপাদের তেত্রিশটি শ্লোক বাদ দিতে হয় এবং তাহলে এক্ষেত্রে পঁচাত্তরটি শ্লোক থাকবে। কিন্তু তা অসম্ভব। আরবীয় গণিতবিদ ইয়াকুব ইবন তারিক π'এর যে মান নিয়েছেন তা আর্যভটের মানের সমান।

সমস্ত কিছু থেকে স্পষ্টই বলা যায় যে, গণিতপাদ প্রথম আর্যভটের লেখা এবং এ সম্পর্কে ক্যে প্রমুখের দুরভিসন্ধিমূলক মন্তব্য ভ্রমাত্মক।

৫'৪ ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে দুজন আর্যভট

একই নামে দুজন আর্যভট ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে দেখা যায় একথা প্রখ্যাত আরবীয় মনীষী আলবিরূণীর ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়। পৃথকীকরণের জন্য তিনি একজনকে প্রথম আর্যভট এবং কনিষ্ঠকে কুসুমপুরের আর্যভট বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন দ্বিতীয় জন প্রথম আর্যভটের ধারার অনুগামী এবং এ ছাড়াও আলবিরূণী বলেছেন যে দ্বিতীয়জন প্রথমজনের রচনা থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের পূর্ববর্তী কোন ভারতীয় গণিতবিদ দুজন আর্যভটের নামোল্লেখ করেননি এবং দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ সম্পর্কে যা বলেছেন তাও অস্পষ্ট। যাই হোক আমরা পরে দেখতে পাবো যে আলবিরূণী ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য যাঁদের সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁরা এক ব্যক্তি নন। সেইহেতু আলবিরূণীর বক্তব্যের বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার। কারণ যদি এ বিশ্লেষণ না করা যায় তাহলে ভারতীয় গণিতবিদ প্রথম আর্যভটের রচনা ও সন তারিখ প্রভৃতি সম্বন্ধে অযথা সন্দেহ সৃষ্টি করবে। এবং লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্যদেশের কয়েকজন গণিত ঐতিহাসিক আছেন যাঁরা ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যকে খাটো করে দেখানোর জন্য সদাই তৎপর। স্মীথ তাঁর "হিস্ট্রী অব ম্যাথেমেটিকস" গ্রন্থে বড় আর্যভটের রচনাবলী আলোচনাকালে পরবর্তী আর্যভটের সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলেছেন এবং অন্যূন পাঁচবার তিনি পাঠককে সতর্ক করে বলেছেন—তাঁরা যেন গণিতের (আর্যভটের রচনাবলীর অংশ বিশেষ) সন তারিখের ব্যাপারে তথাকথিত সংশয়ের কথা বিস্মৃত না হন। মনে হয় স্মীথ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এ মন্তব্যের পিছনে ক্যে'র মতামতের প্রভাব পড়েছিল। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ক্যে প্রমুখেরা ভারতীয় সব রচনাতেই বিদেশী বিশেষ করে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করতে অভ্যস্ত। আলবিরূণীর বক্তব্যকেও সাময়িকভাবে গুরুত্ব দিলেও উচ্চতর বিশ্লেষণ করা হয় নাই।[১]

আলবিরূণী আর্যভট রচিত দশগীতিকা আর্যাষ্টশত ও তন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে কোনটি কার লেখা (দুই আর্যভটের মধ্যে) সেটি তিনি বলেন নি। আলবিরূণী এক জায়গায় বলেছেন প্রথম গ্রন্থ দুটি তিনি কোন জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে পারেন নি। যা কিছু জানতে পেরেছেন তা ব্রহ্মগুপ্তের রচনা থেকে। তৃতীয় গ্রন্থটির কথা আলবিরূণীর আগের কোন গণিতবিদই উল্লেখ করেন নি এবং পরবর্তী কালে ঐ গ্রন্থটি সম্বন্ধে জানা যায় না। ব্রহ্মগুপ্তের পর ভট্টোৎপল (৯৬৬খ্রীঃ) পৃথুডক

(১) Two Aryabhatas of Albiruni—B. B. Dutta., Bull. Cal. Math. Soc, Vol XVII (1926)

স্বামী, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, ষোড়শ শতকে আর্যভট অনুপন্থী গণেশ, মুনীশ্বর ও জ্ঞানরাজ আর্যভটের রচনাবলীর উল্লেখ করেন। এঁদের রচনা পড়লে মনে হয় আর্যভটের মূল রচনা এঁদের কাছে ছিল। যাই হোক পরবর্তী কালে সম্ভবতঃ এগুলি নষ্ট হয়ে যায়। কোলেব্রুক সাহেব নানা অসুবিধার মধ্যে দীর্ঘকাল অনুসন্ধান চালিয়ে আর্যভটের বীজগণিতের বা অন্য কোন রচনাংশের সন্ধান পান নি। অবশেষে ভাদাউজি "দশগীতিকা" এবং "আর্যভটীয়" এই গ্রন্থ দুটির পুঁথি আবিষ্কার করেন। আর্যভটীয়ের 'গণিত' এবং 'কালক্রিয়া' নামক দুটি অংশের প্রথম ও দশম শ্লোক দুটি থেকে জানা যায়, ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কুসুমপুরে মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে আর্যভট এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এ থেকে পণ্ডিতেরা মনে করেন আর্যভট ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এবং আর্যভটীয় গ্রন্থনামটি রচনাকারের নিজের দেওয়া।

আলবিরূণী তাঁর গ্রন্থে আর্যভট ও তাঁর শিষ্যগণের প্রশংসা করেন এবং ব্রহ্মগুপ্তের আর্যভট সম্পর্কে কঠোর সমালোচনাকেই দোষারোপ করেছেন। বলভদ্র কর্তৃক উদ্ধৃত আর্যভটের রচনাংশ উল্লেখ করে আলবিরূণী বলভদ্রকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি (আলবিরূণী) ব্রহ্মগুপ্ত সম্পর্কে বলেছেন বিজ্ঞানকে পুরাণের অলীক গল্প এবং প্রচলিত কুসংস্কারের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিজ্ঞানকে বলি দিয়েছেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন হয়তো এ সব কারণেই আলবিরূণী ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক আর্যভটের রচনার উদ্ধৃতি সঠিক ছিল কিনা সংশয় প্রকাশ করেন। কারণ ব্রহ্মগুপ্তের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে আর্যভট সম্বন্ধে আলোচনা কালে তিনবার তিনি আর্যভটের মূল গ্রন্থ না পাবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

আলবিরূণী কুসুমপুরের আর্যভট রচিত একটি গ্রন্থের কথা কয়েকবার এমনভাবে বলেছেন যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে গ্রন্থটির অনুলিপি বোধ হয় তাঁব কাছে ছিল। সাচাউ (Sachau) মনে করেন এটি পরবর্তী আর্যভটের রচিত একটি সংস্কৃত গ্রন্থ। কিন্তু এখানে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ডঃ দত্ত[১] মনে করেন সাচাউ, গ্রন্থনামের সঠিক পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি এবং এটিকে AL—ntf বলে ধরে নিয়েছেন। এ হয়তো কোন গ্রন্থের আরবী অনুবাদ যার মূল সংস্কৃত গ্রন্থ আজও পাওয়া যায়নি। ডঃ দত্ত এরপর বলেছেন কুসুমপুরের আর্যভটের রচনার যে উদ্ধৃতি আলবিরূণী দিয়েছেন তা সবই এই বই থেকে দেওয়া কিনা তা আমরা জানি না। অন্ততঃ একটি উদ্ধৃতি বলভদ্রের থেকে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। উপরোক্ত

(১) Two Aryabhatas of Albiruni—B. B. Dutta, Bulli. Cal, Math. Soc. Vol. XVII (1926)

মন্তব্যের পর দত্ত বলেছেন "আলবিরুণী গ্রন্থটিকে ইতস্ততঃ পরিমার্জিত করেছেন, এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় অনুবাদ কালে সাত নকলে আসল খাস্তা হয়ে গিয়েছিল।"

আর্যসিদ্ধান্ত নামে একটি গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায় যেটির রচয়িতা হিসাবে আর্যভটের নাম দেখা যায়। এটি অত্যন্ত বৃহৎ বলে মহা-আর্যসিদ্ধান্ত সংক্ষেপে আর্য-সিদ্ধান্ত নামেও প্রচলিত ছিল। আর্যসিদ্ধান্তের দুটি প্রমাদপূর্ণ পুঁথি দেখে হল বলেন, "যেহেতু আর্য-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে বৃদ্ধ আর্যভটের উল্লেখ আছে। অতএব মনে হয় আর্যভট নামে দুজন গণিতবিদ ছিলেন। কার্ণ (Kern) এ মতের সমর্থক এবং মন্তব্য করেন —হয়তো কোন তরুণ গণিতবিদ গৌরবার্থে আর্যভট নামটি ব্যবহার করেছেন। এই আর্য-সিদ্ধান্তটির বয়স নিয়ে রীতিমত বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বেণ্টলী সাহেব চতুর্দশ শতাব্দীতে এটি রচনা করা হয়েছে বলে মনে করেন। সীওয়েল মনে করেন এটি ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। ডঃ দত্ত বলেন ভট্টোৎপল এই গ্রন্থটির উল্লেখ করেন নি। আলবিরুণী সংস্কৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের যে তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন তাতেও এই গ্রন্থটির উল্লেখ নেই। এই অনুল্লেখকে যদি তাঁর কাল নিরূপণের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসাবে ধরা যায় তাহলে বলতে হবে তিনি (আর্য-সিদ্ধান্তের লেখক) আলবিরুণীর পরবর্তী কালের লোক।

আলবিরুণীর উল্লিখিত দুইজন আর্যভট, আর্যভটীয় গ্রন্থের লেখক আর্যভট এবং আর্যসিদ্ধান্তের আর্যভট ও বৃদ্ধ আর্যভট, এঁদের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। পূর্ববর্তী কোন লেখকই এই বিচিত্র প্রহেলিকাটির সমাধান করতে যথাযথ মনোযোগ দেন নি। কেউ কেউ এব্যাপারে সামান্য সাফল্যমণ্ডিত হলেও কেউই এটির শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হন নি। আলবিরুণীর রচনা থেকে জানা যে আর্যভটীয় গ্রন্থটি দুই জন আর্যভটের একজনের লেখা। ভাদাউজী, বেনড, কার্ন, বেবর, ভিনতেরনিৎস প্রমুখেরা বলেছেন ঐ গ্রন্থটি আলবিরুণী উল্লিখিত কুসুমপুরের আর্যভটের রচনা। গ্রন্থোল্লিখিত বিবরণের সঙ্গে এই মতের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু প্রথম আর্যভট সম্পর্কে এঁরা নীরব। এঁদের বক্তব্য থেকে এই ধারণা করা যায় যে ইনি একজন প্রাচীনতম গ্রন্থকার। ক্যে কিন্তু এ মতের সমর্থক নন। তিনি বলেন আর্যভটীয়ের গণিত অংশটি পৃথকভাবে দশম শতাব্দীর কুসুমপুরের আর্যভটের রচনা। গ্রন্থের বাকী অংশটুকু আলবিরুণী উল্লিখিত প্রথম আর্যভটের (৪৭৬ খ্রীঃ) রচনা বলে ক্যে স্বীকার করেছেন। আপতদৃষ্টিতে মনে হয় ক্যে'র অনুমান সঠিক কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করলে এ মত যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এর দ্বারা সমস্যাটিকে জটিলতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর্যভটের রচনা আর্যাছন্দে রচিত ১০৮টি শ্লোকে নিবদ্ধ হওয়ায় তাঁর

পরবর্তী গ্রন্থকারেরা এটিকে আর্যাষ্টশত নামে অভিহিত করেছেন। আর্যভট নিজে এই নাম দেন নি। ভারতবর্ষে যত পুঁথি পাওয়া গেছে তার সবগুলিতেই গণিত অংশ সমেত ১০৮টি শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়। এটি বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। ব্রহ্মগুপ্তের রচনা যদি পাঠ করা যায় তাহলে দেখা যাবে তিনি (ব্রহ্মগুপ্ত) স্পষ্টই গণিত অংশটি আর্যভটের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন এবং এটির সমালোচনাও করেছেন। সবকিছু খুঁটিয়ে বিচার করে দেখলে আমরা মোটামুটি তুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে পারি। প্রথমতঃ ক্যে'র মতবাদ থেকে খুব বেশী নূতন তথ্য পাওয়া যায় না। কারণ কুসুমপুরের আর্যভটের যে সব উদ্ধৃতি আলবিরূণী দিয়েছেন তার কোনটিই "গণিত" অংশের নয়। বরং পরে আমরা দেখতে পাবো এই ধরনের বহু উদ্ধৃতি আর্যভটীয় গ্রন্থের নানা অংশে নানা স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আলবিরূণীর রচনা অনুসারে আর্যভটের স্থিতিকাল দশম শতাব্দী হতেই পারে না। অথচ ক্যে'র অনুমান তাই। এবং apogees'র স্থান নির্ণয়ে তিনি লঘু আর্যভটীয় গ্রন্থের বিরোধী মত দিয়েছেন। মনে হয় তিনি বৃদ্ধ আর্যভটের অনুগামী ছিলেন। বৃদ্ধ আর্যভট আলবিরূণী কথিত প্রথম আর্যভট নন। তাই এটুকু বলা যেতে পারে আর্যভট নামে গণিতবিদ তুজন নয় তিন জন।

এবার আলবিরূণী প্রদত্ত সব উদ্ধৃতিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক কি পাওয়া যায়। আলবিরূণী ১৫ বার শুধু আর্যভটের নাম এবং ২৩ বার আর্যভটের শিক্ষার উল্লেখ করেছেন।

(১) ব্রহ্মগুপ্তের উদ্ধৃতি থেকে—[১] ১৫৬, ১৬৮, ২৭৬, ২৮০, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮৬। [২] ১৬, ১৭, ৩৩, ১১১, ১৪০ (?)

(২) বলভদ্রের উদ্ধৃতি থেকে—[১] ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬,

(৩) পুলিশের ,, ,, —[১] ২৬৬, ২৭৫ (?)

(৪) আরবী লেখক আবু আলহাসান এবং অল আহাস এর থেকে [২] ১৮, ১৯,

(৫) কুসুমপুরের আর্যভটের গ্রন্থ থেকে—[১] ১৭৬, ২৪৬, ৩১৬, ৩৩০, ৩৩৫, ৩৭০,

(৬) অজ্ঞাত উৎস থেকে—[১] ১৫৬, ১৫৭, ২২৫, ২২৭, ২৬৭, ২৬৮, (২২৫, ২২৭) এই তুটি উদ্ধৃতি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে এর মতে আর্যভটের শিষ্যগণের মত নিহিত সম্ভবত এতুটি ৫নং উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির রচনাকার হচ্ছেন

(১) প্রথম আর্যভট—[১] ২৪৬, ৩৭০,

(২) কুসুমপুরের আর্যভট—[১] ১৭৬, ২৪৬, ৩১৬, ৩৩০, ৩৩৫, ৩৭০,

(৩) আর্যভট—[১] ১৫৬, ১৫৭, ১৬৮, ২২৫, ২২৭, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭৬, ২৮০, ৩৭৩, ৩৭৬, ৩৭৭,

বলভদ্রের রচনায় কুসুমপুরের আর্যভটের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় আর্যভট এঁর পূর্ববর্তী লোক। কিন্তু বলভদ্রের কাল নির্ণয় সঠিকভাবে এখনও হয় নি। ভট্টোৎপলের রচনায় বলভদ্রের উদ্ধৃতি দেখে মনে হয় বলভদ্র ভট্টোৎপলের পূর্ববর্তী কালের গণিতবিদ। আলবিরূণী তাঁর গ্রন্থে বলেছেন বলভদ্র ও কুসুমপুরের আর্যভটের রচনার আরবী অনুবাদ হয়েছিল। এ থেকে অনুমান করা যায় এঁরা অন্ততপক্ষে সপ্তম শতাব্দীর লোক। ব্রহ্মগুপ্তও এই শতাব্দীরই লোক। এথেকে বলা যেতে পারে কুসুমপুরের আর্যভট হয় বলভদ্রের সমসাময়িক না হয় ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ববর্তী সময়ের লোক।

একটু নজর করলেই বোঝা যাবে আর্যসিদ্ধান্তের রচনাকার ও আর্যভটীয় গ্রন্থের রচনাকার অভিন্ন নন। আর্যসিদ্ধান্তের রচনাকার আলবিরূণী উল্লিখিত কোন আর্যভটই নন। কারণ (ক) আলবিরূণীর কোন উদ্ধৃতির আর্যসিদ্ধান্তে নেই (অবশ্য একটি ছাড়া) (খ) আর্যসিদ্ধান্তের রচনাকারের সঙ্গে কুসুমপুরের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই। (গ) π এর মান, কল্প, যুগের পরিমাণ, পৃথিবীর আয়তন ও ঘূর্ণন ইত্যাদি আঙ্কিক ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

বহুপণ্ডিত আর্যসিদ্ধান্তের উল্লিখিত বৃদ্ধ আর্যভট ও আর্যভটীয় গ্রন্থের কুসুমপুরের আর্যভটকে অভিন্ন বলতে চান। কিন্তু আর্যসিদ্ধান্তের লেখকই বলেছেন তাঁর রচনা বৃদ্ধ আর্যভটের রচনার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। এক্ষেত্রে উভয়ের রচনায় বড় রকমের সাদৃশ্য আশা করলেও পূর্বকথিত মৌলিক পার্থক্যগুলি পাওয়া যাচ্ছে। আর্যভটীয়ের সংক্ষিপ্ত রচনা পদ্ধতির জন্য মাঝে মঝে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। হয়তো এটি কোন বড় রচনার ক্ষুদ্র সংস্করণ। এটি কি বৃদ্ধ আর্যভটের রচনা? ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্ত রচিত ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে আর্যভটের নিন্দা করা হয়েছে। আবার ৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আর্যভটের গণিতের ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য "করণ" রচনা করেছেন। বলা হয় জনমতের চাপে তিনি এটি করতে বাধ্য হন। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি দুর্বল যুক্তি। লক্ষণীয় এই যে একটি epicycle এর পরিমাণ [২] ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ৩৩, ১১১,

দেখা যাচ্ছে আলবিরূণী প্রদত্ত বেশীর ভাগ উদ্ধৃতিই সরাসরি প্রথম বা দ্বিতীয় আর্যভটের থেকে নেওয়া হয় নি।

আলবিরূণী কর্তৃক উদ্ধৃত সকল রচনাংশগুলিরই সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ আর্যভটীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। অনেকক্ষেত্রে বাক্যগুলি অভিন্ন। বলা যেতে পারে এই অংশগুলি আলবিরূণী কুসুমপুরের আর্যভটের গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন। অন্যান্য উৎসের উদ্ধৃতি গুলি ঠিক মেলে না। অনেক সময় আলবিরূণী নিজের ব্যাখ্যাও উদ্ধৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়েছিলেন। দু এক জায়গায় কিছু ভুলও রয়ে গেছে। কুসুমপুরের আর্যভাটের গ্রন্থে যাকে কোটিপদ্ম ও পরপদ্ম বলা হয়েছে আর্যভটীয়তে কোটি ও অর্বুদ বলা হয়েছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ভ্রান্তিমিশ্রিত সে যুগেই ছিল একথা আলবিরূণীও বলে গিয়েছেন। এ সব ভুল আলবিরূণী ব্যবহৃত আকর গ্রন্থের বা আরবী অনুবাদকের বা লিপিকারের যে কোন একজনের হতে পারে। আলবিরূণী এসব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিছু কিছু অবশ্য নিজে ঠিক করেছেন। আর্যভটীয় গ্রন্থের সঙ্গে একটি উদ্ধৃতির মিল নেই ; এছাড়া বাকি কুড়িটির যথাযথ মিল আছে। এ থেকে বলা যেতে পারে যদিও আলবিরূণী বিভিন্ন উৎস থেকে আর্যভট সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তবু তার মূল ছিল আর্যভটীয় গ্রন্থের উপর।

এবার দেখা যাক আর্যভটীয় গ্রন্থটি কোন আর্যভটের রচনা। আর্যভটীয়ের রচনা-কার নিশ্চয়ই ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ববর্তী ছিলেন। কারণ ব্রহ্মগুপ্ত এঁর উদ্ধৃতি ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে দিয়েছেন। আবার আলবিরূণী বলেছেন ব্রহ্মগুপ্ত প্রথম আর্যভটের থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাহলে কুসুমপুরের আর্যভট কে? আলবিরূণীর আগেই দুজন আর্যভট ছিলেন। একজন ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন অপরজন ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। কিন্তু ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের আর্যভটের সঙ্গে আলবিরূণীর পরিচয় ছিল না। কোন উদ্ধৃতিও তাঁর সঙ্গে মেলে না। বরং একটি উদ্ধৃতি এই আর্যভটের মতের বিরোধী। আবার আলবিরূণীর প্রমাণেই বলা যায় কুসুমপুরের আর্যভট দশম শতাব্দীর মত এত পরবর্তীকালের পণ্ডিত নন। তাহলে কি কুসুমপুরের আর্যভট কোন নূতন পণ্ডিত? এ অনুমান নিরাপদ নয়। কারণ দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের পূর্বে কোন ভারতীয় গণিতবিদই দুজন আর্যভটের অস্তিত্বের কথা বলেন নাই। ডঃ দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন কুসুমপুরের আর্যভট একটি আকাশকুসুম চিন্তা মাত্র। একজনকেই দুজন বলে ভুল করা হয়েছে। অবশ্য এমত শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতেরও।

আলবিরূণী কথিত দ্বিতীয় আর্যভটকে অস্বীকার করতে গেলে বিরোধীযুক্তিগুলি এইরকম হবে। (১) Al-ntf এর উল্লেখ, কুসুমপুরের আর্যভটের গ্রন্থ। (২) আলবিরূণীর দ্বিতীয় আর্যভটে দৃঢ় বিশ্বাস।

আলবিরূণী ভারতে আসার পূর্বে ভারতীয় গণিতের আরবী অনুবাদ থেকে জ্ঞান

আহরণ করে থাকবেন। এই অনুবাদের বিশ্বস্ততায় তিনি নিজেই সন্দেহপরায়ণ ছিলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি এতে ভুল ছিল। Al-ntf সম্বন্ধে মনে হয় এটি ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কুসুমপুরবাসী আর্যভটের রচনার একটি ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদ। এ থেকেই হয়তো আলবিরূণী দুজন আর্যভটের অভিন্নত্ব ধরতে পারেন নি বরং পৃথক ব্যক্তি মনে করার যুক্তি পেয়েছিলেন এবং সেটা আরব দেশ থেকেই পেয়েছিলেন। ভারতে আসার পর তিনি আর্যভটের কোন পুঁথি না পাওয়ায় এ ধারণা শুদ্ধ হতে পারে নি। তাছাড়া তিনি অভিযোগ করেন তিনি পড়তে গিয়ে ভাল ভারতীয় শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসতে পারেন নি। তাছাড়া ভারতীয়দের গোঁড়ামীর জন্য আলবিরূণী অনেক কিছু শিখতেও পারেন নি। ফলে এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আর এই সব বিভ্রান্তির ফলেই ক্যে প্রমুখেরা ভারতীয় ঐতিহ্যকে খাটো করে দেখানোর জন্য তৎপর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১ যোগ ও বিয়োগ

বর্তমান সময়ে যোগ ও বিয়োগ এই দুই প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজসাধ্য হওয়ায় আমরা এ বিষয়ে খুব বেশী নজর দিই না। বাংলায় যাকে যোগ বলা হয়, বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাতে বলা হয় "aggregation, composition, assemble, Join, numeri, addendi, collection, addition প্রভৃতি। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে যোগের পরিবর্তে সংকলিত, সংকলন, মিশ্রণ, সম্মেলন, সংযোজন, প্রক্ষেপণ, যুতি, অভ্যাস প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করা হোত। বিয়োগকে ইউরোপীয় দেশে বলতো extraction, Subduction, rebate, subtractio, minuend, defferentia, excessus প্রভৃতি। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে বিয়োগের পরিবর্তে ব্যৎকলিত, ব্যৎকলন, শোধন, পাতন, অন্তর, বিয়োজ্য প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করা হোত। যোগ ও বিয়োগ অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ে। সেইহেতু ভারতীয় বহু গ্রন্থে এর নিয়ম এবং এ সম্পর্কে প্রশ্নাবলী অনেকক্ষেত্রে উল্লেখ থাকতো না। তবে দ্বিতীয় আর্যভট ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তাছাড়াও শ্রীধরাচার্য ও মহাবীরাচার্য এ নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ সম্পর্কে লীলাবতীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের ১২ তম শ্লোক বলেছেন :

"কার্য্যঃ ক্রমাদুক্ত মতোঽথবাঙ্কযোগো যথাস্থানক মন্তরংবা ॥"

অর্থাৎ সংখ্যাগুলির যোগ তাহাদেয় স্থানের অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিয়োগ তাহাদের পার্থক্য অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে।[১]

নিয়মটি বলার পর দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ সম্পর্কে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"অয়ে বালে লীলাবতি মতিমতি ব্রূহি সহিতান্ দ্বিপঞ্চ দ্বাত্রিংশৎ ত্রিনবতি শতাষ্টাদশ দশ। শতো পেতানেতানযুত বিযুতাংশ্চাপি বদমে যদি ব্যক্তে যুক্তি ব্যবকলন মার্গেঽসি কুশলা।

অর্থাৎ হে বুদ্ধিমতি কন্যে লীলাবতি! যদি তুমি যোগ ও বিয়োগ ব্যাপারে দক্ষা হও, তাহা হইলে বল—দুই, পাঁচ, বত্রিশ, একশত তিরানব্বই, আঠার দশ ও একশত

(১) অঙ্ক ভাবনা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী, ১৯৬৫,

সংখ্যার যোগফল কত? এবং অযুত হইতে এই যোগফল বিয়োগ দিলে কত থাকিবে?

অর্থাৎ ২+৫+৩২+১৯৩+১৮+১০+১০০=৩৬০

১০০০০−৩৬০=৯৬৪০।

মহাসিদ্ধান্তে দ্বিতীয় আর্যভট বলেছেন:

'সংখ্যাবতাং বহূ নামেকীকরণং তদেব সঙ্কলিতম্।
যতপাস্তং সর্বধনাত্ তদ্বব্যবকলিতং তু শেষকং শেষম্॥'

এটির অর্থ অত্যন্ত সরল, অতএব ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৬'২ সাধারণ গুনন

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে গুণের প্রচলন বহু আগে থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে বাখ্‌শালীর পাণ্ডুলিপি, ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, ত্রিশতিকা, সিদ্ধান্তশেখর ও লীলাবতীতে ব্যাপকভাবে গুণের সংজ্ঞা ও তৎসংক্রান্ত উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত সহজ ও সরল বলেই হয়তো আর্যভটীয়তে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নাই। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে গুণের পরিবর্তে হনন, বধ, ক্ষয় প্রভৃতি নানা প্রকার পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বে রচিত শুল্বসূত্রগুলিতে "অভ্যাস" শব্দটি ব্যবহার করা হোত। অবশ্য এটি অনেক সময় যোগের পরিবর্তে আবার অনেক সময় গুণের পরিবর্তে ব্যবহার করা হোত। যতদূর মনে হয় পুনঃ পুনঃ যোগ করার ফলেই গুণের উৎপত্তি, হয়তো সেইজন্যেই এটির ব্যবহার হয়ে থাকবে। বাখ্‌শালীর পাণ্ডুলিপিতে গুণের পরিবর্তে "পরস্পরকৃতক" শব্দটি ব্যবহার করা হোত।

যাকে গুণ করা হয় তাকে গুণ্য এবং যার দ্বারা গুণ করা হবে তাকে গুণক বা গুণকার এবং গুণফলকে প্রত্যুৎপন্ন বলা হয়।

গুণ করার পদ্ধতি নানা প্রকার ছিল। ব্রহ্মগুপ্ত চার প্রকার গুণনের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে—(১) গোমূত্রিক, (২), খণ্ড (৩) বেধ, (৪) ইষ্ঠ। শ্রীধরাচার্য চার প্রকার গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে—(১) কপাট সন্ধি, (২) তস্থ, (৩) রূপ বিভাগ, (৪) স্থান বিভাগ। মহাবীর ধরতে গেলে শ্রীধরাচার্যকে অনুসরণ করেছেন। শ্রীপতি ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য পাঁচ প্রকার গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় আর্যভট 'কপাট সন্ধি' পদ্ধতিটি উল্লেখ করেছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত গোমূত্রিক পদ্ধতিতে বলেছেন ঃ

গুণকারখণ্ডতুল্যো গুণ্যো গোমূত্রিকাকৃতো গুণিতঃ।

সহিতঃ প্রত্যুত্‌পন্নো গুণকারভেদতুল্যো বা ॥ ৫৫

অর্থাৎ গুণকের খণ্ড করিয়া তৎখণ্ড সংখ্যক স্থলে গুণ্যকে রাখিয়া গোমূত্রিকারে গুণ করিয়া যোগ করিলে ফল উৎপন্ন হইবে দ। ইহা গুণকখণ্ডের ভেদ অনুসারে হইবে।

গোমূত্রিক বলতে গরুর মূত্রের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাকারে যে পদ্ধতিতে গুণ করা হয় তাকে গোমূত্রিক পদ্ধতি বলা হয়।

খণ্ড পদ্ধতিতে গুণককে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে তারপর গুণ করা হয়।

ধরা যাক ১৩ × ১৫৮

১৩ × ১৫৮ = (৬ + ৭) × ১৫৮ = ৬ × ১৫৮ + ৭ × ১৫৮

= ৯৪৮ = ১১০৬

= ২০৫৪.

ইষ্টগুণ সংজ্ঞায় ব্রহ্মগুপ্ত বরলছেন—

"গুণয়ো রাশির্গুণকাররাশিনেষ্টাধিকোনকেন গুণঃ।

গুণয়োষ্টবধো ন যুতো গুণকেঽভ্যধিকোনকে কার্যঃ ॥৫৬

অর্থাৎ গুণকের সহিত কোন ইষ্টরাশি যোগ বা বিয়োগ করিয়া তদ্বারা গুণ্যকে গুণ করিবে। এবং অতঃপর ঐ ইষ্টরাশি দ্বারা গুণ করিয়া পূর্বফলে বিয়োগ অথবা যোগ করিবে।

এই পদ্ধতির দু একটা উদাহরণ তুলে ধরছি—[১]

৯৩ × ১৩ = (৯৩ + ৭) × ১৩ − ৭ × ১৩ = ১৩০০ − ৯১ = ১২০৯

৯৩ × ১৩ = (৯০ + ৩) × ১৩ = ৯০ × ১৩ + ৩ × ১৩ = ১১৭০ + ৩৯ = ১২০৯

কপাট সন্ধি পদ্ধতিতে শ্রীপতি বলেছেন (গণিত তিলকম্—শ্রীপতি, পৃঃ ৪)

বিন্যস্য গুণ্য গুণকাখ্যরাশে—রধঃ কপাটদ্বয় সন্ধি যুক্ত্যা

উতসার্য হন্যাত ক্রমশোঽনুলোমং, বিলোম মাহো উত তত্‌স্থমেব।

অর্থাৎ গুণকের নীচে গুণ্য নিবেশ করিয়া কপাটদ্বয়ের সন্ধির যুক্তিতে গুণ্যকে ক্রমশঃ সরাইয়া (বা উঠাইয়া) অনুমলোম ক্রমে গুণ করিবে, (তাহা সেই স্থানেই গুণ করিতে হইবে।)

কপাটসন্ধি পদ্ধতিটি পরবর্তীকালে আরব জগতে বিশেষ সমাদর লাভ করে। আল খোয়ারজমি, অল হাসার, অল-কলসাদী প্রভৃতি আরবীয় গণিতবিদদের গ্রন্থে এই

(১) ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত—Vol I. Page 160, Edited by Ram Swarup Sarma

পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। অল নশবী এই পদ্ধতিটিকে বলতেন অল অমল অল হিন্দি এবং তারিক অল হিন্দি। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রায় আড়াই পরিছেদে গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি লীলাবতীতে বলেছেন ঃ

"গুণ্যান্ত্যমঙ্কং গুণকেন হন্যাদুৎসারি তেনৈৰ মুপান্তিমাদীন্। গুণ্যস্ত্বধোঽধোগুণ খণ্ডতুল্যস্তৈঃ খণ্ডকৈঃ সঙ্‌গুণি তো যুতো বা। ভক্তোগুণঃ শুধ্যতি যেন তেন লব্ধ্যা চ গুণ্যো গুণিতঃ ফলংবা। দ্বিধা ভবেদ্রূপবিভাগ এবং স্থানৈঃ পৃথগ্ বা গুণিতঃ সমেতঃ ইষ্টোনযুক্তেন গুণেন নিঘ্নোঽভীষ্টঘ্ন গুণ্যান্বিত বর্জ্জিতো বা।"

"গুণ্যের (অর্থাৎ যাহাকে গুণ করিতে হইবে) শেষ সংখ্যাকে গুণকের দ্বারা গুণ করতে হইবে। তাহার পরের সংখ্যাকে আবার তাহার পরের সংখ্যাকে অথবা গুণ্যকে গুণকের দ্বারা পৃথক পৃথক গুণ করিয়া রাখিতে হইবে, পরে সমস্ত সংখ্যাগুলি যোগ করিতে হইবে। অথবা গুণককে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার দ্বারা গুণ করিতে হইবে। এইরূপ দুইটি বিভাগ দেখা যায়। অথবা পৃথক পৃথক ভাবে স্থানীয় সংখ্যাকে গুণ করিতে হইবে পরে সমস্তগুলি একত্রে যোগ করিতে হইবে। অথবা যে কোন রাশি বর্দ্ধিত করিয়া বা অল্প করিয়া লইয়া তাহারদ্বারা গুণ করিতে হইবে, পরে গুণফলকে যোগ করিতে হইবে বা গুণফল হইতে বিয়োগ করিতে হইবে।"[১]

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ দিয়ে সূত্রগুলির প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"বালে বালকুরঙ্গলোলনয়নে লীলাবতি প্রোচ্যতাং পঞ্চত্র্যেক মিতাদিবাকরগুণা অঙ্কাঃ কতিস্যুর্যদি। রূপস্থানবিভাগ খণ্ড গুণনে কল্যাণি কল্যাণিনি ছিন্নাস্তেন গুণেন তে চ গুণিতাজাতাঃ কতি স্যুর্বদ।"

অর্থাৎ হে মৃগশাবকের ন্যায় চঞ্চল নয়নে কন্যে লীলাবতি। একশত পঁয়ত্রিশকে বার দ্বারা গুণ করিলে কত হইবে বল। হে কল্যাণি। বিভিন্ন অংশ দ্বারা খণ্ড গুণনেই বা কিরূপ হইতে বল।

উদাহরণটি তিনি বিভিন্ন প্রকারে সমাধান করেছেন। তিনি বলেছেন—

ন্যাসঃ। গুণ্য ১৩৫। গুণক ১২।

গুণ্যান্তমঙ্কং গুণকের হন্যাদিতি কৃতে জ্ঞাতম্। ১৬২০। অথবা গুণরূপবিভাগে খণ্ডকৃতে—৮।৪। আভ্যাং পৃথগ্ গুণ্যে গুণিতে যুতে চ জাতং তদেব। ১৬২০।

অর্থাৎ এই শ্লোকগুলির অর্থ হচ্ছে

(১) অঙ্ক ভাবনা—প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৬৫.

"দৃষ্টান্ত। গুণ্য ১৩৫, গুণক ১২। গুণ্য এর শেষ অঙ্ককে গুণকের দ্বারা গুণ করিয়ে ১৬২০ হইল। অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়া গুণ করিলে যথা ৮ দ্বারা গুণ করিয়া ১০৮০ হইল, পরে ৪ দ্বারা গুণ করিলে ৫৪০ হইল। এইবার এই দুইটি সংখ্যা যোগ করিলে ১৬১০ হইবে।"

প্রসঙ্গেক্রমে বলা যায় শেষোক্ত পদ্ধতি নিম্নরূপে লেখা যায়।

$১২ \times ১৩৫ = (৮+৪) \times ১৩৫ = ৮ \times ১৩৫ + ৪ \times ১৩৫ = ১০৮০ + ৫৪০ = ১৬২০,$

অথবা গুণ্যক স্ত্রিভির্ক্তোলব্ধং ।৪। এভিস্ত্রিভিঃ। ৩ বা গুণ্যে গুণিতে জাতং তদেব। ১৬২০।"

অর্থাৎ "অথবা গুণ্যককে তিন দ্বারা ভাগ করিয়া যে ৪ পাওয়া যাইল তাহার দ্বারা এবং ৩ দ্বারা গুণ্যকে গুণ করিলে উভয়ের যোগফল ১৬২০ হইবে।"

"অথবা স্থান বিভাগে খণ্ডে ১।২। আভ্যাং পৃথগ্ গুণ্যে গুণিতে যথাস্থান যুতে চ জাতং তদেব। ১৬২০।"

"অথবা ১২ এই সংখ্যাকে স্থানের বিভাগ করিয়া খণ্ড করিয়া লইয়া অর্থাৎ প্রথমে দুইদ্বারা পরে ১ দ্বারা গুণ্যকে গুণ করিয়া যোগ করিলে ১৬২০ হইবে।"

"অথবা দ্ব্যূনেন (১০) দ্বাভাঞ্চ (২) পৃথগ্ গুণ্যে গুণিতে যুতে চ জাতং তদেব ১৬২০।"

অথবা ১২ হইতে দুই কম করিয়া লইয়া অর্থাৎ ১০ দ্বারা পরে ২ দ্বারা গুণ্যকে পৃথক্ পৃথক্ গুণ করিয়া পরে যোগ করিলে ১৬২০ হইবে।

গণিতের ভাষায় এটি লেখা যায়ঃ

$১২ \times ১৩৫ = ১০ \times ১৩৫ + ২ \times ১৩৫ = ১৩৫০ + ২৭০ = ১৬২০$

অথবাষ্টযুতেন গুণেন (২) গুণ্যে গুনিতে ইষ্ট (৮) গুণিত গুণ্য হীনে চ জাতং তদেব ১৬২০।

এটির অর্থ হচ্ছে "অথবা গুণকের সহিত ৮ যোগ করিয়া অর্থাৎ কুড়ি করিয়া লইয়া তাহার দ্বারা গুণ্যের সহিত গুণ করিলে, এবং গুণ্যের সহিত ৮ দ্বারা গুণ করিলে পরে উভয়ের বিয়োগ করিলে ১৬২০ হইবে।"

অর্থাৎ, $১২ \times ১৩৫ = (২০-৮) \times ১৩৫ = ২০ \times ১৩৫ - ৮ \times ১৩৫$

$= ২৭০০ - ১০৮০ = ১৬২০$

৬.৩ সাধারণ ভাগ

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে সাধারণ ভাগ অম্পর্কে অনেকেই আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য, মহাবীর, দ্বিতীয় আর্যভট, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য

প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম আর্যভটের আর্যভটীয়তে ভাগ সম্পর্কে উল্লেখ নেই। তবে তিনি যে এ বিষয়ে জানতেন না তা ঠিক নয়। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে তিনি বর্গ, বর্গমূল, ঘন ও ঘনমূল প্রভৃতি জানতেন। সুতরাং ভাগ নিশ্চয়ই জানতেন। বাখ্‌শালীর পাণ্ডুলিপি আধুনিক ভাগ সম্পর্কে নীরব থাকলেও এর প্রয়োগ বহু উদাহরণে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন জৈন গ্রন্থ যেমন তত্ত্বার্থাধিগমস্থত্রে সাধারণ ভাগের ক্ষেত্রে সাধারণ উৎপাদকের কথা উল্লিখিত আছে।

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে ভাগকে সাধারণত ভাগহার, ভাজন ; হরণ, ছেদন প্রভৃতি শব্দে ভূষিত করা হয়েছে। লবকে ভাজ্য, হার্য্য এবং হরকে ভাজক, ভাগহর অথবা হর বলা হয়েছে। ভাগফলের পরিবর্তে "লব্ধি" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য লীলাবতীতে বলেছেন :

"ভাজ্যাদ্ধরঃ শুধ্যতি যদ্‌গুণঃ স্যাদান্ত্যাৎ ফলং তৎ খলু ভাগহারে। সমেন কেনাপ্য প্রবর্ত্ত্য হার ভাজ্যৌ ভজেদ্বা সতি সম্ভবে তু।"

অর্থাৎ ভাজ্য হইতে হর পাওয়া যায়। ভাজ্যকে গুণ করিলে ভাজকের শেষ সংখ্যা পাওয়া যায়। ইহাই ভাগের ভাগফল অথবা সম্ভব হইলে কোন ক্ষুদ্র সংখ্যায় যাহা ভাজ্য ও ভাজকের মধ্যে সাধারণ রাশি তাহার দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল পাওয়া যায়[১]।

ত্রিশতিকায় শ্রীধরাচার্য বলেছেন :

"তুল্যেন সম্ভবে সতি হরং বিভাজ্যং চ রাশিনা ছিত্বা।
ভাগোহার্যঃ ক্রমশঃ প্রতিলোমং ভাগহারবিধিঃ ॥"

মহাসিদ্ধান্তে দ্বিতীয় আর্যভট বলেছেন :

"ভাজ্যস্যাধো হারং নিধায় ভাজ্যাত্‌ ত্যজেদভীষ্ট গুণম্‌।
হারমভীষ্টং লব্ধং শেষং বিভজেদ্ধবং সমূত সার্য ॥"

মহাবীর গণিতসার সংগ্রহে বলেছেন :

"বিন্যস্য ভাজ্যমানং তস্যাধঃস্থেন ভাগাহারেণ।
সদৃশাপবর্তাবিধিনা ভাগং কৃত্বা ফলং প্রদেত ॥"

মহাবীর অবশ্য একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

"রূপাগ্র সপ্তবিংশতিশতানি কনকানি যত্র ভাজ্যন্তে।
সপ্তত্রিংশতপুরুষৈরেকস্যাংশং মমাচক্ষ ॥"

অর্থাৎ ২৭০টি স্বর্ণখণ্ড ৩৭ জনকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইলে প্রতিটি লোক কতটি করিয়া পাইবে আমাকে বল।

(১) অঙ্ক ভাবনা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৬৫, পৃঃ ৭

৬.৪ ভগ্নাংশ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন সাফল্যজনক ভগ্নাংশের ব্যবহার ১৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বে আহ্মীস পেপিরাসে দেখতে পাওয়া যাবে। অবশ্য ব্যাবিলনবাসীরাও কিছু কিছু ভগ্নাংশের ব্যবহার করেছেন। আহ্মীস পেপিরাসের কোন এক জায়গায় $\frac{২}{৪৩} = \frac{১}{২৪} + \frac{১}{১৫৮} + \frac{১}{১০৩২}$ এইভাবে লেখা থাকতে দেখা যায়। তবে অধিকাংশই হাইরেটিক বা কার্সিভ হাইরেটক লিপিতেও তাঁরা এগুলিকে প্রকাশ করেছেন। যেমন ধরা যাক $\frac{১}{৫}$, $\frac{১}{১০}$, $\frac{১}{৩০}$ প্রভৃতিকে তাঁরা লিখতেন $\widehat{\text{IIII}}$ $\widehat{\cap}$ $\cap\widehat{\cap}\cap$ এবং $\frac{১}{৪২} = \text{II}\widehat{\substack{\cap\cap\\\cap\cap}}$ বা $\widehat{\substack{\cap\cap\\\cap\cap}}\text{II}$ প্রতীক চিহ্ন দিয়ে।[১] চীনারাও অতি প্রাচীনকাল থেকে ভগ্নাংশর ব্যবহার করতেন। প্রায় ১১০৬ খ্রীষ্টপূর্বে তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ চৌউ পেঙ্গীতে ২৪৭$\frac{৯৩৩}{১৪৬০}$ প্রভৃতি ভগ্নাংশ এবং তৎ-সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম উল্লিখিত হতে দেখা যায়। গ্রীকরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। অন্ততপক্ষে হীরণ আরিষ্টার্কাস প্রমুখ গ্রীক গণিতবিদ্‌দের লেখায় ভগ্নাংশের বহুল ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

মিশর, ব্যাবিলন, চীন, গ্রীস প্রভৃতি দেশের মত ভারতবর্ষেও ভগ্নাংশের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকে দেখা যায়। অন্ততপক্ষে ঋক্‌বেদ ও তৎপরবর্তী সূত্র সাহিত্যে ভগ্নাংশের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদে অর্ধ, ত্রিপদ, কুষ্ঠ, শফ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হতে দেখা যায়। তাছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থে পঞ্চদশভাগ, সপ্তভাগ পঞ্চভাগ, ত্রি-অষ্ট, ত্রয়স্রষ্ট প্রভৃতি শব্দও দেখা যায়। ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বে রচিত বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ১০$\frac{১}{২০}$ কলা এই ভগ্নাংশটিকে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে "কলা দশ সবিংশ নাড়িকা স্যাদ"।

বিভিন্ন শুল্বসূত্রে ভগ্নাংশের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন বৃত্তকে বর্গক্ষেত্রে অথবা বর্গক্ষেত্রকে বৃত্তে পরিণত করতে গিয়ে নিম্নলিখিত ভগ্নাংশের সন্ধান পাওয়া যায়।

$$a = d\left(১ - \frac{১}{৮} + \frac{১}{৮.২৯} - \frac{১}{৮.২৯.৬} + \frac{১}{৮.২৯.৬৮}\right)$$

বিতত ভগ্নাংশেরও সন্ধান মেলে শুল্বসূত্রে। তবে অপ্রত্যক্ষ ভাবে এর উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। যেমন $\sqrt{২}$ এর অষ্টম, তৃতীয় ও চতুর্থ অভিসারী হচ্ছে $\frac{৫৭৭}{৪০২}$, $\frac{৭}{৬}$, $\frac{১৭}{১২}$,

বিভিন্ন জৈন গ্রন্থে $\frac{৬১}{২}$, $\frac{৫৪৮}{৬১}$, $\frac{৫৪৭}{৬১}$, প্রভৃতি ভগ্নাংশের উল্লেখ থাকতে

১. D. E. Smith—History of Mathematics, V-2, P-211,

দেখা যায়। সূর্যপ্রজ্ঞপ্তির ১৮ তম সূত্রে বলা হয়েছে “দৌ জোয়নাহং অদ্ধচুয়ত্তালীসতে সীতসয়ভাগে।” অর্থাৎ উদ্দিষ্ট সংখ্যা হচ্ছে $২\frac{৪২\frac{১}{২}}{১৮৩}$। অন্য একজায়গায় বলা হয়েছে “তিনি জোয়নাহং অদ্ধসীতলীসংচ তে সীতয়ভাগে” অর্থাৎ উদ্দিষ্ট সংখ্যা $\frac{৩৪৬\frac{১}{২}}{১৮৩}$। “চত্বারি জোয়নাহং অদ্ধবাবন্নয়তে সীতয়ভাগে।” অর্থাৎ সংখ্যাটি হচ্ছে $৪\frac{৫১\frac{১}{২}}{১৮৩}$।

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে ছোট ছোট ভগ্নাংশকে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা সহজেই লিখতে পারতেন তার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। তবে বড় বড় ভগ্নাশকে প্রাচীন ভারতীয়রা ছোট ছোট ভগ্নাংশে ভেঙ্গে তারপর যোগ পদ্ধতির সাহায্যে লিখতেন। প্রসঙ্গক্রমে সূর্যপ্রজ্ঞপ্তির ২৩-তম সূত্রের কথা ধরা যেতে পারে। এখানে বলা হয়েছে ঃ

“সীতালীসাহ জোয়ন সদস্সেহিং ছন্নউতীন্নয় জোয়নেহি তত্তীসাএয় সউভাগেহিং জোয়নস্স সডিং ভাগং চ এসদ্দিধাছেত্তা চন্নিয়া ভাগহিং।”

অর্থাৎ শ্লোকটির উদ্দিষ্ট ভগ্নাংশটি এই ভাবে লেখা যায় ঃ

$$\left(৫২৫১\frac{৪৭}{৬১}\right)\times\left(৯-\frac{১}{৬১}\right)=৪৭০৯৬\frac{৩৩}{৬০}+\frac{২}{৬০\times৬}$$

অন্য কয়েকটি জায়গায় কয়েকটি বড় বড় ভগ্নাংশ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ঃ

$$৪৭২৬৩\frac{২১}{৬০}\div৫৪৯=৮৬\frac{৫}{৬০}+\frac{২৪}{৬১\times৬০}$$

$$\frac{১৮}{৬০}\times\frac{৫৪৮}{৬১}=২+\frac{৪১}{৬০}+\frac{৪৩}{৬০\times৬১}$$

বৃহৎক্ষেত্র সমাসে জিনভদ্রগণি বলেছেন ঃ

“কল লখক দুগং ইয়াল সহস্সা ণব সয়া সঠহিয়া।. স্বপ্নেমবণেউ অংসং চউ স্বপ্নগ সত্ত এগ পণ। ছেউ চউ অট্ঠ তিগ ণব দুগা য বাহে স উত্তরদ্ধসস”

উদ্দিষ্ট সংখ্যাটি হচ্ছে ঃ $২৪১৯৬০\frac{৪০৭১৫}{৪৮৩৯২}$

আর্যভটের ৩২ এবং ৩৩-তম শ্লোকদ্বয়ে যা বলা হয়েছে তার মর্মার্থ হচ্ছে ঃ

$$\frac{a}{b}=q_1+\frac{1}{q_2+}\frac{1}{q_3+}\frac{1}{q_4+}\cdots\cdots$$

(১) Guru Gobinda Chakravorty—On the Hindu Treatment of fraction—Journal of the Department of Letters, Vol XXIV, (1934), pages 59—76.

প্রথম আর্যভটের পূর্বে ভাগ সম্পর্কে নানা আলোচনা থাকলেও সে আলোচনায় গণিতের রূপ ধরা পড়েনি। বলতে গেলে ভগ্নাংশ ও তৎসম্পর্কিত আলোচনা প্রথম আর্যভটের থেকে স্থচনা হয়। ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য, শ্রীপতি, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখ ভারতীয় গণিতবিদেরা এই স্থচনার সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই কয় প্রকার ভাগ এবং কি কি, তারপর ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, লঘুকরণ প্রভৃতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। শ্রীধরাচার্য ও মহাবীর বলেছেন ভাগ ছয় প্রকার। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন চার প্রকার। যাই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে ছয় প্রকার ভাগের উল্লেখ ছিল সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। এই ছয় প্রকার ভাগ হচ্ছে (১) ভাগ, (২) প্রভাগ, (৩) ভাগানুবন্ধ, (৪) ভাগাপবাহ, (৫) ভাগ-ভাগ, (৬) ভাগমাতৃ।

(১) ভাগ: আধুনিক গণিতের ভাষায় "ভাগ" লেখা হয়ে থাকে

$$\left(\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} \pm \frac{e}{f} + \cdots\cdots\right)$$

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন:

"অন্যোহন্য হারাভিহতৌ হরাংশৌরাশ্যোঃ সমচ্ছেদবিধানমেবম্।
মিথো হরাভ্যামপবর্ত্তিতাভ্যং যদ্বা হরাংশৌ সুধিয়াত্র গুণ্যেণ।"

অর্থাৎ দুইটি রাশির হর ও লবকে বিপরীতক্রমে অপর রাশির হর দ্বারা গুণ করিয়া সমান হর বিশিষ্ট রাশিতে পরিণত করা যায়, অথবা হর ও লব উভয়কে বুদ্ধিমানগণ হরদ্বয় হইতে সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়া বিপরীত ক্রমে গুণ করিতে পারেন।[১]

এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

"রূপত্রয়ং পঞ্চনবস্ত্রিভাগো যোগার্থমেতান্বদ তুল্যহরান্।
ত্রিষষ্ঠি ভাগশ্চ চতুর্দ্দশাংশঃ সমচ্ছিদৌ মিত্র বিয়োজনার্থম্॥"

ন্যাস $\frac{৩}{১}+\frac{১}{৫}+\frac{১}{৩}$

জাতা সমচ্ছেদাঃ $\frac{৪১}{১৫}+\frac{১}{১৫}+\frac{৫}{১৫}$। যোগে জাতম্ $\frac{৫৩}{১৫}$ অর্থাৎ সাধারণ হরে পরিণত করিয়া এই তিনটি রাশি যোগ করিলে কি হইবে বল: $\frac{৩}{১}+\frac{১}{৫}+\frac{১}{৩}$।

যোগের সময় সাধারণ হরে পরিণত করা হইল (১৫) অতএব $\frac{৪৫}{১৫}+\frac{৩}{১৫}+\frac{৫}{১৫}=\frac{৫৩}{১৫}$

---

(১) অঙ্কভাবনা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী, ১৯৬৫ পৃঃ ১১

গণিতসার সংগ্রহে মহাবীর বলেছেন :

"সদৃশহৃতচ্ছেদহতৌ মিথোঽংশহারৌ সমচ্ছিদাবংশৌ
লুপ্তৈকহরৌ যোজ্যৌ ত্যাজ্যৌ বা ভাগজাতি বিধৌ
ছেদাপর্বতকানাং লব্ধানাং চাহতৌ নিরুদ্ধ স্যাত্
হরহৃতনিরুদ্ধগুণিতে হারাংশগুণে সমো হার।"

ত্রিশতিকায় শ্রীধরাচার্য বলেছেন :

"ছেদাভ্যমন্যোন্যং হন্যাচ্ছেদাংশকৌ সমচ্ছিত্যৈ।"

(২) প্রভাগ :—বর্তমানে $\frac{a}{b}$এর$\frac{c}{d}$এর$\frac{e}{f}$ ধরণের ভগ্নাংশ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে অবশ্য এ ধরণের ভগ্নাংশ নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। তবে তাঁরা এধরনের ভগ্নাংশকে প্রভাগ নামে অভিহিত করেছেন। প্রভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য। তাছাড়াও শ্রীধরাচার্য, মহাবীরাচার্য, দ্বিতীয় আর্যভট প্রভৃতি ভারতীয় গণিতবিদেরা দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের মত না হলেও ব্যাপক আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য তাঁর লীলাবতীতে বলেছেন "লবালম্বাশ্চ হরাহরঘ্না ভাগপ্রভাগেষু সবর্ণনংস্যাৎ।" অর্থাৎ "লবের সহিত এবং হরের সহিত হরের গুণ করিতে হয় ভগ্নাংশের উপরিভাগে"।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য শুধু মাত্র নিয়মই বলে যান নি, সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েও দিয়েছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন :

"দ্রম্মার্দ্ধত্রিলবদ্বয়স্য সুমতে পাদত্রিয়ংযদ্ভবেৎ পঞ্চাংশকো তং যোড়শাংশচরণঃ সম্প্রার্থি তেনার্থিনে। দত্তোযেন বরাটকাঃ কতি কদর্য্য নার্পিতা স্তেন মে ক্রহিত্বং যদি বেৎসি গণিতে জাতিং প্রভাগাভিধাম্।"

ন্যাসঃ। "$\frac{১}{১}$ $\frac{১}{২}$ $\frac{২}{৩}$ $\frac{৩}{৪}$ $\frac{১}{৫}$ $\frac{১}{১৬}$ $\frac{১}{৪}$ সবর্ণিতে জাতম্ $\frac{৬}{৭৬৮০}$ ষড়ভিরপত্তিতে জাতম্ $\frac{৬}{৭৬৮০}=\frac{১}{১২৭০}$ একো দত্তো বরাটকাঃ।"

অর্থাৎ "কোন ভিক্ষুক কোন এক কৃপণ ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা চাইতে—সে এক দম্মের অর্ধেকের দুই তৃতীয়াংশের তিনের চতুর্থাংশের একের পঞ্চমাংশের একের ষোল অংশের সিকি ভাগ দান করিল—গণিতের উপভাগে যদি তোমার দক্ষতা থাকে তাহা হইলে বল কতগুলি কড়ি কৃপণটি দান করিয়াছিল।

বর্ণনা—দ্রম্মএব (অর্দ্ধ) $\frac{১}{২}$র ত্রিলোক দ্বয়স্যপাদাপোছত্রয়ং $\frac{৩}{৪}$ এর (পঞ্চমাংশক) $\frac{১}{৫}$ এর (যোড়শাংশ) $\frac{১}{১৬}$ এর (চরণা) $\frac{১}{৪}=\frac{৬}{৭৬৮০}$ সংক্ষেপ করণে $\frac{১}{১২৮০}$। অর্থাৎ একটি কড়ি দান করিল। এক দম্ম = ১২৮০টি কড়ি।" প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন এই উদাহরণটিকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিণত করার প্রয়াসও দেখা যাচ্ছে।

প্রভাগ সম্বন্ধে ত্রিশতিকায় শ্রীধরাচার্য বলেছেন :
"ছেদানামভ্যাসঃ প্রভাগজাতৌ ভবেত্ তথাংশানাম্।"
মহাবীরচার্য গণিতসারসংগ্রহে বলেছেন :

অংশানাং সঙ্গুননং হারাণাং চ প্রভাগজাতৌ স্যাত্।
গুণকারোংঽশকরাশেহরিহরো ভাগভাগ জাতিবধৌ ॥"

(৩) ভাগানুবন্ধ

আধুনিক গণিতের ভাষায় ভাগানুবন্ধ প্রকাশ করা হয়ে থাকে এইভাবে :

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\text{ এর }\frac{a}{b}+\frac{e}{f}\text{ এর}\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\text{ এর }\frac{a}{b}\right)+\cdots\cdots$$

অথবা, $\left(a+\frac{b}{c}\right)$,

এ সম্পর্কে অবশ্য শ্রীধরাচার্য, মহাবীরাচার্য, দ্বিতীয় আর্যভট, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখ ভারতীয় গণিতবিদেরা আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের আলোচনাই সবচেয়ে বেশী মনে রেখাপাত করে। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন :

"ছেদকরূপেষু লবাঘনর্ণসেবাস্য ভাগঃ অধিকোনকাশ্চেং। স্বাংশাধিকোনঃ খলু যত্র তত্র ভাগানুবন্ধে চলবাপবাহে। তলস্থহারেণ হরন্নিং স্যাংস্বাংশাধিকোনেন তু তেন ভাগান্।"

অর্থাৎ "যে কোন পূর্ণসংখ্যা হরের দ্বারা গুণ করিলে লবটি যোগ চিহ্ন বা বিয়োগ চিহ্ন যুক্ত হয় যদি অংশগুলি তাহার সহিত যোগ বা বিয়োগ করা হয়। কিন্তু ইহার কোন অংশদ্বারা যদি রাশিটি বর্দ্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তবে ভগ্নাংশের যোগে বা বিয়োগে নিম্নস্থিত হরকে হরের দ্বারা গুণ করিতে হয় এবং লবকে বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হরের দ্বারা গুণ করিতে হয়।"[১]

এই সূত্রটির সঙ্গে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

"সাঙ্কিদ্বয়ং ত্রয়ং ব্যক্তি্ কীদৃগ্ ব্রূহি সবর্নিতম্। জানাস্যংশানুবন্ধঞ্চেওথা ভাগাপবাহনন্।"

ন্যাসঃ ২ ৩

$\frac{১}{৪}\ \frac{\dot{১}}{৪}$ সবর্নি জাতম্— $\frac{৯}{৪}\ \frac{১১}{৪}$

(১) অঙ্কভাবনা, প্রথম সংখ্যা, ১৯৩৫, পৃঃ ১২

অর্থাৎ ভগ্নাংশের বৃদ্ধি বা হ্রাসের সহিত যদি পরিচয় থাকে তাহা হইলে বল, দুই এবং এক চতুর্থাংশ যুক্ত হইলে, তিন হইতে এক চতুর্থাংশ হ্রাস করা হইলে কত হয়।

বর্ণনা ২ ৩

$\frac{১}{৪}$ $\frac{\dot{১}}{৪}$ ২ এবং $\frac{১}{৪} = \frac{৯}{৪}$ এবং ৩ হইতে $\frac{১}{৪}$ বিয়োগ করিলে $\frac{১১}{৪}$ হইবে।[2]

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন শেষের উদাহরণটি অর্থাৎ (৩ − $\frac{১}{৪}$) এইটি ভাগা পবাহের উদাহরণ।

ত্রিশতিকায় শ্রীধরাচার্য ভাগানুবন্ধ সম্বন্ধে বলেছেন—

"ভাগানুবন্ধজাতৌ রূপগুণচ্ছেদসঙ্গুণঃসাংশঃ"

গণিতসার সংগ্রহে মহাবীর বলেছেন ঃ

"হরহতরূপেস্বংশান সংক্ষিপ ভাগানুবন্ধজাতিবিধৌ
গুণয়াগ্রাংশচ্ছেদাবংশযুতচ্ছেদহারাভ্যাম্।"

(৪) ভাগা পবাহ

আধুনিক গণিত শাস্ত্রের ভাষায় ভাগাপবাগকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে $\left(a - \frac{b}{c}\right)$ উপায়ে। ভাগাপবাগ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য, মহাবীরাচার্য, দ্বিতীয় আর্যভট, দ্বিতীয় ভাস্কারাচার্য ও আরও অনেক ভারতীয় গণিতবিদ আলোচনা করেছেন।

এ সম্পর্কে ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের বিখ্যাত টীকাকার চতুর্বেদাচার্য পৃথুডকস্বামী একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"অষ্টৌ পলাণি বণিজা সিতচন্দনস্য নীতানি চোত্তরগিরিং কিল কান্যকুব্জাত্।
দানং চ দত্তমপি পঞ্চসুতেন মানস্যার্ধ যপঞ্চনবমাষ্টমং তদাকিম্।"

অর্থাৎ কোন ব্যবসায়ী আট পলের শ্বেত চন্দন কান্যকুব্জ হইতে উত্তর গিরিতে লইয়া আসিলেন এবং এটি পাঁচজনকে $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৫}$, $\frac{১}{৯}$, $\frac{১}{৮}$ দাগ করিলেন উহা হইলে ধনপ্রমাণ কত?

গণিতসার সংগ্রহে মহাবীরাচার্য বলেছেন ঃ

হরহতরূপেস্বংশানপনয় ভাগাপবাহজাতি বিধৌ।
গুণয়াগ্রাংশচ্ছেদা বংশোনচ্ছেদহারাভ্যাম্।

(৫) ভাগ ভাগ ঃ ভাগ ভাগ ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে খুব বেশী আলোচিত হয়নি

তাহলেও শ্রীধরাচার্য, মহাবীরাচার্য আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্তের আলোচনায় $\left(\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}\right)$ এ ধরণের ভাগ ভাগের প্রকাশ না থাকলেও $\dfrac{\frac{p}{q}}{\frac{r}{s}}$ ধরণের প্রকাশ আছে। তাঁর এটিকে ভগ্নাংশের ভাগ বলাই শ্রেয়। শ্রীধরাচার্য বলেছেন :

"রূপে ছেদেন হৃতে ছেদগমো ভবতি ভাগভাগবিধিঃ"

উদাহরণও ইনি দিয়েছেন। উদাহরণটি হচ্ছে—

যড়্ ভাগ ভাগো দশভাগভাগ
স্ত্রিভাগভাগশ্চ নবাংশভাগঃ
জানাসি চেদ্রূহি সখে বিচিন্ত্য
দ্বিভাগভাগশ্চ ধনং কিমৈক্যম্।

১	১	১	১	১
১	১	১	১	১
৬	১০৩		৯	৩

অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

(৬) ভাগমাতৃ—এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে আলোচনা করেছেন শ্রীধরাচার্য ও মহাবীরাচার্য। শ্রীধরাচার্য বলেছেন :

ভাগাদীনাং যস্যাং সম্ভূতির্ভবতি ভাগমাতা সা
তস্যাং যথোক্তকরণৈঃ পৃথক পৃথক ফল বিনিষ্পত্তিঃ।

এটির একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

"অর্ধং পাদাত্ পাদস্ত্রিভাগভাগাঽর্ধমর্ধসংযুক্তম্
ত্র্যংশোঽর্ধেন বিহীনঃ সমাসতঃ কিং ফলং ভবতি।"

ন্যাস

১/২	১/৪	১/৪	১/১	১/২	১/৩
			৩	১/২	১/২

লব্ধং রূপানি ৪ ভাগশ্চ $\frac{২৩}{৪৯}$

৬.৫ ভগ্নাংশের প্রাথমিক নিয়মাদি

ভগ্নাংশ সম্পর্কে প্রথম আর্যভটের পরবর্তী সকলেই কিছু না কিছু আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে আবার অনেকেই ভগ্নাংশের প্রাথমিক নিয়মগুলি নিয়েও আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়।

ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, শ্রীধরাচার্য, মহাবীর, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ ভারতীয় গণিতজ্ঞরা। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন—

বিপরীতচ্ছেদগুণা রাশ্যোচ্ছেদাংশকাঃ সমচ্ছেদাঃ
সঙ্কলিতেংহশা যোজ্যো ব্যবকলিতেংহশাগুবং কার্যম্ ॥

অর্থাৎ দুইটি ভগ্নাংশের প্রত্যেকটি ভগ্নাংশের লব ও হরকে অপরটির হর দ্বারা গুণ কর। তারপর, যোগ কর। বিয়োগের ক্ষেত্রে উপর অংশদ্বয়ের একটি হইতে অপরটি বিয়োগ কর।

অর্থাৎ আধুনিক গণিতের ভাষায় বলতে গেলে

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} \pm \frac{cb}{bd}$$

চতুর্বেদাচার্য এ সম্পর্কে উদাহরণে বলেছেন ঃ

সত্রিভাগং তথা সার্ধং রূপং ষড়ভাগ সংযুক্তম্।
একীকৃতং ভবেক্তিং স্বং রূপত্রসমন্বিতম্ ॥

ন্যাস ঃ

১	১	১	
১	১	১	$\frac{৩}{১}$ যথোক্তরণেন জাতৌ রাশিঃ ॥ ৭ ॥
৩	২	৬	

অর্থাৎ এটির মর্মার্থ হচ্ছে—

$১+\frac{১}{৩}+১\frac{১}{২}+১\frac{১}{৬}=\frac{৪}{৩}+\frac{৩}{২}+\frac{৭}{৬}=\frac{৮}{৬}+\frac{৯}{৬}+\frac{৭}{৬}=\frac{২৪}{৬}=৪$

'রূপত্রয় সমন্বিতং' এটির তাৎপর্য বলা হবে $৪+৩=৭=$ যোগফল $=$ রাশি।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন ঃ

"যোগোহন্তরং তুল্যহরাংশকানাং কল্প্যহরোরূপমহাররাশেঃ" ॥

অর্থাৎ ভগ্নাংশে যোগ অথবা বিয়োগ সমান হর গ্রহণ করতে হয়। যার ভাগফল নেই সেরূপ রাশির এক বলিয়া হর কল্পনা করতে হয়। একটি সুন্দর উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য উল্লেখ করেছেন—

"পঞ্চাংশপাদ ত্রিলবার্দ্ধ যষ্ঠানেকীকৃতান্ ব্রূহি সখে মমৈতান্ এভিশ্চ"
ভাগৈরথ বর্জিতানাং কিং স্বাৎ ত্রয়াণং কথয়াশু শেষম্।

ন্যাস ঃ $\frac{১}{৫}, \frac{১}{৪}, \frac{১}{৩}, \frac{১}{২}, \frac{১}{৬}$ ঐক্যে জাতম্ $\frac{২৯}{২০}$

অথৈতৈর্বিবর্জিতানাং ত্রয়াণাং শেষম্ $\frac{৩১}{২০}$

বর্ণনা— $\frac{১}{৫}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}=\frac{১২+১৫+২০+৩০+১০}{৬০}$

$$=\frac{৮৭}{৬০}=\frac{২৯}{২০}$$

তিন থেকে বাদ দিলে শেষ থাকবে $\frac{৩১}{২০}$

ভগ্নাংশের গুণন : এ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা ব্যাপক আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের কোন একজায়গায় বলেছেন :

রূপাণিচ্ছেদণান্যংশযুতানি দ্বয়োর্বহুনাং বা
প্রত্যুৎপন্নো ভবতিচ্ছেদবধেনোদ্ধতোঽংশবধঃ ॥

অর্থাৎ মর্মার্থ হচ্ছে দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশাদি গুণের জন্য সমস্ত লবগুলির গুণফলকে সমস্ত হরগুলির গুণফল দিয়ে ভাগ করা হয়।

অর্থাৎ যদি $\frac{a}{b}$ এবং $\frac{c}{d}$ এই দুইটি ভগ্নাংশ দেওয়া থাকে

তাহলে এদের গুণফল হবে $=\frac{a\times c}{b\times d}$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

"অংশাহতিশ্ছেদ বধেন ভক্তা লব্ধং বিভিন্নে গুণনে ফলং স্যাৎ ॥"

অর্থাৎ লবগুলির গুণফলকে হরগুলির গুণফলের দ্বারা ভাগ করিলে ভগ্নাংশের গুণফল পাওয়া যায়।

এ সম্পর্কে ভাস্করাচার্য (১১৫০ খ্রীঃ) একটি সুন্দর উদাহরণ তুলে ধরে প্রাঞ্জলভাবে সমাধান করেছেন। তিনি বলেছেন—

"সত্যংশরূপ দ্বিতয়েন নিঘ্নং স সপ্তমাংশ দ্বিতয়ং ভবেৎ কিম্। অর্দ্ধ
ত্রিভাগেন হতঞ্চবিদ্ধি দক্ষোঽসি ভিন্নে গুণনা বিধৌ চেৎ।"

ন্যাস : ২ ২
$\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৭}$

সবর্ণি জাতম্— ৭ $\frac{১৫}{৭}$

গুণিতে জাতম্— $\frac{৫}{১}$

ন্যাসঃ $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{৩}$

গুণিতে জাতম্ $\frac{১}{৬}$

অর্থাৎ "দুই ও একের সাতকে দুই ও একের তিন দিয়া গুণ করিলে কি হইবে এবং একের দুইকে একের তিন দিয়া গুণ করিলে কি হইবে যদি গুণের বিধানে নিপুণা হও তো বল

বর্ণনা $২+\frac{১}{৩}$ $২+\frac{১}{৭}$

উভয়ে যোগ করিলে $\frac{৭}{৩}$ $\frac{১৫}{৭}$

উভয়ের গুণফল $\frac{৭}{৩}\times\frac{১৫}{৭}=\frac{৫}{১}$

বর্ণনা $\frac{১}{২}$ এবং $\frac{১}{৩}$ গুণ করিলে $\frac{১}{২}\times\frac{১}{৩}=\frac{১}{৬}$

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে উদাহরণটি দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ভগ্নাংশের যোগ ও গুণ এই দুইটি নিয়মেরই উদাহরণ সমাধান করে দিয়েছেন।

ভগ্নাংশের ভাগ ঃ প্রথম আর্যভটের আর্যভটীয়তে যোগ বিয়োগ প্রভৃতি প্রাথমিক নিয়মগুলি না থাকলেও ভগ্নাংশের ভাগ সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত আছে। আর্যভটীয়তে ত্রৈরাশিক নিয়ম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েই ভগ্নাংশের ভাগের ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ $\frac{f\times i}{p}$ এখানে $f=\frac{a}{b}$, $i=\frac{c}{d}$ এবং $p=\frac{m}{n}$

এই ধরণের রাশির সাহায্যে ত্রৈরাশিকের রাশিটিকে নির্ণয় করেছেন। তবে প্রথম আর্যভট যাই করুণ না কেন ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীরাচার্য শ্রীধরাচার্য, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন ঃ

পরিবর্ত্ত্য ভাগহারচ্ছেদাংশৌ ছেদসংগুণচ্ছেদঃ।
অংশোঽংশগুণো ভাজ্যস্য ভাগহারঃ সবর্ণিতয়োঃ ॥

অর্থাৎ ভাজকের লবের সহিত হরের পরিবর্তন কর। তারপর ভাজ্যের লবের সঙ্গে নূতন ভগ্নাংশে লবের গুণ করিয়া ঐ গুণফলকে ভাজের হরের সঙ্গে নূতন ভগ্নাংশের হরের গুণ ফল দ্বারা ভাগ কর।

অর্থাৎ $\frac{p}{q}$ কে $\frac{r}{s}$ দিয়ে ভাগ করতে হলে

$\frac{r}{s}$ কে পরিবর্তিত কর $\frac{s}{r}$ এ' তারপর $\frac{p}{q}\times\frac{s}{r}=\frac{ps}{qr}$ হবে।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন ঃ

"ছেদং লবঞ্চ পরিবর্ত্ত্যহরস্য শেষঃ কার্যে২থ ভাগহরেণ গুণনাবিধিশ্চ।"

অর্থাৎ "লবের সহিত হরের পরিবর্তন করিয়া গুণনের নিয়মানুসারে গুণ করিতে হইবে।" এর উদাহরণও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য দিয়েছেন ঃ

সত্র্যাংশরূপ দ্বিতয়েন পঞ্চত্র্যংশেন ষষ্ঠং বদ মে বিভজ্য।
দর্ভীয়গ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশ্চেদস্তি তে ভিন্নহতৌ সমর্থা ॥

ন্যাস ঃ ২

$\frac{১}{৩}$ $\frac{৫}{১}$ $\frac{১}{৩}$ $\frac{২}{৬}$

যথোক্ত করণেন জাতম্ $\frac{১৫}{৭}$ $\frac{১}{২}$

অর্থাৎ পাঁচকে দুই এবং একের তিন দ্বারা ভাগ করিলে এবং একের ছয়কে একের তিন দ্বারা ভাগ করিলে হে কুশাগ্রসুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্নে যদি সমর্থ হও তো বল।

বর্ণনা—২

$\frac{১}{৩}$ $\frac{৫}{১}$ $\frac{১}{৩}$ $\frac{২}{৬}$

উক্ত প্রকার স্থির করা হইল $\frac{১৫}{৭}$ $\frac{১}{২}$

এ প্রসঙ্গে শ্রীধরাচার্য বলেছেন—ছেদাংশ বিপর্যাসে হরস্ত বিহিতে বিধিঃপুর্ব।
মহাবীরাচার্য বলেছেন—

"অংশীকৃত্যচ্ছেদং প্রমানরাশেতঃ ক্রিয়া গুণবত্।
প্রমিতফলেহণ্যহরঘ্নে বিচ্ছিদি বা সফল বচ্চ ভাগ হৃতৌ ॥"

ভগ্নাংশের বর্গ ও বর্গমূল ঃ এ সম্পর্কে ভারতীয় গণিতবিদদের অনেকেই আলোচনা করেছেন। তবে ব্রহ্মগুপ্ত ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ব্যাপকভাবে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন ঃ

"সংবর্নিতাংশ বর্গচ্ছেদকৃতি বিভাজিতো ভবতি বর্গঃ।
সংবর্নিতাংশমূলং ছেদপদে নাদ্ধতংমূলম্ ॥"

অর্থাৎ "ভগ্নাংশের বর্গ নির্ণয় করিতে হইলে লবের বর্গ করিয়া উহাকে হরের বর্গ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। ভগ্নাশের বর্গমূল নির্ণয় করিতে হইলে লবের বর্গমূলকে হরের বর্গমূল দ্বারা ভাগ করিতে হইবে।" দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন ঃ

"বর্গে কৃতৌ ধনাবিধৌ তুঘনৌ বিধয়ৌ হারাংশয়েরেথ পদে চ পদ প্রসিদ্ধে।"

অর্থাৎ বর্গ নির্ণয় করিতে হইলে অথবা ঘন নির্ণয় করিতে হইলে লব এবং হর উভয়ের বর্গ বাহির করিতে হইবে এবং উভয়ের ঘন বাহির করিতে হইবে। এবং বর্গ মূল বাহির করিতে হইলে লব ও হরের উভয়ের বর্গমূল নির্ণয় করিতে হইবে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এই শ্লোকটি ভগ্নাংশের ঘনমূলের কথাও উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ সম্পর্কে উদাহরণে বলেছেন ঃ

সার্দ্ধত্রয়াণাং কথয়াশু বর্গং বর্গাত্ততো বর্গ পদঞ্চ মিত্র।
ঘনঞ্চ মূলঞ্চ ঘনাত্ততোহপি জানাসি চেদ্ বর্গঘনৌ বিভিন্নৌ ॥

ন্যাস ঃ— ৩ $\frac{১}{২}$

ছেদঘ্ন রূপে কৃতে জাতম্ $\frac{৭}{২}$

অস্য বর্গঃ $\frac{৪৯}{৪}$ মূল $\frac{৭}{২}$

ঘনঃ $\frac{৩৪৩}{৮}$ অস্য মূলং $\frac{৭}{২}$

অর্থাৎ তিন এবং অর্ধেকের সমষ্টির বর্গ কত শীঘ্র বল। এবং বর্গের বর্গমূল কত? তাহার ঘন এবং তাহার ঘনমূল যদি নিপুণা হয়তো শীঘ্র বল।

বর্গনা ৩
$\frac{১}{২}$

ভগ্নাংশের প্রকৃত রূপ করিয়া হইল $\frac{৭}{২}$

এই ভগ্নাংশের বর্গ $\frac{৪৯}{৪}$, ইহার বর্গমূল $\frac{৭}{২}$

এই ভগ্নাংশের ঘন $\frac{৩৪৩}{৮}$ ইহার ঘনমূল $\frac{৭}{২}$

ভগ্নাংশের ঘনমূল সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন :

"ছেদো ঘনাদ্ দ্বিতীয়াদ্ ঘনমূলকৃতি স্ত্রিসঙ্গুণাপ্তকৃতিঃ।
শোধ্যা ত্রিপূর্বগুণিতা প্রথমাদ্ ঘনতো ঘনোমূলম্ ॥"

একক ভগ্নাংশ : অর্থাৎ যে ভগ্নাংশের লব এক হয় এবং হর একভিন্ন যে কোন রাশি হবে। এ সম্পর্কে মহাবীরাচার্য কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে গিয়েছেন।

প্রথম উদাহরণ : ১'কে কতকগুলি একক ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ।

"রূপাংশকরাশীনাং রূপাদ্যাস্ত্রিগুণিতা হরা ক্রমশঃ
দ্বিদ্বিত্র্যংশাভ্যস্তাবাদিমচরমৌ ফলে রূপে"

অর্থাৎ মর্মার্থ হচ্ছে :

১কে নির্দিষ্ট সংখ্যক একক ভগ্নাংশের সাহায্যে লিখতে হলে ভগ্নাংশগুলির লব ১ হবে, প্রথম ভগ্নাংশের হর ১ এবং তৎপর সবগুলি হরকে ৩ এবং $৩^২$, $৩^৩$, $৩^৪$... এই ক্রম অনুযায়ী গুণ করতে হবে তবে প্রথম হরটিকে ২ এবং শেষের হরটিকে^{২} দ্বারা আবার গুণ করতে হবে।

অর্থাৎ গণিতের ভাষায় এটি প্রকাশ করলে হ'বে

$$১ = \frac{১}{২} + \frac{১}{৩} + \frac{১}{৩^২} + \frac{১}{৩^৩} + \frac{১}{৩^৪} + \cdots\cdots + \frac{১}{৩^{n-২}} + \frac{১}{২.৩^{n-২}}$$

দ্বিতীয় উদাহরণ : ১' কে বিজোড় সংখ্যক একক ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ।

একাংশকরাশীনাং দ্ব্যাদ্যা রূপোত্তরা ভবন্তি হরাঃ।
স্বাসন্নপরাভ্যস্তাঃসর্বে দলিতাঃ ফলে রূপে ॥

অর্থাৎ মর্মার্থ হচ্ছে—

১ কে বিজোড় সংখ্যক একক ভগ্নাংশের সাহায্যে লিখতে হোলে প্রত্যেকটি ভগ্নাংশের লব ১ হবে হরগুলির প্রথম থেকে ২ এবং এক এক বৃদ্ধি করে গুণ করতে হবে। আবার হরগুলি ৩ এবং এক এক বৃদ্ধি করে গুণ করতে হবে। তৎপর সবগুলিকে অর্ধেক কর। অর্থাৎ গণিতের ভাষায় বলতে গেলে

$$১=\frac{১}{২.৩.\frac{১}{২}}+\frac{১}{৩.৪.\frac{১}{২}}+\cdots\cdots \frac{১}{(২n-১)\ ২n.\frac{১}{২}}+\frac{১}{২n\frac{১}{২}}$$

তৃতীয় উদাহরণঃ কোন একক ভগ্নাংশকে কতকগুলি ভগ্নাংশ যার হর দেওয়া আছে তার সাহায্যে প্রকাশ।

লব্ধহর প্রথমস্যচ্ছেদঃ সস্বাংশকোঽয়মপরস্য।

প্রাক্ স্বপরেণ হতোঽন্ত্যঃ স্বাংশেনৈকাংশকে যোগে॥

এটিকে গণিতের ভাষায় লিখলে হবে

$$\frac{1}{n}=\frac{a_1}{n(n+a_1)}+\frac{a_2}{(n+a_1)(n+a_1+a_2)}+\cdots\cdots+$$

$$\frac{a_{r-1}}{(n+a_1+\cdots+a_{r-2})(n+a_1+\cdots+a_{r-1})}+\frac{}{a_r(n+a_1+a_2+\cdots+a_{r-1})}$$

চতুর্থ উদাহরণঃ কোন ভগ্নাংশকে কতকগুলি একক ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ।

সেষ্টো হারো ভক্তঃ স্বাংশেন নিরগ্রমাদিমাংশহরঃ।

তদ্যুতিহারাপ্তষ্টঃ শেষোঽস্মাদিত্থমিতরেষাম্॥

এটি গণিতের ভাষায় লিখলে হবে :

$$\frac{p}{q}=\frac{1}{r}+\frac{i}{r.q} \quad \cdots \quad (a)$$

আবার $\frac{i}{r.q}$কে, (a) এর মত প্রকাশ করা হবে এবং এভাবে চলতে থাকবে। এটি পছন্দ করা সংখ্যা i এর উপর নির্ভরশীল।[১]

পঞ্চম উদাহরণঃ একক ভগ্নাংশকে দুটি ভিন্ন একক ভগ্নাংশের যোগফলের সাহায্যে এইভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।[২]

(১) B. B. Dutta and A. N. Singh—History of Hindu Mathematics Part I. পৃষ্ঠা ২০১

(২) শ্লোকগুলির উদ্ধৃতি দিলাম না।

(ক) $\frac{1}{n}=\frac{1}{t.n}+\frac{1}{\frac{t.n}{t-1}}$

(খ) $\frac{1}{\alpha.\beta}=\frac{1}{\alpha(\alpha+\beta)}+\frac{1}{\beta(\alpha+\beta)}$

ষষ্ঠ উদাহরণ : কোন ভগ্নাংশকে অপর দুটি ভগ্নাংশের যোগফলের সাহায্যে প্রকাশ (হরটি অবশ্য দেওয়া থাকবে) অর্থাৎ

$$\frac{x}{y}=\frac{a}{\frac{ap+b}{x}\times\frac{y}{p}}+\frac{b}{\frac{ap+b}{x}\times\frac{y}{p}\times p}.$$

এ ছাড়া আরও এ ধরণের উদাহরণ দেওয়া আছে।

সপ্তম অধ্যায়

৭.১ বর্গ

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে বর্গ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। তবে পদ্ধতিগত ভাবে আলোচনা শুরু হয় প্রথম আর্যভটের সময় থেকে। এরপর ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য, মহাবীরাচার্য, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখ ভারতীয় গণিতবিদেরা রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করে আলোচনা করেছেন। বর্গ এবং কৃতি এই দুইটি শব্দ অনেকক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা হোত। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে সারি থেকে বর্গ কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। প্রথম আর্যভট বর্গ সম্বন্ধে বলেছেন—

"বর্গসমচতুরশ্র ফলঞ্চ সদৃশদ্বয়স্য সংবর্গঃ।"[১]

অর্থাৎ একটি সমচতুরশ্রের চারিটি সমান পার্শ্ব থাকিলে তাহা দ্বারা উৎপন্ন ক্ষেত্রফলকে বর্গ বলে অথবা দুইটি সমান রাশির গুণফলকে বর্গ বলা হবে।

১। (ক) প্রথম ভাস্করাচার্য আর্যভটীয়ের টীকায় এই শ্লোকটির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করেছেন—

বর্গঃ করণী কৃতিঃ বর্গণা যাবকরণমিতি পর্যায়াঃ। সমাশ্চতস্রঃ অশ্রয়ো যস্য সোঽয়ং [**সম**] **চতুরশ্র** ক্ষেত্র বিশেষঃ, স বর্গঃ। সমচতুরশ্রক্ষেত্র বিশেষঃ সংজ্ঞী, বর্গঃ সংজ্ঞা। অত্র সংজ্ঞিসংজ্ঞয়োরভেদেন উপচারেণ উচ্যতে 'বর্গঃ সমচতুরশ্রঃ' ইতি। যথা 'মাংসপিণ্ডো দেবদত্তঃ' ইতি। অন্যথাত্র যাবান্ সমচতুরশ্রক্ষেত্র বিশেষঃ তস্য সর্বস্যানিষ্ঠস্যাপি বর্গসংজ্ঞাপ্রসঙ্গঃ। ক্বান্যত্রানিষ্টস্য সমচতুরশ্রক্ষেত্রবিশেষস্য বর্গসংজ্ঞা প্রসঙ্গঃ ? উচ্যতে—অসমকর্ণস্য সমচতুরশ্রক্ষেত্রবিশেষস্যাস্য। দ্বি-সমত্র্যশ্রক্ষেত্রস্য সমুন্নতবদবস্থিতস্যাস্য।

বর্গসংজ্ঞাপ্রসঙ্গে কো দোষঃ ? উচ্যতে—'ফলং চ সদৃশদ্বয়স্য সংবর্গঃ' ইতি সদৃশদ্বয়স্য সংবর্গঃ ফলং প্রাপ্নোতি, ন চেষ্যতে এবম্। ক্ব তর্হি ? কর্ণগ্রহণং কর্তব্যম্; বর্গঃ সমকর্ণসমচতুরশ্রক্ষেত্রবিশেষ ইতি। অথবা তুল্য সঙ্খ্যাভ্যাং কর্ণাভ্যামুপলক্ষিতস্যৈব সমচতুরশ্রক্ষেত্রবিশেষস্য বর্গসংজ্ঞা জিজ্ঞাস্যতে। কুতঃ ? নানিষ্টার্থত্বাচ্ছাস্ত্রপ্রবৃত্তেঃ। অথবা নৈব লোকে এবমাকারবিশিষ্টস্য সমচতুরশ্রক্ষেত্রস্য সমচতুরশ্রসংজ্ঞা সুসিদ্ধা। আয়তচতুরশ্রক্ষেত্রাদিষু বর্গকর্মণোঽস্তিত্বাত্তেষামসমচতুরশ্রাণামপি বর্গসংজ্ঞাপ্রসঙ্গঃ। নৈষ দোষঃ। তেষ্বপি যো বর্গঃ স সমচতুরশ্রক্ষেত্রফলম্। তদ্যথা—সমচতুরশ্রমেত্রমালিখ্য অষ্টধা বিভজ্য ত্রিকচতুষ্কবিস্তারায়ামানি চত্বারি আয়ত চতুরস্র ক্ষেত্রাণি পঞ্চকর্ণানি পরিকল্পয়েত্। তত্রৈবং পরিকল্পিতচতুরশ্রায়তচতুরশ্রক্ষেত্রকর্ণবাহুকং সমচতুরশ্রং ক্ষেত্রং মধ্যেঽবতিষ্ঠতে। যস্তত্রায়তচতুরশ্রক্ষেত্রকর্ণায়তবর্গঃ, স চান্তঃ

ব্রহ্মগুপ্ত বর্গ করবার জন্য দুটি নিয়ম বলেছেন। তিনি ৬৩তম শ্লোকের প্রথমাংশে বলেছেন—

"রাশেরূনং দ্বিগুণং বহুতর গুণ মূনকৃতিযুতং বর্গঃ।"

অর্থাৎ যে রাশির বর্গ করা হবে সেটিকে দুই বা ততোধিক খণ্ড খণ্ড রাশিতে ভাগ কর। তারপর প্রথমরাশির বর্গ কর। তারপর প্রথম রাশির দ্বিগুণের সঙ্গে পরের রাশি গুণ কর। তৎপর শেষ রাশির বর্গ কর। অতঃপর সবগুলিকে যোগ কর।

বলা বাহুল্য এ থেকে আমরা $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ সূত্রটি পাচ্ছি।

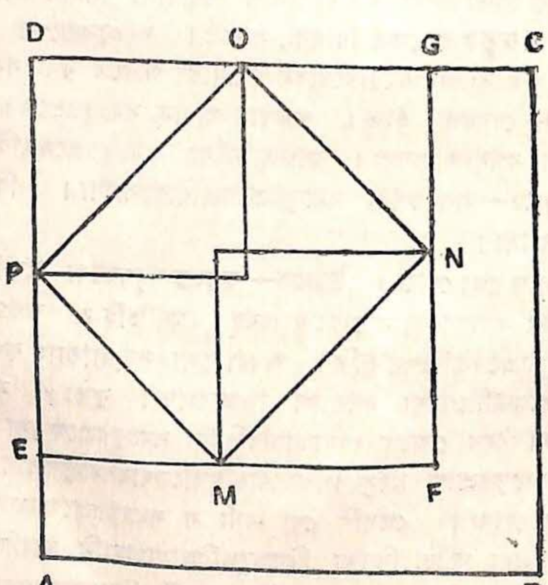
ব্রহ্মগুপ্ত এই শ্লোকটির শেষার্ধে বীজগণিতীয় পদ্ধতিতে বর্গ বের করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন :

'রাশেরিষ্টযুতোনাদ্বধঃ কৃতির্বেষ্টকৃতিযুক্তঃ'

অর্থাৎ রাশির সঙ্গে ইষ্ট রাশি যোগ করে এবং রাশির সঙ্গে ইষ্ট রাশি গুণ করে উভয় ফলকে আবার গুণ কর। তৎপর ইষ্ট রাশির বর্গ যোগ করো।

অর্থাৎ $n^2 = (n+a)\ (n-a) + a^2$ ।

সমচতুরশ্রক্ষেত্রে ফলম্। ত্রিভুজেঽপ্যেতদেব দর্শনম্, অর্ধায়তচতুরশ্রত্বাত্ ত্রিভুজস্য। দুর্বিদগ্ধপ্রত্যায়নায় চ ক্ষেত্রমালিখ্যতে।



অস্মাদ্ যো যো বর্গঃ সমচতুরশ্রক্ষেত্রবিশেষঃ। এবং ফলং চ সদৃশদ্বয়স্য সংবর্গঃ।

শ্রীধরাচার্য ত্রিশতিকায় বলেছেন—

কৃত্বান্ত্যপদস্থ কৃতিং শেষপদর্দ্বিগুণমন্ত্যমভিহন্যাত্।
উত্মার্যোর্য পদাদষং চোত্সারয়েত্ কৃতয়ে ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মগুপ্ত যা বলেছেন সেটিই এখানে প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য অবশ্য বর্গ সম্বন্ধে বেশ বড় রকমের অলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"সমদ্বিঘাতঃ কৃতিরুচ্যতেঽত্র স্থাপ্যোঽন্ত্য বর্গো দ্বিগুণান্ত্য নিঘ্নাঃ। স্বস্বোপরিষ্ঠাচ্চ

সংবর্গ ইতি অস্য সমচতুরশ্রস্য ক্ষেত্রফলং নিরূচ্যতে। সদৃশস্য দ্বয়ং সদৃশদ্বয়ম্। অথবা সদৃশদ্বয়ং চ তদ্দ্বয়ং চ সমসদৃশদ্বয়ম্ সদৃশদ্বয়স্য সংবর্গঃ। সংবর্গো ঘাতো গুণনা ইতিরুদ্বর্তনা ইতি পর্যায়াঃ। সদৃশদ্বয়সংবর্গঃ ফলং তস্য সমচতুরশ্রস্যঃ সদৃশদ্বয়সংবর্গ ইত্যত্র ইষ্টবাহুবচনং কর্তব্যম্। অন্যথা হি যয়োঃ কয়োশ্চিত্সদৃশয়োঃ সংবর্গ ফলং প্রাপ্নোতি। নৈতদস্তি। নহি ফলার্থী অন্যক্ষেত্রমুদ্দিশ্যান্যয়োরভ্যাসং করোতি। ন হোদনার্থী পাংস্থনাদত্তে। (Āryabhaṭiya of Āryabhaṭa with the Commentary of Bhāskara I and Someśvara, critically edited with introduction and Appendices by Kripa Sankar Shukla, গণিতপাদ, পৃঃ ৪৭—৪৮). (এটিকে এবার থেকে Ā (K.S.S) বলবো)।

(খ) সূর্যদেব যজন আর্যভটীয়ের এই শ্লোকটির টীকায় বলেছেন—

সমসংখ্যাশ্চত্বারো বাহবো যস্য স ক্ষেত্রবিশেষো বর্গফলত্বাদ ভেদো পচারেণ বর্গ ইত্যুচ্যতে। ফলং চ তস্য চতুরশ্রস্য সদৃশদ্বয়সংবর্গঃ, তদ্বাহ্বোর্দ্বয়োর্ঘাত ইত্যর্থঃ। ভিন্নেষ্বপ্যংশবর্গং ছেদবর্গেণ হরেত্। যথাহ—

অংশকৃতৌ ভক্তায়াং ছেদজবর্গেণ ভিন্নবর্গফলম্। (পাটীগণিতম্, সূ ৩৪) ইতি। অস্য ক্ষেত্রস্য বর্গসংজ্ঞাকরণং, তত্ফলানয়নপ্রকারঃ [চ] সদৃশদ্বয়সংবর্গ এব বর্গপরিকর্ম-ণোঽপি স্বরূপমিতি প্রদর্শনার্থম্। সদৃশদ্বয়সংবর্গ ইতি সামানোক্তিরপ্যনৈনৈবাভিপ্রায়েণ নেতব্যা। উত্তরার্ধেঽপি ঘন সংজ্ঞাকরণং, 'সদৃশত্রয়সংবর্গ' ইতি সামান্যবচনং চ ঘনপরিকর্ম প্রদর্শনার্থমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। উত্তরত্র বর্গ ঘন মূলানয়নাভিধানমপ্যন্যথা ন সংগচ্ছতে। তস্মাত্ সমচতুরশ্রফলং বর্গপরিকর্ম চ পূর্বার্ধেন প্রতিপাদ্যতে, উত্তরার্ধেন ক্ষেত্রস্য ফলং ঘনপরিকর্ম চ প্রতিপাদ্যতে ইতি। (Āryabhaṭiya of Āryabhaṭa, with the Commentary of Sūrya Deva Yajvan, critically edited with introduction and Appendices by K. V. Sarma, গণিতপাদ, পৃঃ ৩৪). [এটিকে এবার থেকে Ā (K. V. S.) বলবো]।

(গ) নীলকণ্ঠ সোমসূত্বন আর্যভটীয়ের এই শ্লোকটির টীকাতে বলেছেন:

বর্গ ইত্যুক্তে সমচতুরশ্রং ক্ষেত্রং বোদ্ধব্যম্। যতস্তত্ক্ষেত্রফলং বর্গীকরণেন

তথা পরেঽঙ্কাস্ত্যক্ত্বান্ত্য মুৎসার্য্য পুনশ্চ রাশি॥ খণ্ডদ্বয় স্যাভিহতির্দ্বিনিঘ্নৌ তৎ খণ্ডবর্গৈক্যযুতা কৃতির্বা। ইষ্টোনযুগ্রাশি বধঃ কৃতিঃ স্যাদিষ্টস্য বর্গেণ সমন্বিতো বা।"

অর্থাৎ সমান দুইটি সংখ্যার গুণফলকে বর্গ বলে। শেষ রাশি উপরে রাখিতে হইবে, অবশিষ্ট রাশি দ্বিগুণ করিতে হইবে এবং শেষ রাশির দ্বারা গুণ করিয়া উপরে রাখিতে হইবে, পরে পুনরায় শেষ রাশি ভিন্ন অন্য রাশি রাখিতে হইবে। অথবা দুইটি অংশের দ্বিগুণ করিয়া অংশগুলির বর্গের সহিত যোগ করিলে বর্গ হইবে। রাশির সহিত ধরিয়া লওয়া রাশি যোগ করিতে হইবে এবং রাশির সহিত ধরিয়া লওয়া রাশি বিয়োগ করিতে হইবে। এইবার সেই দুইটির গুণ করিতে হইবে এবং তাহার সহিত ধরিয়া লওয়া রাশির বর্গ যোগ করিতে হইবে তাহা হইলেই রাশির বর্গ পাওয়া যাইবে।[১]

সূত্রগুলি দেবার পরই ভাস্করাচার্য (দ্বিতীয়) কতকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন :

সখে নবানাঞ্চ চতুর্দ্দশানাং ব্রূহি ত্রিহীনস্য শতত্রয়স্য।
পঞ্চোত্তর স্যাপ্যযুতস্য বর্গং জানাসি চেদ বর্গবিধান মার্গম॥

অর্থাৎ হে প্রিয়ে! নয়, চতুর্দশ, তিন শতকের তিন কম, অযুতের পাঁচ বেশী ইহাদের বর্গ বাহির করিবার রীতি যদি তোমার জানা থাকে বল।

এষাং যথোক্তকরণেন জাতাবর্গাঃ ৮১।১৯৬।৮৮২০৯।১০০১০০০২৫

সম্পাদ্যতে। তদ্যথা—তত্ প্রদর্শনায় সমচতুরশ্রং ফলকং মৃন্ময়ং বা নির্মায়াঙ্গুল-হস্তযোজনকলাদিষু যেন মানেন তত্ক্ষেত্রং মীয়তে তেনৈকবিস্তারং বিদার্য পুনঃ প্রত্যেকমেরুদীর্ঘং চ ছিন্নেষু যাবন্তঃ খণ্ডাঃ স্যুস্তাবত্ফলং তত্ ক্ষেত্রম্। এবং তদ্গতফলান্যপি চতুরশ্রাণি। ন কেবলং সমচতুরশ্রক্ষেত্র এব ফলানাং সমচতুরশ্রত্বম্। অপিতু বৃত্তত্র্যশ্রচাপাকারাদিষ্বখিলেষ্বপি তেষ্বপে সমচতুরশ্রকোষ্ঠ সঙ্খ্যয়া হি ফলাখ্যা। কথং পুনস্তদানয়নমিত্যত আহ—সদৃশদ্বয়স্য সংবর্গ ইতি। তুল্যেষু চতুর্ষু বাহুষ্বেক-কোণস্পৃষ্টয়োর্দ্বয়োঃ সংবর্গ ইতি যাবত্। এতদুক্তং ভবতি—যাবদ্বাহুকং সমচতুরশ্রং ক্ষেত্রং তাবতী সঙ্খ্যয়াপি তাবত্কৃত্বঃ কৃতা বর্গাখ্যা। উক্তং ন বৈজয়ন্ত্যা—

"বর্গস্তাবত্কৃতিশ্চেতি তাবতকৃত্বঃ কৃতে দ্বয়ম্।
তন্মূলে চ পদং হেতুঃ

(Āryabhaṭīya of Āryabhaṭācārya with the Bhāṣya of Nīlkanthasomasutvan. Edited by K. Sāmbaśivaśāstri, গণিতপাদঃ, পৃঃ ৫—৬). (এটিকে এবার থেকে Ā (K.S) বলবো)।

---

(১) অঙ্ক ভাবনা—প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৬৫

এখানে আমি ৯ এবং ২৯৭ এর বর্গ কিভাবে করেছেন সে কথাই উল্লেখ করছি।

অথবা নবানাং খণ্ডে। ৪।৫। অনয়োরাহতি ২০।

দ্বির্নিঘ্নী - ৪০। তৎ খণ্ডবর্গৈক্যেন ৪১। যুতা জাতা সৈব কৃতি ৮১। অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে "অথবা ৯কে ৪ এবং ৫ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহাদের গুণ করা হইল ২০। ইহাদের গুণফলকে দ্বিগুণ করা হইল ৪০। তাহাদের দুইটির অর্থাৎ ৪^২ এবং ৫^২ বর্গের যোগ করা হইল এবং এই দুইটি যোগ করিলে ৪০+৪১=৮১।

২৯৭ এর বর্গ করতে গিয়ে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য $n^2=(n+a)(n-a)+a^2$ এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন :

অথবা রাশিঃ ২৯৭। অয়ং ত্রিভিরূনিতঃ। পৃথগ্ যুতশ্চ। ২৯৪ ৩০০ অনয়োর্ঘাতঃ ৮৮২০০। ত্রিবর্গ ৯। যুতো জাতো বর্গঃ স এব ৮৮২০৯। এবং সর্ব্বত্রাপি।

অর্থাৎ "অথবা ২৯৭ এই রাশির বর্গ। ইহা হইতে ৩ বাদ দিতে হইবে এবং ইহাতে তিন যোগ করিতে হইবে। ইহাতে ২৯৪ ও ৩০০ এই দুইটি রাশি পাওয়া যাইল। ইহাদের গুণ করিতে হইবে। ৮৮২০০ ইহার সহিত তিনের বর্গ যোগ করিতে হইবে। অতএব ৮৮২০০ যোগ ৯=৮৮২০৯ হইবে।"

৭.২ ঘন

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে বর্গের মত ঘন সম্বন্ধেও ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। যাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য, শ্রীপতি, মহাবীরাচার্য, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের আলোচনা প্রায় একই রকমের তবে অনেকে অবশ্য উদাহরণ সহযোগে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম আর্যভট ঘন সম্পর্কে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"সদৃশত্রয় সংবর্গো ঘনস্তথা দ্বাদশাশ্রিঃস্যাত্‌"[১]

(১) (ক) প্রথম ভাস্করাচার্য প্রথম আর্যভটের এই শ্লোকটির টীকায় বলেছেন : [সদৃশত্রয়স্য সংবর্গঃ] সদৃশভয়সংবর্গঃ। সদৃশভয়সংবর্গো ঘনো ভবতি। ঘনো বৃন্দং সদৃশভয়াভ্যাস ইতি পর্যায়াঃ। স চ দ্বাদশাশ্রিঃ। দ্বাদশ অশ্রয়ো যস্য সোঽয়ং দ্বাদশাশ্রিঃ, স্যাত্‌ ভবেত্‌। 'তথা' শব্দেন সমচতুরশ্রতাং ঘনস্য প্রতিপাদয়তি। নৈতদস্তি। অন্তরেণাপি 'তথা' শব্দং অস্য ঘনস্য সমচতুরশ্রতা শক্যত এব প্রতিপত্তুম্। কুতঃ ? সদৃশভয়সংবর্গ ইত্যনেন সমচতুরশ্রক্ষেভফলস্য তত্‌ক্ষেভবাহুসদৃশমেবোচ্ছ্রায়মাচষ্টে, যস্মাত্‌ ক্ষেভফলমুচ্ছ্রায়গুণিতং ঘনফলম্। অথবা 'বর্গঃ সমচতুরশ্রঃ' ইত্যত্রাধিকৃতং সমচতুরশ্রগ্রহণমনুবর্ততে, অশ্রয়ো যস্য মৃদান্যেন বা প্রদর্শয়িতব্যাঃ।

[$\bar{A}$(K.S.S) গণিতপাদ, পৃঃ ৫০—৫১]।

অর্থাৎ মর্মার্থ হচ্ছে—তিনটি সমান সংখ্যার গুণফল এবং যে বস্তুর ১২টি ধার (edge) আছে তাকে ঘন বলে। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন :

স্থাপ্যোঽন্তঘনোঽন্তকৃতিস্ত্রিগুণোত্তরসংগুণা চা ততপ্রথমাত্
উত্তরকৃতিরন্ত্যগুণা ত্রিগুণা চোত্তর ঘনশ্চ ঘন ॥”

অর্থাৎ মর্মার্থ হচ্ছে—দুইটি রাশির যোগের ঘন নির্ণয় করতে হলে প্রথম রাশি = অন্ত্যসংজ্ঞক, দ্বিতীয়রাশি = উত্তরসংজ্ঞক ধরা হবে। তারপর অন্তের ঘনের সঙ্গে অন্ত্যের বর্গের সঙ্গে উত্তর এবং তিন গুণ করে যোগ করবে, তারপর অন্তের সঙ্গে উত্তরের বর্গ এবং তিন গুণ করে যোগ কর। সর্বশেষে উত্তরের ঘন যোগ কর। অর্থাৎ এ সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি

$$(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$

চতুবেদাচার্য অবশ্য এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন।[১]
শ্রীধরাচার্য, মহাবীরাচার্য, শ্রীপতি প্রমুখেরা এই সূত্রটি দিয়েছিলেন।

$$n^3 = \sum_{r=1}^{n} \{3r(r-1)+1\}$$

তবে কেউ কেউ $n^3 = n(n+a)(n-a)+a^2(n-a)+a^3$ এই সূত্রটিও দিয়ে গিয়েছেন।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এই প্রসঙ্গে প্রথমে সংজ্ঞা তারপর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

(খ) সূর্যদেব যজন আর্যভটের এই শ্লোকটির টীকায় বলেছেন :

তথা তেনৈব প্রকারেণ সমদ্বাদশাশ্রিঃ ক্ষেত্রবিশেষো ঘনসংজ্ঞঃ। ভূমিগতাশ্চত্বারো বাহবঃ, অধউর্ধ্বায়তাশ্চত্বারঃ, উপরি চত্বারঃ। এবং সমদ্বাদশবাহুর্ঘনঃ। তস্য চ ফলং তদ্বাহুনাং ভয়ানাং ঘাতঃ। ভিন্নেষ্বপ্যংশঘনং ছেদঘনেন বিভজেত্। যথাহ—অংশস্য ঘনং বিভজেচ্ছেদস্য ঘনেন ঘনফলং ভিন্নম্ (পাটিগণিতম্, সূ-৩৫)। [Ā (K. V, S.) পৃঃ ৩৫]

(গ) নীলকণ্ঠ সোমসুত্বন আর্যভটের এই শ্লোকটির টীকায় বলেছেন :

দ্বাদশাশ্রির্ঘনস্তথা ঘনফল চ দ্বাদশাশ্রি। বক্ষ্যমাণেষু ষড়শ্রিঘনগোলাদিষ্বপি ঘনফলং দ্বাদশাশ্রচেব। তদানয়নমপি সদৃশত্রয়সংবর্গ ইতি প্রদর্শিতম্। তুল্যানাং বিস্তৃতিদীর্ঘপিণ্ডানাং ঘাতো ঘনঃ। তদ্যুক্তিরপি মৃদাদিনা প্রদর্শ্যা। [Ā(K.S) পৃঃ ৬]

---

(১) চতুরস্রা সমা বাপী হস্তত্রিঘনসংজিতা
বেধেন চ তথা তস্যাঃ ফলং ব্রূহি ঘনাত্মকম্।

"সমত্রিঘাতঞ্চ ঘনঃ প্রদিষ্টঃ স্থাপ্যো ঘনোঽন্ত্যস্য ততোঽন্ত্যবর্গ। আদিত্রি নিঘ্নস্ততঃ আদিবর্গস্ত্যন্ত্যা হতোঽথাদিঘনশ্চ সর্ব্বে॥ স্থানান্তরত্বেন যুতা ঘনঃ স্যাৎ প্রকল্প্য তৎ খণ্ডযুগং ততোঽন্ত্যম্। এবং মূহুর্বর্গঘন প্রসিদ্ধা বাদ্যাঙ্কতো বা বিধিরেষঃ কার্য্যঃ। খণ্ডাভ্যাং বাহতোরাশিস্ত্রিঘ্নঃ খণ্ডঘনৈক্যযুক্। বর্গমূল ঘনস্বঘ্ন। বর্গরাশের্ঘনো ভবেৎ।"

অর্থাৎ সমরাশিকে সমরাশি দ্বারা তিনবার গুণ করিলে ঘন পাওয়া যায়। শেষ রাশির ঘন বাহির করিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর, শেষ রাশির বর্গ প্রথম রাশির তিনগুণের দ্বারা গুণ করিতে হইবে। তারপর প্রথম রাশির বর্গ তিন গুণ করিয়া শেষে রাখিতে হইবে এবং শেষে প্রথম রাশির ঘন লইতে হইবে। এইগুলি সমস্ত যোগ করিতে হইবে; সেই সংখ্যাটিকে দুইটি ভাগ করিয়া একটিকে শেষে রাখিতে হইবে। এইভাবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। অথবা এই নিয়ম রাশির প্রথম স্থানটিকে লইতে হইবে ঘন বা বর্গ বাহির করিবার জন্য। অথবা সেই সংখ্যার তিন গুণকে ইহার দুইটি খণ্ডের দ্বারা গুণ করিতে হইবে। ঐ খণ্ডগুলির ঘন বাহির করিয়া যোগ করিতে হইবে। অথবা নির্দিষ্ট সংখ্যার বর্গমূলকে ঘন করিতে হইবে, পরে উহাই বর্গমূলের ঘনবর্গ হইবে।

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

নবঘনং ত্রিঘনশ্চ ঘনং তথা কথয় পঞ্চ ঘনস্য ঘনঞ্চমে।

ঘনপদঞ্চ ততোঽপি ঘনাৎ সখেযদি ঘনেঽস্তি ঘনা ভবতো মতিঃ।

অর্থাৎ হে সখে যদি তোমার ঘন সম্বন্ধে সেরূপ বুদ্ধি থাকে, তাহলে বল ৯ এর ঘন কত? তিনের ঘনের ঘন কত? পাঁচের ঘনের ঘন কত? এবং সেই ঘনগুলির ঘন কত। উল্লেখযোগ্য এই উদাহরণটির মধ্যে সূচক প্রকরণের ইঙ্গিত বহন করছে। এরপর দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য সমাধান করেছেন এইভাবে—

ন্যাসঃ ৯।২৭।১২৫

জাতাঃ ক্রমেণ ঘনাঃ ৭২৯।১৯৬৮৩।১৯৫৩১২৫

অথবা রাশিঃ ।৯। অস্য খণ্ডে ৪।৫। আভ্যাং রাশির্হতঃ ১৮০। ত্রিনিঘ্নশ্চ ৫৪০। খণ্ড ঘনৈক্যেন ১৮৯। যুতো জাতো ঘনঃ ৭২৯।

অর্থাৎ মর্মার্থ হচ্ছে—"৯ এই রাশির ঘন বাহির করিতে হইলে ৪ ও ৫ এই দুই খণ্ডে ভাগ করিতে হইবে। এই দুইটি রাশি দ্বারা ৯কে গুণ করিতে হইবে, ৯ × ৪ × ৫ = ১৮০। ইহার তিনগুণ করিতে হইবে ১৮০ × ৩ = ৫৪০। খণ্ড ঘনের ঐক্য = ১৮০ + ৯ = ১৮৯। দুইটি যোগ করিলে ঘন হইবে ৫৪০ + ১৮৯ = ৭২৯।

অথবা রাশি ২৭। অন্যখণ্ডে ২০।৭। আভ্যাং ঘনস্ত্রিঘ্নশ্চ। ২২৩৪০। খণ্ডঘনৈক্যেন। ৮৩৪২। যুতো জাতো ঘনঃ ১৯৬৮৩।

অর্থাৎ ২৭ এই রাশির ঘন বাহির করিতে হইলে ২০ ও ৭ এই দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করা হইল। ২০, ৭ এবং ২৭ এই তিনটি রাশির গুণ করিতে হইবে। =৩৭৮০ ইহার সহিত ৩ গুণ করিতে হইবে। =১১৩৪০ খণ্ডঘনের ঐক্য ৮৩৪৩। এই দুইটি রাশির যোগ করিতে হইবে।

১১৩৪০+৮৩৪৩=১৯৬৮৩, ২০^৩+৭^৩=৮০০০+৩৪৩=৮৩৪৩।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন এখানে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য

$(a+b)^3=a^3+b^3+3ab(a+b)$ এই সূত্রটির সাহায্যে সমাধান করেছেন।

শ্রীধরাচার্য ত্রিশতিকায় বলেছেন—

স্থাপ্যোঽন্ত্যঘনোঽন্ত্যকৃতিঃ স্থানাধিক্যংত্রিপূর্বগুণিতা চ।
আদ্যকৃতিরন্ত্যগুণিতা ত্রিগুণা চ ঘনস্তথাদ্যস্য
নির্যুক্তরাশিরন্ত্যস্তথা ঘনোঽসৌ সমত্রিরাশিহতিঃ
খৈকাদিচয়েনান্ত্যে ত্র্যাদিহতে বা যুতিঃ সৈকে ॥

মহাবীরাচার্য বলেছেন—

অন্তস্য ঘনঃ কৃতিরপি সা ত্রিঽতোতসার্থ শেষগুণিতা বা শেষকৃতিস্ত্রন্ত্যহতা স্থাপ্যোতসথৈবমত্র বিধি।

৭.৩ বর্গমূল

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে বর্গমূল নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। তবে পদ্ধতিগত এবং সুশৃঙ্খলভাবে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম আর্যভটের সময় থেকে। প্রথম আর্যভট ছাড়া শ্রীধরাচার্য, মহাবীর, শ্রীপতি ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থ শুল্ব সূত্রে দ্বিকরণী বলে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য বর্গমূলের 'মূল' শব্দটি অনুযোগদ্বার সূত্রে পাওয়া যায়।

প্রথমেই ভাস্করাচার্য (দ্বিতীয়) বর্গমূল সম্পর্কে কি বলেছেন তা দেখা যাক। লীলাবতীর প্রথম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে বলেছেন:

"তক্ত্বান্ত্যাদ্ বিষমান্ত কৃতিং দ্বিগুণয়েন্মুলং সখে তদ্বৃতে ত্যক্ত্বা
লব্ধকৃতং তদাদ্যবিষমাল্লব্ধং দ্বিনিঘ্নং ন্যসেৎ। পঙ্‌ক্তাং পঙক্তি
হৃতে সমেঽন্য বিষমাব্যক্তাপ্তবর্গং ফলং পঙ্‌ক্তাং তদ্
দ্বিগুণং ন্যসেদিতি মুহুঃ পঙ্‌ক্তে র্দলং স্যাৎ পদম্।"

অর্থাৎ বিষম রাশির শেষ ত্যাগ করিয়া মূল রাশিকে দ্বিগুণ করিতে হইবে। সম রাশিকে তাহার দ্বারা ভাগ করিয়া যে ভাগফল হইল, সেই ভাগফলের বর্গ সেই সমরাশি হইতে বিয়োগ করিয়া দ্বিগুণ করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ এক পঙ্‌ক্তিতে ভাগফলের দ্বিগুণ রাখিতে হইবে।

এইভাবে পুনরায় ভাগফলের দ্বিগুণ করিতে হইবে। পুনরায় সমরাশির দ্বারা ভাগ করিতে হইবে এবং ভাগফলের বর্গ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। এইভাবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে যতক্ষণ না রাশি শেষ হয়।[১]

এই সঙ্গে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন।

মূলং চতুর্ণাঞ্চ তথা নবানাং পূর্ব্বং কৃতানাঞ্চ সখ কৃতীনাম্।
পৃথক্ পৃথক বর্গপদানি বিদ্ধি বুদ্ধের্বিবৃদ্ধির্যদি তেঽত্র জাতা।

ন্যাসঃ ৪।৯।৮১।১৯৬।৮৮২০৯।১০০১০০০২৫ লব্ধানিক্রমেন মূলানি ২।৩।৯।১৪।২৯৭।১০০০৫.

অর্থাৎ মূল ৪, ৯ এবং পূর্ব পূর্ব রাশির পৃথক পৃথক বর্গ পদ জানিও, যদি তোমার বুদ্ধি বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

উদাহরণের প্রকার ৪।৯।৮১।১৯৬।৮৮২০৯।১০০১০০০২৫ এইভাবে ক্রমে ক্রমে বর্গ পাওয়া যাইল—২।৩।৯।১৪।২৯৭।১০০০৫।

ভাস্করাচার্যের প্রণালীতে ১০০১০০০২৫-এর বর্গমূল করা যাক ;

```
          ১০০১০০০২৫ ( ১০০০৫
          ১
          ──────
            ০০
  ২০০০৫ |  ১০০০২৫
        |  ১০০০২৫
           ──────
              ×
```

বর্গমূল সম্পর্কে প্রথম আর্যভট আর্যভটীয়ের গণিতপাদের চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন ঃ

"ভাগং হরেদবর্গান্নিত্যং দ্বিগুণেন বর্গমূলেন
বর্গাদ্বর্গে শুদ্ধে লব্ধং স্থানান্তরে মূলম্ ॥"

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

অবধেশ নারায়ণ সিং এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উদাহরণ তুলে ধরে ব্যাপারটিকে

(১) অঙ্ক ভাবনা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৬৫, পৃঃ—৮

পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি ৫৪৭৫৬-এর বর্গমূল প্রথম আর্যভটের নিয়মে করেছেন। এখানে সেটি তুলে ধরা হল।[১]

```
                              | — | — |
                              ৫  ৪  ৭  ৫  ৬( বীজ ২
(বর্গ বিয়োগ)                   ৪
২ × বীজ অর্থাৎ ৪               ) ১৪ (৩           ভাগফলকে পরবর্তী স্থানে স্থানা-
                                 ১২             ন্তরিত করা হ'ল এবং এর ফলে
  ভাগফলের বর্গ                 )  ২৭            বীজ ( root )  ২৩ হল।
                                   ৯
২ × বীজ অর্থাৎ ২ × ২৩ = ৪৬)  ১৮৫ ( ৪          ভাগফলকে পরবর্তী স্থানে স্থানা-
                                  ১৮৪           ন্তরিত করা হ'ল ফলে বীজ
  ভাগফলের বর্গ                   )  ১৬  (       ( root ) = ২৩৪।
                                     ১৬
```

বহু পাশ্চাত্য গণিত ঐতিহাসিক দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বা প্রথম আর্যভটের প্রণালীকে গ্রীক প্রণালী বলে অভিহিত করেন। যাঁরা এ মতের সমর্থক তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক ডি. ই. স্মীথ এবং জি. আর. ক্যে অন্যতম। স্মীথ তাঁর হিস্ট্রী অব ম্যাথেমেটিকস, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৪-১৪৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, মূলাকর্ষণের যে পদ্ধতিটি দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য আলোচনা করেছেন সেটি আলেকজান্দ্রীয়বাসী থিয়ন প্রদত্ত। এটি সম্ভবতঃ আরবদের মাধ্যমে ভারতীয়রা জেনেছে। যতদূর মনে হয় স্মীথ জি. আর. ক্যের কোন একটি প্রবন্ধ পাঠ করে এই মন্তব্যটি করেছেন। ক্যে'র প্রবন্ধটির উল্লেখযোগ্য অংশটি যেটি স্মীথ হয়তো দেখে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন সেটি হচ্ছে ঃ

"The rules for the extraction of square and cube roots given by Āryabhaṭa are perfectly general (algebraical in character) and apply to all arithmetical notations and that the method was known to Greeks and admirably expressed by Theon of Ālexandria."

মনে হয় ক্যে আর্যভটের শ্লোকটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি এবং ইংরাজীতে যে তর্জমা করেছিলেন তা ভ্রমে পূর্ণ ছিল।[২]

(১) A. N. Singh—On the Indian method of root extraction, Bull. Cal. math. Soc., xviii (1927), Pages 131-140.

(২) (i) Always divide the part that is not square by fwice the root of the square, after having subtracted from the squarred part the square of the root. The quotient is the root of the next term.

(ii) Square having been subtracted from square, always the non-square must be divided by double square root. The quotieut placed at the next placee, this gives the square root.

স্মীথের থিয়ন প্রীতি হেতু হয়তো ভারতীয় পদ্ধতি বিদেশী পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত বলতে পেরেছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে থিয়নের পদ্ধতি ও ভারতীয় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। থিয়নের পদ্ধতির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ক্রটি বলছি—

(ক) এটি ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে বর্গমূলের আসন্ন মান নির্ণয় করার পদ্ধতি।

(খ) সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি যার বর্গ ঐ পূর্ণ সংখ্যাটির নিকটস্থ হবে সেটি নির্ণয় করার পদ্ধতি থিয়ন বলেননি।

(গ) যুগ্ম ও অযুগ্ম স্থানের বিভাগ কিভাবে হবে তা বলেননি।

এ ছাড়াও আরও নানা ক্রটি আছে।[১]

থিয়নের পদ্ধতিতে ১৪৪-এর বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে নিম্নরূপে। ১৩ লওয়া হোল, যার বর্গ ১৪৪ এর নিকটস্থ। এবং তারপর $১০^২+২.২.১০+২^২$ ১৪৪ থেকে বিয়োগ করলে বিয়োগফল কিছুই থাকে না। এই পদ্ধতিতে ১০-এর পরিবর্তে ১১ বা ৯ লওয়া যেতে পারে, তাতে বর্গমূল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যতদূর মনে হয় এই পদ্ধতিটি ইউক্লিডের $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ এই সূত্রের বিস্তৃত আলোচনা।

সুতরাং থিয়নের পদ্ধতি এবং ভারতীয় পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এবং বলা যেতে পারে ভারতীয় পদ্ধতি এ ব্যাপারে গ্রীক প্রভাবমুক্ত।

স্মীথের থিয়ন প্রীতি ছাড়াও মূলাকর্ষণ সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন যে বর্তমান মূলাকর্ষণ পদ্ধতিটি কাটানিওর পদ্ধতি। কিন্তু বহু আলাপ-আলোচনা এবং গবেগণার মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, কাটানিওর পদ্ধতি এবং ভারতীয় পদ্ধতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। অবধেশ নারায়ণ সিং এ সম্পর্কে একটি সুন্দর উদাহরণ তুলে ধরে দুই পদ্ধতির সামঞ্জস্য প্রমাণ করেছেন। তাঁর উদাহরণটি এখানে তুলে ধরলাম—

---

(১) থিয়নের পদ্ধতির ইংরাজী অনুবাদ :—

Find the root of the nearest integer to the whole number, subtract the square, convert the remainder into to........and divide it by the double of the first rot, and this determines the next terms found, subtract this square, convert the remainder into second and divide it by the double of the root already found and you will have the square root very nearly.

```
          ৫৪৭৫৬(২৩৪
     ২² = ৪
         ────
  ২ × ২ = ৪)১৪(৩
           ১২
         ────
            ২৭
       ৩² = ৯
         ────
২৩ × ২ = ৪৬)১৮৫(৪
           ১৮৪
         ────
            ১৬
       ৪² = ১৬
         ────
             ×
```

অতএব আর্যভটের পদ্ধতির সঙ্গে কাটানিওর পদ্ধতির মিল রয়েছে। যাই হোক বর্গমূল সম্পর্কে অন্যান্য ভারতীয় গণিতবিদরা কে কি বলেছেন দেখা যাক।

ত্রিশতিকায় শ্রীধরাচার্য বলেছেন—

"বিষমাত্‌ পদতস্ত্যক্ত্বা বর্গং স্থানচ্যুতেন মূলেন
দ্বিগুণেন ভজেচ্ছেষং লব্ধং বিনিবেশয়েত্‌ পঙ্‌ক্তাম্‌।
তদ্বর্গং সংশোধ্য দ্বিগুণী কুর্বীত পূর্ব লব্ধং যত্‌
উত্‌সার্থ ততো বিভজেচ্ছেষং দ্বিগুণীকৃতং দলয়েত্‌ ॥ ১২।১৩।"

গণিতসার সংগ্রহে মহাবীর বলেছেন—

"অন্ত্যৌজাদপহৃতকৃতি মূলেন দ্বিগুণিতেন যুগ্মহৃতৌ।
লব্ধকৃতিস্ত্যাজ্যৌজে দ্বিগুণপদলং বর্গমূলফলম্‌ ॥"

৭.৪ ঘনমূল

বর্গমূলের মত ঘনমূলের সম্পর্কে আলোচনা ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। তবে এ সম্পর্কে পদ্ধতিগত ভাবে প্রথম আলোচনা করেন প্রথম আর্যভট। এরপর শ্রীধরাচার্য, দ্বিতীয় আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা ব্যাপক আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য লীলাবতী গ্রন্থে বলেছেন—

"আদ্যং ঘনস্থান যথাঘনে দ্বে পুনস্তথান্ত্যদ্ঘনতোবিশোধ্যম্‌। ঘনং পৃথকস্থং পদমস্য কৃত্বা ত্রিঘ্ন্যা তদাদ্যং বিভজেৎ ফলন্তু ॥ পঙক্তপংন্যসেৎ তৎকৃতিমন্ত্যনিঘ্নীং ত্রিঘ্নীং ত্যজেৎ তং প্রথমাৎ ফলস্য। তদাদ্যাদ্ঘনমূলমেবং পঙ্‌ক্তির্ভবেদেব মতঃ পুনশ্চ।"

অর্থাৎ প্রথম রাশিটি ঘনের স্থান। পরের দুইটি স্থান ঘন ভিন্ন; অবশিষ্ট সেই প্রকার। শেষ ঘন স্থান হইতে ঘন গ্রহণ করিতে হইবে এবং পৃথক স্থানে বসাইতে হইবে। সেই বর্গমূলের তিনগুণ করিয়া পরের রাশি দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। ভাগফল পরের পঙক্তিতে স্থাপন করতে হইবে। পরের রাশি হইতে যাহাকে তিনগুণ করা হইয়াছিল তাহা বিয়োগ করিতে হইবে এবং ঘনকেও পরেরটি হইতে বাদ দিতে হইবে। এই পঙতিটিই ঘনমূল। প্রয়োজনানুসারে এইরূপ পুনঃ পুনঃ করা যাইতে পারে।[১]

এই প্রসঙ্গে প্রথম আর্যভট বলেছেন ঃ

অঘনাদ্ ভজেদ্ দ্বিতীয়াত্ ত্রিগুণেন ঘনস্য মূলবর্গেন
বর্গাস্ত্রিপূর্বগুণিতঃ শোধ্যঃ প্রথমাদ্ ঘনশ্চ ঘনাত্।"

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন ঃ

ছেদো ঘনাদ্ দ্বিতীয়াদ ঘনমূলকৃতিস্ত্রি সংগুণাপ্তকৃতিঃ
শোধ্যা ত্রিপূর্বগুণিতা প্রথমাদ্ ঘনতো ঘনো মূলম্।"

শ্রীধরাচার্য বলেছেন ঃ

"ঘনপদমঘনপদে দ্বে ঘনপতোঽপাস্য ঘনমতো মূলম্
সংযোজ্য তৃতীয়পদ স্যাধস্তদনষ্টবর্গেণ ॥"

দ্বিতীয় আর্যভট বলেছেন ঃ

ঘনভাজ্যশোধ্যসংজ্ঞানি পদানি ঘনং ত্যজেত্ স্বপদাত্।
মূলংভাজ্যপদাধো নিধায় তদনষ্ট বর্গেন
ত্রিগুণেন ভজেত্ স্বপদাল্লব্ধং বিনিবেশ্য পঙ্ক্তৌতত্
বর্গ ত্রিপূর্ববধজং জহ্যাচ্ছোধ্যাত্ ধনং চ ধনপদতঃ
তন্মূলং ভাজ্যাধো নিধায় কার্যো বিধি প্রাগ্বত্ ॥

যাই হোক ভারতীয় পদ্ধতিতে যা বলা হয়েছে তার সাহায্যে একটি উদাহরণ পূর্ণ সমাধান করে দেওয়া হোল সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পদ্ধতিটিও তুলে ধরা হ'ল—

```
 | — — | — — |
 ১  ৯  ৫  ৩  ১  ২  ৫
 ১
 ———
৩)৯  (২              (ক)        বীজ = ১
  ৬                             বীজ = ১২ পাবার পর ভাগফলকে
 ———                            স্থানান্তরিত কর।
  ৩৫
  ১২
 ———
```

(১) অঙ্ক ভাবনা প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৯৬৫, পৃঃ ১০

```
      ২৩৩          (খ)
        ৮          (গ)
  ──────────
৪৩২)২২৫১ (৫        (ক)      বীজ ১২৫ পাবার পর ভাগফলকে
    ২১৬১                     স্থানান্তরিত কর।
  ──────────
      ৯১২
      ৯০০          (খ)
  ──────────
      ১২৫
      ১২৫          (গ)
  ──────────
       ×
```

সংক্ষিপ্ত নিয়ম ঃ—ঘন বিয়োগ কর, বীজের বর্গকে ৩ দিয়ে গুণ করে ভাগ দাও অর্থাৎ ৩×১², ভাগফলের বর্গকে পূর্বের বীজকে ৩ গুণ কর তৎপর উভয়কে গুণ করে বিয়োগ কর ; ২²×৩×১, ভাগফলের ঘন (করে৷ ভাগ কর। পূর্বের বীজের ৩ গুণ কর। ভাগফলের বর্গের সঙ্গে গুণ করে বিয়োগ কর। ভাগফলের ঘন বিয়োগ কর।

আধুনিক পদ্ধতি ঃ

```
                                      │  ১৯৫৩১২৫ (১২৫
   ⎧ (a)  ১²×৩০০=৩০০                  │  ১
 ১ ⎨ (b)  ১×৩০×২=৬০                   │  ─────
   ⎩ (c)  ২²              ৪           │  ৯৫৩
                    ──────────        │
                          ৩৬৪         │  ৭২৮
   ⎧ (a′)  ১২²×৩০০=৪৩২০০              │  ─────────
 ২ ⎨ (b′)  ১২×৩০×৫= ১৮০০              │  ২২৫১২৫
   ⎩ (c′)  ৫²      =    ২৫            │
                    ──────────        │  ২২৫১২৫
                       ৪৫০২৫          │  ─────────
                                      │     ×
```

৭·৫ করণী

ভারতীয়রা শুধু মূলদরাশির ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁরা অমূলদরাশির ব্যবহার নিয়েও মাথা ঘামিয়েছেন। তাঁরা জানতেন কোন বর্গক্ষেত্রের কর্ণকে

গাণিতিক নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশ করতে গেলে অমূলদ রাশির সাক্ষাত পাওয়া যাবে। প্রকৃত পক্ষে অমূলদ রাশির কথা ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বে মহর্ষি বৌধায়ন রচিত বৌধায়ন শুল্ব সূত্রে পাওয়া যায়। মহর্ষি বৌধায়ন বলেছেন—

"প্রমাণং তৃতীয়েন বর্ধয়েত্ তচ্চতুর্থংনাত্মচতুস্ত্রিংশোনেন সবিশেষঃ।" ৬১-৬২

অর্থাৎ (যে বর্গক্ষেত্রের দ্বিকরণী নির্ণয় করতে হবে) তার বাহুর সঙ্গে ঐ বাহুর এক তৃতীয়াংশ যোগ কর। তৎপর এর এক চতুর্থাংশ যোগ কর। তৎপর এর এক চৌত্রিশাংশ বিয়োগ কর। অর্থাৎ

$$\sqrt{2}=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3.4}-\frac{1}{3.4.34}$$

এ প্রসঙ্গে মহর্ষি কাত্যায়ন বলেছেন

"করণীং তৃতীয়েন বর্ধয়েতচ্চথচতুর্থংনাত্মচতুস্ত্রিংশোনেন ইতি বিশেষঃ॥"

আপস্তম্ব অবশ্য বৌধায়নের উক্তিটিকে অনুসরণ করেছেন।

এখানে এই "সবিশেষঃ" শব্দটির অর্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জি থিবো মনে করেন পরিমাপ বৃদ্ধির একটি পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে সবিশেষঃ। বার্ক অবশ্য এ মতকে সমর্থন করেন নি। বিখ্যাত গণিত ঐতিহাসিক ডঃ বি. বি. দত্ত মনে করেন যে, উভয় গণিত ঐতিহাসিকই "বিশেষঃ এবং সবিশেষঃ" শব্দ দুটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। অত্যন্ত সুখের কথা "বিশেষঃ" শব্দটি পরবর্তী জৈন গ্রন্থ বহুল পরিমানে উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। এবং যা থেকে এর অর্থ কিছুটা পরিষ্কার হয়। ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বে রচিত সূর্যপ্রজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যদি বৃত্তের ব্যাস ৯৯৬৪০ যোজন হয় তাহলে বৃত্তের পরিধি ৩১৫০৪৯ যোজন এবং বিশেধিক হবে। ব্যাস ১০০৬০ যোজন হলে পরিধি ৩১৮৩১৫ যোজন এবং কিঞ্চিৎ বিশেষণ হবে। খ্রীষ্টপূর্বে রচিত জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তিতে চক্রাকার জম্বুদ্বীপের পরিধি নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছে ১০০০,০০ যোজন ব্যাস হলে পরিধি হবে ৩১৬২২৭ যোজন, ৩ যজযুতি ১২৮ ধূন, ৩৩$\frac{১}{২}$ অঙ্গুলি এবং কিঞ্চিৎ বিশেধিক অবশ্য সমস্ত ক্ষেত্রেই $\pi=\sqrt{10}$ ধরা হয়েছে। বিভিন্ন শুল্ব সূত্রগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যখন বর্গমূলের আসন্ন মান নির্ণয় করতে হয়েছে তখনই বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কাত্যায়ন বলেছেন সবিশেষঃ ইতি বিশেষঃ। ত্রিলোক সারে সবিশেষ শব্দটির অর্থ আসন্ন করা হয়েছে।

অনেকে মনে করেন $\sqrt{2}$' এর অমূলদত্ব ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বেও ভারতীয়রা জানতেন। ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বে (?) লিখিত আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রের কোন এক জায়গায় এর

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গুরুগোবিন্দ চক্রবর্তী এ মতের সমর্থনে নানা যুক্তি দেখিয়েছেন।[১]

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ প্রভৃতির মান কি করে ভারতীয়রা এত নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করলেন ? দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা বলতে পারি কোন্ পদ্ধতির সাহায্যে ভারতীয়রা এগুলির মান নির্ণয় করেছিলেন তা জানি না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। জি থিবো বলেছেন "বোধায়ন, আপস্তম্ব প্রমুখ গণিতবিদেরা কি করে এমান পেলেন ? নিশ্চয়ই তাঁরা $\sqrt{2}$ এর মান ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করতে জানতেন না। যদি তাঁরা জানতেন তাহ'লে আরও সূক্ষ্ম মান তাঁরা অবশ্যই জানবেন। যাই হোক, তিনি এ নিয়ে একটি তত্ত্ব দিয়েছেন। তিনি অনেকগুলি সংখ্যাকে তিনটি লম্ব সারিতে এমন ভাবে সাজিয়েছেন যাতে প্রথম সারিতে বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর পরিমাপ, দ্বিতীয় লম্ব সারিতে কর্ণের বর্গের পরিমাপ এবং তৃতীয় সারিতে ঐ কর্ণের বর্গের পরিমানের কাছাকাছি কোন সংখ্যা যার বর্গমূল একটি পূর্ণ সংখ্যা হবে। নিম্নের লম্ব সারিগুলি লক্ষ্য করলে সব কিছু বোঝা যাবে।

1	2	1	11	242	256
2	8	9	12	288	289
3	18	16	13	338	324
4	32	36	14	392	400
5	50	49	15	450	441
6	72	64	16	512	529
7	98	100	17	578	576
8	128	121	18	648	625
9	162	169	19	722	729
10	200	196	20	800	784

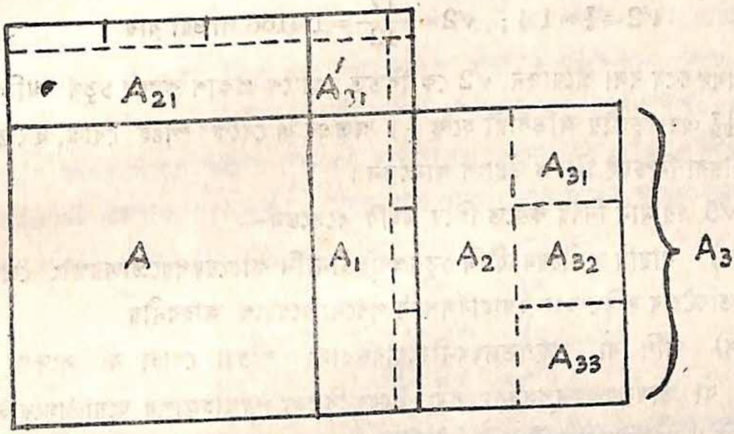
এই লম্ব সারিগুলি দেবার পর থিবো একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন কি করে ভারতীয়রা এই আসন্নমান পেয়েছিলেন। কিন্তু থিবোর পদ্ধতির চেয়ে বি. বি. দত্তের গ্রন্থে একটি সুন্দর পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে।[২] পদ্ধতি হচ্ছে—

A এবং B দুটি বর্গক্ষেত্র লওয়া হ'ল যাদের বাহুর দৈর্ঘ এক একক এখন Bকে সমান তিনটি A_1, A_2, A_3 অংশে ভাগ করা হল। A_3 কে আবার A_{31}, A_{32}, এবং A_{33}, সমান এই তিনটি অংশে বিভক্ত করা হোল। এবার A বর্গ ক্ষেত্রটির মাথায় A_2কে এবং A_{31}কে বসান হল (চিত্রে A_{21}, A'_{31} দেখান হয়েছে) ফলে একটি নূতন বর্গক্ষেত্র M গঠিত হোল। এইবার A_{32} এবং A_{33} এর

(১) Guru Gobinda Chakravarty—Surd in Hindu Mathematics—Journal of the Department of Letters. Vol XXIV (1934), Pages 29-58

(২) B. B Datta—Science of Sulba. Page 191

প্রত্যেকটিকে 4টি সমান অংশে বিভক্ত করে প্রথম চারটি A_{21} এবং A_{31} এর মাথায় বসান হোল এবং দ্বিতীয় চারটি A_1 এবং A_{31} এর পাশে বসান হ'ল। এবং একটি ছোট বর্গক্ষেত্র (ডানদিকের মাথায় যে ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রটি আছে।)



যোগ করার ফলে একটি নূতন বড় বর্গক্ষেত্র গঠিত হল যার বাহুর পরিমাপ $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3.4}$, তাহলে আমার দেখতে পাচ্ছি নূতন বর্গক্ষেত্রটি পূর্বের দুটি বর্গক্ষেত্রের যোগফল অপেক্ষা $\left(\frac{1}{3.4}\right)^2$ অংশ বেশী। সুতরাং নূতন বর্গক্ষেত্রটিকে একটি ছোট বর্গক্ষেত্রে পরিণত করতে গেলে উভয় ধার থেকে সরু সরু দুটি ক্ষেত্র বাদ দেব। ধরা যাক, প্রস্থ x। সুতরাং,

$$2x\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3.4}\right)-x^2=\left(\frac{1}{3.4}\right)^2$$

যদি x_1^2 কে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে করে বাদ দেওয়া যায় তাহলে আমরা পাব

$$x_1^2=\left(\frac{1}{3.4}\right)^2\div\frac{3.4}{34}=\frac{1}{3.4.34}$$

$$\therefore\quad \sqrt{2}=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3.4}-\frac{1}{3.4.34}$$

ঠিক এই পদ্ধতি ব্যবহার করে

$\sqrt{3}=1+\frac{2}{3}+\frac{1}{3.5}-\frac{1}{3.5.52}$ নির্ণয় করা হয়েছে।

"মানব শুল্ব সূত্রে" $\sqrt{2}$ এর মান কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়

এখানে, $40^2+40^2=56^2$

$4^2+4^2=(5\frac{2}{3})^2$ এই সম্পর্ক দুটি থেকে

$$\sqrt{2}=\frac{7}{5}=1\cdot4\ ;\quad \sqrt{2}=\frac{17}{12}=1\cdot4166$$ পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন $\sqrt{2}$ কে বিতত ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে চতুর্থ অভিসারী হচ্ছে $\frac{17}{12}$ এবং তৃতীয় অভিসারী হচ্ছে $\frac{7}{5}$। অতএব এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতীয়রা নিশ্চয়ই বিতত ভগ্নাংশ জানতেন।

$\sqrt{5}$ এর মান নির্ণয় করতে গিয়ে মহর্ষি বলেছেন—

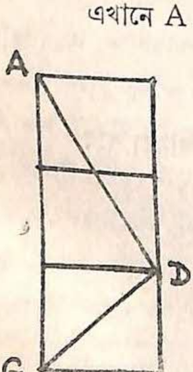
(ক) আয়াম তৃতীয়েন ত্রীনি চতুরস্রণ্যন্থচীনানি কারয়েদপরস্মোত্তরস্যাং শ্রোণ্যাং গার্হপত্যস্তস্যৈব দক্ষিণেঽংসেঽন্বাহার্যপপচন পূর্বসোত্তরেঽংশ আহবনীয়

(খ) অপি বা গার্হপত্যাহবনীয়যোরন্তরালং পংচধা যোঢ়া বা সংভুজ্য ষষ্ঠং সপ্তমং বা ভাগভগন্তকমুপসমস্য সমং ত্রৈধং বিভজ্য পূর্বস্মাহন্ত্যপদ্ দ্বয়োর্ভাগয়োলক্ষণং করোতি। গার্হপত্যাহবনীয়যোরন্তৌ নিয়ম্য লক্ষণেন দক্ষিণাপায়ম্য লক্ষণে শঙ্কু নিহন্তি তদ্দক্ষিণাগ্নেরায়তনং ভবতি।

(গ) অপি বা প্রমাণং পংচমেন বর্ধয়েতসর্ব পংচধা সংভুজ্যা পরস্মাদন্ত্যাদ্ দ্বয়োর্ভাগযোর্লক্ষণং করোতি পৃষ্ঠচান্তয়োঃ পাশৌ প্রতিমুচ্য লক্ষণেন দক্ষিণাপায়স্য লক্ষণে শঙ্কু নিহন্তি তদ্দক্ষিণাগ্নেরায়তনং ভবতি।"

এই শ্লোকগুলিকে যদি গণিতের ভাষায় আলোচনা করা যায় তাহলে নিম্নরূপ হবে:

এখানে A = আহ্বনীয়, G = গার্হপত্য, D = দক্ষিনাগ্নি ধরা হয়েছে



ধরা যাক AG = b. তাহলে সূত্রানুযায়ী পাওয়া যায়

$$AD=\frac{b}{3}\sqrt{5},\ \frac{4}{b}b,\ \frac{7\,b}{9},\ \frac{16}{21}b,\ \frac{18}{25}b,$$

$$BD=\frac{b}{3}\sqrt{2},\ \frac{2}{5}b,\ \frac{7}{18}b,\ \frac{8\,b}{21},\ \frac{12}{25}b,$$

এবং এর ফলে পাওয়া যায়

$\sqrt{5}=2\frac{2}{3},\ 2\frac{1}{3},\ 2\frac{2}{7},\ 2\frac{4}{25}$

$=2\cdot4,\ 2\cdot333\cdots\cdots,\ 2\cdot285\cdots\cdots,\ 2\cdot16.$

$\sqrt{2}=1\cdot2,\ 1\cdot1166\ .\ ,\ 1\cdot44.$

বর্তমান গণনায় $\sqrt{5}=2\cdot23607\cdots\cdots$ এবং

$\sqrt{2}=1\cdot414213\cdots\cdots$ পাওয়া যায়।

মানব শুল্ব সূত্রে অবশ্য $\sqrt{2}$ ইত্যাদি ছাড়াও

$\sqrt{29}$ 5·3888. এবং $\sqrt{61}$ =7·8333 মান দেওয়া হয়েছে।

একথা সত্য যে শুল্ব সূত্রে করণী নির্ণয় করার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি উল্লেখ করা হয় নি। যে সূত্রসমূহ শুল্বসূত্রে দেখা যায় তার উপর ভিত্তি করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একটি নিয়ম খাড়া করেছেন। শুল্বসূত্রে বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রকে বর্গক্ষেত্র প্রভৃতি রূপান্তর এবং আয়তক্ষেত্রের কর্ণের উপর অথবা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত ক্ষেত্রের জ্যামিতিক অঙ্কন থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই অনুমান করেছেন। যেমন ধরা যাক কোন আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল A থেকে একটি বর্গক্ষেত্র যার বাহু a বাদ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে

$$\sqrt{A} = a + \frac{A-a^2}{2a} - \frac{\left(\frac{A-a^2}{2a}\right)^2}{2\left(a+\frac{A-a^2}{2a}\right)}$$

বাক্‌শালীর পাণ্ডুলিপিতে যে সূত্রটি পাওয়া গিয়েছে তাকে আধুনিক গণিতের ভাষায় রূপ দিলে দাঁড়ায়

$$\sqrt{A} = \sqrt{a^2+r} = a + \frac{r}{2a} - \frac{\left(\frac{r}{2a}\right)^2}{2\left(a+\frac{r}{2a}\right)}$$

অবশ্য এই সূত্রটি গ্রাহ্য হবে যদি r<a থেকে ছোট হয়। এল, রডেট বিভিন্ন শুল্বসূত্র পর্যালোচনা করে বলেছেন :

$$\sqrt{a^2+r} = a + \frac{r}{2a+1} + \frac{\frac{r}{2a+1}\left(1-\frac{r}{2a+1}\right)}{2\left(a+\frac{r}{2a+1}\right)} + \epsilon$$

বহু ঐতিহাসিক মনে করেন ভারতীয়রা $\sqrt{2}$ প্রভৃতির অমূলদত্ব জানতেন না। কিন্তু কিন্তু জি থিবো বলেছেন প্রাচীন ভারতীয় গণিত গ্রন্থসমূহ দেখে মনে হয় যে ভারতীয়রা $\sqrt{2}$ প্রভৃতি রাশির অমূলদত্ব জানতেন। ফন শ্রেডার তাঁর প্রবন্ধে এ মতকে সমর্থন জানিয়েছেন। বার্ক শ্রেডারকে অনুসরণ করেছেন। আর গার্বে Philosophy of ancient India গ্রন্থে, ই. ডব্লিউ হপকিনস্ Religion of India গ্রন্থে, এ. এ. ম্যাকডোনেল History of Sanskrit literature গ্রন্থে থিবোর মতকেই সমর্থন

করেছেন কিন্তু অপরপক্ষে এইচ ৎসেনথেন "Theorem de Pythagore, এম. ক্যান্টর über dieälteste indische Mathematik, এইচ ফোগট Haben die alten Indian den Pythagoreisechen Lehrsatz und das Irationale gekannt ?' প্রভৃতি প্রবন্ধ সমূহে এ মতকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন"। এঁদের অনেকেই এ ব্যাপারে গ্রীকদের প্রতি ঝুঁকেছেন। যাঁরাই হউন না কেন, কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারেন না যে গ্রীকরা কখন অমূল্য রাশি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিল। এটি তাদের নিজস্ব আবিষ্কার অথবা ভারতীয় বা বিদেশীদের কাছ থেকে পাওয়া কিনা তা বলা শক্ত। গুরু গোবিন্দ চক্রবর্তী মনে করেন পীথাগোরাস অমূলদ রাশি সম্পর্কে জানতে পারেন বৈদেশিক প্রভাবহেতু।

অমূলদ রাশি সম্পর্কে গ্রীকরা যে জ্যামিতিক প্রমাণ দিয়েছেন মিশরীয়রা, ব্যাবিলনীয় ও ভারতীয়রা তা অন্যভাবে জানতেন। অধ্যাপক টি এরিক পীট রাইন্দ ম্যাথেমেটিক্যাল পেপিরাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মিশরীয়রা $3^2+4^2=5^2$ এর জ্যামিতিক প্রমাণ জানতেন না। 400 খ্রীষ্টপূর্বে ডেমোক্রিটাস Harpendnataus অর্থাৎ rope Strecher সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন এবং এটি সমসূত্র নিরঙ্কুক এর এখানে

$$\epsilon=\frac{\left[r-\left\{\frac{r}{2a+1}+\frac{r}{2a+1}\,\frac{\left(1-\frac{r}{2a+1}\right)}{2\left(a+\frac{r}{2a+1}\right)}\right\}\times\left\{2a+\frac{r}{2a}+\frac{\frac{r}{2a+1}\left(1-\frac{r}{2a+1}\right)}{2\left(a+\frac{r}{2a-1}\right)}\right\}\right]}{2\left\{a+\frac{r}{2a+1}+\frac{\frac{r}{2a+1}\left(1-\frac{r}{2a+1}\right)}{2\left(a+\frac{r}{2a+1}\right)}\right\}}$$

বিভিন্ন বেদী নির্মাণ করতে গিয়ে ভারতীয়রা করণী নিরসন (Rationalisation) পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। বিশেষ করে "সৌত্রামণিকী বেদী" এবং "অশ্বমেধচিতি" নির্মাণ করতে গিয়ে এই পদ্ধতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সৌত্রামণিকী বেদী সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়মের মত দেখতে, এর বাহুগুলি যথাক্রমে $\frac{24}{\sqrt{3}}$, $\frac{30}{\sqrt{3}}$ ও $\frac{36}{\sqrt{3}}$

প্রক্রম ধরা হয়। ঐতিহাসিকেরা বলেন $\frac{24}{\sqrt{3}}=8\sqrt{3}$, $\frac{30}{\sqrt{3}}=10\sqrt{3}$ এবং $\frac{36}{\sqrt{3}}=12\sqrt{3}$ প্রক্রম ভারতীয়রা জানতেন। এবং এরই সাহায্যে সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল ভারতীয়রা বের করেছেন। অর্থাৎ সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল ঃ

$$\frac{36}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2}\left(\frac{24}{\sqrt{3}}+\frac{30}{\sqrt{3}}\right)=324 \text{ ধরা হয়েছে।}$$

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন ভারতীয়রা বিশেষ করে শুল্বসূত্রকারেরা দ্বিকরণী $=\sqrt{2}$, ত্রিকরণী $=\sqrt{3}$, সপ্তকরণী $=\sqrt{7}$, তৃতীয় করণী $=\sqrt{\frac{1}{3}}$, সপ্তম করণী $=\sqrt{\frac{1}{7}}$, অষ্টাদশ করণী $=\sqrt{18}$ প্রভৃতি অর্থ করেছেন।

সমসূত্র নিরঞ্চক শব্দটি বৈদিক যুগে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তাছাড়া অনেকে অনুমান করেন যে পীথাগোরাস যখন ভারতে আসেন সেই সময় হয়তো তিনি ভারতীয়দের কাছ থেকে রাশির অমূলদত্ব জেনে যান। এবং দেশে গিয়ে জ্যামিতিক পদ্ধতির সাহায্যে আলোচনা করেন। অবশ্য ভারতীয়রা পাটী-গণিতীয় অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং সমস্ত কিছু বিগব বিশ্লেষণ করে এটুকু বলা যায় যে ভারতীয়রা স্বাধীনভাবে এবং একান্ত নিজস্ব পদ্ধতিতে রাশির অমূলদত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। এবং তাতে কোন বৈদিশির প্রভাব ছিল না।

৭.৬ ভারতীয় 'মূল' শব্দটিতে আরবীয় প্রভাব একটি কল্পনা-প্রসূত মন্তব্য

বিখ্যাত গণিত ঐতিহাসিক সলোমন গাঁজ[১] অ্যামেরিকান ম্যাথেমেটিক্যাল ম্যান্থলিতে একটি প্রবন্ধে বলেছেন, চীনারা মূল, তৃণলতা এবং গুল্মকে কুণ বলতেন। ভারতীয়রা গাছের শিকড়কে মূল বলতেন। মনে হয় এটি আরবীয় প্রভাব হেতু হয়েছে। প্রথমে এটি চীনাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তারপর চীনাদের কাছ থেকে ভারতীয়রা পায়।

গাঁজ এবং স্মীথ মনে করেন, ইংরাজীতে "root" শব্দটি আরবীয় শব্দ "Jadhr" শব্দ থেকে এসেছে। মূলত Jadhr শব্দটি বর্গভিত্তিক কোন ধারণা থেকে এসেছে। ৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ইবন মুসা অল খোয়ারজমী তাঁর গ্রন্থে "jadhr" শব্দটির সংজ্ঞা

১. On the origin of term 'root' by Solomon Gandz, American Mathematical Monthly, Vol 33 (1926) Pages 261—265 and Vol 35 (1928) Pages 67—75.

অতি সহজভাবে দিয়েছেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, কোন পূর্বসূরী হিব্রু কর্তৃক খোয়ারজমী প্রভাবিত হওয়ার ফলে এটিকে তার গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরবর্তীকালে আরবরা এটির প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হয়েছিলেন। তারপর যখন মধ্যযুগে আরবীয় গ্রন্থগুলি ল্যাটিনে অনূদিত হয় তখন এটির ভুল অর্থ করা হয়। Radix শব্দটি এই ভুলের মাস্থল হিসাবে jadhr শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হতে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন গাঁজ এবং স্মীথ এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে ভারতীয় মূল এবং তৎসংক্রান্ত সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ভারতীয় "মূল" শব্দটি সংখ্যা তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত আছে। মহম্মদ ইবন মূসার প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পূর্বে প্রথম আর্যভট "মূল" শব্দটি ব্যবহার করেন। তাছাড়াও আমরা পূর্বের পরিচ্ছদে দেখেছি বরাহমিহির, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, মহাবীর, দ্বিতীয় আর্যভট, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা মূল শব্দটি ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, ভারতীয়রা মূল শব্দটির কোন সংজ্ঞা দেন নি। এবং প্রথম থেকেই বর্গ, ঘন প্রভৃতির সংজ্ঞা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। এঁরা বলেছেন, দুটি সমরাশির গুণফল বর্গ, তিনটী সমরাশির গুণফল ঘন। এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করার পর ভারতীয় গণিতজ্ঞরা মূলাকর্ষণ (বর্গমূল ও ঘনমূল) করার সূত্র উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে মূল শব্দটি বিপরীত পদ্ধতির প্রত্যক্ষ সহযোগ এসেছে। ব্রহ্মগুপ্ত কোন এক জায়গায় বলেছেন, "পদম্ কৃতির্যত তত" অর্থাৎ কোন বর্গের মূল সেইটি, যেটি বর্গ করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি—ভারতীয়রা রাশির সঙ্গেই "মূল" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অতএব গাঁজের যে অনুমান, ভারতীয় মূল শব্দটিতে আরবীয় প্রভাব রয়েছে তা ভ্রমাত্মক।

মূল শব্দটির সমার্থক 'পদ' শব্দটিও ভারতীয়রা ব্যবহার করেছেন, এবং এটি প্রথম আর্যভট (৪৯৯ খ্রীঃ) ছাড়া প্রত্যেকেই তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিতেরা বহু গবেষণার পর মন্তব্য করেন 'মূল' শব্দটি 'পদ' শব্দ থেকে প্রাচীন।

সংস্কৃত এবং পালি ভাষায় পদের অর্থ পা (step), অংশ, পাশ (side) প্রভৃতি। মনে হয় দাবা খেলার একটী বর্গঘর থেকে পাশ শব্দটি এবং জমির অংশ প্রভৃতি থেকে অংশ শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। মূল শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থ বহন করে। যেমন মূল শব্দের অর্থ ভিত্তি, ভূমি, কারণ, ধার (edge) প্রভৃতি। যাই হোক (মূল এবং পদ শব্দ দুটী নিয়ে ডঃ বিভূতিভূষণ দত্ত ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং সেই আলোচনা

অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক হওয়ায় আমরা এখানে সামান্য কিছু উল্লেখ করে পাঠকদের উক্ত প্রবন্ধটি দেখতে অনুরোধ করি।[১])

প্রথম আর্যভট বর্গ ও ঘনের সংজ্ঞা পাটীগণিতীয় পদ্ধতির পাশাপাশি জ্যামিতিক পদ্ধতিও দিয়েছেন। যেমন সমচতুরস্র=বর্গ, সমদ্বাদশস্র=ঘন প্রভৃতি তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বর্গের মূল নিশ্চয়ই বর্গচিত্র থেকে এবং ঘনের মূল ঘনচিত্র থেকে এসেছে। প্রথম আর্যভটের পর এভাবে ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, মহাবীর, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখ পরবর্তীকালের ভারতীয় গণিতবিদরা দিতে পারেন নি। অবশ্য ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের ভাষ্যকার ও টীকায় পৃথুদকস্বামী এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ডঃ দত্ত দেখিয়েছেন, মহম্মদ ইবন মুসা এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রথম আর্যভটের পুনরাবৃত্তি। যাই হো'ক সমস্ত কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে আমরা বলতে পারি ভারতীয় মূল শব্দটির উপর আরবীয় jadhr শব্দটির প্রভাব নেই।

১. On mula the Hindu term for "Root"—Bibhuti Bhusan Datta—American Mathematical Monthly ; Vol 34, 1972. Pages 420—423.

অষ্টম অধ্যায়

৮.১ ত্রৈরাশিক, ব্যস্তরাশি ও বহুরাশিক

ত্রৈরাশিক ঃ ত্রৈরাশিক শব্দটি বহু আগে থেকেই ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বাকশালীর পাণ্ডুলিপি, আর্যভটীয়, ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, ত্রিশতিকা লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থে ত্রৈরাশিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ অঙ্কের প্রশ্নে ত্রৈরাশিকের ব্যবহার অত্যন্ত সহজ ও সরল হওয়ায় ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে এটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় এবং উচ্চ প্রশংসিত হয়ে স্থান পেয়েছে। তাছাড়াও এর একটি সার্বজনীন প্রয়োগও কিছুটা এজন্য দায়ী। ভারতীয় গণিতবিদেরা ভাবতেন যে, একজন অজ্ঞ লোকও এই ত্রৈরাশিকের ব্যবহার করতে পারে। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলধ্যায়ের প্রশ্নাধ্যায়র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে এ সম্পর্কে সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"অস্তি ত্রৈরাশিকং পাটী বীজং চ বিমলা মতিঃ।
কিমজ্ঞাতং সুবুদ্ধীনামতো মন্দার্থমুচ্যতে ॥ ৩॥
বর্গং বর্গপদং ঘনং ঘনপদং সন্ত্যজ্য যদ্ গণ্যতে
তৎ ত্রৈরাশিকমেব ভেদ বহুলং নান্যৎ ততো বিদ্যতে।
এতদ্ যদ্ বহুধাস্মদাদিজড়ধী ধীবৃদ্ধিবুদ্ধ্যা বুধৈ—
র্বিদ্বচ্চক্রচকোরচারুমতিভিঃ পাটীতি তিন্নির্ম্মিতম্ ॥ ৪ ॥
নৈব বর্ণাত্মকং ন বীজানি পৃথক্ পৃথক্।
একমেব মতির্বীজমনল্প কল্পনা যতঃ ॥ ৫॥"

অর্থাৎ[১] ত্রৈরাশিকই পাটীগণিত, বিমলমতিই বীজগণিত। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কি অজ্ঞাত আছে ? এজন্য অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিগণের বোধের নিমিত্ত বলা হইতেছে।

বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল, ব্যতীত যাহা কিছু গণিত হয়, সকলই নানা ভেদ বিশিষ্ট ত্রৈরাশিক ভিন্ন কিছুই নহে। আমাদিগের ন্যায় অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিগণের বিকাশের জন্যই, চকোরের ন্যায় অতীব বুদ্ধিমান্ জ্যোতির্ব্বিদগণ, নানাবিধ প্রক্রিয়া ভেদ দ্বারা পাটীগণিত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বীজ, বর্ণাত্মক নহে বা পৃথক্ পৃথক্ প্রক্রিয়াত্মকও নহে। একমাত্র বুদ্ধিই বীজ, তাহা হইতেই নানাবিধ কল্পনা হইয়া থাকে।

১। শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ লিখিত ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণির গোলধ্যায়ের প্রশ্নাধ্যায়ের ৩—৫ শ্লোকগুলির অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হোল।

পঞ্চসিদ্ধান্তটীকাতেও বরাহমিহির যা বলেছেন তা থেকে স্পষ্ট বলা যেতে পারে যে ত্রৈরাশিকের সঙ্গে জড়িত অঙ্কের প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ ও সরল।

ত্রৈরাশিক সম্পর্কে প্রথম ভাস্করাচার্য বলেছেন 'মাত্র তিনটি রাশির' প্রয়োজন হেতু এটিকে ত্রৈরাশিক বলা হয়েছে। এই তিনটি রাশি হচ্ছে প্রমাণ, ফল ও ইচ্ছা। অবশ্য দ্বিতীয় আর্যভট বলেছেন মান, বিনিময় ও ইচ্ছা। যাই হো'ক এখন ত্রৈরাশিক সাহায্যে কিভাবে প্রশ্নের সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয়দের পদ্ধতি উল্লেখ করা হ'ল।

প্রথম আর্যভট গণিতপাদে বলেছেন[২]—

ত্রৈরাশিকফলরাশিং তমথেচ্ছারাশিনা হতং কৃত্বা
লব্ধং প্রমাণভজিতং তস্মাদিচ্ছাফলমিদং স্যাত্॥ ২৬

---

১. পঞ্চসিদ্ধান্ত টীকা—বরাহমিহির—(জি থিবো ও সুধাকর ত্রিবেদী কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ) ৪র্থ অধ্যায় (৩৭ শ্লোক)।

২। (ক) ত্রৈরাশিক সম্পর্কে প্রথম আর্যভটের শ্লোকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রথম ভাস্করাচার্য বলেছেন:

ত্রয়ো রাশয়ঃ সমাহৃতাঃ ত্রিরাশিঃ। ত্রিরাশিঃ প্রয়োজনমস্য গণিতস্যেতি ত্রৈরাশিকঃ। ত্রৈরাশিকে ফলরাশিঃ ত্রৈরাশিকফলরাশিঃ। তং ত্রৈরাশিকফলরাশিম্। অথশব্দঃ পরিজ্ঞানবস্তুপরিগ্রহে উত্তরগ্রন্থপ্রতিপাদেন বর্ততে। অত্রৈবংপ্রকারোঽর্থঃ কোঽত্র প্রতিপাদিতঃ? উচ্যতে—পরিভাষা। সা চ লোকব্যবহারাত্ প্রতিবিষয়ং ভিন্নেতি লোক প্রয়োগাদেব প্রদর্শিতা। অন্যথা হি প্রতিবিষয়ং ভিন্নাঃ পরিভাষাঃ বিষয়াশ্চ সংখ্যাতীতাঃ। তেনোপদেষ্টুমশেষতঃ সা ন শক্যতে। অতঃ অথশব্দেন লোকপ্রসিদ্ধাং পরিভাষাং প্রতিপাদয়তি। ইচ্ছারাশিনা হতং কৃত্বা, যোঽসৌ ফলরাশিঃ স ইচ্ছারাশিনা হতঃ ক্রিয়তে, তমিচ্ছারাশিনা হতং গুণিতং কৃত্বা। লব্ধং লব্ধমাপ্তম্। প্রমাণভজিতং প্রমাণরাশিনা ভজিতং প্রমানভাজতম্। তস্মাদেবং-কথমিত্যাহ—প্রমাণভজিতং প্রমাণরাশিনা ভজিতং প্রমানভাজতম্। তস্মাদেবং-কথমিত্যাহ—প্রমাণভজিতাত্। ইচ্ছাফলং ইচ্ছায়াঃ ফলং, ইচ্ছাফলং ইচ্ছারাশিফল-বিধাদ্রাশেঃ প্রমাণভজিতাত্। ইদমিতি লব্ধং প্রত্যক্ষীকৃত্যোক্তম্। [Ā (K.S.S.) গণিতপাদ, পৃঃ ১১৬]

(খ) সূর্যদেব যজন প্রথম আর্যভটের ত্রৈরাশিক সম্পর্কে শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলেছেন:

ত্রিরাশিসাধ্য যদ্ গণিতকর্ম তত্ ত্রৈরাশিকম্। তস্মিন্ ফলরাশিমিচ্ছারাশিনা হতং কৃত্বা তস্মাত্ প্রমাণরাশিনা বিভজ্য লব্ধমিদমিচ্ছাফলং স্যাত্। অত্র হীয়ং বাচোযুক্তিঃ—এতাবদ্ভিরেতাবন্তি লভ্যন্তে এতাবদ্ভিঃ কিয়ন্তীতি। তত্র প্রথমঃ প্রমাণরাশিঃ, দ্বিতীয় ফলরাশিঃ, তৃতীয় ইচ্ছারাশিঃ। তৈশ্চতুর্থো রাশিঃ সাধ্যতে। [Ā (K.V.S.) গণিতপাদ, পৃঃ ৬৫]।

সংক্ষিপ্তভাবে মর্মার্থ হচ্ছে—ত্রৈরাশিকে ফলকে ইচ্ছা দিয়ে গুণ করে প্রমাণ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল হ'বে সেইটিই ইচ্ছার ফল।

এ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্তও উল্লেখ করেছেন। তবে চতুর্বেদাচার্য ব্রহ্মগুপ্তের পদ্ধতিটিকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন ঃ

"ত্রৈরাশিকে প্রমাণং ফলমিচ্ছাত্যন্তয়ো সদৃশরাশী
ইচ্ছাফলেন গুণিতা প্রমাণভক্তা ফলং ভবতি ॥ ১০॥"

(গ) নীলকণ্ঠ সোমসুত্বন প্রথম আর্যভটের এই শ্লোকটির টীকায় বলেছেন ঃ

ইচ্ছাফলপ্রমাণৈস্ত্রিভী রাশিভিঃ সাধ্যং গণিতং ত্রৈরাশিকম্। তত্র যঃ ফলরাশিস্তমিচ্ছারাশিনা হত্বা প্রমাণরাশিনা বিভজ্য তস্মাদ্ যল্লব্ধমিদমিচ্ছাফলং স্যাত্। এতত্‌সংবন্ধিন এতাবন্ত ইতি জ্ঞাতে এতত্‌সংবন্ধিনঃ কিয়ন্ত ইতস্যাং জিজ্ঞাসায়াম্। অস্য গণিতস্যোপয়োগঃ। যথা…………। এবং সর্বত্রাপীচ্ছারাশৌ প্রমাণরাশিতুল্যে ফলরাশিতুল্যমিচ্ছাফলম্। তত্র যদি দ্বিগুণিতেন প্রমাণ রাশিনা তুল্য (মি ? ই) চ্ছারাশিঃ তদা দ্বিগুণেতেন ফলরাশিনা তুল্যমিচ্ছাফলমিত্যপ্যনুমেয়ম্। অনেনৈব ন্যায়েন যয়া সংখ্যয়া গুণিতেন প্রমাণরাশিনা তুল্য ইচ্ছারাশিস্তয়া সংখ্যয়া গুণিতেন ফলরাশিনা তুল্যমিচ্ছাফলমিতি স্থিতম্। সা চ সংখ্যা প্রমাণরাশিনেচ্ছারাশৌ বিভক্তে স্যাত্। ত্বয়া পুনঃ ফলরাশৌ গুণিতে ইচ্ছাফলং স্যাত্। অতঃ সর্বত্রাপি প্রমাণেনেচ্ছাং বিভজ্য তেন ফলে গুণিতে ইচ্ছাফলং স্যাত্। এতদেবাত্রাপি ক্রিয়তে। তত্র যত্ প্রথমং প্রমাণেনেচ্ছায়া হরণং কর্তব্যং তদত্র পশ্চাতক্রিয়তে, তথা কৃতেঽপি ফলবৈষম্যাভাবাদ্, ইত্যেতাবানেব বিশেষঃ। অত এব কেবলেনৈবেচ্ছারাশিনা গুণনং পশ্চাত্ প্রমাণরাশিনা হরণং চোক্তম্। যত্র পুনঃ প্রমাণরাশেন্যূন ইচ্ছারাশিঃ তত্রেচ্ছারাশিনা প্রমাণরাশিং বিভজ্য তেন ফলরাশি বিভক্তে ইচ্ছাফলঃ স্যাত্। তথাহি—অত্রাপি প্রমাণতুল্যায়ামিচ্ছায়াং ফলতুল্যমিচ্ছাফলম্। যদা পুনঃ প্রমাণার্ধতুল্যেচ্ছা তদা ফলার্ধতুল্যমিচ্ছাফলম্। প্রমাণত্র্যংশতুল্যায়ামিচ্ছায়াং ফলত্র্যংশতুল্যমিচ্ছাফলম্। এবং সর্বত্রাপি প্রমাণস্য যাবতাংশেন তুল্যেচ্ছা ফলস্যাপি তাবতাংশেন তুল্যমিচ্ছাফলম্। সা চ সংখ্যেচ্ছয়া প্রমাণে বিভক্তে স্যাত্। ত্বয়া পুনঃ ফলে বিভক্তে ইচ্ছাফলং স্যাত্। অতঃ সর্বত্রাপীচ্ছয়া প্রমাণং বিভজ্য তেন ফলে বিভক্তে ইচ্ছাফলং স্যাদিতি যুক্তম্। তত্র যদিচ্ছয়া প্রমাণস্য হরণং কর্তব্যং তদকৃত্বা কেবলেনৈব প্রমাণেন ফলে বিভক্তে তত্‌ফলমিচ্ছয়া পুনর্গুণনীয়ং ভবতি। কথম্। হারকস্য মহত্ত্বে ফলস্য ন্যূনত্বং ভবতি, ইচ্ছয়া হরণাভাবেনেচ্ছয়া গুণিতত্বমত্র হারকস্য মহত্ত্বম্। অতস্তেন হৃতং ফলমিচ্ছয়া হৃতেন ফলেন তুল্যমেব ভবতি। অতস্তদিচ্ছয়া গুণনীয়া জাতম্। অতঃ প্রমাণেন ফলং বিভজ্যেচ্ছয়া গুণিতে ইচ্ছাফলং স্যাত্ তত্র প্রমাণেন হরণং পশ্চাদপি

মর্মার্থ হচ্ছে, ত্রৈরাশিকে প্রমাণ এবং ইচ্ছা এক জাতীয়। এই দুইটী এবং ইচ্ছা সম্বন্ধীয় ফল ভিন্ন জাতীয়। ফলকে ইচ্ছা দ্বারা গুণ করে গুণফলকে প্রমাণ দিয়ে ভাগ দিলে ইচ্ছা সম্বন্ধীয় ফল পাওয়া যাবে।

চতুর্বেদাচার্য এ সম্পর্কে উদাহরণে বলেছেন—

"শতমষ্টোত্তরং ধেনোয়োদদাতি দিনৈস্ত্রিভিঃ

মাসযুক্তেন সোঽব্দেন কিয়তীর্গাঃ প্রয়চ্ছতি॥"

অর্থাৎ মর্মার্থ হচ্ছে—কোন ব্যক্তি তিন দিনে একশ আটটি গো দান করে তাহলে তিনশ নব্বই দিনে কয়টি গো দান করিবে? সমাধান অবশ্য চতুর্বেদাচার্য করে দিয়েছেন।

"অত্র প্রমাণম্=৩ দিনানি, ফলম্ ১০৮ গাবঃ। ইচ্ছা=১ বর্ষ+১ মাস= ৩৬০ দিন+৩০ দিন=৩৯০ দিনানি।

অত্রাঽনুপাতো যদি কোঽপি ত্রিভির্দিনৈঃ ১০৮ গাবঃ প্রয়চ্ছতি তদা ৩৯০ দিনৈঃ কিয়তীর্গা দদাতি $\frac{১০৮ \times ৩৯০}{৩}$=১৪০৪০=ইচ্ছাফলম্। অত্র প্রমাণমিচ্ছা চ সমান জাতী, ফলং ১০৮ ভিন্নজাতিক ভিতি স্পষ্টমেব দৃশ্যতি।"

অর্থাৎ এখানে ৩ দিন=প্রমাণ, ১০৮=ফল, ৩৯০ দিন ইচ্ছা=১ বৎসর+১ মাস =৩৬০ দিন+৩০ দিন=৩৯০ দিন।

এখানে প্রমাণ এবং ইচ্ছা এক জাতীয় এবং ফল ভিন্ন জাতি। এখন প্রমাণ এবং ফলকে গুণ করে গুণফলকে ইচ্ছা দিয়ে ভাগ দিলে $\frac{১০৮ \times ৩৬০}{৩}$=১৪০৪০ ইচ্ছা ফল হবে।

চতুর্বেদাচার্য এইটি ছাড়াও আরও একটী সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন।

কর্তুংশক্যম্। অত এবেচ্ছয়া ফলং নিহত্য প্রমাণেন হরণমত্রোক্তম্। এবমুভয়থাপীচ্ছয়া ফলে হতে প্রমাণেন বিভক্তে ইচ্ছাফলং ভবতীতি যুক্তম্। অত্র প্রমাণাদধিকায়া মিচ্ছায়াং প্রথমোক্তঃ প্রকারঃ, ন্যূনায়ামপর ইতি (নি) য়মো নাস্তি। উভয়ত্রাপ্যুভয়থা বাসনা দ্রষ্টব্যা। অথবা প্রমাণেন পুনঃ ফলং বিভজ্য তেনচ্ছায়াং গুণিতায়াং ফলেন প্রমাণং বিভজ্য তেনচ্ছয়াং বিভক্তায়াং ইচ্ছাফলং স্যাত্। অত্রাপি বাসনা পূর্বোক্ত-ন্যায়েন দ্রষ্টব্যা। সর্বথাপীচ্ছাফলয়োর্ঘাতঃ প্রমাণেন হর্তব্যো ভবতি। যত্র পুনরিচ্ছায়া বৃদ্ধৌ ফলস্য হ্রাস ইচ্ছায়া হ্রাস বা ফলস্য বৃদ্ধিস্তত্র ব্যস্তত্রৈরাশিকং কর্তব্যম্।...... ... ...

[Ā (K. S.) গণিতপাদ, পৃঃ ২০৫—২০৮]

ত্রিশতিকায় শ্রীধরাচার্য বলেছেন—

আদ্যন্তয়োস্ত্রিরাশাবভিন্নজাতি প্রমাণমিচ্ছা চ
ফলমন্যজাতি মধ্যে তদন্ত্যগুণমাদিমেন ভজেত্ ॥ ২১

মহাবীরাচার্য বলেছেন—

ত্রৈরাশিকেঽত্র সারং ফলমিচ্ছাসঙ্গুণং প্রমাণাপ্তম্।
ইচ্ছাপ্রময়োস্সাম্যে বিপরীতেয়ং ক্রিয়া ব্যস্তে ॥ ৫৮

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন—

প্রমাণমিচ্ছা চ সমানজাতী আদ্যন্তয়োস্তঃ ফলমন্যজাতি।
মধ্যে তদিচ্ছাহতমাদ্যহৃত্যাদিচ্ছাফলং ব্যস্তবিধির্বিলোমে ॥

অবশ্য ইনি এই সঙ্গে প্রচুর উদাহরণ সমাধান করে দিয়েছেন।

ব্যস্ত ত্রৈরাশিকঃ দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ত্রৈরাশিকের মধ্যে ব্যস্ত ত্রৈরাশিক সম্পর্কে সামান্য জুড়ে দিয়েছেন। তাছাড়াও একটী আলাদা শ্লোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে ব্যস্ত ত্রৈরাশিক সম্পর্কে পদ্ধতিগত ভাবে ভারতীয় মধ্যে সম্ভবতঃ ব্রহ্মগুপ্তই প্রথম আলোচনা করেন। তিনি ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের গণিতাধ্যায়ে বলেছেন ঃ

ব্যস্ত ত্রৈরাশিকফলমিচ্ছাভক্তঃ প্রমাণফলঘাতঃ।
ত্রৈরাশিকাদিষু ফলং বিষমেষ্বেকাদশান্তেষু ॥ ১১

অর্থাৎ প্রমাণ এবং ইচ্ছার মধ্যে যেটি ভিন্ন জাতীয় তাকে প্রমাণ দিয়ে গুণ করে ইচ্ছা দিয়ে ভাগ দিলে ব্যস্ত ত্রৈরাশিক পাওয়া যায়। ব্যস্ত ত্রৈরাশিকের উদাহরণ চতুর্বেদাচার্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ষট্সৌবর্ণিকয়া ভারস্তুলয়া সংমিতঃ পুরাঃ।
পংচসৌবর্ণিকায়াস্তু তয়া কিং স্যাদ্বদ স্ফুটম্ ॥

অর্থাৎ যদি ছয়টী স্বর্ণিকের ওজন এক তোলা হয় তবে পাঁচটী স্বর্ণিকের ওজন কত ?

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য লীলাবতীতে বলেছেন ঃ

ইচ্ছাবৃদ্ধৌ ফলে হ্রাসো হ্রাসে বৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
ব্যস্তং ত্রৈরাশিকং তত্র জ্ঞেয়ং গণিতকোবিদৈঃ"

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ সম্পর্কে উদাহরণও দিয়েছেন।

শ্রীধরাচার্য ত্রিশতিকাতে বলেছেন ঃ

"আদিগুণিতেঽন্ত্যভক্তে মধ্যে মানান্তরে ভবতি গণিতম্।"

মহাবীরাচার্য এ সম্পর্কে গণিত সার সংগ্রহে অংলোচনা করেছেন।

বহুরাশিক ঃ বহুরাশিকের ব্যবহার প্রথম আর্যভটের সময় থেকে চলে আসছে। যদিও প্রথম আর্যভট তাঁর গ্রন্থে এ নিয়ে আলোচনা করেননি তথাপি অনেক পণ্ডিত এ মত পোষণ করে থাকেন। প্রথম ভাস্করাচার্য আর্যভটীয়ের ভাষ্য করতে গিয়ে বলেছেন—"এখানে আচার্য আর্যভট শুধু ত্রৈরাশিক সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তাহলে কি করে পঞ্চরাশিক, সপ্তরাশিক, নবরাশিক প্রভৃতির সূত্র জানা যাবে। আমি বলি এইরূপ ঃ আচার্যদেব শুধুমাত্র অনুপাতের প্রাথমিক নিয়ম বলেছেন। অন্যান্যগুলি যেমন পঞ্চরাশিক প্রভৃতি অনুপাতের প্রাথমিক নিয়ম থেকেই করা যায়। কিভাবে? পঞ্চরাশিক দু'টী ত্রৈরাশিকের সাহায্যে, সপ্তরাশিক তিনটী ত্রৈরাশিকের সাহায্যে করা যায়। এইগুলিই আমি উদাহরণে উল্লেখ করবো।"

বহুরাশিক সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন—

ফলংসংক্রমণমুভয়তো বহুরাশিবধোঽল্পবধ হৃতো জ্ঞেয়ম্।
সকলেষ্বেবং ভিন্নেষ্ৃভয়তশ্ছেদসংক্রমণম্ ॥১২

অর্থ নিষ্প্রয়োজন। চতুর্বেদাচার্য অবশ্য ব্রহ্মগুপ্তের ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের টীকা ও ভাষ্য করতে গিয়ে সোজাসুজি পঞ্চরাশিকের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন

শতস্য দশকা বৃদ্ধিস্ত্রিভির্মাসৈর্নিরূপিতা।
পঞ্চমাস প্রযুক্তায়াঃ ষষ্টের্লাভো নিগদ্যতাম্।"

অর্থাৎ তিনমাসের একশ টাকার সুদ দশ টাকা। তাহলে পাঁচ মাসের যাট টাকার সুদ কত?

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে এটি সুদ কষার উদাহরণ হিসাবেও ধরা যেতে পারে।

এটি ধরা হয়েছে এইভাবে,

৩ ১০০ ১০	৫ ৬০	তারপর	৩ ১০০	৫ ৬০ ১০

$$\therefore \quad \text{সুদ} = \frac{৫ \times ৬০ \times ১০}{৩ \times ১০০} = ১০ \text{ টাকা}$$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন ঃ—

পঞ্চসপ্তনবরাশিকাদিকেঽন্যোন্যপক্ষনয়নং ফলচ্ছিদাম্।
সংবিধায় বহুরাশিজে বধে স্বল্পরাশিবধভাজিতে ফলম্ ॥

এছাড়া শ্রীধর ও মহাবীর প্রায় একই কথা বলেছেন।

৮'২ শ্রেঢ়ী

অধুনা যেটিকে "প্রগতি" বলা হয়ে থাকে প্রাচীন ভারতবর্ষে সেটিকে শ্রেঢ়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রেঢ়ী সম্পর্কে ভারতীয়দের চিন্তা ধরতে গেলে বৈদিক যুগ থেকেই ছিল। উদাহরণস্বরূপ অথর্ববেদের কথা বলা যেতে পারে। এখানে বলা হয়েছে :

"যে তে রাত্রি নৃচক্ষসো দ্রষ্টারো নবতির্নব।
অশতিঃ সন্তষ্টা উতো তে সপ্ত সপ্তভিঃ।
ষষ্টিশ্চ ষট্ চ রেবতি পঞ্চাশৎ পঞ্চ সুম্নয়ি।
চত্বারশ্চচত্বারিংশচ্চ ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ বাজিনি।
দ্বৌ চ তে বিংশতিশ্চ তে রাত্রেকাদশাবমাঃ
তেভির্নো অন্ত পায়ুভির্নু পাহি দুহিতর্দিব।"" ১৯।৬।২। ৩-৫

অর্থাৎ হে রাত্রি তোমার ৯৯ জন দ্রষ্টা মানব জাতির প্রতি দৃষ্টি রাখে তাহারা সংখ্যায় ৮৮ বা ৭৭। হে ঐশ্বর্যশালিনী ৬৬, হে সোভাগ্যশালিনী ৪৫, তাহারা ৪৪ এবং ৩৩। তুমি ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ। হে যামিনী তোমার ২২, ১১ এবং আরও ক্ষুদ্রতর সংখ্যা আছে। হে গগণ দুহিতা, এই সকল প্রহরীদের লইয়া তুমি আজ আমাদের রক্ষক।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে সংখ্যাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে ৯৯, ৮৮. ৭৭, ৬৬, ৫৫, ৪৪, ৩৩, ২২, ১১ প্রভৃতি। এটি একটি সমান্তর প্রগতি যার সাধারণ অন্তর ১১।

বিভিন্ন সংহিতাতেও সমান্তর শ্রেণীতে বিভিন্ন সংখ্যা সাজান অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।[১] যেমন তৈত্তিরীয় সংহিতার কথাই ধরা যাক। এখানে যে ভাবে সংখ্যা গুলি উল্লেখ আছে সে গুলি হচ্ছে :

১, ৩, ৫, ৭......১৯,২৯,৩৯,...৯৯,

২, ৪, ৬, ৮,......২০

৪, ৮, ১২,...

১০, ২০, ৩০...

লক্ষ্য করার মত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথম সারিতে সংখ্যাগুলি দুভাবে সাজান আছে। (ক) সমান্তর শ্রেণী যার সাধারণ অন্তর ২, (খ) সমান্তর শ্রেণী যার সাধারণ অন্তর

১. Growth and Development of Progressive series in India—Guru Gobinda Chakravarty. Journal of the Department of letters Vol. XXIV. 1934 Pages 1—18

১০। দ্বিতীয় সারি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এটি একটি সমান্তর প্রগতি যার সাধারণ অন্তর ২। অনুরূপভাবে তৃতীয় ও চতুর্থটি সমান্তর শ্রেণীতে সংখ্যা সাজান রয়েছে।

বাজসনেয় সংহিতাতে দেখতে পাওয়া যায় ঃ

৪, ৮, ১২, ১৬,····· ৪৮,

১, ৩, ৫, ৭,······৩১

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও সংখ্যাগুলি শ্রেণী অনুযায়ী সাজান রয়েছে। যেমন ঃ ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬,···১৯৬৬০৮, ৩৯৩২১৬।

বৃহৎদেবতাতে সমান্তর শ্রেণীর যোগফল পর্যন্ত উল্লেখ আছে। যেমন ঃ

২+৩+৪+···+১০০০=৫০০৪৯৯.

সুতরাং আমরা লক্ষ্য দেখতে পাচ্ছি যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও নানাবিধ ধর্মগ্রন্থে সমান্তর শ্রেণীর সাহায্যে সংখ্যাগুলি উল্লেখিত হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও সমান্তর শ্রেণীর সাহায্যে সংখ্যার উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। বৌদ্ধ সাহিত্য দীঘনিকায়তে মানুষের জীবন বৃদ্ধি সম্পর্কে গণনা করতে গিয়ে নিম্নোক্তরূপে সংখ্যাগুলি সাজান হয়েছে

১০, ২০, ৪০, ···, ৮০০০০,

ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রে ১+২+৩+৪+·········+৮১৯২=১৬৩৮৩ এর কথা উল্লিখিত আছে। নেমীচন্দ্রের ত্রিলোকসারে ১, ৫, ১৩, ২৯, ৬১, ১২৫, ২৫৩ সংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। কতকগুলি বলয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে নেমীচন্দ্র এই সংখ্যাগুলি বলেছেন। দেখা গেছে প্রত্যেকটি বলয়ের দৈর্ঘ্য $a, 2a, 2^2a, \ldots\ldots 2^{n-1}a$।

$\therefore$ ব্যাস $a, (2^2+1)a, (2^3+2^2+1)a$, n তম বলয়ের ব্যাস $a(1+2^2+2^3$

$+\ldots\ldots+2^n)=a2^{n+1}-3a.$

অন্তগড়াদশাওতে সংখ্যাগুলি সমান্তর প্রগতিতে সাজিয়ে তার যোগফল পর্যন্ত নির্ণয় করে দেখানো হয়েছে। যেমন ঃ

৭+১৪+২১+২৮+৩৫+৪২+৪৯=১৯৬

৮+১৬+২৪+৩২+৪০+৪৮+৫৬+৬৪=২৮৮

৯+১৮+২৭+৩৬+৪৫+৫৪+৬৩+৭২+৮১=৪০৫

১০+২০+৩০+৪০+৫০+৬০+৭০+৮০+৯০+১০০=৫৫০

১+২+৩+·········+১০০=৫০৫০

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করলাম যে, সমান্তর প্রগতিতে সংখ্যাগুলির উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রয়েছে। কিন্তু কোনও গ্রন্থে কোন সূত্র বা সংজ্ঞা আলোচিত হয় নাই। ঠিক সুষ্ঠভাবে প্রথম আলোচিত হয় বাকশালীর পাণ্ডুলিপিতে। তারপর আর্যভটীয়, ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত শেখর, লীলাবতী প্রভৃতি ভারতীয় গ্রন্থে আলোচিত হয়। সাধারণতঃ ভারতীয় গণিতগ্রন্থে শ্রেণীকে 'শ্রেঢ়ী' বলেই উল্লেখ করা হত। ব্যতিক্রম শুধু বাকশালীর পাণ্ডুলিপিতে। এখানে শ্রেঢ়ীর পরিবর্তে "বর্গ" শব্দটি উল্লিখিত আছে। তাছাড়াও সংকলিতম্, রূপণাকরণ শব্দটিও দেখতে পাওয়া যায়।

বিখ্যাত গণিত ঐতিহাসিক ক্যে, হের্ণলে প্রমুখেরা মনে করতেন এটি (রূপণ) শেষ পদের আগের পদটি অর্থাৎ ($n-1$)-তম পদটি। কিন্তু বিখ্যাত গণিত ঐতিহাসিক ডঃ বি. বি. দত্ত বলেছেন "রূপণ" শব্দটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞাতরাশি যার নির্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া আছে। সুতরাং "রূপণকরণ" শব্দটির অর্থ হচ্ছে সমগ্র (Summation)। অবশ্য এ মতের সমর্থনের জন্য "রূপণকরণ ফলম্ রূপ" লাইনটির উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। এখানে রূপ=২১ দেখতে পাওয়া যায়। ঘন সংকলিত করতে গিয়ে "পার্থ" শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মনে হয় পার্থক্য শব্দটি পার্থ শব্দটি থেকে উল্লিখিত হয়েছে।

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে প্রথমপদকে আদি বা মুখ্যপদ বলা হয়েছে। শেষ পদকে অন্তপদ বলা হয়েছে। সমান্তর শ্রেণীর মধ্য পদকে মধ্য ধরা হয়েছে। আগেই আমরা দেখেছি যে, অথর্ববেদ, বৃহৎদেবতা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সংখ্যাগুলি সমান্তর শ্রেণীতে সাজান রয়েছে। তবে এদের মধ্যে কোনটিতেই সমান্তর শ্রেণী সম্পর্কে সূত্রগুলির উল্লেখ নেই। ঠিক পদ্ধতিগতভাবে প্রথম আর্যভটের আর্যভটীয়তে এইগুলি আলোচিত হ'তে দেখা যায়। আর্যভটীয়ের গণিতপাদের ১৯তম শ্লোকে বলা হয়েছে :—

"ইষ্ট্যং ব্যেকং দলিতং সপূর্বমুত্তরগুণং সমুখংমধ্যম্।
ইষ্টগুণিতমিষ্টধনং ত্বথবাঽহদ্যন্তং পদার্ধহতম্ ॥২২

এই শ্লোকটির মর্মার্থকে সূত্রে রূপ দিলে দাঁড়ায়—

মর্মার্থ হচ্ছে : পদসংখ্যা ($=n$) থেকে 1 বাদ দাও, তারপর 2 দিয়ে ভাগ দাও। তারপর পূর্ব্বের পদসংখ্যা যোগ কর (যদি অবশ্য থেকে থাকে) তারপর সাধারণ অন্তর দিয়ে গুণ কর, তারপর প্রথম পদ যোগ কর। তাহলে এই ফল সমান্তর মধ্যক পাওয়া যাবে। এটিকে পদসংখ্যা ($=n$) দিয়ে গুণ করলে সমগ্র

শ্রেণীর অন্তর্গত সংখ্যাসমূহের পাওয়া যাবে। অন্যভাবে বলা যায় প্রথম এবং শেষ পদের যোগফলকে পদসংখ্যার অর্ধেক দিয়ে গুণ করলে শ্রেঢ়ীস্থ সংখ্যার যোগফল পাওয়া যাবে।

এটি ব্যাখ্যা করার পুর্বে এ সম্পর্কে প্রথম ভাস্করাচার্যের ভাষ্যটি অনুধাবন করা যাক। প্রথম ভাস্করাচার্য বলেছেন ঃ

অত্র বহ্নি স্থত্রাণি মুস্তকব্যবস্থিতানি, তেষাং যথাসংযোগং সম্বন্ধঃ। 'ইষ্টং ব্যেকং দলিতমুত্তরগুণং সমুখম্' ইতি মধ্যধনা নয়নার্থং স্থত্রম্। 'মধ্যমিষ্টগুণিতমিষ্টধনম্' ইতি গচ্ছধনানয়নার্থম্। 'ইষ্টং ব্যেকং সপূর্বমুত্তরগুণং সমুখম্' ইত্যন্ত্যোপান্ত্যাদিধনা-নয়নার্থম্। 'ইষ্ট ব্যেকং দলিতং সপূর্বমুত্তরগুণং সমুখমিষ্টগুণিতমিষ্টধনম্' ইত্যবান্তর-যথেষ্টপদসংখ্যানয়নার্থম্। এবমেতানি পাদোনয়াঽহর্যয়া প্রতিবদ্ধানি। তানি যথাক্রমেণোদ্দেশকেষ্বেব প্রতিপাদয়িষ্যামঃ।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, যদি সমান্তর শ্রেণী (শ্রেঢ়ী) এইরূপ থাকে $a+(a+d)+\ldots\ \ldots$ তাহলে বলা হয়েছে,

(ক) $(a+pd)(a+\overline{p+1}d)+\cdots\cdots+(a+\overline{p+n-1}d)$ এই n তম পদের সমান্তর মধ্যক হবে

$$a+\left(\frac{n-1}{2}+p\right)d\cdots\cdots$$

(খ) $(a+p.)+(a+\overline{p+1}d)+\cdots\cdots+(a+\overline{p+n-1}d)$ এই n পদ সমষ্টির যোগফল হবে

$$n\left\{a+\left(\frac{n-1}{2}+p\right)d\right\}$$

এখন যদি $p=0$ ধরা হয়, তাহলে

(গ) $a+(a+d)-1\cdots\cdots\{a+(n-1)d\}$ এই শ্রেণীটির সমান্তর মধ্যক হবে

$$a+\frac{n-1}{2}d$$

(ঘ) পদ সমষ্টির যোগফল হবে $n\left\{a+\frac{n-1}{2}d\right\}$

(ঙ) যদি F প্রথম পদ হয় এবং L যদি শেষপদ হয় পদ সমষ্টির যোগফল হবে

$$\frac{n}{2}(\mathrm{F}+\mathrm{L}).$$

ত্রিলোকসারে $1+2+3+\cdots\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$ এর উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। অবশ্য ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে চ্যাং-চিন-চেন লিখিত সুয়ান সুতে $S=\frac{n}{2}(a+b)$ সূত্রটি দেখতে পাওয়া যায়।

আর্যভট গণিতপাদের ২০তম শ্লোকে n-তম পদ নির্ণয় করার সূত্রটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—

গচ্ছোঽষ্টোত্তরগুণিতদ্দ্বিগুণাদ্যুত্তরবিশেষবর্গযুতাত্।
মূলং দ্বিগুণাদ্যূনং স্বোত্তরভাজিতং সরূপার্ধম্ ॥ ২০।

পদসংখ্যা নির্ণয় করতে হবে এইভাবে ঃ সাধারণ অন্তরকে আটগুণ করে তাকে যোগফল দিয়ে গুণ কর, তারপর প্রথম পদের দ্বিগুণের সঙ্গে সাধারণ অন্তর বিয়োগ করে তার বর্গ যোগ কর এবং মূল লও। তারপর প্রথম পদের দ্বিগুণ বিয়োগ কর এবং এই বিয়োগফলকে সাধারণ অন্তর দিয়ে ভাগ দাও তারপর এক যোগ কর। তারপর সমগ্র ফলটির অর্ধেক লও।

এটির মর্মার্থ থেকে সূত্র রূপে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়

$$n=\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{8bs+(2a-b)^2}-2a}{b}+1\right)$$

মহাবীর তাঁর লিখিত গণিতসার সংগ্রহে প্রথম পদ ও সাধারণ পদ বের করবার সূত্র দিয়েছেন। তার সূত্রে বলা হয়েছে

$$\text{প্রথম পদ}=\frac{s-\frac{n(n-1)}{2}\mathrm{b}}{n}=\frac{\mathrm{s}}{n}-\frac{(n-1)}{2}b=\frac{\frac{2s}{n}-(n-1)b}{2}$$

$$\text{সাধারণ অন্তর}=\frac{s-na}{\frac{n^2-n}{2}}=\frac{\frac{s}{n}-a}{\frac{n-1}{2}}=\frac{\frac{2s}{n}-2a}{n-2}$$

মহাবীরের কতকগুলি বিশেষ ধরণের শ্লোকে এমন কতকগুলি সূত্র পাওয়া গেছে যার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব অসীম। তিনি বলেছেন—

$a_1=\frac{s_1a}{s}$, $b_1=\frac{s_1b}{s}$

এছাড়াও বলেছেন—

রাশোরেকাংশয়োশ্ছেদৌ কৌ ভবেতাং তয়োর্যুতিঃ
ষোড়শো দশা ভাগো বা ব্রূহি ত্বং গণিতার্থবিত ॥

শ্লোকটির মমার্থ স্থত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়

$a_1 = n\,(n-1)p - 2n_1$ এবং $b = (n_1)^2 - n_1 - 2pn$

a = প্রথম পদ, b = সাধারণ অন্তর, n = প্রথমশ্রেণীর পদসংখ্যা

n_1 = দ্বিতীয় শ্রেণীর পদসংখ্যা, p = ছুটি শ্রেণীর যোগফলের অনুপাত।

আর্যভট (৪৭৬ খ্রীঃ) গণিতপাদের ২১ তম শ্লোকে বলেছেন :

একোত্তরাদ্যুপচিতের্গচ্ছাদ্যেকোত্তরত্রিসংবর্গঃ

ষড়্‌ভক্তঃ স চিতিঘনঃ সৈকপদঘনো বিমূলো বা ॥

আধুনিক গণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে হবে

$$s_1 + s_2 \cdots\cdots + s_n = \frac{n(n+1)\ (n+2)}{6} = \frac{(n+1)^3 - (n-1)}{6}$$

এখানে $s_r = (1+2+\cdots\cdots+r)$

অবশ্য মহাবীর গণিতসার সংগ্রহের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩০৫½ শ্লোকে যা বলেছেন তার মমার্থ হচ্ছে

$s_a + s_a + b + s_a + 2b + \cdots\cdots + n$ তম পদ

$$= \frac{n}{2}\left[\left\{\frac{(2n-1)\,b^2}{6} + \frac{b}{2} + ab\right\}\ (n+1) + a(a+1)\right]$$

$S_\infty = a + (a+b) + \ldots\ldots +$ n পদ পর্যন্ত

মহাবীর অবশ্য নিম্নোক্ত চার ধরণের সমান্তর শ্রেণীর যোগফলের উল্লেখ করেছেন

(১) n-তম স্বাভাবিক সংখ্যাদির যোগফল

(২) $1^2 + 2^2 + \ldots\ldots + n^2$

(৩) $1^3 + 2^3 + \ldots\ldots + n^3$

(৪) এযামৈক্যানি অর্থাৎ 1, 2,......9

এদের যথাক্রমে সমষ্টি 1, 3, 6, 10, 15, 21, 25, 36, 45

এদের সমষ্টি যথাক্রমে 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165

আর্যভট (৪৭৬ খ্রীঃ) গণিতপদের ২২-তম শ্লোকে যা বলেছেন তার মমার্থ হচ্ছে[১]

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots\ldots + n^2 = \frac{n(n+1)\ (2n+1)}{6}$$

এবং $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots\ldots + n^3 = (1+2+3+\ldots\ldots+n)^2$

১। সৈক সগচ্ছ পদানাং ক্রমাত্‌ ত্রিসংবর্গিতস্য ষষ্ঠোংশঃ বর্গচিতিঘনঃ স ভবেত্‌, চিতিবর্গো ঘনচিতিঘনশ্চ।

গ্রীকেরা অবশ্য

$$3\{a^2+(2a)^2+(3a)^2+\cdots\cdots+(na)^2\}=(n+1)\,(na)^2+a\{a+2a+\cdots na\}$$

এবং এদের যোগফল নির্ণয় করতে সক্ষম। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এই সূত্রে $a=1$ বসালে প্রথম আর্যভটের সূত্রটি পাওয়া যাবে।

আর্যভট অবশ্য $1^3+2^3+\ldots+10^3=(\frac{1}{2}\,10.11)^2$ বলেছেন, তবে ইটালীর বিখ্যাত গণিতবিদ ফিবোনাচ্চি একাদশ শতাব্দীতে এ সম্পর্কে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সূত্র দেন। এই সূত্রটি হচ্ছে

$$1^3+2^3+\cdots\cdots+n^3=\{\tfrac{1}{2}\,n(n+1)\}^2$$

মহাবীর গণিতসার সংগ্রহের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যা বলেছেন তার মর্মার্থ হচ্ছে

$$a^2+(a+b)^2+(a+2b)^2+\ldots\ldots+n\text{-তম পদ}$$

$$=n\left[\left\{\frac{(2n-1)\,b^2}{6}+ab\right\}(n-a)+a^2\right]$$

এবং $a^3+(a+b)^3+(a+2b)^3+\cdots\cdots+n$-তম পদ পর্যন্ত

$=s^2b+sa\,(a-b)$ যদি $a>b$ হয়

অথবা $s^2b-sa\,(a-b)$ যদি $a<b$ হয়

এখানে $s=a+(a+b)+(a+2b)+\cdots\cdots+n$-তম পদ পর্যন্ত

প্রথম আর্যভট, মহাবীর, প্রমুখেরা সমান্তর শ্রেণী সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তার চেয়ে অনেক সুশৃঙ্খলভাবে ব্রহ্মগুপ্ত এবং দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য আলোচনা করেছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের গণিতাধ্যায়ের ১৭ নং সূত্রে বলেছেন

"পদমেকহীনমুত্তরগুণিতং সংযুক্তমাদিনা হন্ত্যধনম্।

আদিযুতান্ত্যধনার্ধং মধ্যধনং পদগুণনং গণিতম্"।

অর্থাৎ প্রথমপদ, সাধারণ অন্তর এবং পদসংখ্যা জানা থাকলে শেষপদ কত সংখ্যা, মধ্যপদ কত সংখ্যা এবং যে কোন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করা যেতে পারে। পদসংখ্যা থেকে এক বিয়োগ করে ঐ বিয়োগফলকে সাধারণ অন্তর দিয়ে গুণ করে তারপর প্রথম পদ যোগ করলে শেষ পদ পাওয়া যাবে। এই শেষপদের সঙ্গে প্রথম পদ আবার যোগ দিয়ে তারপর দুই দিয়ে ভাগ দিলে মধ্যপদ পাওয়া যাবে। এই মধ্যপদকে পদ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সমগ্র পদের সমষ্টি পাওয়া যাবে।

অর্থাৎ আধুনিক গণিতের ভাষায় বলতে গেলে

$$t_n=a+(n-1)b,\quad t_k=\frac{2a+(n-1)\,b}{2},\quad S_n=\frac{n}{2}\{2a+(n-1)b\}$$

এখানে $t_n = n$-তম পদ, a প্রথম পদ, b সাধারণ অন্তর, t_k = মধ্যম পদ।

$S_n = n$ সংখ্যক পদের সমষ্টি।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন ঃ

যথোত্তরচয়েঽন্ত্যাদিধনজ্ঞানায় করণসূত্রং বৃত্তম্। ব্যৈকপদঘ্নচয়ো মুখযুক্ স্যাদন্ত্যধনং মুখধুগ্দলিতং তত্। মধ্যধনং পদসঙ্গুণিতং তত্সর্বধনং গণিতজ্ঞ তদুক্তম্।

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

আদ্যে দিনে দ্রম্মচতুষ্টয়ং যো দত্বা দ্বিজেভ্যোঽনুদিনং প্রবৃত্তঃ।

দাতুং সখে পঞ্চয়েন পক্ষে দ্রম্মা বদ দ্রাক্কতি তেন দত্তা ॥

অর্থাৎ যদি কোন লোক কোন ব্রাহ্মণকে প্রথমদিন চার দ্রম্ম এবং প্রত্যেকদিন পাঁচটি করে দ্রম্ম বেশী দিতে থাকে তাহলে একপক্ষ দিনকালে ঐ লোক কত দ্রম্ম দান করেছিল ?

এখানে প্রথমপদ = 4, সাধারণ অন্তর = 5, পদসংখ্যা = n

$\therefore$ দ্রম্ম সংখ্যা $= \frac{15}{2}\{2.4+(15-1)5\}$

$= \frac{15}{2}\{8+70\}$

$= \frac{15 \times \overset{39}{\cancel{78}}}{\cancel{2}} = 585$

পদসংখ্যা নির্ণয় করার পদ্ধতি ব্রহ্মগুপ্ত ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

উত্তরহীন দ্বিগুণাদিশেষবর্গং ধনোত্তরাষ্টবধে।

প্রক্ষিপ্য পদং শেষোণং দ্বিগুণোত্তরহৃতং গচ্ছঃ।১৮

অর্থাৎ প্রথম পদের দ্বিগুণের সঙ্গে সাধারণ অন্তর বিয়োগ করে যে শেষ থাকে তার বর্গ লও তৎপর পদসমষ্টির যোগফলের সঙ্গে আটগুণ সাধারণ অন্তর গুণ করে যোগ কর। তারপর এদের মূল লও। এই মূল থেকে শেষ বিয়োগ দাও সর্বশেষে এই বিয়োগফলকে সাধারণ অন্তরের দুগুণ দিয়ে ভাগ দাও।

$$n = \frac{-(2a-b)+\sqrt{(2a-b)^2+8sb}}{2b}$$ এই সূত্রটি

পদ সংখ্যা নির্ণয় করার একটি সুন্দর উদাহরণ বিখ্যাত টীকাকার চতুর্বেদাচার্য পৃথুদকস্বামী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"মুখে দশেষ্টকা যত্র পংচ পংচাধিকাশ্চ যে।

ইষ্টকানাং শতং লগ্ন চিতৌ তত্র পদংবদ ॥"

অর্থাৎ কোন চিতির (ভাটা) মুখে দশটি ইট থাকে এবং পাঁচ পাঁচ করে বৃদ্ধি করার ফলে মোট একশ ইট লাগে। তাহলে পদসংখ্যা কত ? পৃথুদকস্বামী ব্রহ্মগুপ্তের সূত্রানুযায়ী সমাধান করেছেন। তিনি বলেছেন :

প্রথম পদ $=10(=a)$, সাধারণ অন্তর $=5(=b)$, পদ সংখ্যার সমষ্টি $=100(=s)$.

$2\times$ প্রথম পদ $-$ সাধারণ অন্তর $=$ শেষ $=2\times10-5=20-5=15$.

$(\text{শেষ})^2=(15)^2=225$.

$4\times$ পদ সংখ্যার সমষ্টি $\times$ সাধারণ অন্তর $=4\times100\times5=4000$.

$\therefore$ $4\times$ পদ সংখ্যার সমষ্টি $\times$ সাধারণ অন্তর $+(\text{শেষ})^2=4000+225=4225$ এর মূল $=65$.

$$\frac{\text{মূল} - \text{শেষ}}{2\times \text{সাধারণ অন্তর}}=\frac{65-15}{2\times 5}=5$$

$\therefore$ পদসংখ্যা $=5$.

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য যে উদাহরণটি লীলাবতীতে দিয়েছেন সেটি হচ্ছে—

"দ্রম্মত্রয়ং যঃ প্রথমেঽহি দত্বা দাতুং প্রবৃত্তো দ্বিচয়েন তেন। শতত্রয়ং ষষ্ঠ্যধিকং দ্বিজেভ্যো দত্তং কিয়দ্ভির্দিবসৈর্বদাশু॥"

অর্থাৎ কোন লোক প্রথম দিনে কোন পুরোহিতকে তিন দ্রম্ম দান করিল। তারপর প্রতিদিন দুই দ্রম্ম করে বেশী দিতে থাকায় তার তিনশ দ্রম্ম দিতে হল। তাকে কতদিনে এতগুলি দ্রম্ম দিতে হয়েছিল ?

কোন প্রগতি 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 দেওয়া আছে। নূতন প্রগতি যেটি পূর্বের প্রগতি থেকে পাওয়া যায় অর্থাৎ 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 এবং 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165 প্রভৃতি শ্রেণীর যোগফল সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন—

"সৈকপদঘ্নপদার্দ্ধমথৈকাদ্যঙ্কযুতিঃ কিল সঙ্কলিতাখ্যা।
সা দ্বিযুতেন পদেন বিনিঘ্নী স্যাত্ ত্রিহৃতা খলু সংকলিতম্॥'

অর্থাৎ পদ সংখ্যার সঙ্গে এক যোগ কর। তারপর পদসংখ্যার অর্ধেক দিয়ে গুণ কর। তাহ'লে একাদি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি পাবে। তাপর পদসংখ্যার সঙ্গে দুই যোগ করে পূর্বোক্ত ফলকে গুণ করে তিন দিয়ে ভাগ দিলে, যোগফল সমষ্টির গুচ্ছ পাওয়া যাবে।

$1^2+2^2+3^2+\cdots\cdots+n^2$ এবং $1^3+2^3+\cdots\cdots n^3$ প্রভৃতি স্বাভাবিক

সংখ্যার বর্গ এবং ঘন'র যোগ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত এবং দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন—

দ্বিঘ্নপদং কুযুতং ত্রিবিভক্তং সঙ্কলিতেন হতং কৃতিযোগঃ।
সঙ্কলিতস্য কৃতেঃ সমমেকাদ্যঙ্কঘনৈক্যমুদীরিতমদ্যৈঃ

অর্থাৎ মর্মার্থ হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গযোগ নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে পদ-সংখ্যার দ্বিগুণ করে এক যোগ কর এবং তিন দিয়ে ভাগ দাও তারপর স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফলের সমষ্টি দিয়ে গুণ করলে উক্ত সমষ্টি পাওয়া যাবে এবং স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টির বর্গ করলে স্বাভাবিক সংখ্যাগুলির ঘন সমষ্টি পাওয়া যাবে।

এ প্রসঙ্গে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন—

দ্বিগুণপদসৈকগুণিতং তত্ ত্রিহৃতং ভবতি বর্গসংঙ্কলিতম্।
ঘনসংঙ্কলিতং তত্কৃতিরেষাং সমগোলকৈশ্চিতয়ঃ ॥

গুণোত্তর শ্রেণীর ব্যবহার আমরা চার'শ খ্রীষ্টপূর্বে দেখতে পাই। পিঙ্গলের ছন্দসূত্রে $1^3, 2^3, 3^3$......প্রভৃতি সংখ্যার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য ছন্দসূত্রে দু'ধরণের নিয়মের উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। সহগগুলি ত্রিভুজাকৃতি করে সাজান আছে। আমরা সাধারণত পাস্কালের ত্রিভুজ বলে জানি সেটি এই ছন্দসূত্রে কিছুটা অমার্জিত অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। বহু পণ্ডিত অনুমান করেন আরবীয় গণিত-বিদেরা ভারতে এবং চীনের কোন জায়গা থেকে এটি নিয়ে যায় পরে এটি ইউরোপে প্রচলিত হয়।

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 7

দ্বিতীয় নিয়মটি হচ্ছে $\dfrac{ar^n - a}{r-1}$

অবশ্য ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের বিখ্যাত টীকাকার পৃথুদকস্বামী দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনুসরণ করেছেন। মহাবীর, নেমীচন্দ্র প্রমুখ গণিতবিদেরাও এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন।

মহাবীর গণিতসারসংগ্রহে সাধারণ অন্তর, প্রথম পদ ও পদসংখ্যা বের করতে গিয়ে তিনটি সূত্র দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯৭ এবং ১০১ শ্লোকে বলেছেন—

গুণধনমাদিবিভক্তং যত্‌পদ নিতবধসমং স এব চয়ঃ
গচ্ছপ্রমগুণপ্রহৃতং গুণিতং ভবেত্‌ প্রভবঃ।

যার সংক্ষিপ্ত মমার্থ হচ্ছে—

$$\frac{a(r^n-1)}{r-1} \div a = \frac{r^n-1}{r-1} \text{ এবং } \frac{r^n-1}{r-1} - 1 = \frac{r^n-r}{r-1}$$

$$\text{এবং } a = \frac{a(r^n-1)}{r-1} \times \frac{r-1}{r^n-1}$$

পদসংখ্যা নির্ণয় করবার সূত্র ৯৮ তম শ্লোকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—

মুখভক্তে গুণবিত্তে যথা নিরগ্রং তথা গুণনেহৃতে
যাবত্‌যোঽত্র শলাকাস্তাবান্‌ গচ্ছো গুণধনস্য ॥

মহাবীরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে গুণোত্তর শ্রেণীর যোগফল নির্ণয় করা। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১৪-তম শ্লোকে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

গুণচিতিরন্ত্যাদিহৃতা বিপদাধিকহীন সংগুণা ভক্তা
ব্যেকগুণেনাদ্যা ফলরহিতা হীনেঽধিকে ফলযুক্তা ॥

যার মমার্থ হচ্ছে—

$a+(ar\pm m)+\{(ar\pm m)r\pm m\}+[\{(ar\pm m)r+m\}r\pm m]+\ldots\ldots\ldots$
$+\ldots\ldots\ldots+n$-তম পদ।

$$=s' \pm \frac{\left(\frac{s'}{a}-r\right)^m}{r-1}$$

$s'=a+ar+ar^2+\ldots\ldots\ldots+n$-তম পদ।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য গুণোত্তর শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করলেও কিছুটা অস্পষ্ট এবং প্রকৃত সূত্রের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে তিনি কিছু উদাহরণ দিয়েছেন।

বাক্‌শালীর পাণ্ডুলিপিতেও শ্রেণীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[১] যেমন ঃ

১ (ক). $a_1+2a_1+3a_1+\ldots\ldots\ldots+na_1$

২ (খ). $a_1+2a_1+3a_2+4a_3\ldots\ldots+na_{n-1}$

৩ (গ). $a_1+2a_1+3(a_1+a_2)+4(a_1+a_2+a_3)+\ldots\ldots$

(১) Folio 24 verso, (২) 23 recto, (৩) 23 recto and verso,

এই প্রক্রিয়াকে যুতিবর্গক্রম বলা হয়েছে। (ক), (খ) ও (গ) এবং

$b+(b+d)+(b+2d)+\cdots\cdots$ সাহায্য নিয়ে নিম্নোক্ত শ্রেণী গঠিত হয়েছে।[১]

৪ (ঘ). $a_1+(2a_1\pm b)+3a_1\pm(b+d)+4a_1\pm(b+2d)+\cdots\cdots$

৫ (ঙ). $a_1+(2a_1+b)-\{3a_2+(b+d)\}+\{4a_3+(b+2d)\}+\cdots\cdots$

৬ (চ). $a_1+(2a_1+b)+\{3(a_1-a_2)(\pm b+d)\}+\{4(a_1+a_2+a_3)$
$\pm(b+2d)$

এগুলিকে সাধারণত যুতগণিত ঋণকর্মের যুতকর্ম বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও ভারতীয় অন্যান্য গণিতগ্রন্থে শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যাই হ'ক আমরা লক্ষ্য করলাম যে বৈদিক সাহিত্যে যুগ্ম ও অযুগ্ম সংখ্যাজাত শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। তারপর শ্রেণী সম্পর্কে ভারতীয় গণিতবিদেরা আরও বেশী চিন্তা-ভাবনা করার ফলে আরও নানা ধরণের শ্রেণীর সাক্ষাৎ মিলতে থাকে। এ সম্পর্কে নবম শতাব্দীতে নেমীচন্দ্র লিখিত ত্রিলোকসারে ১৪ ধরণের শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

(১) সর্ব অর্থাৎ $1, 2, 3 \ldots \ldots n$ স্বাভাবিক সংখ্যাদির শ্রেণী

(২) সম অর্থাৎ $2, 4, 6 \ldots \quad 2n$ সংখ্যাদির শ্রেণী

(৩) বিষম অর্থাৎ $1, 3, 5 \ldots \cdots (2n-1)$ সংখ্যাদির শ্রেণী

(৪) কৃতি অর্থাৎ $1^2, 2^2, 3^2 \ldots \ldots n^2$ সংখ্যাদির শ্রেণী

(৫) অকৃতি, অবর্গ অর্থাৎ $2, 3, 5, 6 \cdots \cdots (n-1)$ সংখ্যাদির শ্রেণী

(৬) ঘন অর্থাৎ $1^3, 2^3, 3^3, 4^3 \ldots \quad n^3$ সংখ্যাদির শ্রেণী

(৭) অঘন অর্থাৎ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 অর্থাৎ ঘনমূল করা যায় এমন সংখ্যা বাদ দিয়ে অন্যান্য সংখ্যা।

(৮) কৃতিমাতৃকা অর্থাৎ $1, 2 \cdots \cdots \sqrt{n}$ সংখ্যাদির শ্রেণী

(৯) অকৃতিমাতৃকা অর্থাৎ $\sqrt{n}+1, \sqrt{n}+2 \ldots \ldots$ সংখ্যাদির শ্রেণী

(১০) ঘনমাতৃক

(১১) অঘনমাতৃক অর্থাৎ অঘ$+1$, অঘ$+2$, ... সংখ্যাদির শ্রেণী

(১২) দ্বিরূপবর্গ অর্থাৎ $2^2, 2^4, 2^8, 2^{16}, 2^{32}$ সংখ্যাদির শ্রেণী

(১৩) দ্বিরূপঘন অর্থাৎ $2^3, (2^3)^2, (2^3)^4, (2^3)^8, (2^3)^{16}$ সংখ্যাদির শ্রেণী

(১৪) দ্বিরূপঘন ঘন অর্থাৎ $(2^3)^3=512$, $((2^3)^3)^2=262144$ সংখ্যাদির শ্রেণী

(৪) 25 verso and 26 recto, (৫) 24 recto, (৬) 24 verso and 24 recto.

৮.৩ সমবায় ও বিন্যাস :

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে সমবায় ও বিন্যাসের অন্তর্ভুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বহু ঐতিহাসিক অবশ্য এ ব্যাপারে ভারতীয়দের দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ডি. ই. স্মীথ তাঁর হিস্ট্রী অব ম্যাথেমেটিকস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের পূর্বে ভারতীয়রা এ ব্যাপারে কিছু জানতেন সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গিয়েছেন। যাঁরা বৈদিক ছন্দ এবং স্বর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাঁরাই জানেন যে বৈদিকছন্দের সঙ্গেই এগুলির উৎপত্তি বা আবির্ভাব ঘটেছিল। দুইশত খ্রীষ্টপূর্বের আগে পিঙ্গলের ছন্দসূত্রে ছন্দ, যতি, মিল প্রভৃতির আলোচনায় সমবায় ও বিন্যাসের সাক্ষাৎ মেলে।

এটি অধিগত করার পর ভারতীয়দের বিভিন্ন শাস্ত্রে এর মূল সূত্র প্রযোগ করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুশ্রুতের সুশ্রুত সংহিতার কথা বলা যেতে পারে। এখানে একজায়গায় বলা হয়েছে ছয়টি স্বাদ একযোগে একটি, দুটি, তিনটি,……ছয়টি করে নিলে 63 রকমের স্বাদ পাওয়া যাবে। তিনশত খ্রীষ্টপূর্বে লিখিত ভগবতীসূত্রে একজায়গায় বলা হয়েছে n সংখ্যক বস্তু থেকে একযোগে একটি, দুটি, …..প্রভৃতি তুলে নিলে সমবায় সংখ্যাগুলি কত হবে। জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, অনুযোগদ্বার সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বিন্যাস ও সমবায়ের সূত্র পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতাতে

$^{n}p_r = n(n-1)(n-2)\ldots\ldots(n-r+1)$ এবং

$$^{n}c_r = \frac{n(n-1)\cdots\cdots(n-r+1)}{1.2.3.4\cdots\cdots r}$$

সূত্রগুলি পাওয়া গিয়েছে। বরাহমিহিরের এই গ্রন্থে ষোলটি গন্ধ একযোগে একটি, দু'টি, তিনটি ও চারটি নিলে 174720টি পাওয়া যাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহজ্জাতকে গ্রহের যুতি (conjunction) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উপর্যুক্ত সূত্রাদি প্রয়োগ করা হয়েছে। সাধারণত ভারতীয়রা সমবায়কে বিকল্প, ভঙ্গ প্রভৃতি নাম দিয়েছেন "বিকল্প" কথাটি ছয়শত খ্রীষ্ট পূর্বে লিখিত সুশ্রুত সংহিতাতে পাওয়া যায়। বর্তমানে সমবায় ও বিন্যাসে আমরা একযোগ একটি, একযোগে দুটি প্রভৃতি বলে থাকি, এগুলি ভারতীয়রা বলতেন একসংযোগ, দ্বিকসংযোগ, ত্রিক সংযোগ প্রভৃতি।

সুশ্রুতের ৬৩ তম অধ্যায় অর্থাৎ রসবেদ বিকল্পধ্যায়ের একজায়গায় বলা হয়েছে—ছয়টি বিভিন্ন স্বাদের বস্তু একযোগে দুটি করে নিলে পনেরো রকমের স্বাদ পাওয়া যাবে। এগুলি পাওয়া যাবে এইভাবে[১]

১. দ্রষ্টব্য—Growth and development of Permutations and Combinations in India-by Gurugobinda Chakravarty—Bull. Cal. Math Soc ; Vol 24 (1982) Page 79

মধুর স্বাদের সঙ্গে	(১)	মধুর+এ্যাসিড
	(২)	মধুর+নোনতা
	(৩)	মধুর+কটু
	(৪)	মধুর+তিতো
	(৫)	মধুর+সংকোচক (Astringent)
এ্যাসিডের সঙ্গে	(১)	এ্যাসিড+কটু
	(২)	এ্যাসিড+তিতো
	(৩)	এ্যাসিড+সংকোচক
	(৪)	এ্যাসিড+নোনতা
নোনতার সঙ্গে	(১)	নোনতা+কটু
	(২)	নোনতা+তিতো
	(৩)	নোনতা+সংকোচক
কটুর সঙ্গে	(১)	কটু+তিতো
	(২)	কটু+সংকোচক
সংকোচকরে সঙ্গে	(১)	সংকোচক+কটু

∴ সমগ্রভাগে ৫+৪+৩+২+১=১৫

পরবর্তী কালে সহজ ও সংক্ষিপ্ত গাণিতিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও জৈন গ্রন্থে এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। বরাহ মিহির বিকল্প পদ্ধতি (alternative method) হিসাবে এটিকে চিহ্নিত করেন এবং এই পদ্ধতির নাম দেন লোষ্ট্র পদ্ধতি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন

"ইচ্ছা বিকল্পৈঃ ক্রমশোঽভিনীয়
নীতে নিবৃত্তিঃ পুনরন্যনীতিঃ ॥"

অর্থাৎ প্রথম স্থানটি যে কোন একটি দিয়ে পূর্ণ কর। দ্বিতীয় স্থানটি বাকীগুলির একটি দিয়ে পূর্ণ কর এবং অন্যান্যগুলি এইভাবে কর।

তিনশত খ্রীষ্টপূর্বে পিঙ্গল n বিভিন্ন অক্ষর থেকে এক যোগে একটি, দুটি…… এবং একযোগে সবগুলি নিলে সমবায় সংখ্যা কত হবে সে কথা বলে গিয়েছেন। অবশ্য তাঁর এই বলে যাওয়া কথাটি হচ্ছে "পরে পূর্ণমিতি" অর্থাৎ "তারপর সমগ্র সমষ্টি।" এটি এত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা যে সাধারণ মানুষ এটির মর্মার্থ বুঝতে পারবে না। এই সংক্ষিপ্ত কথাটির অর্থ হলায়ুধ টীকা করেছেন তিনি বলেছেন ঃ

"অনেন একদ্ব্যাদিলঘুক্রিয়াসিদ্ধ্যর্থং যাবদভিমতং প্রথমপ্রস্তারবত্ মেরুপ্রস্তারং দর্শয়তি। উপরিষ্টাদেকং চতুরস্রকোষ্ঠং লিখিত্বা তস্যাধস্তাত্ উভয়তোঽর্দ্ধনিষ্ক্রান্তং কোষ্ঠকদ্বয়ং লিখেত্, তস্যাপ্যধস্তাত্ ত্রয়ং তস্যাপধস্তাচ্চতুষ্টয়মেবং যাবদভিমতং স্থানমিতি মেরুপ্রস্তারঃ। তস্য প্রথমে কোষ্ঠে এক সংখ্যামব্যবস্থাপ্য লক্ষণমিদং প্রবর্ত্তয়েত্। তত্রদ্বিকোষ্ঠায়াং পঙ্ক্তাবুভয়োঃ কোষ্ঠয়োরেকৈকমঙ্কং দদ্যাত্। ততস্তৃতীয়ায়াং পঙ্ক্তৌ পর্য্যন্ত কোষ্ঠয়োরেকৈকমংকম্ দদ্যাত্। মধ্যমকোষ্ঠে তূপরিকোষ্ঠদ্বয়াং কমেকীকৃত্য পূর্ণং নিবশয়েদিতি পূর্ণশব্দার্থঃ। চতুর্থ্যাং পঙ্ক্তাবপি পর্য্যন্তকোষ্ঠয়োরেকৈকমংকম্ স্থাপয়েত্। মধ্যমকোষ্ঠয়োস্তূপরিকোষ্ঠদ্বয়াংকমেকীকৃত্য পূর্ণং ত্রিসংখ্যারূপং স্থাপয়েৎ। উত্তরত্রাপ্যেবমেব ন্যাসঃ। তত্র দ্বিকোষ্ঠয়াং পঙ্ক্ত বেকাক্ষরস্য প্রস্তারঃ।......তৃতীয়ায়াং পঙ্ক্তৌ দ্ব্যক্ষবস্য প্রস্তারঃ। চতুর্থ্যাম পঙ্ক্তৌ ত্র্যক্ষরস্য প্রস্তারঃ॥"

এটির সর্মার্থ হচ্ছে—একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর, এটির ঠিক নীচে একই আকারের দুটি প্রকোষ্ঠ নির্মান কর। (ছবি দ্রষ্টব্য) এইরূপে পর পর করে যাও। প্রথম প্রকোষ্ঠে ১ বসাও। এই ভাবে চিহ্ন আরম্ভ হওয়া উচিত (The marking should be started) দ্বিতীয় পঙ্ক্তির দুটি প্রকোষ্ঠের প্রত্যেকটিতে ১ বসাও। তৃতীয় পঙ্ক্তির প্রান্ত প্রকোষ্ঠদ্বয়ের প্রত্যেকটিতে ১ বসাও এবং মাছখানের প্রকোষ্ঠটিতে দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত (অবশ্য প্রকোষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত) সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল বসাও। চতুর্থ পঙ্ক্তির প্রান্ত প্রকোষ্ঠদ্বয়ের প্রত্যেকটিতে ১ বসাও মাঝের প্রকোষ্ঠদ্বয়ের প্রত্যেকটিতে তৃতীয় পঙ্ক্তিস্থ প্রকোষ্ঠের পাশাপাশা প্রকোষ্ঠদ্বয়ের সংখ্যাদুটির যোগফল বসাও। এইভাবে অগ্রসর হও। দ্বিতীয় পঙ্ক্তি একটি অক্ষরের সমবায় দেবে। তৃতীয় পঙক্তি দুটি অক্ষরের সমবায় দেবে। ইত্যাদি । এই পদ্ধতিকে "মেরু প্রস্তার" বলে।

এটিকে চিত্রের সাহায্যে উপস্থিত করলে এইরূপ হয়

| ১ |
| ১ | ১ | ২
| ১ | ২ | ১ | ৪
| ১ | ৩ | ৩ | ১ | ৮
| ১ | ৪ | ৬ | ৪ | ১ | ১৬
| ১ | ৫ | ১০ | ১০ | ৫ | ১ | ৩২
| ১ | ৬ | ১৫ | ২০ | ১৫ | ৩ | ১ | ৬১

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

সমবায় সংখ্যা নির্ণয় করতে গেলে প্রথমতঃ একযোগে একটি, দুটি,……একযোগে সমগ্রগুলি নিয়ে কতগুলি হয় দেখতে হবে। তারপর এগুলির যোগফল নিতে হবে হবে। গাণিতিক সূত্রানুযায়ী বলা যায় $^{n}c_0 + {}^{n}c_1 + \cdots\cdots + {}^{n}c_n$

পিঙ্গলের ছন্দ সূত্রে আর একটি সূত্র আছে যেটিকে আধুনিক গণিতের ভাষায় লিখলে দাড়ায়

$$^{n}c_r + {}^{n}c_{r+1} = {}^{n+1}c_{r+1}$$

এবার তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে পিঙ্গল কেন "পরে পূর্ণমিতি" কথাটি বলেছেন এবং ভাষ্যকার ঠিক উপরের পাশাপাশি প্রকোষ্ঠদ্বয়ের সংখ্যার যোগফল কেন নিতে বলেছেন।

বরাহমিহির মেরু প্রস্তরের নীতিকে সামান্য পরিবর্তন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৃহৎ সংহিতার এক জায়গায় বলেছেন—

"পূর্ব্বেণ পূর্ব্বেণ গতেন যুক্তং।
স্থানং বিনান্তং সংখ্যাম্॥"

কথিত আছে সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় যদি প্রত্যেকটির সঙ্গে সম্পূখপূর্ব সংখ্যা যোগ করা যায়। একমাত্র শেষেরটি ছাড়া।

বিখ্যাত ভাষ্যকার এবং গণিতবিদ ভট্টোৎপল এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন ১৬টি বস্তু থেকে একযোগ একটি, দুটি,…… প্রভৃতি নিয়ে সমবায় সমষ্টি নির্ণয় কর।

	একযোগে দুটি	একযোগে চারটি
১৬		
১৫	১২০	
১৪	১০৫	
১৩	৯১	১৮২০
১২	৭৮	১৩৬৫
১১.	৬৬	১০০১.
.১০	৫৫	.৭১৫
৯	৪৫	৪৯৫
৮	৩৬	৩৩০
৭	২৮	২১০

	একযোগে দুটি	একযোগে চারটি
৬	২১	১২৬
৫	১৫	৭০
৪	১০	৩৫
৩	৬	১৫
২	৩	৫
১	১	১

ভট্টোৎপল আবার বলেছেন সমবায় অন্য উপায়ে বের করা যায়। সেটি হচ্ছে—সংখ্যাগুলি বিপরীত ভাবে সাজিয়ে রাখ। তার নীচে প্রত্যক্ষক্রমে সাজিয়ে রাখ। সংখ্যাগুলি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অনুযায়ী গুণ কর। নীচে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা দিয়ে ভাগ দাও। এটিকে আধুনিক গণিতের ভাষায় লিখলে ছাড়ায়

$$\frac{n(n-1)\cdots\cdots(n-r+1)}{1.\ 2.\ 3\cdots\cdots r} \text{ বা } \frac{n\ !}{r!\ (n-r)!}$$

এই পদ্ধতি গণিত সার সংগ্রহে মহাবীর প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য লীলাবতীতেও এই পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন।

পিঙ্গল আরও দুটি সূত্র দিয়েছেন। একজায়গায় m-অক্ষর থেকে অর্ধযুগ্ম সংখ্যক ছন্দের সংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন "সমং তাবত কৃতঃ কৃতমর্দ্ধসমং"। আধুনিক গণিতের ভাষায় লিখলে দাড়ায় $(2^m)^2 - 2^m$

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি অযুগ্ম সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য বলেছেন" বিষময়ং, রাস্যূনম"। গণিতের ভাষায় এটিকে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় $(2^{2m})^2 - 2^{2m}$

নির্দিষ্ট সংখ্যক বস্তুর বিন্যাস করার কথা ভগবতীসূত্রে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এ ব্যাপারে গাণিতিক সূত্রাদি অনুযোগদ্বারসূত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে

"সেকিংতম্ পুব্বানুপুব্বী? ধম্মাস্তিকায় আগাসাস্তিকাএ জীবাস্তিকাএ পোগ্-গলাস্তিকাএ অদ্ধাসমএ সেতম্ পুব্বানুপুব্বী। সে কিং তং অনানুপুব্বী? প্রয়াএ চৈব এগাদআএ এগুত্তরিআএ ছগচ্ছগয়াএ সঢ়ীএ অন্নমন্নবভাসো দুখুনো সেতং অনানুপুব্বী।"

মর্মার্থ হচ্ছে—"প্রত্যক্ষক্রমকি? ধর্মাষ্টিকায়, অধর্মাষ্টিকায়, আকাষ্টিকায়, জীবাষ্টিকায়, পদ্গলাষ্টিকায় এবং সাম্য এগুলিই প্রত্যক্ষক্রম। বিপরীতক্রম কি? অনন্তপূর্বী বা মিশ্রক্রম কি।

এই শ্রেণীতে প্রথম পদ এক, সাধারণ বৃদ্ধি এক এবং পদসংখ্যা ছয়। পরপর সংখ্যাগুলি গুণ করে দুই বাদ দাও।"

অর্থাৎ ছয়টি বস্তুর বিন্যাস $1\times2\times3\times4\times5\times6$ এটিকে ব্যাপ্তিকৃত হিসাবে লিখিলে দাড়ায় $1\times2\times3 \ldots \ldots \times n$

প্রত্যক্ষ এবং বিপরীতক্রমকে বাদ দেবার জন্য শেষে দুই বাদ দেবার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও অনুযোগদ্বার স্থত্রে আরও নানা স্থত্রাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শীলাঙ্ক স্থরী কর্তৃক উদ্ধৃত একটি শ্লোক এ ব্যাপারে খুবই মূল্যবান। তিনি বলেছেন :

একাদ্যা গচ্ছপর্যন্তাঃ পরস্পরসমহতাঃ।
রাশয়স্তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং বিকল্পগণিতে ফলম্ ॥

মর্মার্থ না বললেও এটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে n সংখ্যক বিভিন্ন বস্তুর বিন্যাস সমষ্টি হচ্ছে $1\times2\times3 \ldots \ldots \times n$; এই প্রসঙ্গে একটি অর্ধমাগধী শ্লোক তুলে ধরছি

'পুব্বানুপুব্বি হেট্টা সময়াভেএণ কুণজহাজেট্টং
উপরিমতুল্লং পুরত্ত নসেজ্জ পুব্বক্কমো সেসে ॥

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি সংস্কৃত শ্লোকটিও তুলে ধরা দরকার। সেটি হচ্ছে

গণিতেঽন্ত্যবিভক্তে তু লব্ধং শেষৈর্বিভাজয়েত্।
আদাবন্তে চ তত স্থাপ্যং বিকল্পগণিতে ক্রমাত্ ॥

দ্বিতীয় ভাস্কারচার্যের লীলাবতীতে এই স্থত্রগুলি পাওয়া যায়

১. $\frac{n!}{n}$ সংখ্যাদির যোগফল $\times(10^{n-1}+\ldots\ \ldots\ +10+1)$

২. $\frac{n!}{n.p!q!}$ × সংখ্যাদির যোগফল $\times(10^{n-1}+10^{n-2}+\ldots+10+1)$

৩. $\frac{(t-1)(t-2)\cdots\{t-(n-1)\}}{1.\ 2.\ 3.\cdots(n-1)}$

এছাড়াও আরও নানা স্থত্র লীলাবতীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়

৮.৪ দ্বিপদ উপপাদ্য[১]

দ্বিপদ সহগগুলিকে ত্রিভুজাকৃতি করে সাজান ধনাত্মক অখণ্ড স্থচক পক্ষে দ্বিপদ উপপাদ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে গণিত ঐতিহাসিকেরা মত দেন। ইউরোপ এ ব্যাপারে পাস্কালের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তিনি ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে Traité du

১. Binomial theorem in ancient India—Amulya Kumar Bag. Indian Journal of History Science, Vol ; 1. 1966, Pages 68—74.

triangle arithmétique গ্রন্থে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাপিয়ানুস, ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টীফেল, ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে স্নিউরেল, ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তার্তাগালিয়া, ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বেল্লী, ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সু য়ুয়ান উ চিয়েন গ্রন্থে চিউ শীচিএ, হিয়াং চিএ চিউ চাঙ্গ সুয়ান ফা গ্রন্থে আঙ্গ হুই, ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে চিয়া হিয়েন প্রমুখেরা দ্বিপদ সহগগুলিকে ত্রিভুজাকৃতিতে সাজানোর কথা বলেছেন। ভারতবর্ষে অবশ্য এগুলিকে ত্রিভুজাকৃতিতে সাজান কথা পিঙ্গলের ছন্দসূত্রে দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সঙ্গীতে ছন্দের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে এবং এই সঙ্গীত প্রধানত তিন ধরণের: (১) স্বর সঙ্গীত, (২) বর্ণ সঙ্গীত ও (৩) তাল সঙ্গীত।

প্রথমটি খাদে এবং চরা স্বরের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়টি দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র শব্দের উপর নির্ভরশীল এবং তৃতীয়টি এ দুটি ক্ষেত্র বাদ দিয়ে যা থাকে তার উপর নির্ভরশীল। স্বর সঙ্গীতের উপর প্রধানত ভিত্তি করেই বৈদিক ছন্দ রচিত এবং এখানে 'সময়' খুব একটা প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে বলে মনে হয় না। সাধারণত বৈদিক ছন্দগুলি অনুষ্টুভ (এক পঙ্‌ক্তিতে আটটি অক্ষর), ত্রিষ্টুপ (এক পঙ্‌ক্তিতে এগারটি অক্ষর) ও জগতী (এক পঙ্‌ক্তিতে বারটি অক্ষর) এই তিন ভাগে বিভক্ত। এগুলির সঙ্গে কতকগুলি বা একটি অক্ষর যোগ বিয়োগ করে মোট তেত্রিশটি ছন্দ পাওয়া গেছে। এগুলির কতকগুলি উল্লেখ করছি

ছন্দের মধ্যে	অক্ষর সংখ্যা	ছন্দের নাম	অক্ষর সংখ্যা
উক্তা	১	উষ্ণিক	৭
অত্যুক্তা	২	অনুষ্টুভ	৮
মধ্যা	৩	বৃহতী	৯
প্রতিষ্ঠা	৪	পঙ্‌ক্তি	১০
সুপ্রতিষ্ঠা	৫	ত্রিষ্টুভ	১১
গায়ত্রী	৬	জগতী	১২
		অতিজগতী	১৩
...	...	...	...
...	...	...	...

পিঙ্গল তাঁর ছন্দ সূত্রে এ নিয়ে নানা আলোচনা করেছেন। তিনি একজায়গায় বলেছেন যদি কোন ছন্দে তিনটি অক্ষর থাকে এবং লঘুস্বর ও গুরুস্বর থাকে তাহলে এ ছন্দের আরম্ভ ৩টি গুরু দিয়ে হলে শেষ হবে তিনটি লঘু স্বর দিয়ে এবং মাঝখানে লঘু ও গুরু স্বরদ্বয়ের মিশ্রণ থাকবে এবং এ থেকেই দ্বিপদ উপপাদ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এখন আমরা যদি লঘু স্বরকে a এবং গুরুস্বরকে b দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাব।

তিন অক্ষর বিশিষ্ট ছন্দের বিস্তৃতি	সমতুল্য ফল	ব্যাখ্যা
b b b	$=b^3$	এখানে তিনটি গুরুস্বর
a b b	$=ab^2$	$\therefore$ 3 গুরু $=1=1.b^3$
b a b	$=ab^2$	2 গুরু $=3=3ab^2$
a a b	$=a^2b$	1 " $=3=3a^2b$
b b a	$=b^2a$	0 " $=1=a^3$
a b a	$=a^2b$	এখানে অক্ষর সংখ্যা তিন এবং এইটি
b a a	$=ba^2$	a এবং b এর ভেদে গঠিত সুতরাং
a a a	$=a^3$	এইটি নিসন্দেহে $(a+b)^3$ এর বিস্তৃতিকেই মনে করিয়ে দেয়।

বিভিন্ন প্রস্তারের সূত্র পিঙ্গলের ছন্দ সূত্রে পাওয়া যায়। হলায়ুধ অবশ্য পিঙ্গলের ছন্দসূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১। প্রথমে সব "গুরু" গুলিকে সাজাও।

২। তারপর প্রথম "গুরু"র পরিবর্তে "লঘু" বসাও বাকি স্থানে "গুরু" রাখ।

৩। "লঘু"র আগে কোন স্থান থাকলে সেখানে গুরু বসাও ... ।

৪। এইরূপভাবে অগ্রসর হও যতক্ষণ পর্যন্ত না সবগুলি লঘু আসে।

৪টি অক্ষর বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা ছন্দের কথা ধরা যাক। এগুলি এইভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ... ...

সাজান	সমতুল্য ফল
b b b b	$=b^4$
a b b b	$=ab^3$
b a b b	$=ab^3$
a a b b	$=a^2b^2$
b b a b	$=ab^3$
a b a b	$=a^2b^2$
b a a b	$=a^2b^2$
a a a b	$=a^3b$
b b b a	$=ab^3$
a b b a	$=a^2b^2$
b a b a	$=a^2b^2$
a a b a	$=a^3b$
b b a a	$=a^2b^2$
a b a a	$=a^3b$
b a a a	$=a^3b$
a a a a	$=a^4$

অতএব চারটি গুরু নিয়ে সাজানোর সংখ্যা $=1.b^4=1$

তিনটি ,, ,, ,, ,, $=4b^3a=4$

দুটি ,, ,, ,, ,, $=6b^2a^2=6$

একটি ,, ,, ,, ,, $=4ba^3=4$

কোন গুরু না নিয়ে সাজানোর সংখ্যা $=1.a^4=1$

এখন যেহেতু প্রতিষ্ঠা ছন্দের ৪টি অক্ষর অতএব আমরা উপরোক্ত পরিকল্পনা $(a+b)^4$ এর বিস্তৃতি থেকে পেতে পারি। মনে রাখা প্রয়োজন এখানে $a=$লঘু, $b=$গুরু ধরা হয়েছে। b^4, b^3a প্রভৃতিকে সাজিয়ে লেখবার এবং এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার জন্য পিঙ্গল মেরু প্রস্তাবের কথা বলেছেন আমরা "সমবায় ও বিন্যাসে" এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। তবুও এখানে মেরু প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিপদ উপপাদ্যের সম্পর্ক দেখানোর জন্য ছবিটি আবার তুলে ধরা হোল।

| ১ |
১	১
২	২	১
১	৩	৩	১
১	৪	৬	৪	১
১	৫	১০	১০	৫	১

$$1$$
$$^1c_0 \quad ^1c_1 \qquad (a+b)^1$$
$$^2c_0 \quad ^2c_1 \quad ^2c_2 \qquad (a+b)^2$$
$$^3c_0 \quad ^3c_2 \quad ^3c_2 \quad ^3c_3 \qquad (a+b)^3$$
$$^4c_0 \quad ^4c_1 \quad ^4c_2 \quad ^4c_3 \quad ^4c_4 \qquad (a+b)^4$$
$$^5c_0 \quad ^5c_1 \quad ^5c_2 \quad ^5c_3 \quad ^5c_4 \quad ^5c_5 \qquad (a+b)^5$$

ঠিক একভাবেই আমরা $(a+b)^n$ এর সূত্রটি পেতে পারি।

অর্থাৎ $(a+b)^n=a^n+{}^nc_1a^{n-1}b+{}^nc_2a^{n-2}b^2+\cdots\cdots+b^n$

নবম অধ্যায়

৯.১ শূন্য ও অসীম

গত কয়েক দশক ধরে শূন্য এবং স্থানীয়মান সহকারে সংখ্যাপাতন কে প্রথম আবিষ্কার করেছিল সে নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলেছে। কেউ মেসোপটেমিয়াকে এ ব্যাপারে পথিকৃৎ বলে স্বীকার করেন। আবার বহু পণ্ডিত আরবকেও এ সম্মানে ভূষিত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আরবরা নিজেরাই বলেছে "শূন্য" ভারতীয়রা আবিষ্কার করেছেন। বিশ্ব আজ জানতে পেরেছে "শূন্য" ভারতীয়রাই আবিষ্কার করেছেন। ভারতীয়রা কবে থেকে "শূন্য" ব্যবহার করছেন বা কবে আবিষ্কার করেছেন তা নিয়ে মতদ্বৈততা আছে। জি. আর. ক্যে বলেন ভারতীয়রা নবম, দশম শতাব্দীতে স্থানীয়মান সহকারে অঙ্কপাতন পদ্ধতি জানতেন।[১] অপরপক্ষে, বুলার, ভি. এ. স্মীথ, ভাণ্ডারকার প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন অন্ততপক্ষে ৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয়মান সহকারে সংখ্যাপাতন ভারতীয়রা জানতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন খ্রীষ্টাব্দের সূচনা থেকেই ভারতীয়রা সংখ্যাপাতন পদ্ধতি জানতেন। জি. থিবো এ ব্যাপারে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দকেই চিহ্নিত করেছেন। আমরা অনেকেই জানি, স্থানীয়মান সহকারে অঙ্কপাতন করতে গেলে শূন্যের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই থাকবে। স্থানীয়মান পদ্ধতিতে মানগুলি দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যেমন ৭৭ সংখ্যাটিতে একক স্থানে ৭'এর যে মান, দশকস্থানের ৭'এর মান তার দশগুণ। দশকে একক ধরে গণনা ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল। অবশ্য বৈদিক ভারত ও অন্যান্য প্রাচীন দেশে এ পদ্ধতি অল্প বিস্তর প্রচলিত ছিল। পূর্বে সংখ্যাপাত করতে গিয়ে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হত তাতে ছোট ছোট সংখ্যা লেখা গেলেও বৃহৎ সংখ্যাগুলি লিখতে গেলে বেশ অসুবিধা হত। এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটির একটি এবং '০' এই মোট দশটি প্রতীকের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের পদ্ধতি ভারতীয়রা আবিষ্কার করায় গণিতশাস্ত্রে তাদের ভূমিকা এক উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে পৃথিবী স্বীকৃতি দিয়েছে। বিখ্যাত গণিত ঐতিহাসিক জর্জ সার্টন এর ভাষায় "এ শুধু নূতন প্রতীকের ব্যাপার নয়, এ এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পাটীগণিত।" বিখ্যাত ঐতিহাসিক হলষ্টেড

১. Notes on Indian mathematics—Arithmetical notation by G. R. Kaye. Jour. Asiat. soc. Bengal, Vol 3. 1907.

"অন দি ফাউণ্ডেশন এ্যাণ্ড টেকনিক অফ এরিথমেটিক" গ্রন্থে বলেছেন শূন্য প্রতীকটির আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন উক্তিই অতিশয়োক্তি হতে পারে না। অনস্তিত্বকে এইভাবে শুধু বাসস্থান, নাম, আকার ও রূপ দানই নয়, তার মধ্যে ব্যবহারোপযোগী শক্তি প্রতিষ্ঠা করা—এ কাজ যেমন হিন্দুদের দ্বারা সাধিত, তেমনি হিন্দুদের দ্বারাই সাধ্য। এ যেন নির্বাণ থেকে ডাইনামো প্রস্তুত করা। শক্তি ও বুদ্ধির অগ্রগতির পক্ষে এককভাবে আর কোন গাণিতিক সৃষ্ট এর চেয়ে বড় অবদান নেই।"[১]

মেকারস্ অব ম্যাথেমেটিকসে হুপার অঙ্কপাতন পদ্ধতিকে বলেছেন, "অভিনব বৈপ্লবিক এবং ... এ সেই পদ্ধতি যা বর্তমান যুগের বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও নভোশ্চারণ বিদ্যার পথ রচনা করেছে।"[২]

ঐতিহাসিক ফ্রিবেরী বলেছেন, "... বাস্তবে 'অনস্তিত্ব'র কি অসাধারণ গুরুত্ব। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, অঙ্কের মধ্যে স্বতন্ত্র, সুনির্দিষ্টভাবে শূন্যকে গ্রহণ করা সমগ্র গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর অন্যতম। হিন্দুদের দ্বিতীয় মহান অবদান দশমিক স্থানীয়মান পদ্ধতি। খুব জোরের সঙ্গে এ কথাই আবার বলছি যে, গণিতের মুক্তি এনেছে শূন্য পরিকল্পনায় ও দশমিক স্থানীয়মান পদ্ধতি।"[৩]

শূন্যের ব্যবহার বা শূন্যের ধারণা ভারতীয় সাহিত্যে প্রচুর দেখা যায়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ভারতীয়রা শূন্যকে প্রথমে বিন্দু দিয়ে তারপর ছোট বৃত্তের সাহায্যে প্রকাশ করতেন। কে বলতে পারে ভারতীয়রা বহুপূর্বে শূন্যকে অন্য কোন প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করতো কি না? সুবন্ধুর বাসবদত্তা এবং শ্রীহর্ষের নৈষদ চরিতে 'শূন্য বিন্দু' বলে উল্লিখিত আছে। ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণে শূন্যকে বিন্দু বলা হয়েছে। কাশ্মীরীয় অথর্ববেদেও এ ধরণের উল্লেখ থাকতে দেখা যায়।

বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' এবং পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় শূন্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আনুমানিক দু'শ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত পিঙ্গলের ছন্দসূত্রে শূন্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে $২০,২৮২৩৮২ \times ১০^{২৪}$ সংখ্যাটির উল্লেখ থাকতে দেখা যায়।

---

১. Early evidences of the use of the zero—B. B. Dutta. American mathematical monthly, 1931, Vol 38. Page—566

২, ৩, রমাতোষ সরকার লিখিত "প্রাচীন ভারতের গণিতচিন্তা" থেকে খুব সামান্য পরিবর্তন করে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বাক্‌শালীর পাণ্ডুলিপিতে স্থানীয়মান সহ দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকাশ করতে দেখা যায়। যেমন

১২০	৯০	৮০	৭৫	৭২
৬০	৬০	৬০	৬০	৬০

হরকে বাদ দিয়ে লিখলে
১২০ | ৯০ | ৮০ | ৭৫ | ৭২

বরাহমিহিরের সমসাময়িক বিখ্যাত জৈন গণিতবিদ জিন ভদ্রগণি বৃহৎক্ষেত্রসমাসে শূন্য সহ বড় বড় সংখ্যার উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি একজায়গায় ২২৪৪০০০,-০০০,০০০ এবং ৩২০০৪০০০,০০০,০০ সংখ্যাগুলির উল্লেখ করেছেন। তর্থাদিগমস্থত্রে বলা হয়েছে পরিধিকে পঁচিশ হাজার দিয়ে গুণ করলে ৭৯০৫৬৭৫০০০ পাওয়া যাবে। তিন গব্যূতি (gabyuti) কে পঁচিশ সহস্র দিয়ে গুণ করলে ৭৫০০০ হয়।[২]

সপ্তম শতাব্দীর এবং তৎপরবর্তী কালে শূন্য এবং শূন্যের সাহায্যে গাণিতিক প্রকরণের (mathematical operation) জন্য প্রত্যেকটি ভারতীয় গণিতগ্রন্থে একটি করে পরিচ্ছেদ বা অর্ধ পরিচ্ছদে রাখা হয়েছিল। সাধারণত এ ব্যাপারে ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য, মহাবীর, দ্বিতীয় আর্যভট, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখের নাম করতে হয়।

এঁদের গ্রন্থে দেখা যায় নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি—

খচতুষ্টয়রদবেদা—৪৩২০০০০ শূন্যানি সপ্তরদবেদা—৪৩২০০০,০০০০

পংচাংরবাণি গুণরামপংচসপ্তখরেষবঃ শশিনিঃ = ৫৭৭৫৩৩০০০০০

শূন্যের সাহায্যে যোগ এবং বিয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন ব্রহ্মগুপ্ত। এঁর লেখাকে আধুনিক গণিতের ভাষায় রূপ দিলে এইরকম হয় $\pm\propto\pm 0=\pm\propto$, $0+(\pm\propto)=\pm\propto$, $0\pm 0=0$; $0-(\pm\propto)=\mp\propto$

ব্রহ্মগুপ্ত এ ব্যাপারে সরাসরি বলেছেন (ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, ১৮ অধ্যায়)

ধনয়োর্ধনমৃণমৃণয়োর্ধনর্ণয়োরন্তরং সমৈক্যং খম্।
ঋণমৈক্যং চ ধনমৃণধনশূন্যয়োঃ শূন্যয়োঃ শূন্যম্॥ ৩০

অর্থাৎ ধনাত্মক রাশিগুলির যোগ ধনাত্মক, ঋণাত্মক রাশিগুলির যোগ ঋণাত্মক। ... ...। ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক একই রাশি যোগ করলে শূন্য হবে। ঋনাত্মক রাশির সঙ্গে শূন্য যোগ করলে ঋণাত্মক হবে। ধনাত্মক রাশির সঙ্গে শূন্য যোগ করলে ধনাত্মক হবে। দুটি শূন্য যোগ করলে শূন্য হবে ও এছাড়াও ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন—$0\times(\pm 0)=0$, $(\pm a)\times 0=0$, $0\times 0=0, 0^2=0$, $0^3=0$, $\sqrt{0}=0$, $0^{\frac{1}{3}}=0$

২. Early literary evidence of the use of the zero in India.—B. B, Dutta, American mathematical monthly ; 1926, Vol 33, Page 449

তিনি বলেছেন (ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত ১৮ অধ্যায়)

শূন্যবিহীনমৃণমৃণং ধনং ধনং ভবতি শূন্যমাকাশম্।

সোধ্যং যদা ধনমৃণাদৃণং ধনাদ্বা তদা ক্ষেপ্যম্। ৩২

অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

শূন্যর্ণয়োঃ খধনয়োঃ খশূন্যয়োর্বা বধঃ শূন্যম্। ৩৩

অর্থাৎ শূন্য এবং ঋণরাশি গুণ করলে শূন্য হয়। শূন্য এবং ধনরাশি গুণ করলে শূন্য হয়। শূন্যকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য হয়।

এই শ্লোকের পরেই ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন

ধনভক্তং ধনমৃণহৃতমৃণং ধনং ভবতি খং খভক্তংখম্

ভক্তমৃণেন ধনমৃণং ধনেন হৃতমৃণমৃণং ভবতি।

খোদ্ধৃতমৃণং ধনং বা তচ্ছেদং খমৃণধনবিভক্তং বা

ঋণধনয়োর্বর্গঃ স্বং খং খস্য পদং কৃতির্যত তত্। ৩৩-৩৫

অর্থাৎ ধনকে ধন দিয়ে এবং ঋণকে ঋণ দিয়ে ভাগ দিলে ধন হবে। শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে শূন্য হবে। ... ... ধন বা ঋণকে শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে ধন বা ঋণ শূন্য ছেদ হবে। শূন্যকে ধন বা ঋণ রাশি দিয়ে ভাগ দিলে শূন্য হবে। শূন্যের বর্গ শূন্য, শূন্যের ঘন শূন্য, শূন্যের বর্গমূল শূন্য এবং শূন্যের ঘনমূল শূন্য হবে।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন,

যোগে খংক্ষেপ সমং বর্গাদৌ খং খভাজিতো রাশিঃ। খহরঃ স্যাৎ স্বগুণঃখং খগুণশ্চিন্ত্যশ্চ শেষবিধৌ। শূন্যে গুণকে জাতে খং হারশ্চেদ্ পুনস্তদা রাশিঃ। অবিকৃত এব জ্ঞেয়স্তথৈব খেনোনিতশ্চ যুতঃ।

অর্থাৎ যে কোন রাশির সঙ্গে শূন্য যোগ করলে শূন্য হবে। শূন্যের সঙ্গে গুণ শূন্য হবে। শূন্য দ্বারা ভাগ করলে অশেষ হবে। শূন্যের বেলায় শূন্য হইলেও শূন্যের গুণনরূপে থেকে যাবে। শূন্য ভাজকরূপে ধরলে অবিকৃত রাশি যা উহ্য আছে তা অপরিবর্তিত থাকবে।

উদাহরণ—"খং পঞ্চযুগ্মভবতি কিং বদ খস্য বর্গং মূলং ঘনং ঘনপদং খগুণশ্চ পঞ্চ। খেনোদ্ধৃতা দশ চ কঃ খগুণো নিজার্দ্ধযুক্ত স্ত্রিভিশ্চ গুণিতে খহৃতস্ত্রিষষ্ঠিঃ।

আমাকে বল পাঁচের সঙ্গে শূন্য যোগ করলে এবং শূন্যের বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল কত হবে। পাঁচকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে এবং দশ থেকে শূন্য বাদ দিলে কত হয়? এবং কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করে তার সঙ্গে সংখ্যাটির অর্ধেক যোগ করে তার তিনগুণকে শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে ৬৩ হবে।

এটির সমাধানে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন,

ন্যাস। ০। এতৎপঞ্চ যুতং জাতম্ । ৫। খস্যবর্গঃ। ০। মূলম্ । ০। ঘনম্। ০। তন্মূলম্। ০।

ন্যাস। ৫। খেন গুণিতা জাতঃ। ০।

ন্যাস। ১০। এতে খভক্তা। $\frac{১০}{0}$।

মর্মার্থ হচ্ছে—শূন্যের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে ৫ হবে। শূন্যের বর্গ শূন্য হবে। শূন্যের বর্গমূল শূন্য হবে। শূন্যের ঘন শূন্য হবে।

বর্ণনা—শূন্যের সঙ্গে পাঁচগুণ করলে শূন্য হবে।

বর্ণনা—১০। একে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে $\frac{১০}{0}$

এরপর দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "অজ্ঞতো রাশিস্তস্য গুণঃ ০। সার্দ্ধংক্ষেপঃ $\frac{১}{২}$ গুণঃ। ৩। হর। ০ দৃশ্যং। ৬৩। ততো বক্ষ্যমাণেন বিলোম বিধিনা ইষ্টকর্মণা বা লব্ধো রাশিঃ ১৪।"

অর্থাৎ একটি অজ্ঞাত রাশি লওয়া হল, একে শূন্য দিয়ে গুণ করে $\frac{১}{২}$ যোগ করা হ'ল। এর সঙ্গে তিন গুণ করা হ'ল। শূন্য দিয়ে ভাগ করা হ'ল। এখন রাশিটি ৬৩। এখন বিপরীত প্রণালীতে অথবা সাধারণ নিয়মানুসারে রাশিটি ১৪ হবে।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য শূন্য এবং এ নিয়ে যা আলোচনা করেছেন তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি $a/0 = \infty$ বলেছেন। অবশ্য ব্রহ্মগুপ্তও এ কথাই বলেছেন সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু মহাবীর এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা অশুদ্ধ।[১] তিনি বলেছেন

"তাড়িতঃ খেন রাশিঃ খং সোহবিকারী হৃতো যুতোঃ।
হীনোহপি খবধাদিঃ খং যোগে খং যোজ্যরূপকম্।"

অর্থাৎ কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য হবে এবং ঐ সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে রাশিটি অপরিবর্তিত থাকবে … … … …।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য উপর্যুক্ত শ্লোকে এবং অন্যত্র এ বিষয়ে যা কিছু আলোচনা করেছেন তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।[১]

(১) $$\lim_{\xi \to 0} \frac{a\,\xi}{\xi} = a$$

১. Early history of arithmetic of zero and infinity in India—B. B. Dutta. Bulletin of the Calcutta mathematical Society, 1927. Vol 18, Page—164

(২) $$\frac{\left(x\times 0+\frac{x\times 6}{2}\right)}{0}=63$$

(৩) $$\left\{\left(\frac{x}{0}+x-9\right)^2+\left(\frac{x}{0}+x-9\right)\right\}0=90$$

এছাড়াও শূন্য নিয়ে আরও দীর্ঘ আলোচনা দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা আলোচনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ ডঃ বি. বি. দত্ত লিখেছেন।

দশম অধ্যায়

১০·১ বীজগণিতের উৎপত্তি কোথায়

বর্তমান বীজগণিতের প্রতীক পদ্ধতি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এত বেশী পরিচিত হয়ে পড়েছে যে এর অন্তর্নিহিত চিন্তাধারা অতীতে কেন এত শ্লথ গতিতে বিকাশলাভ করেছিল তা ভাবতেও অবাক লাগে। বীজগণিত বলতে যদি $ax^2+bx+c=0$ সমীকরণটি বা এই ধরণের সমীকরণের সমাধান বোঝায় তাহলে এর ইতিহাস শুরু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এর চেয়ে কিছু কম সর্ত আরোপ করলে আমরা বলতে পারি—এর ইতিহাস শুরু তৃতীয় শতাব্দীতে। তবে প্রতীক চিহ্নাদি এবং অন্যান্য কিছু সর্ত এড়িয়ে গিয়ে বলতে পারা যায়, বীজগণিতচর্চার সূচনা হয়েছিল ২২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। অন্ততপক্ষে কয়েকজন পাশ্চাত্য গণিত ঐতিহাসিকদের এই মত। বীজগণিতের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। (ক) খ্রীষ্টপূর্ব যুগ, (খ) প্রথম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ও (গ) ত্রয়োদশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। প্রথম যুগে মিশর, ব্যাবিলন, চীন, ভারতবর্ষ ও গ্রীসে বীজগণিতচর্চা শুরু হয়েছিল। তবে এদের মধ্যে কে প্রথম শুরু করেছিল তা বলা কঠিন। দ্বিতীয় যুগে আরব, ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি দেশে বীজগণিত চর্চা হত এবং তৃতীয় যুগে ইউরোপে এর ব্যাপক বিস্তার হয়।

মস্কো পেপিরাস[১] এবং রাইণ্ড পেপিরাস থেকে জানা যায় যে, আনুমানিক ২২০০ খ্রীষ্টপূর্বে তৃতীয় আমেন-এম হেটের রাজত্বকালে মিশরীয়রা গণিতের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। (তখনকার দিনে হয় মাটির' চাকতির উপর না হয় কোন চামড়া বা বার্চ পাতার উপর লেখা হত এবং এগুলিই গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল) এটি আবার আ-আসার রে'র রাজত্বকালে (১৬৫০ খ্রীঃ পূঃ) আহ্‌মীস নকল করেন। এই রাইণ্ড পেপিরাসে বীজগণিতের নানা উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে "একটি সংখ্যা আছে তার সমস্তটার সঙ্গে এক সপ্তমাংশ

১. ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে Dra Abu'l Neggaতে (মিশর) একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এর কিছুদিন পরে ডব্লিও গোলেনিশ্চেভ এটিকে ক্রয় করেন। এঁর মৃত্যুর পর এটি মস্কো মিউজিয়ম অব ফাইন আর্টসে স্থানান্তরিত করা হয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এটি আনুমানিক ২৭০০ থেকে ১৬৭০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে লিখিত। এর মধ্যে গণিতের নানা সূত্র এবং উদাহরণের উল্লেখ আছে। এই পাণ্ডুলিপিটি গণিত ঐতিহাসিকদের কাছে মস্কো পেপিরাস নামে পরিচিত।

যোগ দিলে উনিশ হয়। সংখ্যাটি কত? আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায় $x+\frac{x}{7}=19$.



(মস্কো ম্যাথমেটিকাল পেপিরাস, উদাহরণ ৭)

ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী অর্ধচন্দ্রাকার স্থলভাগের অধিবাসী ব্যাবিলনীয়রা বীজগণিতের প্রথম যুগে বীজগণিত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। নিনেভ, আসুর, নিপ্পুর প্রভৃতি স্থান খনন করে যে সব মাটির চাকতি পাওয়া গিয়েছে, তাতেই দেখা গিয়েছে এই সব নিদর্শন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাটির চাকতি থেকে একটি উদাহরণ তুলে ধরছি[১]।

আমি একটি পাথর দেখলাম কিন্তু ওজন করলাম না। অতঃপর আমি ১/৭ অংশ বিয়োগ করি, (এবং) $\frac{১}{১৩}$ অংশ বিয়োগ করি। আমি ওজন করলাম (ইহাকে), ১ মা-ন, পাথরটির মূল ওজন কত?[২]

উত্তর: "পাথরটির মূল ওজন ১ মা-ন ৯½ গিন এবং ২½ সে।" আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়[৩]—

$$\left(x-\frac{x}{7}\right)+\frac{1}{11}\left(x-\frac{x}{7}\right)-\frac{1}{13}\left[\left(x-\frac{x}{7}\right)+\frac{1}{11}\left(x-\frac{x}{7}\right)\right]=1,0.$$

সমাধান—

$x=1$ মা-ন $+9\frac{1}{2}$ গিন $+2\frac{1}{2}$ সে $=1,9\ ;\ 30,50$ গিন

১. প্রাচীন ব্যাবিলনের গণিতচর্চা—প্রদীপকুমার মজুমদার (ইতিহাস, শ্রাবণ—পৌষ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ)

২. Mathematical cuniform texts—Edited by O. Neugebaur and A Sachs—YBC 4652 (Problem Text R)

৩. The Treasury of Mathematics, Vol 1—Henrietta Midonick—Page 41.

বস্তুতপক্ষে $\frac{x}{7}=9\ ;\ 55\ ;\ 50,\qquad x-\frac{x}{7}=59\ ;\ 35.$

$$\frac{1}{11}\left(x-\frac{x}{7}\right)=5\ ;\ 25.$$

$$\frac{1}{13}\left[\left(x-\frac{x}{7}\right)+\frac{1}{11}\left(x-\frac{x}{7}\right)\right]=5.$$

এছাড়াও পণ্ডিতেরা মাটির চাকতি পড়ে মত দিয়েছেন যে, ব্যাবিলনবাসীরা বীজগণিতের সাহায্যে এক ঘাত, দ্বিঘাত ও সহ সমীকরণের সমাধান করতে পারতেন।

চীনদেশে ঠিক কবে থেকে বীজগণিত চর্চা শুরু হয়েছিল তা বলা কঠিন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন একহাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চীনে বীজগণিতের চর্চা ছিল। য়োশিও মিকামী প্রমুখ গণিত ঐতিহাসিকেরা বলেন, চ্যাঙ্গ ৎসাঙ্ লিখিত কিউ চ্যাঙ্গ সুয়ান সু গ্রন্থে বীজগণিতের কিছু কিছু উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা এই গ্রন্থের কোন এক স্থান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, $\alpha x+\beta y=\gamma\ ;\quad \alpha' x+\beta' y=\gamma'$ এই দুটি সমীকরণের সমাধান $y=\frac{\gamma\alpha'-\gamma'\alpha}{\beta\alpha'-\beta'\alpha}$ এই গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় এবং এই পদ্ধতিকে চি চু (chih chhu) বলা হয়। তান এবং সান কুও'র রাজত্বকালে এক মাত্রার সহসমীকরণের নির্দিষ্ট উদাহরণ ছাড়া অন্য ধরণের সমীকরণের দিকে নজর দেওয়া হত না। সুঙ্গ গ্রন্থে ইয়াঙ্গ হুই পর পর সমীকরণ-গুলিকে চিয়া হাঙ্গ (Chia hang) ই হাঙ্গ প্রভৃতি বলেছেন। প্রথম অজ্ঞাত রাশির সহগকে সোউ ওয়েই (Shou wei) এবং দুই-এর অধিক অজ্ঞাত রাশির সমীকরণকে হাঙ্গ ফান চি (hang fan chi) বলেছেন। চীনা গণিতগ্রন্থে নিম্নলিখিত সমীকরণটি দেখা যায়[১] :

1	2	3	সাঙ্গ হো পিঙ্গ সু Shang ho ping Shu	$x+y+3z=26$
2	3	2	চুঙ্গ হো পিঙ্গ সু Chung ho ping Shu	$2x+3y+z=34$
3	1	1	শিয়া হো পিঙ্গ সু Hisa ho ping Shu	$3x+2y+z=39$
26	34	39		

১. Joseph Needham—Science and Civilisation in China, Vol 3. Page 115.

চীনা গ্রন্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, চীনারা অনির্ণেয় সমীকরণ সম্বন্ধে জানতেন। চিউ চাঙ্গ গ্রন্থে দ্বিমাত্রার সমীকরণ দেখতে পাওয়া যায়। ৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লীনটে পঞ্জিকা প্রণয়ন করতে গিয়ে লি স্থন ফেঙ্গ দ্বি-মাত্রার সমীকরণের সাহায্য নিয়েছিলেন। হুয়াঙ্গ চী পঞ্জিকায় লিউ ছুও (Liu Chuo) দ্বিঘাত সমীকরণের সাহায্য নিয়েছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে ওয়াঙ্গ সিয়াও থুঙ্গ (Wang Hisao Thung) তৃতীয় মাত্রার সমীকরণের উদাহরণ দিয়েছিলেন। প্রখ্যাত গণিত ঐতিহাসিক লি নিয়েন এবং য়োশিও মিকামী[১] বলেছেন, চীনারা $ax^6+bx^5+cx^4+dx^3+ex^2+fx+g=0$ ধরণের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এছাড়াও প্রাচীন চীনাদের মধ্যে যাঁরা বীজগণিতের উদাহরণ বা তৎসংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে স্থন জী (আনুমানিক প্রথম শতাব্দী), লিউ হুই (২৫০ খ্রীঃ), চি-ন কিউ-সাউ (১২৫০ খ্রীঃ), লি য়ে (১২৫০ খ্রীঃ), স্থ-শি কিএ (১৩০০ খ্রীঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

৬৪০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে থেলিসের সময় থেকে গ্রীক গণিতশাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়েছিল বলা যেতে পারে। এবং পীথাগোরাসের সময় থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক গণিতশাস্ত্রের স্বর্ণযুগ চলেছিল।[২] এই স্বর্ণযুগেই গ্রীকেরা বীজগণিত নিয়ে চর্চা করেছিলেন। ৪৬০ খ্রীষ্টপূর্বে চিওসের হিপোক্রেটস জ্যামিতির সাহায্যে $x^2+\sqrt{\frac{3}{2}}ax=a^2$ ধরণের সমীকরণ সমাধান করেছিন।

$$xy=k^2, \quad x-y=a \cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

$$xy=k^2, \quad x+y=a \cdots\cdots\cdots\cdots (2)$$

$$xy=k^2, \quad x^2-y^2=a^2 \cdots\cdots (3)$$

এই তিন ধরণের সমীকরণের সমাধান ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বে রচিত ইউক্লিডের জ্যামিতিতে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সমাধান করা হয়েছিল। এছাড়াও $x^2+ax=a$ ধরনের সমীকরণের সমাধানও দেখতে পাওয়া যায়। আর্কিমিডিসের গ্রন্থে এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ ও আরও নানা জাতের বীজগণিতীয় সমীকরণ দেখতে পাওয়া যায়। হিরোঁ (৫০ খ্রীঃ ?) $144x(14-x)=6720$ সমীকরণটির সমাধান করেছিলেন। এবং বীজগণিতের অন্যান্য কিছু সমীকরণ, সমাধান করেন। পদ্ধতিগতভাবে গ্রীকদের মধ্যে প্রথম বীজগণিত নিয়ে আলোচনা করেন তৃতীয় শতাব্দীর ডায়োফাণ্টাস

১. Yoshio Mikami—The development of Mathematics in China and Japan Page 130.

২. প্রদীপকুমার মজুমদার—প্রাচীন ব্যাবিলনের গণিতচর্চা (ইতিহাস) শ্রাবন—পৌষ ১৩৮০।

(২৫০ খ্রীঃ)। তাঁর গ্রন্থে নিম্নলিখিত সমীকরণগুলির সমাধান দেখতে পাওয়া যায়।[১] $(x^3+8x)-(5x^2+1)=x$, $x=(x-22)+(x-24)(x-27)(x-20)$ প্রভৃতি। পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীকদের একটি ধাঁধাঁ সংকলন ছিল। তাতে বীজগণিতের নানা উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন এক জায়গায় বলা আছে—

"কতকগুলি আপেল ছিল, তা বণ্টন করে, এক তৃতীয়াংশ দেওয়া হ'ল একজনকে, এক অষ্টমাংশ দেওয়া হ'ল দ্বিতীয়জনকে, এক চতুর্থাংশ দেওয়া হ'ল তৃতীয়জনকে, এক পঞ্চমাংশ দেওয়া হ'ল চতুর্থজনকে, ১০টি পঞ্চমজনকে এবং একটি ষষ্ঠজনকে। কয়টি আপেল ছিল ?[২] এটিকে আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়

$$\frac{x}{3}+\frac{x}{8}+\frac{x}{4}+\frac{x}{5}+10+1=x.$$

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে আরব্য গণিতশাস্ত্রের যাত্রা শুরু হয় এবং তখন থেকেই ভারতীয় ও গ্রীকগণিত গ্রন্থ তাঁদের ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। এরপর আরবীয়রা দীর্ঘ একশ বছর ধরে ধৈর্য সহকারে এগুলি অনুধাবন করতে থাকে। আরব জগতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বীজগণিতের ক্রমোন্নতিতে তাঁরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বীজগণিতে আরব জগতে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন যাঁরা তাদের মধ্যে আল-খারেজিমী, আল কারখি, ওমর খৈয়াম প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য। আমরা অনেকেই জানি আল খারেজিমীর হিন্দু-আরবীয় লিখন পদ্ধতির উপর লিখিত গ্রন্থটি ছাড়াও সমীকরণ সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির তিনি নাম দেন আল-জাবর-ও-আল-মুকাবালা (অর্থাৎ সংযোজন ও বিয়োজন)। আজকাল আমরা যেটিকে পক্ষান্তরকরণ বলি উপরোক্ত আরবী নামটি তারই বর্ণনা। আল-জাবর এর অর্থ একত্র করা এবং আল-মুকাবালা'র অর্থ সামনা সামনি রাখা। আল-খারেজিমীর এই গ্রন্থটি "Lunduse algebrae et almucgra-balesque" নামে ল্যাটিনে অনূদিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত এটি অ্যালজাব্রা নামেই অভিহিত হতে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিজয়ী মুরেরা আল-জবরের ভিন্ন অর্থ করেছিলেন। মধ্যযুগে স্পেনীয় নাপিতকে (বা স্পেন দেশে নাপিতকে) আলজেব্রিষ্টা অর্থাৎ হাড়-জোড়ার লোক বলা হ'ত। তখনকার দিনে নাপিতেরা শুধু চুলই ছাঁটতো না পরন্তু হাড় জোড়া দেওয়া প্রভৃতির কাজ জানতো। আল-জাবর এর অর্থ একত্রীকরণ মনে রাখলে অঙ্কে আলজাব্রা এবং নাপিতের হাড় জোড়ার মধ্যে কিছুটা মিল খুঁজে

১. T. L. Heath—History of Greek mathemmatics, Vol 2 দ্রষ্টব্য।
২. ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন—গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস—পৃষ্ঠা—৪৬।

পাওয়া যায়।[১] যাই হ'ক আল-খারেজিমীর লেখা গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায় যে তিনি $ax^2=bx$, $ax^2+c=bx$, $ax^2=bx+c$ প্রভৃতি নানা ধরণের বীজগণিতের সমীকরণের সমাধান করেছিলেন।

আল খারেজিমীর পরেই এ ব্যাপারে আল কারখির নাম মনে পড়ে। ইনি বীজগণিতের চিহ্ন সমূহ, তাদের ব্যাখ্যা, প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণের সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে $x^3+y^3=z^2$, $x^2-y^2=z^3$, $x^2y^3=z^2$ প্রভৃতি বীজগণিতীয় সমীকরণ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও আরও নানা ধরণের বীজগণিতীয় সমীকরণের উদাহরণ ও সমাধান তিনি দিয়েছেন। তিনি ঘাত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন x^2 এর প্রতিশব্দ মাল, x^3 এর প্রতিশব্দ কাব। $x^2 \times x^2$ এর প্রতিশব্দ (?) মাল মাল বলেছেন। তিনি $x^2 \times x^3 = x^5$ বলেছেন কিন্তু তাঁর পূর্বে এটিকে x^6 লেখা হ'ত।[২] অনেক পণ্ডিত এবং গণিত ঐতিহাসিক মনে করেন আল কারখি লিখিত আলফাকরী যদি আল খারেজিমীর রচিত আল-জাবর ওআল-মুকাবালা'র পূর্বে ইউরোপে প্রচার এবং প্রসারলাভ করতো তাহলে বীজগণিতের নাম আলজাব্রার পরিবর্তে ফাকরী নামেই পরিচিত হত।

এ দুজনের পরেই আরবজগতে বীজগণিত নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন ওমর খৈয়াস। তাঁর গ্রন্থে আমরা

$\frac{1}{x^3}+\frac{a}{x^2}+\frac{b}{x}=c$, $x^2+cx^2+bx=a$ প্রভৃতি নানা ধরণের সমীকরণ দেখতে পাই।

১০.২ ইউরোপে বীজগণিতের প্রসার

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের স্বর্ণযুগ তখন স্মৃতির মণিকোঠায় স্থান পেয়েছে, আরব জগতে ধিকি ধিকি করে গণিতের সামান্য কিছু চর্চা চলেছে এবং চীনে প্রায় আরব জগতের মতই অবস্থা। গণিতশাস্ত্রের চর্চা যখন এই অবস্থা, তখন ইউরোপে নব-জাগরণ শুরু হয়। এই নবজাগরণের ফলে সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, অঙ্কনে প্রভৃতি নানা দিকে উন্নতির জোয়ার দেখতে পাওয়া যায়। এ জোয়ারের ঢেউ গণিতশাস্ত্রকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল এক নব দিগন্তের সীমানায়। গণিতশাস্ত্রের নব জাগরণ শুরু

১. কাজী মোতাহার হোসেন—গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৪৮

২. এম আকবর আলি—বিজ্ঞানে মুসলমানের দান : দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৭

হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে। তবে এ নবজাগরণের পিছনে কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণ দেখতে পাওয়া যায়।[১]

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বহুবার এঙ্গল, সাক্সন, ফ্রাঙ্ক, গথ ও অন্যান্য টিউটনেরা রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারে না। ফলে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বে তোরণ সম্রাট কনষ্টানটাইন কর্তৃক স্থাপিত বাইজেনটাইন নগরীর উপর প্রতিষ্ঠিত কনষ্টাণ্টিনোপলের কোন ক্ষতি করতে পারে না। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সৈন্যরা কনষ্টাণ্টিনোপল অবরোধ করে এবং কিছুকালের মধ্যেই রোমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হতে থাকে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই পতনের ফলে পশ্চিম ইউরোপে চিন্তা ও কার্য উভয়ক্ষেত্রে বিষম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর কিছুদিন পরেই বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ নৌযাত্রার দিকে দৃষ্টি দেয়। আবিষ্কৃত হয় নূতন নূতন দেশ। সংযোগ সাধিত হয় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একদা যে সমস্ত দেশ শীর্ষে ছিল তাদের সঙ্গে। ফলে ভাব বিনিময় ও জ্ঞান বিজ্ঞানের আদান প্রদান অতি দ্রুত ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। কনষ্টাণ্টিনোপলের পতনের ফলে বহু জ্ঞানী গুণী ও বিজ্ঞজন ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এরই জন্য যে সব দেশ জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ধকারে ছিল তারা এঁদের সহায়তায় গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। তাছাড়া এসব গুণীব্যক্তিদের কাছে বহু গ্রন্থের নকল ছিল এবং এগুলি ইউরোপের অন্যান্য দেশ সহজেই হস্তগত করে। আমরা জানি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ছাপাখানার প্রচলন হয় এবং অল্প মূল্যে এইসব গ্রন্থের অনুবাদ ও নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার লাভ হেতু জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা দ্রুত এগিয়ে চলতে থাকে। গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ এবং আরবীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ অনুবাদ হেতু ইউরোপীয় দেশ সমূহ নানা তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে এবং তারপর নিজেরাই নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে থাকে।

নানা গ্রন্থ অনুবাদের মধ্যে বীজগণিতও অনূদিত হতে থাকে অবশ্য বীজগণিতের অনুবাদ আগেও কিছু কিছু হয়েছিল। মধ্যযুগে আলখারেজিমির আলজাব্রার অন্ততঃ তিনটি ল্যাটিনে অনুবাদ করা হয়। একটি করেন ঘেরার্ডো এবং দ্বিতীয়টি করেন রেকর্ডে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডায়োফাণ্টাসের একটি গ্রন্থ জাইলাণ্ডার অনুবাদ করেন। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আরবী ও গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদের ফলে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রভাব ইউরোপ সহজেই পড়তে থাকে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন আরবী

১। কাজী মোতাহার হোসেন—গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস

গ্রন্থ অনুবাদের ফলে ইউরোপে ভারতীয় প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

ইউরোপে যাঁরা বীজগণিতকে আধুনিক পর্যায়ে নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে গিরেলামো কার্দানো, তার্তাগালিয়া প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য লিওনার্দো অব পীসা'র নাম না করলে এ ব্যাপারে কিছুটা অন্যায় করা হবে। তাছাড়া লুকাশ ডি বুরগো, ফেরারী, মার্সেম্যান, ফের্মা প্রমুখেরা বীজগণিতের উন্নতি সাধনে উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি সমীকরণে দেখা যায় একটি গ্রীক অক্ষর ρ আছে এটিকে ডায়োফান্টাস ξ এবং আমরা এটিকে x রূপে লিখি। এটি অবশ্য অজ্ঞাত ও নির্ণেয় সংখ্যা। ◇ এটি ডায়োফান্টাসের সময় △ এবং বর্তমানে x^2 লেখা হয়। বাঁদিকের তৃতীয় বন্ধনী থাকায় একটি সমান চিহ্ন "=" ধরা হয়। তাছাড়া P অক্ষরটি চারবার আছে। এটি ল্যাটিনের Plus এর আদ্যাক্ষর।

1 ◇ P6 ρ P9 [1 ◇ P3 ρ P24

(১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি বীজগণিতের সমীকরণ)

যাই হোক উপর্যুক্ত আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে এবং ছবিতে যেটি দেওয়া আছে তা থেকে বলা যায় সমীকরণটি হচ্ছে—

$1x^2+6x+9=1x^2+3x+24$ বা, $x^2+6x+9=x^2+3x+24$,

রেনে দেকার্ত বীজগণিতের সমীকরণ লিখতেন

$yy\} \; cy-\frac{cx}{b}y+ay-ac.$

দেকার্ত ডানপাশের দ্বিতীয় বন্ধনীকে সমান চিহ্ন বলতেন। ভিয়েটা বীজগণিতে প্রতীক চিহ্ন এত সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। যাইহক আমি এখানে নবজাগরণের পর থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত উল্লেখ-যোগ্য বীজগণিত গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার প্রভৃতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরছি।

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থকার / প্রবন্ধকার	গ্রন্থ / প্রবন্ধ	তারিখ
1.	Alexander	Synopsis Algebraica	1693
2.	Albert Girard	Invention Nouvellie en Algebre	1629
3.	Baker	Geometrical Key & C	1684

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থকার / প্রবন্ধকার	গ্রন্থ / প্রবন্ধ	তারিখ
4.	Bulliald	Opus Novum ad Arithmeticam Infinitorum	1682
5.	Barrow	in Lectiones Geometricae	1669
6.	Bachet	Diophantus cum commentariis	1621
7.	Bombelli		1579
8.	Bernard Solignac	Arith. libri ii et Algebrae totidemm	1580
9.	Buteo	De Logistica	1559
10.	Ferreus		1545
11.	Clavius		1580
12.	Cavalerius	Geometria Indivisibilibus continuorum and C	1635
13.	De Moivre	Various Memoirs in Phil Trans	1697-1730
14.	De Lagny	Various pieces on equations	1692
15.	Dechales	Cursus seu Mundus Mathematicus	1690
16.	De Billy	Nova Geometricae clavis Algebra	1643
17.	Descarts	Geometria	1637
18	Diophantus	Arithmeticorum, Librisex	360*
19.	Fermat	in Varia opera mathematica	1679
20.	Frenicle	Various paper in Mem. of French Accd	1666

* 1575 খ্রীষ্টাব্দে ল্যাটিনে অনূদিত হয়।

21	Folinus	Algebra, Sive Liber de Rebus occultics	1619
22.	Ghetaldus	De Resolutione et compositione Mathematica	1630
23.	Harriot	Artis Analyticae Praxis	1631
24.	Harigonius	Cursus Mathematicus	1634
25.	Hally (Dr.)	in philosophical Transactions	1687 এবং 1694
26.	Issac Newton	The Binominal theorem	1666
27.	James Gregary	Exercitationes Geometricae	1668
28.	Jossalin	De occulta parte Mathematicorum	1576

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থকার / প্রবন্ধকার	গ্রন্থ / প্রবন্ধ	তারিখ
29.	Kersey	Elements of Algebra	1673
30.	Kinckhausen	আইজ্যাক নিউটন গ্রন্থটিকে মূল গ্রন্থ বলে ব্যবহার করেন	1661
31.	Leonardo Bonacci		1202
32.	Lucas Paciolus	Summa de Arithmetica & C.	1494
33.	Leibnitz	in Leipsic Acts & C.	1677
35.	Pell	Rhonius Algebra গ্রন্থটিকে উন্নতি সাধন করে অনুবাদ করেন।	1668
35.	Outghtreed	Clavis Mathematica	1631
36.	Prescot	Nouveaux Elemens de Mathematiques	1675
37.	Pascal		1654
38.	Pedro Nugnez	Libro de Algebra & C.	1567
39.	Peletarius	De Occulta parte Numerorum	1558
40.	Recorde	Whetstone of wit	1557
41.	Ramus	Arithmeticae Libri duo et totidem Algebrae	1560
42.	Renaldinus	opus Algebraicum	1644
43.	Rhonius	Algebra (ইংরাজীতে অনূদিত)	1659
44.	Rolle	Une Me´thode Pour la Resolution des equations indetermine´es	1690
44[a]	Rudloff	Algebra	1522
45.	Rapson	Analysis Aequationum Universalis	1690
46.	Sault	New Treatise of Algebra	1698
47.	Slusius	Mesolabum	1659
48.	Stevinus	Arithmatique, & C aussi l' Algebre	1585
49.	Scheubelius	Algeba Compendiosa	1551
50.	Stifelius	Algebra	1544
51.	Tschirnhausen	in the Leipsic Acts	1683
52.	Vieta	Opera Mathematica	1600
53.	Van Ceulen		1619
54.	Ward	Compendium Algebra	1695

১. সমস্ত গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের নাম ও তারিখ সত্যপ্রকাশ লিখিত Founders of Sciences in Ancient India গ্রন্থের ৪১১—৪১৪ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১০.৩ ভারতবর্ষে কবে উৎপত্তি ?

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বীজগণিতের উৎপত্তিস্থল এবং তার ব্যাপক উন্নতি বিধানের জন্য মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, আরব ও ইউরোপের কথাই উল্লেখ করলাম। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে বীজগণিতের আলোচনা এবং চর্চায় ভারতবর্ষ কতটা এবং কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং কবে ভারতবর্ষে বীজগণিতের চর্চা প্রাথমিক অবস্থায় শুরু হয়েছিল। গণিত ঐতিহাসিকেরা মনে করেন ভারতবর্ষে বীজগণিত চর্চার শুভ সূচনা হয় শতপথ ব্রাহ্মণের যুগে অর্থাৎ প্রায় ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তারপর দেখা যায় শুল্বসূত্রে বীজগণিতের নানা তত্ত্ব প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত রয়েছে। নানা ধরণের যজ্ঞবেদী নির্মাণ পদ্ধতি ভারতীয় ঋষিরা জানতেন। এবং এই সবক্ষেত্রে উন্নত পর্যায়ের বীজগণিতের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। মহাবেদী নির্মাণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম যার সম্মুখভাগ ২৪ একক দীর্ঘ, ভূমি ৩০একক, উচ্চতা ৩৬ একক এবং x একক করে আকৃতি বৃদ্ধি করলে m একক ক্ষেত্রের জন্য আমরা নিম্নলিখিত বীজগণিতীয় সমীকরণটি পাই

$$36x \times \frac{(24x+30x)}{2} = 36 \times \frac{(24+36)}{2} + m$$

অথবা $972x^2 = 972x + m$

$$\therefore \quad x = \sqrt{1 + \frac{m}{972}}$$

যদি $m = 972(n-1)$ বসান যায় তাহলে $x = \sqrt{n}$ পাওয়া যায়। $n = 14$ বা $14\frac{3}{7}$ শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়।

শ্যেণচিত নির্মাণ করতে গিয়ে আমরা নিম্নলিখিত বীজগণিতীয় সমীকরণের সাক্ষাৎ পাই (অবশ্য আধুনিক বীজগণিতে রূপ দেবার পর)

$$2x \times 2x + 2\{x + (x + \tfrac{x}{5})\} + x \times (x + \tfrac{x}{10}) = 7\tfrac{1}{2} + m$$

m = অগ্নিবেদীর আকৃতি বৃদ্ধি ধরা হয়েছে।

তাহলে $x^2 = 1 + \frac{2m}{15}$, $m = 94$ ধরলে $x^2 = 13\frac{8}{15} = 14$ (আসন্ন) ফল পাওয়া যাবে এবং এটি শতপথ ব্রাহ্মণে দেখতে পাওয়া যায়।[১]

শুল্বসূত্র নির্দিষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট যজ্ঞবেদী নির্মাণ করতে গিয়ে অনেকবর্ণ অনির্ণেয় সমীকরণ (Indeterminate equations in several variables) দেখতে

---

১. The Science of the Sulba, B. B. Datta, পৃঃ ১৬৫—১৬৬

পাওয়া যায়। "গার্হপত্যয় বেদী" নির্মাণ কল্পে বলা হয়েছে, একটি বর্গক্ষেত্র যার বাহু ১ ব্যায়ম এবং ৫টি স্তর ইট দিয়ে তৈরী। প্রত্যেক স্তরে ২১টি ইট থাকবে। ইটগুলি বর্গাকার, আয়তাকার বা যে কোন আকৃতি বিশিষ্ট হতে পারে। কিন্তু পরপর দুটি স্তরের ইটগুলির ফাঁক এক লাইনে পড়বে না।

ধরা যাক ইটগুলি বর্গাকার, তিন ধরণের ইট পাওয়া যাবে যাদের বাহু ১/৬, ১/৪ ও ১/৩ ব্যায়ম। প্রথম স্তরটি ১/৬ ব্যায়ম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৯টি ইট এবং ১/৪ ব্যায়ম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ১২ ইট থাকবে। দ্বিতীয় স্তরে ১/৬ ব্যায়ম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ১৬টি ইট এবং ১/৩ ব্যায়ম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৫টি ইট থাকবে। তৃতীয় ও পঞ্চম স্তর প্রথম স্তরের ন্যায় এবং চতুর্থ স্তর দ্বিতীয় স্তরের ন্যায় সাজান হল। এ থেকে নিম্নলিখিত সমীকরণ পাই—

$$\frac{x}{m^2}+\frac{y}{n^2}=1, \quad x+y=21 \cdots\cdots(\text{ক})$$

এর দুটি মাত্র সমাধান পাওয়া যায় (ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যায়)

$x=9, y=12, m=6, n=4$

$x=5, y=16, m=3, n=4$

"গরুড় চয়ন চিতি" নির্মাণ করতে গিয়ে একটু কঠিন ধরনের একাধিক অজ্ঞাত রাশির অনির্ণেয় সমীকরণের সাক্ষাৎ মেলে।

বলা হয়েছে এটি ৭½ বর্গপুরুষ ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট এবং ৫টি স্তরে বিভক্ত। সাজানোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্তর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্তর অপেক্ষা পৃথক। প্রত্যেকটি স্তরে বিভিন্ন মাপের ২০০টি ইট থাকবে। মহর্ষি বৌধায়ণ চারটি বিভিন্ন মাত্রার ইটের কথা উল্লেখ করেছেন। এই আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত সমীকরণদ্বয় পাওয়া যায়।

$$\frac{x}{m}+\frac{y}{n}+\frac{z}{p}+\frac{u}{q}=7\tfrac{1}{2}, \quad x+y+z+u=200\cdots\cdots(\text{খ})$$

m, n, p এবং q ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা।

এখানে m, n, p এবং q এর মান সমীকরণদ্বয় সমাধান করার পর পাওয়া যায় এবং মানগুলি হচ্ছে

$$m=16, n=25, p=36, q=100\,; \quad \begin{cases} x=24, y=120, z=36, u=20 \\ \text{বা} \\ x=12, y=125, z=63, u=0 \end{cases}$$

এক্ষেত্রে পাঁচ ধরনের ইটের কথা মহর্ষি আপস্তম্ব বলছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন সমীকরণগুলির সমাধান করার জন্য বিস্তৃত আলোচনা শুল্বসূত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। আপস্তম্ব শুল্ব সূত্রের বিভিন্ন ভাষ্যকার যেমন করবিন্দস্বামী, কপর্দিস্বামী ও সুন্দররাজ

উপর্যুক্ত সমীকরণটির সমাধান বের করেছেন। তাঁদের সমাধানকৃত মানগুলি হচ্ছে এই[১]—

ভাষ্যকার	m	n	p	q	r	x	y	z	w	u
করবিন্দস্বামী	16	25	64	100	144	67	58	48	18	9
"	16	25	36	64	100	12	157	9	0	22
কপর্দিস্বামী	"	"	"	"	"	10	159	9	8	14
সুন্দররাজ	"	"	"	"	"	70	45	9	56	20
"	16	25	64	100	144	74	45	52	20	9
"	"	"	"	"	"	77	42	40	32	9

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে মহর্ষি আপস্তম্ব পাঁচ ধরণের ইটের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সমাধান নিম্নলিখিত সমীকরণদ্বয় থেকে পাওয়া যায়[২]

$x+y+z+w+u=200,$

$$\frac{x}{m}+\frac{z}{n}+\frac{z}{p}+\frac{w}{q}+\frac{u}{r}=7\tfrac{1}{2}\cdots\cdots(\text{গ})$$

অন্যান্য কতকগুলি যজ্ঞবেদী নির্মাণ করতে গিয়ে বিভিন্ন শুল্বসূত্রে নিম্নলিখিত সমীকরণগুলির সাক্ষাৎ পাই।

$$x^2+y^2=z^2\cdots\cdots(\text{ঘ}),\quad x^2+a^2=z^2\cdots\cdots(\text{ঙ})$$

$$\left.\begin{aligned}ax+by+cx+du=p\\ x+y+z+u=q\end{aligned}\right\}\cdots\cdots\cdots(\text{চ})$$

এছাড়াও আরও নানাধরণের সমীকরণ বিভিন্ন শুল্ব সূত্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

---

১. K. N. Kamalamma : On the solution of a Problem on Indeterminate equations in Sulba Sutras B. C. M. S. vol. 40 (1948), Page, 140-145.

২. S. N. Srinivasiengar—The history of ancient Indian mathematics, Page 18

একাদশ অধ্যায়

১১.১ ভারতীয় বীজগণিতে সংজ্ঞা, পরিভাষা ইত্যাদি

ইংরাজীতে যাকে আলজাব্রা বলা হয় ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে সেটি বীজগণিত নামে অভিহিত হয়ে থাকে। অবশ্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন বীজগণিত নামটি প্রথম ব্যবহার করেন পৃথুদকস্বামী। ব্রহ্মগুপ্ত বীজগণিতের নাম দেন কুট্টক গণিত বা কুট্টক। এ নামকরণের উৎস ছিল "কুট্টন" শব্দটি যার অর্থ চূর্ণন বা বিশ্লেষণ। অবশ্য পরবর্তীকালে বীজগণিতকে অব্যক্ত গণিত বলা হয়েছে। মনে হয় এই নামটি সম্পর্কে ভারতীয়দের স্বচ্ছ ও সম্যক ধারণার ফলেই উদ্ভূত হয়েছে। কারণ, সঠিক মান জানা নেই এমন রাশি নিয়ে কাজ করাই বীজগণিতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে পরিষ্কারভাবে বীজগণিতের সংজ্ঞা দেওয়া আছে কি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন—

বীজং মতিবিবিধবর্ণ সহায়িনী হি
মন্দাববোধবিধয়ে বিবুধৈর্নিজাদ্যৈঃ
বিস্তারিতা গণকতামরসাংশুমদ্ভির্যা সৈব
বীজগণিতাতাহ্বযতামুপেতা।[১]

এখানে শ্লোক দুটির অর্থ হচ্ছে "বিবিধবর্ণ সাহায্যকারিণী বুদ্ধিই বীজগণিত। অল্পবুদ্ধিদের (মন্দবুদ্ধিদের) জন্য পূর্বাচার্যগণ বলেছেন।... ... ..."

অবশ্য বীজগণিতের সংজ্ঞা এখানে অতটা পরিষ্কারভাবে না উল্লেখ থাকলেও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য পাটীগণিতের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে এ সম্পর্কে ভালভাবে এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—

দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তসংজ্ঞং
ব্যক্তং পাটীগণিতং অব্যক্তং বীজগণিতং।

অর্থাৎ গণিত দুই প্রকার ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। পাটীগণিত ব্যক্ত গণিত এবং বীজগণিত অব্যক্ত গণিত।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য আরও বলেছেন "ব্যক্তমব্যক্তবীজং" অর্থাৎ ব্যক্তগণিতের বীজ অব্যক্ত গণিত।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদগণ শুধু সংজ্ঞা এবং তুলনামূলক বিচার করেই ক্ষান্ত

১। বীজগণিত—সুধাকর দ্বিবেদী (পরে মুরলীধর ঝা কর্তৃক সংশোধিত) পৃঃ ৯৯

হননি। সঙ্গে সঙ্গে বীজগণিতের প্রয়োজনই বা কি সে সম্পর্কও বলেছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ব্রহ্মগুপ্তের লিখিত ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকদুটি তুলে ধরা যেতে পারে। এখানে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন

প্রায়েণ যতঃ প্রশ্নাঃ কুট্‌টাকারাদৃতে ন শক্যন্তে।
জ্ঞাতুং বক্ষামি ততঃ কুট্‌টাকারং সহ প্রশ্নৈঃ ॥
কুট্টকখর্ণধনাব্যক্তমধ্যহরণৈকবর্ণভাবিতকৈঃ
আচার্যস্তন্ত্রবিদাং জ্ঞাতৈর্বর্গপ্রকৃত্যা চ ॥

অর্থাৎ বীজগণিত ছাড়া কোন গণিতবিদ কোন গণিতের প্রশ্ন হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন এবং এইজন্য বীজগণিত সম্পর্কে বলছি। যে সব জ্যোতির্বিজ্ঞানী কুট্টক গণিত, শূন্যের যোগ, ধনাত্মক ঋণাত্মকাদির যোগ, অব্যক্তাদির যোগ, মধ্যমাহরণ, একবর্ণ সমীকরণ, ভাবিত গণিত, বর্গ প্রকৃতি জানবেন তিনিই আচার্য বলে স্বীকৃতি পাবেন।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একজায়গায় বলেছেন

দ্বিবিধগণিত মুক্তং ব্যক্তমব্যযুক্তং
তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ
যদি ভবতি তদেদং জ্যোতিষং ভূরিভেদং
প্রপঠিতু মধিকারী সোহন্যথা নামধারী ॥

অর্থাৎ "ব্যক্তগণিত (পাটীগণিত) ও অব্যক্ত গণিত (বীজগণিত) নামক দ্বিবিধ গণিত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং শব্দশাস্ত্রে (ব্যাকরণে) পঠীয়ান ব্যক্তিই বহুভেদ বিশিষ্ট এই জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিবার অধিকারী, অন্যথা কেবল জ্যোতিষী নামধারী হইয়া থাকে।[১]

এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে বীজগণিতের প্রয়োজনীয়তা কত এবং এটি না জানলে কি হতে পারে সে কথাই বলেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে পাটীগণিতের সঙ্গে বীজগণিতের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি অন্যত্র বলেছেন—

উপপাত্তযুতং বীজগণিতং গণিকা জগুঃ
ন চৈদেবং বিশেয়োঽস্তি ন পাটীবীজয়োর্যৎ ॥

১। শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থকৃত সিদ্ধান্ত শিরোমণির গোলধ্যায়ের পঞ্চম পৃষ্ঠার ৭ম শ্লোকের বঙ্গানুবাদ।

বীজগণিত জানলে যে গণিতজ্ঞদের মনে আনন্দানুভূতি জাগতে পারে সে কথা দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন। তিনি বলেছেন—

"উক্তং বীজোপযোগীদং সংক্ষিপ্তং গণিতং কিল।

অতো বীজং প্রবক্ষামি গণকানন্দকারকম্॥

বিশ্লেষণের (চূর্ণনের) জন্য যে গণনাবিজ্ঞানের প্রয়োজন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন গণিতজ্ঞদের আনন্দ দানের জন্য বিশ্লেষণ সম্পর্কে বলবো।

আধুনিক বীজগণিতের একটি সমীকরণ $ax^2+by^3=c$ নিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই সমীকরণটির সহগদ্বয় হচ্ছে a এবং b, ঘাত হচ্ছে দুই এবং তিন, অজ্ঞাতরাশিদ্বয় হচ্ছে x এবং y এবং c হচ্ছে ধ্রুবক সংখ্যা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রাচীন ভারতে যে সময় বীজগণিতের চর্চা ছিল তখন কি এই ধরণের পারিভাষিক শব্দ, সমীকরণ লেখার পদ্ধতি ইত্যাদি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, হ্যাঁ ছিল তবে আগেকার দিনে যে ভাবে এগুলি বলা হত বা লেখা হত তা এখনকার বীজগণিতের থেকে কিছুটা পার্থক্য ছিল। এখানে প্রথমে সহগ, তারপর অজ্ঞাতরাশি এবং সবশেষে ঘাত ও ধ্রুবক সংখ্যা নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করছি।

সহগ—সহগ বলতে যা বোঝায় প্রাচীন ভারতের গণিতশাস্ত্রে ঠিক সেরকম দেখা যায় না। তবে ব্রহ্মগুপ্ত কখনও কখনও সহগকে গুণক, গুণকার ইত্যাদি বলেছেন। ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের নানা অধ্যায়ে এর উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। যেমন বলা হয়েছে "... ... গুণক গুণাদিষ্ট যুত ... ..." অন্যত্র "গুণকে প্রথমং ... ..."

পৃথুদকস্বামী অবশ্য সহগকে অঙ্ক বা প্রকৃতি বলেছেন। এগুলি শ্রীপতি ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের (১১৫০ খ্রীঃ) লেখার মধ্যে দেখা যায়।

অজ্ঞাতরাশি—আধুনিক বীজগণিতে অজ্ঞাতরাশিকে x, y, z প্রভৃতি প্রতীক চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে ঠিক এভাবে লেখা হত না। ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বে লিখিত জৈন সাহিত্য স্থানাঙ্গ সূত্রে অজ্ঞাতরাশিকে "যাবৎ তাবৎ" বলা হয়েছে। বাক্‌শালীর পাণ্ডুলিপিতে যদৃচ্ছা, বাঞ্ছা, কামিক প্রভৃতি শব্দ অজ্ঞাত-রাশির পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। প্রথম আর্যভট অবশ্য অজ্ঞাতরাশিটিকে "গুলিকা" বলেছেন। যেমন ধরা যাক গণিতপদের ৩০ তম শ্লোকে তিনি বলেছেন "গুলিকান্তরেণ বিভজেদ... ... ...", ব্রহ্মগুপ্ত অবশ্য বলেছেন "অব্যক্ত", দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য (১১৫০খ্রীঃ) অজ্ঞাতরাশিটিকে যাবৎ তাবৎ, কালক, নীলক, পীতক, লোহিত, হরিতক, শ্বেতক, কপিলক, পিঙ্গলক, ধুম্রক, পাতলক, শ্যামলক প্রভৃতি বলেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে অজ্ঞাতরাশিটিকে ভারতীয় গণিতবিদেরা কি ভাবে লিখতেন? লক্ষ্য করা গিয়েছে যে ভারতীয়রা অজ্ঞাতরাশিকে শুধু "য়ারৎ তাবৎ" প্রভৃতি বলতেন সঙ্গে সঙ্গে এগুলি অজ্ঞাতরাশির পরিবর্তে লিখতেন। বাক্‌শালীর পাণ্ডুলিপিতে "0" প্রতীক দিয়ে লেখা হত। যেমন [1]

0	5	যু	মূ	0	স	0	7+	মূ	0
1	1			1.		1	1		1

এটিকে আধুনিক বীজগণিতে লিখলে দাঁড়ায়

$\sqrt{y+5}=m$, এবং $\sqrt{y-7}=n$

শ্রীপতি সিদ্ধান্তশেখরের অব্যক্ত গণিতাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন [2]—

যাবত্তাবত্ কালকো নীলকাদ্যা
বর্ণাঃ কল্প্যা নূনমব্যক্তমানে
তেষাং তুল্যা ভাস্বতঃ স্বোট্গমাহি
সংবর্গঃ সাদ্ভাবিতং চাপমানম্ ॥

শ্লোকটির সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে—"অব্যক্ত রাশির মান—যাবৎ-তাবৎ, কালক, নীলক, প্রভৃতি কল্পনা করবে।... ... ..." দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ও তৎপরবর্তী বহু ভারতীয় গণিতবিদই অজ্ঞাতরাশির পরিবর্তে শ্রীপতির মতই "যাবৎ-তাবৎ" ইত্যাদি বলেছেন।

শক্তি বা ঘাত—ইংরাজীতে যাকে বলে power, বাংলায় সাধারণত শক্তি বা ঘাত বলা হয়। বীজগণিতে ঘাতের প্রয়োগ ভারতবর্ষে বহু শত বৎসর আগে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় তিনশ খ্রীষ্টপূর্বে লিখিত জৈন সাহিত্য উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে ঘাতের প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে দ্বিতীয় ঘাতকে বর্গ, তৃতীয় ঘাতকে ঘন, চতুর্থ ঘাতকে বর্গ-বর্গ, ষষ্ঠ ঘাতকে ঘন-বর্গ, দ্বাদশ ঘাতকে ঘনবর্গ-বর্গ বলা হয়েছে। তিনের বেশী অযুগ্ম পূর্ণ সংখ্যার ঘাত সম্পর্কে খুব বেশী একটা উল্লেখ থাকতে দেখা যায় না। অনুযোগদ্বার সূত্রে অখণ্ড পূর্ণ সংখ্যার ঘাত এবং ভগ্নাংশের ঘাতের উল্লেখ থাকতে দেখা যায় এবং এগুলিকে আধুনিক গণিতের ভাষায় রূপ দিলে দাঁড়ায়—

প্রথম বর্গ $=a^2$, দ্বিতীয় বর্গ $=(a^2)^2=a^4$, ..., n তম বর্গ $=a^{2^n}$

১. বাক্‌শালীর পাণ্ডুলিপি Folio 59, recto.

২. Babuaji Misra—Siddhanta Sekhara of Sripati. পৃষ্ঠা ৮৬

প্রথম বর্গমূল $\sqrt{a}=a^{\frac{1}{2}}$, তৃতীয় বর্গমূল $=\sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}}=a^{\frac{1}{2^3}}$

… … … … n তম বর্গমূল $=a^{\frac{1}{2^n}}$

আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিনের অধিক অযুগ্ম পূর্ণ রাশির ঘাত সম্পর্কে খুব বেশী একটা আলোচনা ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে দেখা যায় না। তবে সপ্তম শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত এ সম্পর্কে কিছু বলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪১ তম শ্লোকটির কথা ধরা যেতে পারে। এখানে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন—

অব্যক্তবর্গ ঘনবর্গ বর্গপঞ্চগত ষড়্গতাদীনাম্।
তুল্যানাং সংকলিতব্যবকলিতে পৃথগতুল্যানাম্ ॥ ৪১

অর্থাৎ অব্যক্তবর্গ, ঘন, বর্গ বর্গ, পঞ্চঘাত, ষড় ঘাত, ইত্যাদির সমান জাতি যোগ এবং বিয়োগ হয় … … … …।

অন্যত্র বলেছেন—

সদৃশদ্বিবধো বর্গস্ত্র্যাদিবধস্তদ্ গতোঽন্যজাতিবধঃ
অন্যোঽন্যবর্ণঘাতো ভাবিতকঃ পূর্ববচ্ছেষম্। ৪২

অর্থাৎ সমান ছুটি অব্যক্তরাশি গুণ বর্গ রাশি হয়, সমান তিনটি অব্যক্তরাশির গুণ ঘন হয়, সমান চারটি রাশির গুণ বর্গ বর্গ হয়, এবং এইভাবেই পঞ্চঘাত প্রভৃতি হয় … … … …।

যাই হোক এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে পঞ্চম ঘাতকে "বর্গ ঘন ঘাত" সপ্তম ঘাতকে 'বর্গ-বর্গ-ঘন ঘাত বলা হয়ে থাকে।

ঘাতকে (বা শক্তিকে) লিখতে গিয়ে ভারতীয়রা সাধারণতঃ আদ্যক্ষর ব্যবহার করতেন। যেমন কোন রাশির ঘাত (বা শক্তি) বর্গ হলে "ব" লিখতেন। অর্থাৎ যদি ধরা যায় তাঁরা x^2 কে লিখতে চাইছেন তাহলে যা ব লিখতেন। অনেকক্ষেত্রে ছুটি ভিন্ন অজ্ঞাতরাশি বিভিন্ন ঘাত সহ গুণ করতে গিয়ে ভাবিত শব্দটির আদ্যক্ষর "ভা" বর্ণটি ভারতীয়রা লিখতেন। যেমন x^2y^3 কে "যা ব কা ঘ ভা" শব্দটি ভারতীয় বীজগণিতে দেখা যায়। বাকৃশালীর পাণ্ডুলিপিতে বর্গমূল ইত্যাদি লিখতে গিয়ে "মূ" শব্দটি লেখা থাকতে দেখা যায়। যেমন [১]

১. বাকশালীর পাণ্ডুলিপি, F. 67. V

11	7+	মূ	2
1	1		1

অর্থাৎ $\sqrt{11-7}=2.$

কোথাও কোথাও বিশেষ করে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বীজগণিতে "ক" অর্থাৎ করণীর আদ্যক্ষরটিও উল্লেখ থাকতে দেখা যায়।

ধ্রুবক রাশি : $ax+c=0$ এই ধরণের বীজগণিতীয় সমীকরণে c-রাশিটিকে ধ্রুবক রাশি বলা হয় (ইংরাজীতে এটিকে "Constant term" বলে) প্রাচীন ভারতে এটিকে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা হত। যেমন বাক্শালীর পাণ্ডুলিপিতে "দৃশ্য" বলে উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে এটির পরিবর্তে "রূপ" শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

১১.২ চিহ্নাদির ইতিহাস নিয়মাদি এবং প্রাথমিক প্রক্রিয়াদি

যোগ বিয়োগের প্রতীক চিহ্ন কবে থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আমরা জানি না। যেটুকু জানা গেছে তা থেকে বলা যায় যে, এখনকার মত "+" এবং "−" চিহ্ন তখনকার দিনে ব্যবহার করা হত না। এই চিহ্ন দুটি বিভিন্ন প্রতীক চিহ্নের ক্রমোন্নতির ফলে আজ গণিতশাস্ত্রে পাকাপাকি ভাবে স্থান করে নিয়েছে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন খ্রীষ্টপূর্ব পনেরশ শতাব্দীতে মিশরে আহ্‌মীসরা প্রথম যোগ এবং বিয়োগ চিহ্ন ব্যবহার করেন। তাঁরা ∧ এবং ↗ চিহ্নদুটি যোগ এবং বিয়োগকে বুঝাতে চেয়েছেন।[১] যদিও এখন যেমন "+" এবং "−" চিহ্নের ব্যবহার হয়তো তাঁরা এভাবে বোঝাতে চান নি। অনেক পণ্ডিত বলেন আহ্‌মীসরা "∧" চিহ্নটি ডান থেকে বাঁদিকে বোঝাবার জন্য ব্যবহার করেছেন কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়রা এটিকে বাঁদিক থেকে ডান দিককে বুঝিয়েছেন।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ডায়োফাণ্টাস (২৭৫ খ্রীঃ) তাঁর এরিথমেটিকা গ্রন্থে যোগ বিয়োগ চিহ্নের স্পষ্ট ব্যবহার করে গিয়েছেন তিনি "↑" চিহ্নটিকে বিয়োগ চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করে গিয়েছেন। অবশ্য এ মত বিখ্যাত গণিত ঐতিহাসিক টি. এল. হীথের।[২] হীথ বলেছেন ψ চিহ্নটি যখন উল্টিয়ে লেখা যায় তখন দাঁড়ায় ⋔ এবং এটির ক্রমোন্নতির ফলে "↑" চিহ্নটি এসেছে।

এবার ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে যোগ, বিয়োগ চিহ্নের ব্যবহার কি ভাবে হত এবং

১. Smith, D. E—History of Mathematics Vol 2, Page-396

২. Heath, T. L—History of Greek Mathematics Vol-2, Page-452

কি ধরনের হত তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমেই এ ব্যাপারে বাক্‌শালীর পাণ্ডুলিপির কথা মনে আসে এবং এখানে যোগ ও বিয়োগ চিহ্নের যে প্রতীক ব্যবহৃত হতে দেখা যায় তা রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক। এই পাণ্ডুলিপিতে "+" চিহ্নটি ব্যবহৃত হত বিয়োগের প্রতীক হিসাবে। এবং চিহ্নটি সেই সংখ্যাটির পরে বসান হত যেটি অন্য কোন মূল সংখ্যা থেকে বিয়োগ করা হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে—

১ ৩ ৬ + = ১৩ − ৬ = ৭

১ ১

ডাঃ থিবো, হের্নলে প্রমুখেরা মনে করেন + এবং ♇ মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। তাঁদের এ মন্তব্যে ক্যে বলেছেন এ ব্যাপারে ভারতীয়রা গ্রীকদের কাছে ঋণী। কিন্তু গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে এ ব্যাপারে ভারতীয়রা গ্রীকদের কাছে ঋণী নয়।[১] বাক্‌শালীর পাণ্ডুলিপির "+" চিহ্নটির উৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। এবং লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় পরবর্তী ভারতীয় গণিত শাস্ত্রে "+" চিহ্নটিকে বিয়োগ চিহ্নের প্রতীক হিসাবে খুব কমই ব্যবহৃত হতে দেখা যায় (অবশ্য আমার মনে হয় পরবর্তী কালে এটি আদৌ ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে) ভারতীয়রা সাধারণত সে প্রক্রিয়াটি করতেন তার আদ্যক্ষার সংখ্যাটির শেষে বসিয়ে ঐ প্রক্রিয়াটিকে বোঝাতে চাইতেন। যোগ করতে গিয়ে তারা "যু" অক্ষরটি ব্যবহার করতেন। এটি "যুত" শব্দের আদ্যক্ষর। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত উদাহরণটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

৫ ৪

১ ১ যু (যু)

বিয়োগ করতে হলে "ঋণ" শব্দটির আদ্যাক্ষর "ঋ" বর্ণটি ব্যবহার করা হত। অনেক পণ্ডিত মনে করে ঋ বর্ণটির ক্রমোন্নতির ফলেই "+" চিহ্নটি ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে দেখা যায়। অনেক পণ্ডিত অবশ্য অশোক লিপির ক (ক) বর্ণটির সঙ্গে "+" চিহ্নের সাদৃশ দেখেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ হ্যের্ণলে অনুমান করেন ক বর্ণটি সংস্কৃত। কনীয়স বা ন্যূন শব্দ থেকে এসেছে।২ উভয়েই অর্থ হচ্ছে "কমাও" বিখ্যাত গণিত ঐতিহাসিক ডঃ বিভূতিভূষণ দত্ত মনে করেন—সংস্কৃত ক্ষয় শব্দটির

১. Bibhuti Bhusan Datta—The Bhaksali Mathematics, Bulletin of the Calcutta mathematical Society. 1929, Vol-21, Page 1—60.

২. Brijmohan—History of plus and minus signs. I. J. H. S., Vol. 2, 1967, P-47-51

ক্রমবিকাশের ফলে "+" চিহ্নটি ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে এসেছে। বিখ্যাত টীকাকার পৃথুদকস্বামী এবং তৎপরবর্তী বহু ভারতীয় গণিতবিদ যে সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হবে তার মাথায় একটি বিন্দু (˙) বসিয়ে বিয়োগ চিহ্নকে বোঝাতে চেয়েছেন। যেমন ধরা যাক ১২৭=৫।

যাই হোক এখন চিহ্নের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা না করে চিহ্নাদির নিয়ম (বা সূত্র) সম্বন্ধে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে কে কি বলেছেন তা নিয়ে কিছু বলা যাক। অবশ্য আমরা ইতিপূর্বে পাটীগণিতের মধ্যে যোগ; বিয়োগ প্রভৃতির নিয়মগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানেও প্রায় একই তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

চিহ্নাদির নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করতে দেখা যায় ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে, গণিতসার সংগ্রহে, সিদ্ধান্ত শেখরে, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বীজগণিত প্রভৃতি গ্রন্থে। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন "দুটি ধনাত্মক রাশির যোগ ধনাত্মক, দুটি ঋণাত্মক রাশির যোগ ঋণাত্মক এবং ঋণাত্মক ও ধনাত্মক রাশির যোগ তাদের পার্থক্যকে বোঝাবে।

মহাবীর গণিতসারসংগ্রহে বলেছেন "ধনাত্মক রাশিদ্বয়ের যোগফল তাদের পার্থক্যকে বোঝাবে। দুটি ধনাত্মক রাশির যোগফল ধনাত্মক ও দুটি ঋণাত্মক রাশির যোগফল ঋণাত্মক হবে।"

শ্রীপতি সিদ্ধান্ত শেখরে বলেছেন ঃ

ঐক্যং যুতৌ স্যাত্ ক্ষয়য়োঃ স্বয়োশ্চ
ধনর্ণয়োরন্তরমেব যোগঃ
সংশোধ্যমানং স্বমৃণং তথর্ণং
ধনং ভবেদ্যুক্তবদত্র যোগঃ ॥[১]

অর্থাৎ দুটি ধনরাশির বা দুটি ঋণরাশি যোগ হয়ে থাকে। একটি ধন অপরটি ঋণ হলে তাদের অন্তরই যোগ। বিযোজ্য ধন হলে বিয়োগ স্থলে তা ঋণ হবে এবং ঐরূপ ঋণরাশি ধন হবে। অতঃপর এদের যোগ করতে হবে।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এঁদের কথাই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

বিয়োগ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত ব্রাহ্মস্ফুটে বলেছেন—

ধনয়োর্ধনমৃণমৃণয়োর্ধনর্ণ য়োরন্তরং সমৈক্যংখম্
ঋণমৈক্যং চ ধনমৃণধন শূন্যয়োঃ শূন্যয়োঃ শূন্যম্ ॥[২]

---

১. Babuaji Misra—Siddhanta S´ekhara. of Sripati—Ch XIV (iii)

২. ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত—অষ্টাদশ অধ্যায়, ৩০তম শ্লোক।

অর্থাৎ বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র বিয়োগ করলে ধনাত্মক, ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক বিয়োগ দিলে ধনাত্মক, আবার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ বিয়োগ দিলে বিপরীত হবে অর্থাৎ ঋণাত্মকটি ধনাত্মক ও ধনাত্মকটি ঋণাত্মক হবে। ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক বিয়োগ অথবা ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক বিয়োগ দিতে গেলে যোগ করতে হয়।

মহাবীর, শ্রীপতি, ভাস্করাচার্য (দ্বিতীয়) প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

গুণের নিয়ম সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন—

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক রাশিদ্বয়ের গুণফল ঋণাত্মক, দুটি ঋণাত্মক রাশির গুণফল ধনাত্মক, দুটি ধনাত্মক রাশির গুণফল ধনাত্মক। অর্থাৎ এটিকে আধুনিক গণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়

$$a \times (-b) = -ab,\ a \times b = ab,\ -a \times (-b) = ab.$$

মহাবীর গণিতসারসংগ্রহে, শ্রীপতি সিদ্ধান্ত শেখরে এবং দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বীজগণিতে এই একই কথা বলেছেন।

ভাগ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন ঃ

ধনভক্তং ধনমৃণহৃতমৃণং ধনং ভবতি খং খভক্তং খম্।

ভক্তমৃণেন ধনমৃণং ধনেন হৃতমৃণমৃণং ভবতি।[১]

অর্থাৎ "ধনাত্মককে ধনাত্মক দিয়ে অথবা ঋণাত্মককে ঋণাত্মক দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল ধনাত্মক হবে।" কিন্তু ধনাত্মক রাশিকে ঋণাত্মক বা ঋণাত্মক রাশিকে ধনাত্মক দিকে ভাগ দিলে ঋণাত্মক ভাগফল হবে। আধুনিক গণিতে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় ঃ

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b},\quad \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b},\quad \frac{-a}{b} = \frac{-a}{b},\quad \frac{a}{-b} = \frac{-a}{b},$$

শ্রীপতি, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এই একই সূত্র তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

উদ্ঘাত, ও অবঘাতন সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি মহাবীর, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা রীতিমত আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন—

"খোদ্ধৃত মৃণং ধনং বা তচ্ছেদং খমৃণধনবিভক্তং বা

ঋণাধনয়ো বর্গ স্বংখং খস্য পদং কৃতির্যত্ তত্।"[২]

অর্থাৎ ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক রাশির বর্গ ধনাত্মক।......

মহাবীর গণিত সার সংগ্রহে বলেছেন ঃ

ধনং ধনর্ণয়োর্বর্গৌ মূলে স্বর্ণে তয়োঃ ক্রমাত্।

ঋনং স্বরূপতোঽবর্গো যতস্তস্মান্ন তত্ পদম্।

১, ২, ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত (১৮ অঃ) ৩০ তম শ্লোক, ৩৫ তম শ্লোক,

অর্থাৎ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক রাশির বর্গ ধনাত্মক। এদের বর্গমূল ধনাত্মক বা ঋণাত্মক কিন্তু ঋণাত্মক রাশির বর্গমূল হতে পারে না।

এ থেকে বোঝা যে সে মহাবীরের সময় কাল্পনিক রাশির প্রচলন হয় নাই। কিন্তু দুটি বীজের কথা সে সময়ে তাঁরা জানতেন।

শ্রীপতি সিদ্ধান্ত শেখরের চতুর্দশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে বলেছেন—

ধনং ক্ষয়স্যাথ ধনস্য বর্গৌ
তে এব মূলে তু তয়োর্ভবেতাম্।
ঋণস্য নো মূলমবর্গহেতো—
রিত্থং ঘনস্যাপি বিধির্বিধেয়ঃ ॥

অর্থাৎ ঋণ বা ধনরাশির বর্গ ধনই হবে। ধনাত্মক বর্গরাশির মূল ধন। ……… ……। ঋণাত্মক রাশির বর্গমূল নাই। যেহেতু তাহা বর্গ নহে। …………। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রায় একই কথা বলেছেন।

আধুনিক বীজগণিতে যদি $\alpha_1 x+\beta_1 y+\gamma_1$ এবং $\alpha_2 x+\beta_2 y+\gamma_2$ এই দুটি যোগ করতে হয় তাহলে প্রথমে আমরা লিখি

$$\begin{array}{l}\alpha_1 x+\beta_1 y+\gamma_1\\ \alpha_2 x+\beta_2 y+\gamma_2\\ \hline (\alpha_1+\alpha_2)x+(\beta_1+\beta_2)y+(\gamma_1+\gamma_2)\end{array}$$

অর্থাৎ x-এর তলে x; y-এর তলে y প্রভৃতি রেখে যোগ বা বিয়োগ করি। এ ধরণের সূত্র বা নিয়ম (যাই বলা হোক না কেন) ভারতীয় বীজগণিতে দেখা যায়। যেমন ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪১ তম শ্লোকে বলা হয়েছে

অব্যক্তবর্গ ঘনবর্গ বর্গপঞ্চগত ষড়্গতাদীনাম।
তুল্যানাং সংকলিত ব্যবকলিত পৃথগতুল্যানাম্।

অর্থাৎ অজ্ঞাত রাশির বর্গের সঙ্গে সেই জাতীয় অজ্ঞাত রাশির বর্গ, অজ্ঞাত রাশির ঘনবর্গের সঙ্গে সেই জাতীয় অজ্ঞাতরাশির ঘনবর্গ, অজ্ঞাতরাশির ষড়ঘাতের সঙ্গে সেই জাতীয় অজ্ঞাতরাশির ষড়ঘাত যোগ বা বিয়োগ করতে হবে। …………।'

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন—

"যোগোঽন্তরং তেষু সমানজাত্যোর্বিভিন্ন জাত্যোশ্চ পৃথক্ স্থিতিশ্চ ॥"

একই জাতের অজ্ঞাতরাশির সঙ্গে একই জাতের অজ্ঞাতরাশির যোগ বা বিয়োগ করবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাস্করাচার্যের বীজগণিত থেকে একটি উদাহরণ তুলে দেওয়া হল।

যাবত্তাবত্ কালক—
নীলকবর্ণাস্ত্রিপঞ্চসপ্ত ধনম্
দ্বিত্র্যেকমিতৈঃ ক্ষয়গৈঃ
সহিতা-রহিতাঃ কতি স্যুস্তৈঃ।

ন্যাসঃ "যা ৩ কা ৫ নী ৭। যা ২̇ কা ৩̇ নী ১̇। যোগে জাতং যা ১ কা ২ নী ৬। বিয়োগে জাতং যা ৫ কা ৮ নী ৮।"

যোগেকৃতে	বিয়োগেকৃতে
যা ৩ কা ৫ নী ৭	যা ৩ কা ৫ নী ৭
যা ২̇ কা ৩̇ নী ১̇	যা ২̇ কা ৩̇ নী ১̇
যা ১ কা ২ নী ৬	যা ৫ কা ৮ নী ৮

এখানে ২̇, ৩̇ এবং ১̇ এর অর্থ −২, −৩ এবং −১, অর্থাৎ উপর্যুক্ত আলোচনা আধুনিক বীজগণিতে করলে হবে,

$$\begin{array}{r} 3x+5y+7z \\ -2x-3y-\ z \\ \hline x+2y+6z \end{array} \qquad \begin{array}{r} 3x+5y+7z \\ -2x-3y-\ z \\ \hline 5x+8y+8z \end{array}$$

বীজগণিতীয় গুণ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ব্যাপক আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বীজগণিতে সূত্র দেবার পর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

যাবত্তাবত্ত্রয়মৃণ মৃণং কালকৌ নীলকঃ স্বং
রূপেণাঢ্যা দ্বিগুণিতমিতৈস্তৈ স্ত তৈরেব নিঘ্নাঃ।
কিং স্যাসাত্তেষাং গুণনজফলং গুণ্যভক্তং চ কিং স্যাদ্
গুণয়স্যাথ প্রকথয় কৃতিং মূলমস্যাঃ কৃতেশ্চ।

ন্যাস : গুণ্যঃ যা ৩̇ কা ২̇ নী ১ রু ১
গুণকঃ যা ৬̇ কা ৪̇ নী ২ রু ২

"গুণিতে জাতং যাব ১৮ কাব ৮ নীব ২ যাকাভা ২৪ যনীভা ১২̇ কানীভা ৮̇ যা ১২̇ কা ৮̇ নী ৪ রু ২।"

আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়

$$-3x-2y+\ z+1$$
$$-6x-4y+2z+2$$

$18x^2(=\text{যাব ১৮})+8y^2+2z^2-24xy-12xz-8yz-12x-8y+8z+2.$

বীজগণিতে ভাগ, বর্গ, বর্গমূল সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, নারায়ণ জ্ঞানরাজ বেশ ভালভাবেই আলোচনা করেছেন।[১]

১১.৩ সমীকরণ ও তার শ্রেণী বিভাগ

সমীকরণ শব্দটি ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে সমকরণ বা সমীকরণ বলেছেন। আরও সহজে বলা হয় "সম"। টীকাকার পৃথুদকস্বামী সমীকরণকে "সাম্য" বলেছেন। শ্রীপতি বলেছেন সদৃশ-করণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ সিদ্ধান্তশেখরের চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম শোকটির উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

বস্বর্ণকুট্টকক্কতি প্রক্কতি প্রভেদা
নব্যক্তবর্ণসদৃশীকরণে চ বীজে
তে মধ্যমাহরণভাবিতকে চ বুদ্ধা
নিস্মংশয়ং ভবতি দৈববিদাং গুরুত্বম্।

অর্থাৎ "ধন ঋণ কুট্টক, বর্গপ্রক্কতি, অব্যক্ত সমীকরণ, অনেকবর্ণ সমীকরণ, মধ্যমাহরণ এবং ভাবিত প্রভৃতি জ্ঞাত হইলে দৈববিৎদের মধ্যে তাহার গুরুত্ব হয়।"

এ প্রসঙ্গে শুধু ব্রহ্মগুপ্তের শ্লোকটি উদ্ধৃত করছি

বর্ণ প্রমাণ ভাবিত ঘাতো ভবতীষ্টবর্ণ সঙ্খ্যৈবম্।
সিদ্ধতি বিনাঽপি ভাবিত সমকরণাত্ কিং কৃতং তদতঃ। ১৮।৬৩

যাইহোক আমরা দেখলাম ইংরাজীতে যাকে equation বলা হয়েছে ভারতীয়রা সমীকরণ, সমীকার বা সমক্রিয়া বলেছেন। সম অর্থাৎ সমান ক্রিয়া অর্থাৎ করা। সুতরাং সমক্রিয়ার অর্থ হচ্ছে সমান করা।

সমীকরণ গঠন করতে গিয়ে পৃথুদকস্বামী বলেছেন অজ্ঞাত রাশির পরিবর্তে যাবৎ তাবৎ বসাও। তারপর গুণ, ভাগ ইত্যাদি দুইটি পক্ষ করে দুই পক্ষ সমান কর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সমীকরণটি কিভাবে লেখা হত?

বাকৃশালীর পাণ্ডুলিপিতে সমীকরণ লেখা হত এই ভাবে

০	৫	যু	মূ	০		স	০	৭+	মূ	০
১	১			১			১	১		১

এটিকে আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়

$\sqrt{x-5}=m, \quad \sqrt{x-7}=n.$

১. Bibhuti Bhusan Datta and Avadhesh Narayan Singh; History of Hindu Mathematics, Part 2 Pages 17—28.

বাকশালীর পাণ্ডুলিপিতে যে ভাবে সমীকরণ লেখা হয়েছে পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি চোখে পড়ে না। সমীকরণ লেখার ক্ষেত্রে দেখা গেল একটি পক্ষকে প্রথমে লিখে তারপর দ্বিতীয় পক্ষকে পাশে না লিখে নীচে লেখা হত। যেমন পৃথূদকস্বামী তার টীকায় বলেছেন

যা ব ০ যা ১০ রু ৮̇ $(x^2 0+x10-8)$

যা ব ১ যা ০ রু ১ (x^2+x0+1)

এখানে x^2=যা ব, x=যা, এবং বিয়োগ চিহ্নকে বোঝাতে গিয়ে সংখ্যার মাথায় একটি বিন্দু দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য সমীকরণকে লিখতেন এই একইভাবে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর একটি উদাহরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে সমীকরণ পাত করতেন এবং তারপর কিভাবে সমাধান করতেন পরে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করছি—

অসমানসমচ্ছেদান রাশীংস্তাংশ্চতুরোবদ
যদৈক্যং যদ ঘনৈক্য বা যেষাং বর্গৈক্যসংমিতম্।

অত্র রাশয়ঃ যা ১, যা ২, যা ৩, যা ৪, এষাং যোগঃ যা ১০
বর্গযোগেনানেব যাব ৩০, সম ইতি পক্ষৌ যাবত্তাবতাঽপবর্তে
ন্যাসঃ

যা ৩০ রূ ০
যা ০ রূ ১০

সমশোধনাদিনা প্রাপ্তল্লব্ধযাবত্তারমানেনোত্থাপিতা রাশঃ
$\frac{১}{৩}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{৩}{৩}$, $\frac{৪}{৩}$।

এখানে সমশোধন কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, শ্রীপতি প্রমুখেরা উল্লেখ করেছেন।

শ্রীপতি তাঁর সিদ্ধান্ত শেখরের চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৭ তম শ্লোকে বলেছেন—

বর্গো যতোঽব্যক্তগুণং চ শোধ্যং
সমুজ্‌ভ্য রূপাণি তদন্যতস্তু
রূপাণি বর্গৈগুর্ণয়েচ্চতুর্ভি
রব্যক্তবর্গং চ নিধায় মূলম্।

অর্থাৎ "বর্গসমীকরণে দুটি সমানপক্ষস্থলে প্রথম (এক) পক্ষ হইতে অব্যক্তবর্গ এবং অব্যক্ত রাশি শোধন করিবে এবং দ্বিতীয় পক্ষে প্রথম পক্ষের রূপ (ব্যক্ত) রাশি শোধন করিবে। অতঃপর বর্গের সহিত স্থির রূপ রাশিকে চতুরাহত করিয়া

(অর্থাৎ উভয়পক্ষকে চার দ্বারা গুণ করিয়া তাহাতে কিছু অব্যক্ত বর্গ যোগ করিয়া) মূল গ্রহণ করিবে।"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে শেষের লাইন গুলি $ax^2+bx+c=0$ ধরণের সমীকরণের বীজ নির্ণয় করার পদ্ধতি বলছেন।

এই সমস্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে সমীকরণ কিভাবে গঠন করতে হয় তা পুঙ্খানুপঙ্খভাবে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা আলোচনা করেছেন। এবার সমীকরণের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে ভারতীয়রা কি বলেছেন তা আলোচনা করা যাক।

তাঁরা সমীকরণকে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা

(ক) যাবৎ তাবৎ (Simple equation), (খ) বর্গ (Quadratic equation), (গ) ঘন (Cubic equation) (ঘ) বর্গ-বর্গ (biquadratic equation)

ব্রহ্মগুপ্ত সমীকরণকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা

(ক) একবর্ণ সমীকরণ (equations in one unknown quantity)

(খ) অনেকবর্ণ সমীকরণ (equation in several unknowns)

(গ) ভাবিত (equation involving products of unknowns)

একবর্ণ সমীকরণ আবার দুভাগে বিভক্ত। যথা (১) রৈখিক সমীকরণ (linear equations) (২) অব্যক্তবর্গ সমীকরণ (quadratic equations)

বিখ্যাত ভাষ্যকার পৃথুদক স্বামী সমীকরণকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন।

(ক) একবর্ণ সমীকরণ (খ) অনেকবর্ণ সমীকরণ (গ) মধ্যমাহরণ (equations with one, two or more unknowns in their second and higher powers.) (ঘ) ভাবিত।

এছাড়াও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, শ্রীপতি প্রমুখেরা সমীকরণের বিভাগ সম্বন্ধে অথবা কয়েক প্রকার সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে কতকগুলি সমীকরণ উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি পূর্বসূরীরা উল্লেখ করে নাই।

---

১. যাদবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এটির বঙ্গানুবাদ ক'রে দেওয়ায় আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

দ্বাদশ অধ্যায়

১২.১ একমাত্রার সরল সমীকরণ

একমাত্রার সরল সমীকরণ নিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে রীতিমত চর্চা হয়েছিল। এর প্রথম সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় শুল্ব সূত্রে। কিছু কিছু নিদর্শন খ্রীষ্টপূর্বে রচিত স্থানাঙ্গ সূত্রেও পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে প্রথম আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা এ নিয়ে ব্যাপক অথচ পদ্ধতিগতভাবে আলোচনা করেছেন। একমাত্রার সরল সমীকরণ প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(ক) একটি অজ্ঞাত রাশিবিশিষ্ট এক মাত্রার সরল সমীকরণ, (খ) দুটি অজ্ঞাতরাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সরল সমীকরণ ও (গ) অনেকগুলি অজ্ঞাতরাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সরল সমীকরণ।

(ক) দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একটি অজ্ঞাত রাশিবিশিষ্ট একমাত্রার সরল সমীকরণ সমাধানের জন্য অনেক পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। ইষ্টকর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এগুলির মধ্যে একটি। তিনি লীলাবতীতে প্রথমে 'ইষ্টকর্ম' পদ্ধতির সংজ্ঞা দেন, তারপর উদাহরণ সহযোগে এটি আরও সহজ করে তোলেন। তিনি বলেন[1],

"অথেষ্ট কর্ম্মস্থ করণ সূত্রং বৃত্তম্। উদ্দেশকালাপবদিষ্ট রাশিঃ ক্ষুণ্ণো হৃতোহংশৈঃ রহিতো যুতো বা। ইষ্টাহতং দৃষ্টমনেন ভক্তং রাশির্ভবেদ প্রোক্তমিতীষ্ট কর্ম্ম ॥

অনুবাদ[2]—যে কোন রাশি ইচ্ছানুরূপ ধরিয়া লইলেই চলিবে। তাহাকে গুণ করিলে অথবা ভাগ করিলে এবং ভগ্নাংশের দ্বারা যোগ করিলে অথবা বিয়োগ করিলে প্রদত্ত রাশি ধরিয়া লওয়া রাশি দ্বারা গুণ করিলে এবং তাহা দ্বারা ভাগ করিলে নির্ণেয় রাশি বাহির হইবে। ইহাকেই ইষ্টকর্ম বলা হয়।

অত্রোদ্দেশকঃ। পঞ্চঘ্ন স্বত্রিভাগোনো দশভক্তঃ সমন্বিতঃ।
রাশিত্র্যংশার্দ্ধপদৈঃ স্যাৎ কো রাশির্দ্ব্যূন সপ্ততিঃ।

অনুবাদ[3]—উদাহরণ : এমন কোন সংখ্যা আছে, যাহাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলের সহিত মূল সংখ্যার $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$ অংশ যোগ করিলে দুই কম সত্তর পাওয়া যায়।

---

১. লীলাবতী (কোলেব্রুকের অনুবাদ এবং হারাণচন্দ্র ব্যানার্জির টীকা সহ)—পৃষ্ঠা ১৬—১৭
২. অঙ্কভাবনা (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী—১৯৬৫) পৃষ্ঠা—১৫
৩. অঙ্কভাবনা (অনুরূপ)

ন্যাসঃ। গুণঃ ৫। স্বত্রিভাগঃ $\frac{১}{৩}$। হরঃ ১০। রাশ্যংশাঃ $\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{৪}$ দৃশ্যম্ ৬৮

অত্র কিল কল্পিত রাশিঃ ৩। পঞ্চঘ্নঃ ১৫। স্বত্রিভাগোনঃ। দশভক্তঃ ১। কল্পিত ৩। রাশেস্ত্র্যংশার্দ্ধপ্যাদৈঃ $\frac{৩}{৩}$, $\frac{৩}{২}$, $\frac{৩}{৪}$ সমন্বিতো হরো জাতঃ $\frac{১৭}{৪}$ অথ দৃষ্টম্। ৬৮। ইষ্টেন ৩। গুণিতম ১০৪ × $\frac{১৭}{৪}$ হরেণ ভক্তং জাতো রাশিঃ ৪৮।

এবং সর্ব্বত্রোদাহরণে রাশিঃ কেন চিদগুণিতো ভক্তো বা রাশ্যংশেন রহিতো যুতো বা ইষ্টস্তত্রেষ্টং রাশিং প্রকল্প্য তস্মিন্নুদ্দেশকালাপবৎকর্ম্মণি কৃতে যন্নিষ্পদ্যতে তেন দৃষ্ট মিষ্টগুণং ফলং রাশিঃ স্যাৎ।

অনুবাদ[৪]—বর্ণনা: ৫ দ্বারা গুণ। $\frac{১}{৩}$ তাহা হইতে বিয়োগ। দশ দ্বারা ভাগ। পরে ইহার সহিত $\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{৪}$ যোগ করিতে হইবে। নির্ণেয় রাশি ৬৮ হইবে। ধরিয়া লওয়া হইল রাশি ৩। ৫ দিয়া গুণ করা হইল = ১৫। একের তিন অংশ বাদ দেওয়া হইল = ১০। দশ দ্বারা ভাগ করা হইল = ১। যে রাশি ধরা হইয়াছিল অর্থাৎ ৩ ইহার সহিত $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{২}$ এবং $\frac{১}{৪}$ যোগ করা হইল, অর্থাৎ $\frac{৩}{৩}$, $\frac{৩}{২}$, $\frac{৩}{৪}$ যোগফল হইল $\frac{১৭}{৪}$। ৬৮কে ইহার দ্বারা ভাগ করা হইল। অতএব ৬৮ × ৩ ÷ $\frac{১৭}{৪}$ = ৪৮। এইভাবে যে কোন রাশি এক ধরিয়া লইলে সকল ক্ষেত্রেই একই রকম হইবে।

এইভাবে যে কোন রাশি গ্রহণ করিলে এবং তাহাকে গুণ করিলে অথবা যে কোন ভগ্নাংশ লইয়া যোগ করিলে বা বিয়োগ করিলে যে রাশি ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহাই হইবে। যে ফল হইবে তাহাকে প্রদত্ত রাশি দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল সেই অনুসন্ধেয় রাশি হইবে।

উপরোক্ত উদাহরণটি আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়—

$$\frac{5x-\frac{5x}{3}}{10}+\frac{x}{3}+\frac{x}{2}+\frac{x}{4}=70-2.$$

$x=3$ ধরে গণনা করলে

$$\frac{5\times 3-5\times\frac{3}{3}}{10}+\frac{3}{3}+\frac{3}{2}+\frac{3}{4}=\frac{17}{4}$$

তারপর $x=68\times 3\div\frac{17}{4}=48$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এই উদাহরণটির পর আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণটি হচ্ছে এইরকম—

"যূথার্দ্ধং সত্রিভাগং বন বিচরব্রতং কুঞ্জরাণাঞ্চ ইষ্টং যড়ভাগশ্চৈব নদ্যাং পিবতি

৪. অঙ্কভাবনা (অনুরূপ)

চ সলিলং সপ্তমাংশেন মিশ্রঃ। পদ্মিন্যা চাষ্টমাংশঃ স্বনবম সহিতঃ ক্রীড়তে মাহুরাগো নাগেন্দ্রা হস্তিনীভিস্ত্রিস্থভি রনুগতঃ কা ভবেৎ যুথসঙ্খ্যা।" অর্থাৎ একটি হস্তির দল হইতে ইহার তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধেক বন মধ্যে বিচরণ করিতেছিল। ইহার সপ্তমাংশের সহিত একের ষষ্ঠাংশ নদীতে জলপান করিতে গিয়াছিল। ইহার অষ্টমাংশের সহিত পদ্মবনে খেলা করিতে গিয়াছিল। দলপতিকে তিনটি হস্তিনীর সহিত দেখা গেল। সেইদলে কতগুলি হস্তী ছিল?[১]

বীজগণিতীয় পদ্ধতিতে এটির সমাধান হচ্ছে এইরূপ—

যদি নির্ণেয় সংখ্যা $=x$ ধরা যায় তাহলে

$$\left(\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{5}+\tfrac{1}{6}+\tfrac{1}{4}\right)x+6=x \quad \text{বা } x=120$$

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, কোলেব্রুক সাহেব লীলাবতী অনুবাদ করতে গিয়ে এটিকে ভুলে অথবা যে কোন কারণেই হ'ক এড়িয়ে গেছেন। পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত লীলাবতীতে এই উদাহরণটি দেখা যায়।[২]

একটি অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সমীকরণ সমাধানের আরও নানা পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে একটি পদ্ধতি প্রথম আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে প্রথম আর্যভট বলেছেন—

"গুলিকান্তরেণ বিভজেদ্ দ্বয়োঃ পুরুষয়োস্ত রূপকবিশেষম্।
লব্ধং গুলিকামূল্যং সদ্যর্থকৃতং ভবতি তুল্যম্।"[৩]

অর্থাৎ দুই ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞাত পরিমাণ রাশির পার্থক্যকে অজ্ঞাত রাশিদ্বয়ের সহগের পার্থক্য দিয়ে ভাগ দিলে ঐ ভাগফলই অজ্ঞাত রাশি।

অর্থাৎ বলা যেতে পারে—দুই ব্যক্তির অর্থের পরিমাণ সমান। প্রথম ব্যক্তির কোন অজ্ঞাত রাশির a পরিমাণ এবং তৎসহ নগদ c একক অর্থ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ অজ্ঞাত রাশির b পরিমাণ এবং তৎসহ নগদ d একক অর্থেই সমান হলে অজ্ঞাত রাশিটি কত?

আধুনিক বীজগণিতে প্রকাশ করলে দাড়ায়

$$ax+c=by+d \quad \text{বা,} \quad x=\frac{d-c}{a-b}$$

---

১. অঙ্কভাবনা—(অনুরূপ)

২. লীলাবতী (কোলেব্রুকের অনুবাদ এবং হারাণচন্দ্র ব্যানার্জীর সহ) পৃষ্ঠা—৩০

৩. আর্যভটীয় (গণিতপাদ) শ্লোক—৩০

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মগুপ্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৩-তম শ্লোকে বলেছেন—

"অব্যক্তান্তরভক্তেং ব্যস্তং রূপান্তরং সমেঽব্যক্তঃ।
বর্গাব্যক্তাঃ শোধ্যা যস্মাদ্রূপাণি তদধস্তাত্ ॥"

অর্থাৎ একবর্ণ সমীকরণে রূপদ্বয়ের (constant terms) বিপরীতকে (চিহ্নযুক্ত) অব্যক্তদ্বয়ের সহগের অন্তর দিয়ে ভাগ দিলে অব্যক্ত মান পাওয়া যাবে।..........।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপতি বলেছেন—

"অব্যক্ত বিশ্লেষহৃতে প্রতীপ—
রূপান্তরেঽব্যক্তমিতী ভবেতাম্।
স্যাদ্বা যুতোনাহতভক্তমিচ্ছে—
ত্তদাঽন্যপক্ষে বিহিতে তথৈব।"[১]

অর্থাৎ একবর্ণ সমীকরণস্থলে প্রথম এবং দ্বিতীয় পক্ষের বর্ণকে যোগ বা বিয়োগ করিয়া একপক্ষে আনয়ন করিবে এবং রূপরাশিকে ঐ ভাবে অন্যপক্ষে লইয়া যাইবে, অতঃপর অব্যক্তের রূপরাশিদ্বারা ব্যক্ত রাশিকে ভাগ করিলে অব্যক্তমান পাওয়া যাইবে।[২]

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রায় একই কথা বলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"একস্য রূপত্রিশতী ষড়শ্বা অশ্বা দশান্যস্য তু তুল্যমৌল্যাঃ।
ঋণং তথা রূপশতঞ্চ তস্য তৌ তুল্যবিত্তৌ চ কিমশ্বমৌল্যম্।"

অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তির কাছে ৩০০ মুদ্রা ও ৬টি ঘোড়া আছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে ১০টি ঘোড়া এবং ১০০ মুদ্রা ঋণ আছে। ঘোড়ার মূল্য কত?

আধুনিক গণিতে রূপ দিলে দাঁড়ায়, $6x+300=10x-100$

উপযুরোক্ত দুইটি পদ্ধতি ছাড়াও ভারতবর্ষে আরও একটি পদ্ধতি চালু ছিল। সেই পদ্ধতির নাম Rule of false positions এবং এই পদ্ধতি বাকশালীর পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে অধিকাংশ ভারতীয় গ্রন্থে এই পদ্ধতিটি অনুপস্থিত। তবে শ্রীধরাচার্য, মহাবীর এবং দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের গ্রন্থাদির মধ্যে এই পদ্ধতির সীমিত প্রয়োগ দেখা যায়।

(খ) দুটি অজ্ঞাতরাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সরল সমীকরণ নিয়ে ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি,

---

১. সিদ্ধান্ত শেখর (বাবুয়াজী মিশ্র সম্পাদিত) পৃষ্ঠা—১০৫, শ্লোক—১৪

২. যাদবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এই অনুবাদটি ক'রে দিয়েছেন।

শ্রীধরাচার্য, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখ ভারতীয় গণিতবিদেরা আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ সূত্র দিয়েছেন, কেউবা শুধুমাত্র উদাহরণ দিয়েছেন, আবার কেউ উদাহরণ সহ সূত্র দিয়েছেন। ব্রহ্মগুপ্ত এই পদ্ধতিকে সংক্রমণ বলেছেন এবং এর সংজ্ঞা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

"......যোগোঽন্তর যুতহীনো দ্বিহৃতঃ সংক্রমন্তরবিভক্তং বা"

অর্থাৎ দুটি রাশির যোগের সঙ্গে দুটি রাশির অন্তর যোগ এবং বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ দিলে রাশি দুটি পাওয়া যাবে। এবং এটিকে সংক্রমণ বলে।

অর্থাৎ গণিতের ভাষায় বললে দাঁড়ায়,

$$x+y=\alpha \qquad \therefore \quad x=\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$x-y=\beta \qquad y=\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

শ্রীপতি এই প্রসঙ্গে বলেছেন :

"যোগোঽন্তরেণোনযুতো দ্বিভক্তঃ
কর্মোদিতং সংক্রমণাখ্যমেতন্।"[১]

অর্থাৎ দুইটি রাশির যোগের সহিত দুইটি রাশির অন্তরকে উন (বিয়োগ) যুক্ত করিয়া দুই দ্বারা ভাগ করিলে রাশিদ্বয় পাওয়া যাইবে।[২]

মহাবীরাচার্য এ সম্পর্কে উদাহরণ দিয়েছেন যা থেকে আমরা আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় বলতে পারি,

$$ax+by=s$$

$$bx+ay=t$$

$$x=\frac{at-bt}{a^2-b^2}, \qquad y=\frac{at-bs}{a^2-b^2}$$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য তাঁর বীজগণিত গ্রন্থে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণটি হচ্ছে এইরকম—

একো ব্রবীতি মম দেহি শতং ধনেন ত্বত্তো ভবামি হি সখে দ্বিগুণস্ততোঽন্যঃ। ব্রূতে দশার্পয়সি চেন্মম্ ষড়্ গুণোঽহং ত্বত্তস্তয়োর্ব্বদ ধনে মম কিং প্রমাণে।

অর্থাৎ এক ব্যক্তি বলছেন, তুমি আমাকে শত মুদ্রা দিলে আমি তোমার দ্বিগুণ

১. সিদ্ধান্ত শেখর (বাবুয়াজী মিশ্র সম্পাদিত)—পৃষ্ঠা ১০৩, ত্রয়োদশ শ্লোকের প্রথমাংশ।

২. যাদবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এই শ্লোকটির অনুবাদ ক'রে দিয়েছেন।

হব। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলছেন, তুমি আমাকে দশ মুদ্রা দিলে আমি তোমার ৬ গুণ অর্থশালী হব।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য দুটি পদ্ধতিতে এই উদাহরণটির সমাধান করেছেন। তিনি বলেছেন :

অত্রাদ্যান্ত্যয়োস্তথা ধনে কল্পনীয়ে যথৈকলাপঃ স্বত এব ঘটতে।

তথা কল্পিতে আদ্যান্ত্য ধনে যা ২ রূ ১০০̇

যা ১ রূ ১০০

অনয়োঃ পরস্য শতে গৃহীতে আদ্যো দ্বিগুণিতঃ স্যাদিত্যে কালাপোঘটতে। অথাদ্যাদ্দশাপনীয় দশভিঃ পরধনং যুতং ষড়্গুণং। স্যাদিতি আদ্যং ষড়্গুণীকৃত্য

ন্যাসঃ যা ১২ রূ ৬৬০̇

যা ১ রূ ১১০

অতঃ সমীকরণেন (যা ১১=৭৭০। যা ৭০)। লব্ধং যাবভাবন্মানং ৭০ অনেনোত্থাপিতে জাতে ধনে ৪০। ১৭০

অথবা দ্বিতীয়ালাপো যথা ঘটতে তথা ধনে কল্পিতে—

যা ১ রূ ১০

যা ৬ রূ ১০̇

অত্রাদ্যাহশস্থ গৃহীতেষু দ্বিতীয়ঃ স্বতএব ষড়্গুণো ভবেত্।

অথ দ্বিতীয়াদৃত মপনীয় আদ্যে শতং সংযোজ্য দ্বিতীয়ং দ্বিগুণীকৃত্য চ

ন্যাসঃ যা ১ রূ ১১০

যা ১২ রূ ২২০

শোধনে কৃতে (যা ১১=রূ ৩৩০। যা ৩০) যাবত্তাবন্মানং ৩০ অনেনোত্থাপনে জাতে ধনে ৪০। ১৭০ পূর্ব্বানীততুল্যে এব।[১]

সমীকরণটি এবং এই দুই পদ্ধতিকে আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়—

সমীকরণ দুটি হচ্ছে—$x+100=2(y-100)$……(i)

$y+10=6(x-10)$ …..(ii)

---

১. শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জোতিস্তীর্থকৃত বীজগণিতম্ (ভাস্করাচার্যের) পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৩।
দ্রষ্টব্য : ভাস্করীয় বীজগণিতম্—আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে (গ্রন্থাঙ্ক—৯৯) এটি নেই, পৃঃ ১৬২।

প্রথম পদ্ধতি[১] :—ধরাযাক $x=2z-100$, $y=z+100$. এবং এই মান (ii) নং এ বসিয়ে আমরা পাব—$z+110=12z-660$

এবং এর ফলে $z=70$, পাওয়া যায়। অতএব $x=2\times70-100=40$

এবং $y=70+100=170$.

দ্বিতীয় পদ্ধতি :—(i) নং সমীকরণ থেকে পাওয়া যায় $x=2y-300$.

এবং (ii) নং থেকে পাওয়া যায় $x=\frac{1}{6}(y+70)$

$$\therefore\quad 2y-300=\frac{1}{6}(y+70)$$

বা, $12y-1800=y+70$

বা, $12y-y=1800+70$

বা, $11y=1870$

বা, $y=\frac{1870}{11}=170$

$$\therefore\quad x=\frac{1}{6}(170+70)=\frac{240}{6}=40$$

(গ) অনেক অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সমীকরণ বাকশালীর পাণ্ডুলিপি, প্রথম আর্যভটের আর্যভটীয়, ব্রহ্মগুপ্তের ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, মহাবীরের গণিতসার সংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বীজগণিত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়। এই ধরণের সমীকরণ নানা প্রকার এবং নানা পদ্ধতিতে সমাধান করা যায় সে কথা অধিকাংশ ভারতীয় গণিতবিদ বলে গিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন দত্ত এবং সিংহের হিস্ট্রী অব হিন্দু ম্যাথেমেটিক্‌সে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।[২] আমি এখানে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বীজগণিত থেকে একটি উদাহরণ তুলে ধরলাম।

সার্দ্ধপঞ্চাংশনবমৈযুক্তাঃ কে স্যুঃসমাস্ত্রয়ঃ।
অন্যাংশদ্বয়হীনাশ্চ ষষ্টিশেষাশ্চ তান বদ।

অর্থাৎ কোন তিনটি রাশি নিজের অর্ধেক, নিজের পঞ্চমাংশ, এবং নিজের নবমাংশ যুক্ত হয়ে সমান হয়। সেই তিনটি রাশি অপরের অংশদ্বয়ের দ্বারা বিযুক্ত হয়ে ৬০ শেষ হয়।

---

১. Datta and Singh—History of Hindu Mathematics, Part-2, পৃঃ—৪৬.

২. পৃষ্ঠা ৪৭—৫৯.

উদাহরণটিকে বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়[১]

$$x+\frac{x}{2}=y+\frac{y}{5}=z+\frac{z}{7} \ldots\ldots \text{(i)}$$

$$x-\frac{y}{5}-\frac{z}{9}=y-\frac{z}{9}-\frac{x}{2}=z-\frac{x}{2}-\frac{y}{5}=60 \ldots\ldots \text{(ii)}$$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এটি সমাধান এইভাবে করেছেন—

অত্র সমরাশিমানং যা ১। ততো বিলোম-বিধিনা অথ স্বাংশাধিকোন ইত্যাদিনা রাশয়ঃ যা ২/৩, যা ৫/৬, যা ৯/১০ ।

এতে অন্যভাগদ্বয়েনীনাঃ সর্বেংহপ্যেবং শেষাঃ স্যুঃ যা ২/৫। এতত্ ষষ্ঠিসমং কৃত্বাপ্ত-যাবত্তাবন্মানেন ১৫০। উত্থাপিতাঃ জাতারাশয়ঃ ১০০। ১২৫। ১৩৫।

অর্থাৎ যা $= w$ ধরলে আমরা সমাধানটির আধুনিক রূপ হয় এইরূপ—

$$x=\frac{2}{3}w, \quad y=\frac{5}{6}w, \quad z=\frac{9}{10}w.$$

এই মান (ii) নং এ বসালে আমরা পাব $\frac{2}{3}w=60$ বা $w=150$

$$\therefore \quad x=\frac{2}{3}\times 150=100, \quad y=\frac{5}{6}\times 150=125,$$

$$z=\frac{9}{10}\times 150=135$$

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, যে এ ছাড়া আরও নানা ধরণের উদাহরণ বিভিন্ন গণিত গ্রন্থে দেখা যায়।

১. Datta and Singh—History of Hindu Mathematics, Part-2. পৃষ্ঠা—৫৭.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১৩.১ এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সম্পর্কে পর্য্যালোচনা

$by=ax\pm c$ এই সমীকরণটিকেই একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ বলা হয়। এই সমীকরণটি নিয়ে প্রাচীন ভারতের গণিতবিদরা এবং অন্যান্য দেশের গণিতজ্ঞরা ব্যাপক কাজ করেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি হচ্ছেন প্রথম আর্যভট। a, b, c ধনাত্মক পূর্ণরাশি ধরে প্রথম আর্যভট $by=ax+c$ এই সমীকরণটির সমাধান করেন এবং তারপর তিনি একমাত্রার সহসমীকরণ সমাধানে তাঁর এই পদ্ধতিকে কাজে লাগান। প্রথম ভাস্করাচার্য $by-ax=-c$ সমীকরণটি সমাধান করেন এবং $by-ax=-1$ এই সমীকরণটির সমাধানও করেন। তাছাড়া প্রথম ভাস্করাচার্য প্রথম আর্যভটের আর্যভটীয় গ্রন্থটির টীকাতে এই $by=ax+c$ সমীকরণটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খ্রীঃ) প্রথম আর্যভটের পদ্ধতিটিকেই অনুসরণ করেছেন। প্রথম ভাস্কর লিখিত মহাভাস্করীয় গ্রন্থে টীকা করতে গিয়ে গোবিন্দস্বামী (৮০০—৮৫০ খ্রীঃ) প্রথম ভাস্করাচার্যের পদ্ধতিকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। লঘু ভাস্করীয়ের টীকা করতে গিয়ে গোবিন্দস্বামী একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে করেছেন। মহাবীরাচার্য (৮৫০ খ্রীঃ) তাঁর গণিতসার সংগ্রহে প্রথম আর্যভট ও প্রথম ভাস্করাচার্যের পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয় আর্যভট (৯৫০ খ্রীঃ) তাঁর মহাসিদ্ধান্ত গ্রন্থে এই সমীকরণটির সমাধান কিছুটা ভিন্ন অথচ উন্নত পদ্ধতিতে করেছেন এবং $by-ax=\pm c$ এ সমীকরণটির সমাধান কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শ্রীপতি (১০৩৯ খ্রীঃ ?) তাঁর সিদ্ধান্ত শেখর গ্রন্থে প্রথম আর্যভট ও প্রথম ভাস্করাচার্যের পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য (১১৫০ খ্রীঃ) লীলাবতী এবং বীজগণিত গ্রন্থদ্বয়ে দ্বিতীয় আর্যভটের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছেন। নারায়ণ পণ্ডিত (১৩৫০ খ্রীঃ) তাঁর গণিত কৌমুদী এবং বীজগণিতবতাংশ গ্রন্থদ্বয়ে একমাত্রার সমীকরণ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। কমলাকর (১৬৫৮ খ্রীঃ) তাঁর সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিবেক গ্রন্থে এটি পূর্বের পদ্ধতির সাহায্যেই একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধান করেছেন। এঁরা ছাড়াও আরও বহু গণিতবিদ আছেন যাঁরা এই সমীকরণটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁরা অধিকাংশই অবশ্য আর্যভটীয়, মহা-

ভাস্করীয়, ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত শেখর, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বীজগণিত প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহের টীকাকার হিসাবেই প্রসিদ্ধ এবং এই গ্রন্থগুলির টীকা করতে গিয়েই প্রসঙ্গক্রমে একমাত্রার সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর্যভটীয়ের ভাষ্যকার যাঁরা একমাত্রার সমীকরণ নিয়ে ভাষ্য দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রভাকর, সোমেশ্বর, সূর্যদেব যজ, যল্ল, নীলকণ্ঠ সোমাসুত্বন, রঘুনাথ রাজ, মাধব, পরমেশ্বর, গতিগোপ, ভুতিবিষ্ণু, কদন্দরাম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মহাভাস্করীয়ের ভাষ্যকার হিসাবে গোবিন্দস্বামী, সূর্যদেব, মক্ষীভট্ট, পরমেশ্বর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। লঘু-ভাস্করীয়ের ভাষ্যকার হিসাবে শঙ্করনারায়ণ, পরমেশ্বর প্রমুখের নাম স্মরণীয়। ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের টীকাকার হিসাবে পৃথুদকস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বীজগণিতের বহু ভাষ্যকার আছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দৈবজ্ঞের নাম উল্লেখযোগ্য। দেবরাজ শুধুমাত্র অনির্ণেয় সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ" কুট্টকার শিরোমণি প্রণয়ন করেন।

১৩.২ ভারতীয় একমাত্রার সমীকরণ সম্পর্কে আধুনিক সমালোচকদের বিচার বিশ্লেষণ

ভারতীয় ও বিদেশী গবেষকরা প্রথম আর্যভট, প্রথম ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, দ্বিতীয় আর্যভট, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, নারায়ণ, কমলাকর প্রমুখের কাজগুলি নিয়ে ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিচার বিশ্লেষণ যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে কোলেব্রুক (১৮১৮ খ্রীঃ), ক্যে (১৯০৮ খ্রীঃ), এন. কে. মজুমদার (১৯১১ খ্রীঃ), ডব্লিউ. ই. ক্লার্ক (১৯৩০ খ্রীঃ), নলিনী বিহারী মিত্র (১৯১৫ খ্রীঃ), বিভূতিভূষণ দত্ত (১৯৩২ খ্রীঃ), প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯২৭ খ্রীঃ), কৃপাশঙ্কর শুক্লা (১৯৭৬ খ্রীঃ), অমূল্যকুমার বাগ (১৯৭৭ খ্রীঃ), সারদাকান্ত গাঙ্গুলী (১৯২৭ খ্রীঃ), প্রদীপকুমার মজুমদার (১৯৭৮ খ্রীঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

জি. আর. ক্যে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে (Notes on Indian Mathematics, J. A. S. B., 1908, P 135) প্রথম আর্যভটের একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন, "It was thought that the special treatment of indeterminate equation was of Indian Origin. Colebroke, Woepcks, Chasles and Rodet seemed to think so, and the conclusions of such eminent scholars can not be altogether ignored. But Colebroke, Woepecks and Chasles attributed the discovery to Brahmagupta and in this were

obviously wrong. They had only very vague ideas about Āryabhata whose works were not available in their times. While Rodet was misled by the later commentaries ...."

ক্যে শেষে মন্তব্য করেন "........These results which are vaguely embodied in Āryabhaṭa's rule may of course, be put in perfectly general form.

ডি. ই. স্মীথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের (History of Mathematics, Vol—1 P—156) এক জায়গায় বলেছেন—এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধানে আর্যভট বিতত ভগ্নাংশের (Continued fraction) পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

আর্যভটের এক মাত্রার সমীকরণ সম্পর্কে এন. কে. মজুমদার তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে (Āryabhaṭas rule in relation to the indeterminate equation of the first degree, B. C. M. S. No.—3, 1911—12, pp 11—19) বলেছেন, আর্যভট কখনই ইউক্লিড বা অন্যান্য গ্রীক বা আলেকজান্দ্রীয় গণিতবিদদের নিকট এ ব্যাপারে ঋণী ছিলেন না। এন. কে. মজুমদার এ ব্যাপারে ক্যে, হীথ প্রমুখদের বিচার বিশ্লেষণকে সমালোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের লীলাবতীর ইংরাজী অনুবাদ কোলেব্রুক সাহেবের করেন। এটি আবার হারাণচন্দ্র ব্যানার্জি দ্বিতীয় সংস্করণে কিছুটা টীকা যোগ করেন এবং এই টীকাতে হারাণচন্দ্র ব্যানার্জি বলেছেন, বিতত ভগ্নাংশের অভিসারিত্ব সম্পর্কে (Convergents of the Continued fraction) প্রচ্ছন্নভাবে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য আলোচনা করেছেন। নলিনী বিহারী মিত্র তাঁর দুটি প্রবন্ধে ([a] Modern Review, Vol 18, June—Dec., 1913. P 506—508 on Indeterminate equations of the first degree, [b] Modern Review, Vol xvii, no 1, P—75) ক্যে'র মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন এবং ভারতীয় এক মাত্রার সমীকরণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

সারদাকান্ত গাঙ্গুলী তাঁর প্রবন্ধ সমূহে [(a) India's Contribution to the theory of Indeterminate equation of the first degree, Journal of the Indian Mathematical Society, Vol 19, 1932. pp 110—120, 129—140, 153—169. (ii) Journal of the Bihar and Orissa Research Society, March 1926, (iii) American Mathematical monthly, Vol 34, 37, (iv) Isis, Vol 12, 1929]. ভারতীয় একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ

সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং তিনি ক্যে'র মন্তব্যকে ধূলিসাৎ করেছেন। তাছাড়াও বলেছেন ভারতীয় পদ্ধতিতে গ্রীক বা চীনা পদ্ধতির প্রভাব নেই।

প্রবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত এবং ডব্লিউ. ই. ক্লার্ক শুধুমাত্র আর্যভটীয়ের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন।

বিভূতিভূষণ দত্ত তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে (Elder Āryabhaṭa's rule for the solution of indeterminate equations of the first degree, B. C. M S, 1932 Vol 24, pp 10-37) আর্যভটের একমাত্রার সমীকরণ নিয়ে ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তবে তাঁর আলোচনা প্রথম ভাস্করাচার্যের টীকার উপর ভিত্তি করেই রচিত।

কৃপাশঙ্কর শুক্লা মহাভাস্করীয় ও লঘুভাস্করীয় গ্রন্থ দুটি সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রথম ভাস্করাচার্যের এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছে।

বস্তুত উপর্যুক্ত বিচার বিশ্লেষণকারীরা শুধুমাত্র একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ নিয়েই আলোচনা করেছেন। দুই একজন বিক্ষিপ্তভাবে বলেছেন যে, এই সমীকরণে বিতত ভগ্নাংশের প্রয়োগ রয়েছে। অমূল্য কুমার বাগ তাঁর প্রবন্ধে (The method of Integral solution of indeterminate equations of the type by=ax ±c in ancient and medieval India, Indian Journal of history of science Vol 12, no 1, 1977. pp 1-16.) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ভারতীয়রা একমাত্রার অনির্ণের সমীকরণে বিতত ভগ্নাংশের এই সূত্রটি প্রয়োগ করেছেন: $p_n q_{n-1} - q_n p_{n-1} = (-1)^n$.

প্রদীপ কুমার মজুমদার তার গবেষণামূলক প্রবন্ধে (A Rationale of Bhaskara-I's method for solving ax±c=by. Indian Journal of history of science, Vol 13, 1978. p-9) বলেছেন প্রথম ভাস্করাচার্য এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধান করতে গিয়ে $p_n q_{n-1} - q_n p_{n-1} = (-1)^n$ সূত্রটি কাজে লাগিয়েছেন অথবা তিনি উক্ত সূত্রটি জানতেন। বলা বাহুল্য প্রদীপ কুমার মজুমদার এ সম্পর্কে ব্যাপক অথচ সুষ্ঠভাবে গবেষণা চালিয়ে গিয়েছেন॥

১৩·৩ এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণের বিভাগ:

একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ তিনটি ভাগে বিভক্ত এবং এগুলি হচ্ছে: (ক) কোন সংখ্যা (N) কে দুটি প্রদত্ত রাশি a এবং b দ্বারা ভাগ করলে দুইটি প্রদত্ত অবশেষ (Remainder) R_1 এবং R_2 পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এ থেকে আমরা পাই

$$N = ax + R_1 = by + R_2.$$

অথবা $by - ax = R_1 - R_2.$

ধরা যাক্ $c = R_1 \sim R_2.$

তাহলে $by - ax = \pm c$

$\pm$ চিহ্ন ধরার কারণ হচ্ছে $R_1 \lessgtr R_2$ ।

(খ) এমন কোন একটি রাশি (x) নির্ণয় করতে হবে যাকে অন্য একটি প্রদত্ত রাশি α দিয়ে গুণ করে ঐ গুণফলের সঙ্গে অন্য একটি প্রদত্ত রাশি (γ) যোগ বা বিয়োগ করার পর তৃতীয় কোন রাশি (β) দিয়ে ভাগ করলে কোন অবশিষ্টাংশ থাকবে না। অর্থাৎ

$$\frac{\alpha x \pm \gamma}{\beta} = y$$

(গ) তৃতীয় ধরণের অনির্ণেয় সমীকরণ হচ্ছে

$$by + ax = \pm c.$$

প্রথম ভাস্করাচার্যই হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় গণিতবিদ যিনি একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণের সঙ্গে জড়িত সব গাণিতিক উদাহরণগুলিকে দুটি শাখায় বিভক্ত করেছেন। এই দুটি শাখা হচ্ছে (ক) সাগ্র কুট্টাকার (খ) নিরগ্র কুট্টাকার। প্রথম ভাস্করাচার্য এই দুই শাখাকে উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি সাগ্র কুট্টাকার (Residual Pulveriser) সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদাহরণ দিয়েছেন :

পঞ্চভিরেকং রূপং দ্বে রূপে চৈব সপ্তভাগেন।
অবশিষ্যতে তু রাশির্বিগণ্যতাং তত্র কা সংখ্যা ॥[১] [Ā. (K. S.S.) পৃঃ ১৩৩]

এটির মর্মার্থ হচ্ছে—এমন একটি রাশি নির্ণয় কর যাকে ৫ দিয়ে ভাগ করলে ১ অবশিষ্ট থাকে ; এবং ৭ দিয়ে ভাগ করলে ২ অবশিষ্ট থাকে।

নিরগ্র কুট্টাকার (Nonresidual Pulveriser) সম্পর্কে প্রথম ভাস্করাচার্য্য নিম্নোক্ত উদাহরণ দিয়েছেন।

(১) করণম্—অধিকাগ্রচ্ছেদং সপ্ত ৭, উনাগ্রচ্ছেদেন পঞ্চকেন ৫, ভাজিতে শেষমুপরি দ্বৌ ২ অধঃ পঞ্চ ৫। অন্নো রাশিরিত্যত্রৈব মতিঃ কল্পতে। অয়ং [উপরি] রাশিঃ কেন গুণিতঃ রূপমগ্রান্তরং প্রক্ষিপ্য পঞ্চভিঃ শুদ্ধং ভাগং দাস্যতীতি লব্ধা। মতিঃ দ্বে রূপে। ভাগ লব্ধম্ একম ১, শেষম ০। অস্য স্থাপনা $\frac{২}{১}$। তৃতীয় পদ স্যানন্ত-বাদ্ এতদেব সঞ্জাতম্। উনাগ্রচ্ছেদভাজিতে শেষম্ ২, অধিকাগ্রচ্ছেদেন সপ্তকেন গুণিতং জাতম্ ১৪, অধিকাগ্র [২] সহিতম্ ১৬। এতদেব দ্বিচ্ছেদাগ্রম্ অয়মেব রাশিঃ পঞ্চভির্ভাগং হ্রিয়মাণঃ একাগ্রঃ সপ্তভির্দ্ব্যগ্র ইতি।
[Ā (K.S.S.) পৃঃ ১৩৩]

অষ্টৌ কেনাভ্যস্তাঃ ষড়্‌রূপযুতা হৃতাস্ত্রয়োদশাভিঃ
দদ্যুঃ শুদ্ধং ভাগং কে গুণকারঃ কিমাপ্তং চ। [Ā(K. S.S) পৃঃ ১৩৫]

অর্থাৎ কোন রাশিকে ৮ দিয়ে গুণ করে ঐ গুণফলের সঙ্গে ৬ যোগ করে ঐ যোগফলকে ১৩ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল শুদ্ধ হবে (division is exact). এবং গুণকারই বা কি?

জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে যে সব একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ আছে তাকে তিনি গ্রহ কুট্টাকার বলেছেন এবং এই গ্রহ কুট্টাকার দুভাগে বিভক্ত—(ক) বার কুট্টাকার (খ) বেলা কুট্টাকার।

গোবিন্দস্বামী লঘুভাস্করীয়ের ভাষ্য দিতে গিয়ে কুট্টকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি সাগ্র ও নিরগ্র এই দুই ধরণের কুট্টকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন

"স পুনঃ কট্টাকারো দ্বি-বিধস্তাবন্নির গ্রসাগ্রতয়া"

অর্থাৎ কুট্টক দুই প্রকার সাগ্র এবং নিরগ্র। এর পর তিনি এগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। তবে সাগ্র ও নিরগ্র কুট্টাকার সম্পর্কে তিনি মহাভাস্করীয়ের ব্যাখ্যায় অতি সুন্দর ভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন—

অথ কঃ সাগ্রঃ? কো বা নিরগ্রঃ। উচ্যতে। অগ্রশব্দঃ সংখ্যাভিধায়ী গৃহ্যতে। অত্র স্বসংখ্যাবাচিনি নির্বর্ত্যাভাবাত্ সংখ্যান্তরমাচষ্টে। সংখ্যান্তরেণ সহ বর্তত ইতি সাগ্রঃ। নির্গতসংখ্যান্তরো নিরগ্রঃ। অথবা, শেষাভিধায্যগ্রশব্দঃ। সহ শেষেণ বর্তত ইতি সাগ্রঃ। বস্ত্বন্তরাপেক্ষক ইত্যর্থঃ। নির্গতশেষো নিরগ্রঃ। অনন্যাপেক্ষিত ইতি যাবাত্। এতদুক্তং ভবতি—কস্মিংশ্চিদ্রাশাবনেন হৃ (? হ) তেঽনেনাপহৃ-তেঽয়ঞ্চায়ঞ্চ শেষঃ, যোঽপহৃতঃ স কঃ ইতি কেনচিত পৃষ্টে তদানয়নোপায়ঃ সংখ্যান্তরেণ সহ বর্তমানত্বাদ্বা বস্ত্বন্তরাপেক্ষকত্বাদ্বা সাগ্রঃ। যেন হতোঽয় মনেন সংযুক্তো বিযুক্তো বাঽনেনাপহৃতঃ শুদ্ধং ভাগং দদাতি স কঃ, ততফলং বা কিমিতি কেনচিত্ পৃষ্টে তদানয়নোপায়ঃ সংখ্যান্তবাশ্রয়াবাদ্বা অন্যনিরপেক্ষকত্বাদ্বা নিরগ্র ইতি। [মহাভাস্করীয়ম্—টি এস কুপ্পান্না শাস্ত্রী সম্পাদিত পৃঃ ৫৪-৫৫. এবার থেকে এটিকে MBH (T. S. K. S.) বলবো]

অর্থাৎ কিন্তু এই 'সাগ্র'টি কি? কোনটিই বা নিরগ্র। (আমি) বলিতেছি—অগ্রশব্দ দ্বারা কোন সংখ্যাকেই বুঝাইতেছে। এ স্থলে সংখ্যা অর্থে সংখ্যান্তরই (অন্য সংখ্যাকে) বুঝাইতেছে। সংখ্যান্তরের সহিত অবস্থিত এই অর্থে 'সাগ্র' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। নির্গত হইয়াছে সংখ্যান্তর যাহা হইতে তাহা নিরগ্রঃ।

অথবা অগ্র শব্দটি শেষার্থক। শেষের সহিত অবস্থিত এই অর্থে সাগ্র। অর্থাৎ অন্য বস্তুর অপেক্ষিত। নির্গত হইয়াছে শেষ যাহা হইতে তাহা নিরগ্র। অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষিত নহে। বলা হয় যে কোন রাশি ইহা দ্বারা গুণিত ও ভাজিত হইলে ইহা অবশিষ্ট থাকে। যাহাকে ভাগ করা হইল তাহা কোন রাশি ইহা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহা আনয়ন করিবার উপায় সংখ্যান্তরের সহিত বর্তমান বলিয়া অথবা বস্ত্বন্তরের অপেক্ষা আছে বলিয়া ইহা 'সাগ্র'। যে সংখ্যা ইহা দ্বারা গুণিত এবং তাহার সহিত যুক্ত বা বিযুক্ত হইয়া যাহা নিঃশেষে বিভাজ্য হইবে সে সংখ্যাটি কি। ইহা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উহা আনয়নের উপায়ের জন্য সংখ্যান্তরের প্রয়োজন না থাকিলে তাহাই নিরগ্র।[১]

যাই হোক গোবিন্দস্বামী এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাথেকে স্পষ্টই দু ধরণের সমীকরণ পেতে পারি। যেমন

$$\frac{ax \pm c}{b} = y \quad \dots \quad \dots \quad \dots \qquad (1)$$

$$N = ax + R_1 = by + R_2 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \qquad (2)$$

(1) নং তিনি দুভাগে ভাগ করেছেন যথা (ক) যখন c ধনাত্মক অর্থাৎ ক্ষেপ ধনাত্মক তখন এটিকে গন্তব্য বলা হয়।

(খ) যখন c ঋণাত্মক অর্থাৎ ক্ষেপ ঋণাত্মক তখন এটিকে গত বলা হয়।

যাই হোক এবার আমরা একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণের ব্যুৎপত্তি পরিভাষা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছি।

১৩·৪ পরিভাষা, ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি

প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদরা একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণের পরিবর্তে কুট্টক, কুট্টকার, কুট্টিকার অথবা কুট্ট ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতেন। যদিও প্রথম আর্যভট একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তবে তিনি এই সমীকরণটির কোন নামকরণ করেন নি। প্রথম ভাস্করাচার্যই (৬০০ খ্রীঃ) প্রথম ভারতীয় গণিতবিদ যিনি এই একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণের পরিবর্তে একটি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তিনি এই সমীকরণকে কুট্টকার বা কুট্ট বলেছেন। এরপর ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন কুট্ট, কুট্টকার, কুট্টক, মহাবীরাচার্য বলেছেন কুট্টিকার।

---

(১) সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষের অধ্যাপক শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য অনুগ্রহ ক'রে এই অংশটি অনুবাদ ক'রে দিয়েছেন। এজন্য তাঁর নিকট ঋণী।

সাধারণত $N=ax+R_1=by+R_2$ এই সমীকরণে a, b কে ভাগহার, ভাজক, ছেদ ইত্যাদি বলা হয়। R_1, R_2, কে অগ্র, শেষ ইত্যাদি বলা হয়।

$$\frac{\alpha x \pm \gamma}{\beta}=y$$ এই সমীকরণে

β'কে ভাজক, γ'কে ক্ষেপ, ক্ষেপক ইত্যাদি এবং α'কে ভাজ্য বলা হয়। অজ্ঞাত রাশি x'কে গুণক, গুণকার ইত্যাদি বলা হয়। y'কে ফল বলা যায়। অবশ্য মহাবীর x'কে রাশি বলেছেন।

হিংসার্থক কুট্ট ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ণক্ প্রত্যয় দ্বারা কুট্টক পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। গণিতশাস্ত্রে হিংসার্থক ধাতু নিষ্পন্ন হনন, ঘাত ইত্যাদি পদে গুণন করা বুঝায়, এজন্য কুট্টক শব্দের অর্থ গুণক। নির্দিষ্ট কোন রাশিকে যে গুণক দ্বারা গুণ করে প্রশ্নোদ্দিষ্ট ক্ষেপ যোগ ও প্রশ্নোক্ত হর দ্বারা ভাগ করলে নিঃশেষ হয়, সেই গুণক কুট্টক নামে অভিহিত।

গোবিন্দস্বামী মহাভাস্করীয়ের টীকা করতে গিয়ে "কুট্টকার শব্দের অর্থ কি?" সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—"কঃ কুট্টাকারশব্দস্যার্থঃ? উচ্যতে। কুট্টনং কুট্টা ছেদনমিতি যাবত্। ক্রিয়তেঽনেনেতি কারঃ। কুট্টায়াঃ কারঃ কুট্টাকারঃ। বিশিষ্টচ্ছেদনং যেন ক্রিয়তে স কুট্টাকারঃ। এতদুক্তং ভবতি —যেন হতেঽস্মিন্ননেন সংযুক্তে বিযুক্তে বা অনেনাপহৃতে নিশ্‌শেষো ভবতি স কুট্টকার শব্দেনাভিধীয়তে ইতি। অথবা, কুট্যতে ছিদ্যতেঽনেনেতি কুট্টঃ। এতদুক্তং ভবতি—পূর্বাভিহিতকুট্টাকারশব্দার্থ ইহ কুট্টশব্দেনাভিধীয়ত ইতি। আক্রিয়তে প্রকাশ্যত অনেনত্যাকারঃ। কুট্টস্য অকারঃ কুট্টাকারঃ। এতদুক্তং ভবতি যেন বিশিষ্টচ্ছেদকরণমুত্পদ্যতে তদ্গণিতং কুট্টকার ইতি। স দ্বিবিধঃ সাগ্রো নিরগ্রশ্চেতি।" [M.B.H (T.S.K.S), পৃঃ ৫৪]

অনুবাদঃ 'কুট্টকার' শব্দের অর্থ কি? বলা হইতেছে কুট্টন বা কুট্টা শব্দের অর্থ ছেদন। ইহার দ্বারা করা হয় এই অর্থে 'কার'। কুট্টার কার (ক) ই কুট্টাকার। অর্থাৎ বিশিষ্ট ছেদন করা হয় যাহা দ্বারা তাহাই 'কুট্টাকার'। এইরূপ বলা হইয়াছে যে—যাহা দ্বারা ইহাকে গুণ করিলে ইহা যুক্ত বা বিযুক্ত করিলে ইহা দ্বারা নিঃশেষে বিভক্ত হইবে তাহাকেই 'কুট্টকার' শব্দে বুঝান হয়। অথবা ইহা দ্বারা কুট্টন বা ছেদন কর্ম করা হয় ইহা দ্বারা এই অর্থে 'কুট্ট'। এইরূপ বলা হয়—পূর্ব কথিত কুট্টকার শব্দের অর্থটীকে 'কুট্ট' শব্দের দ্বারাই কথিত হইতেছে। 'আক্রিয়তে' অর্থাৎ প্রকাশিত হয় ইহা দ্বারা এই অর্থে আকার। কুট্টের আকার এইরূপে

কুট্টাকার। বলা হয় যে গণিতের সাহায্যে বিশিষ্টরূপে ছেদন করা উৎপন্ন হয় সেই গণিতকেই 'কুট্টাকার' বলা হয়। উহা দুই প্রকার (১) সাগ্র বা যাহার কোন একটি সংখ্যা অবশিষ্ট থাকিবে। (২) যে নিঃশেষে বিভক্ত হইবে।[১]

১৩·৫ এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা।

এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত। যেমন

(১) এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণের একটি সমীকরণ

(২) এক মাত্রার অনির্ণেয় সহ সমীকরণ।

প্রথমটি আবার নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত।

(ক) $by-ax=\pm c$, (খ) $by=ax\pm 1$, (গ) $by+ax=\pm c$,

(ঘ) $ax+by+cz=d$.

(ক) $by-ax=\pm c$ সমীকরণ।

আর্যভটের পদ্ধতি ঃ এই ধরনের সমীকরণ সম্পর্কে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আর্যভটই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে আলোচনা করেন। তিনি গণিতপাদের ৩২-৩৩ শ্লোকদ্বয়ে বলেছেন ঃ

অধিকাগ্রভাগহারং ছিন্দ্যাদূনাগ্রভাগহারেণ।
শেষপরস্পরভক্তং মতিগুণমগ্রান্তরে ক্ষিপ্তম্। ৩২
অধউপরিগুণিতমন্ত্যযুগূণাগ্রচ্ছেদভাজিতে শেষম্।
অধিকাগ্রচ্ছেদগুণং দ্বিচ্ছেদাগ্রমধিকাগ্রযুতম্॥ ৩৩

সূত্রটি খুব বেশী পরিষ্কার নয়। ফলে এই শ্লোকদুটির অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দেশী বিদেশী গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক বর্ত্তমানে ডঃ বিভূতিভুষণ দত্তের ব্যাখ্যাই অধিকাংশ গবেষক এবং পণ্ডিত মেনে নিয়েছেন। ডঃ দত্ত তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে[২] যে আলোচনা করেছেন তা শুধু মনোগ্রাহীই ছিল না সঙ্গে ছিল সুদৃঢ় যুক্তির বিস্তার। তিনি এই শ্লোক দুটিকে এইভাবে ভেঙ্গেছেন ঃ

(ক) অধিকাগ্রভাগহারং ছিন্দ্যাদূণাগ্রভাগহারেণ,

(খ) শেষ পরস্পর ভক্তং

(গ) মতিগুণং অগ্রান্তরে ক্ষিপ্তম্।

১। সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষের অধ্যাপক শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য মহাশয় এই অংশটি অনুবাদ করে দিয়েছেন। এজন্য তাঁর নিকট আমি ঋণী।

২, Bibhuti Bhusan Datta ; Elder Aryabhata's rule for the Solution of Indeternate equation of the first degree. Bull. Cal. Math. Soc. Vol—24, Page, 19—37.

(ঘ) অধউপরিগুণিতং অন্ত্যাযুক্।

(ঙ) ঊনাগ্রচ্ছেদভাজিতে শেষং অধিকাগ্রচ্ছেদগুণং অধিকাগ্রযুতম্।

(চ) দ্বিচ্ছেদাগ্রম্।

অর্থ হচ্ছে : (ক) বৃহৎ ভাগশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাজককে ক্ষুদ্র ভাগশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাজক দিয়ে ভাগ দাও (Divide the divisor corresponding to the greater remainder by the divisor corresponding to the smaller remainder).

(খ) এটি আবার চারটি ভাবে প্রকাশ করা যায় যেমন :

($খ_1$) অন্যোন্য ভাগের শেষ ভাগশেষ (The last remainder of the mutual division).

($খ_2$) অন্যোন্য ভাগের শেষ ভাগফল (The last quotient of the mutual division).

($খ_3$) অবশিষ্ট (এবং ক্ষুদ্র ভাগশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাজক) অন্যোন্যরূপে ভাগ দাও, শেষ অবশিষ্ট (The residue and the divisor corresponding to the smaller remainder) being mutually divided, the last residue).

($খ_4$) অবশিষ্ট (এবং ক্ষুদ্র ভাগশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাজক) অন্যোন্যরূপে ভাগ দাও, শেষ ভাগ ভাগফল [The residue (and the divisor corresponding to the smaller remainder) being mutually divided, the last quotient).

(গ) এটি আবার দুভাবে প্রকাশ করা যায়

($গ_1$) মতির দ্বারা গুণ কর এবং ভাগশেষগুলির অন্তর দ্বারা ক্ষিপ্ত কর। [Should be multiplied by an optional integer (mati) and then interpolated (kṣiptam) by the difference of remainder].

($গ_2$) বুদ্ধির সাহায্যে গুণ কর এবং ভাগশেষগুলির অন্তর দ্বারা ক্ষিপ্ত কর (Should be multiplied intelligently and then interpolated by the difference of the remainder).

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে ক্ষিপ্তম্ এবং মতি শব্দ দুটির অর্থ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।

(ঘ) নীচের যে কোন সংখ্যাকে ঠিক উপরের সংখ্যা দিয়ে গুণ কর তারপর এর ঠিক নীচের সংখ্যা যোগ কর [Any number below (i. e. penultimate) is

multiplied by on just above it and then added by that just below it].

(ঙ) শেষ সংখ্যাকে ক্ষুদ্র ভাগশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাজক দিয়ে ভাগ দাও, তারপর বৃহৎ ভাগশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাজক দিয়ে অবশিষ্টকে গুণ কর এবং বৃহৎ ভাগশেষের সঙ্গে যোগ কর।

(চ) এটি দুভাবে প্রকাশ করা যায়

($চ_1$) (ফল হবে) ভাজকদ্বয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা।

($চ_2$) (ফল হবে) ভাজকদ্বয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবশেষ।

প্রথম আর্যভটের এই শ্লোকদুটির অর্থ আরও পরিষ্কার করে হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে প্রথম ভাস্করাচার্য ও সূর্যদেব যজ্বার টীকা অনুধাবন করা প্রয়োজন। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রথমে প্রথম ভাস্করাচার্যের টীকা এবং বঙ্গানুবাদ তুলে ধরা হোল তারপর সূর্যদেব যজ্বার টীকা ও অনুবাদ তুলে ধরা হবে।

প্রথম ভাস্করাচার্যের টীকা: অধিকাগ্রভাগহারং 'ছিন্দাত্। অগ্রং শেষঃ। অধিকাগ্রং যস্য সোঽয়মধিকাগ্রঃ। অধিকাগ্রশ্চাসৌ ভাগহারশ্চ অধিকাগ্রভাগহারঃ। তং অধিকাগ্রভাগহারম্, ছিন্দাত্ বিভজেদিত্যর্থঃ। কেনেত্যাহ—উনাগ্রভাগহারেণ। শেষপরস্পরভক্তম্। লব্ধেন নাস্তি প্রয়োজনম্, সহ কর্ম ক্রিয়তে। পরস্পরেণ ভক্তং পরস্পরভক্তং, ইতরেতরভক্তমিত্যর্থঃ। শেষেণ সহ পরস্পরভক্তং শেষপরস্পরভক্তম্। মতিগুণং স্ববুদ্ধিগুণমিত্যর্থঃ। কথং পুনঃ স্ববুদ্ধিগুণঃ ক্রিয়তে? অয়ং রাশিঃ কেন গুণিতমিদমগ্রান্তরং প্রক্ষিপ্য বিশোধ্য বা অস্য রাশেঃ শুদ্ধং ভাগং দাস্যতীতি। অগ্রান্তরে ক্ষিপ্তম্। সমেষু ক্ষিপ্তং বিষমেষু শোধ্যমিতি সম্প্রদায়াবিচ্ছেদাদ্ ব্যাখ্যায়তে।

এবং পরস্পরেণ লব্ধানি পদান্যবস্থাপ্য, মতিশ্চাধঃ, পশ্চিমলব্ধং চ মত্যা অধঃ। অধউপরিগুণিতম্, অধঃস্থিতেন রাশিনা উপরিরাশির্গুণিতঃ। অন্তযুক্, অন্ত্যেন রাশিনা পশ্চিমলব্ধেন সহিতঃ। এবং ভূয়ো ভূয়ঃ কর্ম যাবত্ কর্মপরিসমাপ্তমিতি। উনাগ্রচ্ছেদভাজিতে শেষম্, উনাগ্রস্য যচ্ছেদং তেন ভাজিতে শেষং, তেন উনাগ্রচ্ছেদেন পূর্বগণিতককর্মণা নিষ্পন্নরাশের্বিভক্তশেষং পরিগৃহ্যতে। অধিকাগ্রচ্ছেদগুণম্, অধিকাগ্রচ্ছেদেন অভ্যস্তম্। দ্বিচ্ছেদাগ্রং দ্বয়োশ্চেদয়োরগ্রম্, অগ্রং সংখ্যা। অধিকাগ্র-যুতম্, অধিকাগ্রেণাযুতম্ অধিকাগ্র যুতম্। এতদুক্তং ভবতি—উনাগ্রচ্ছেদভাজিতে শেষম্ অধিকাগ্রচ্ছেদেনাভ্যস্তমধিকাগ্রসহিতং তদ্দ্বয়োরপি চ্ছেদয়োর্ভাজ্য-রাশির্ভবতীতি। [Ā, (K. S. S.) পৃ, ১৩২-১৩৩]

অনুবাদ: অধিকাগ্রভাগহারকে ছেদন করিবে। অগ্র অর্থাৎ শেষ। অধিক অগ্র যাহার তাহাই অধিকাগ্র। যাহা অধিকাগ্র তাহাই ভাগহার। সেই অধিকাগ্র ভাগহারকে ছেদিত করিবে অর্থাৎ ভাগ করিবে। কাহার দ্বারা? ঊনাগ্রভাগহার দ্বারা। শেষ পরস্পর দ্বারা ভাগ করিবে। ইহাতে লব্ধির প্রয়োজন নাই। শেষের সহিত কর্ম করা হয়। পরস্পর দ্বারা ভাগ এই অর্থে পরস্পর ভক্তম্ অর্থাৎ একটিকে অপরটির দ্বারা ভাগ করিবে। শেষের সহিত পরস্পরের ভাগ এই অর্থে শেষ পরস্পর ভক্ত এই পদটি হইয়াছে। মতিগুণ অর্থাৎ নিজবুদ্ধিদ্বারা আনীত সংখ্যা দ্বারা গুণ। কে নিজ বুদ্ধি প্রসূত গুণকদ্বারা গুণিত হইবে? কারণ রাশিটি কোন রাশিদ্বারা গুণ করিয়া সেই গুণফলে এই অগ্রান্তর যোগ বা বিয়োগ করিলে এই রাশিটি নিঃশেষে বিভক্ত হইবে তাহা নিজ বুদ্ধি দ্বারাই স্থির করিতে হইবে। অগ্রান্তরে ক্ষিপ্তম্ অর্থাৎ যুগ্ম রাশি (সমরাশি) হইলে যুক্ত এবং অযুগ্ম (বিষম) রাশি হইলে বিযুক্ত করিতে হইবে। সকল সম্প্রদায়ই এইরূপ করে।

এইরূপ পরস্পর ভাগলব্ধ সংখ্যাগুলিকে বুদ্ধির সাহায্যে প্রথম লব্ধি উপরে এবং দ্বিতীয় লব্ধি তাহার নিম্নে এইরূপে স্থাপন করিবে। অধ উপরিগুণিতম্ অর্থাৎ অধঃস্থিত রাশিদ্বারা উপরিস্থ রাশিটি গুণ করিতে হইবে অন্ত্যযুক্ অর্থাৎ শেষরাশির সহিত তাহার পরবর্তী রাশির যোগ করিবে। কর্ম সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ বারংবার করতে হইবে।

ঊনাগ্রচ্ছেদভাজিতে শেষম্,—ঊনাগ্রের যাহা ছেদ তাহা দ্বারা বিভক্ত হইলে 'শেষ' পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ ঊনাগ্রচ্ছেদ দ্বারা পূর্বরূপ গণিত কর্ম নিষ্পন্ন রাশি দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই 'শেষ' বলিয়া গৃহীত হইবে। **অধিকাগ্রচ্ছেদগুণম্**—অর্থাৎ অধিকাগ্রছেদদ্বারা গুণিত, **দ্বিচ্ছেদাগ্রম্** অর্থাৎ দুইটি ছেদক সংখ্যাকেই 'অগ্র' বলা হইয়াছে। অগ্র শব্দের অর্থই সংখ্যা। **অধিকাগ্রযুতম্** অর্থাৎ অধিকাগ্র (সংখ্যা) এর সহিত যুক্ত। এইরূপ বলা হইয়াছে যে ঊনাগ্র (সংখ্যা) ছেদ দ্বারা বিভক্ত হইলে যে 'শেষ' থাকে তাহাকে ঊনাগ্র (সংখ্যা) ছেদ সংখ্যাদ্বারা গুণ করিয়া গুণফলে অধিকাগ্র যোগ করিলে উহা ছেদ রাশিদ্বয়ের ভাজ্য রাশি হয়।[১]

সূর্যদেব যজ্বার টীকা: অগ্রং শেষঃ। যেন ভাগহারেণ রাশৌ হৃতে শেষোঽধিকসংখ্যঃ **সোঽধিকাগ্রভাগহারঃ**। যেন হৃতে পূর্বস্মাদ্ হীনসংখ্যঃ শেষঃ

১। শ্রী জগবন্ধু ভট্টাচার্য মহাশয় এই অংশটি অনুবাদ করে দিয়েছেন।

স **উনাগ্রভাগহারঃ**। তমধিকশেষ ভাগহারমূনশেষভাগহারেণ ভজেত্। লব্ধেন নাস্তি প্রয়োজনম্। **শেষপরস্পরভক্তং** ভাজ্য ভাজকশেষয়োঃ স্বরূপম্ অন্যোন্যভক্তং স্যাত্, যাবদ্ধরভাজ্যয়োরল্পতা। লব্ধানিফলান্যুপর্যধোভাবেন স্থাপিতানি সমানি চ ভবন্তি তাবদন্যোন্যং ভজেদিত্যর্থঃ। ততো ভাজ্য শেষং **মতিগুণম্ অগ্রান্তরে ক্ষিপ্তং** চ কার্যম্। কথময়ং ভাজ্যরাশিঃ কেন গুণিতঃ অগ্রয়োঃ শেষয়োবন্তরেণ সংযুতশ্চ ভাগহারশেষেণ শুধ্যতীতি স্ববুদ্ধ্যা গুণকারং পরিকল্প, ফলানামধঃ স্থাপয়েত্। তেন চ ভাজ্যং গুণয়িত্বা ক্ষেপং সংযোজ্য তদধস্থভাজকেন হৃত্বা লব্ধং ফলং মতিসং-জ্ঞিতাদধঃ স্থাপয়েত্। **অধ উপরি গুণিতমন্ত্যযুক্** ততো মত্যা স্বোপরিস্থং গুণয়িত্বা স্বাধঃস্থং ফলং প্রক্ষিপ্য তন্নাশয়েত্। শিষ্টপদানামুপান্ত্যেন স্বোপরিস্থং গুণয়িত্বা মতি সংজ্ঞক অন্ত্যং প্রক্ষিপ্য নাশয়েত্। এবং তাবত্ কুর্যাত্ যাবদ্ দ্বাবেব রাশী স্যাতাম্।

উনাগ্রচ্ছেদভাজিতে শেষ মুপরিস্থরাশিম্ ‍উনাগ্রচ্ছেদেন উনশেষেণ ভাগহারেণ বিভজ্য যদ্দিষ্টং **তদধিকাগ্রচ্ছেদগুণম্,** অধিকশেষেণ গুণিতম্ অধিকাগ্রযুতং দ্বিচ্ছেদাগ্রং ভবতি। দ্বিয়োশ্চেদয়োঃ ভাজ্যরাপির্ভবতীত্যর্থঃ। [Ā (K.V.S.) পৃঃ ৭১]

অনুবাদ—অগ্র অর্থাৎ শেষ। যে ভাগহার দ্বারা রাশিটিকে ভাগ করিলে শেষটির সংখ্যা অধিক হয় সেইটির অধিকাগ্রভাগহার; যাহা দ্বারা ভাগ করিলে শেষটি পূর্বতন সংখ্যা হইতে অল্প হইবে তাহাই উনাগ্রভাগহার, উক্ত অধিকাগ্রভাগকে উনাগ্রভাগহার দ্বারা ভাগ করিবে। ভাগফলের প্রয়োজন নাই। শেষ পরস্পর ভক্তং অর্থাৎ ভাজ্য ভাজকের অবশিষ্ট সংখ্যা দুইটির একটিকে অপরটির দ্বারা ততক্ষণ ভাগ করিবে যতক্ষণ না ভাজ্য ও ভাজকের অল্পতা হয়। অর্থাৎ ভাগফলগুলিকে ক্রমান্বয়ে একটির উপর আর একটি করিয়া যতক্ষণ না সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভাগ করিয়া চলিবে। তাহার পর মতি গুণিত ভাজ্যশেষকে অগ্রান্তরে 'ক্ষেপ' রূপে ব্যবহার করিবে।

কি প্রকার এই ভাজ্যরাশি কাহার দ্বারা গুণিত হইয়া অগ্রশেষ দুইটির অন্তর ফলের সহিত যুক্ত করিয়া ভাগহার শেষ দ্বারা নিরবশেষ হইবে নিজ চিন্তাদ্বারা সেই 'গুণকার' অর্থাৎ গুণকটি কল্পনা করিয়া ফল সমূহের নিম্নে স্থাপন করিবে। তাহা ভাজ্যকে গুণ কয়িয়া ক্ষেপযোগ করিয়া তাহার নিম্নস্থ ভাজক দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফলটিকে কল্পিত (মতি) সংখ্যাটির নিম্নে স্থাপিত করিবে।

তাহারপর 'মতি' দ্বারা নিজের উপরিস্থরাশিটিকে গুণ করিয়া অধস্থিত ফল ক্ষেপ করিয়া তাহার নাশ করিবে (?)। অবশিষ্ট পদসমূহের শেষের পূর্বরাশিদ্বারা তাহার

উপরিস্থিত রাশিটিকে গুণ করিয়া 'মতি' নামক অন্ত্যটি 'ক্ষেপ' ($\pm$) দিয়া (নাশ) শেষ করিবে। এইরূপে যতক্ষণ দুইটি রাশিই না পাওয়া যায় ততক্ষণ কাজ করিবে।

শেষ অর্থাৎ উপরিস্থ রাশিটিকে উনাগ্রছেদ দ্বারা অর্থাৎ উনশেষ ভাজ্যদ্বারা ভাগ করিয়া যাহা শেষ থাকিবে তাহাকে অধিকাগ্রছেদ দ্বারা অর্থাৎ অধিক অবশিষ্ট দ্বারা গুণ করিয়া অধিকাগ্রের সহিত যুক্ত করিলে দ্বিচ্ছেদাগ্র অর্থাৎ ছেদ দুইটিই ভাজ্য রাশি হইয়া থাকে।[১]

সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে প্রথম আর্যভট লিখিত আর্যভটীয়ের গণিতপাদের ৩২-৩৩ শ্লোক দুটির অনুবাদ এইরূপ হবে :

বৃহত্তর ভাগশেষের সঙ্গে জড়িত ভাজককে ক্ষুদ্রতর ভাগশেষের সঙ্গে জড়িত ভাজক দিয়ে ভাগ কর। অবশিষ্টাংশ (residue) (এবং ক্ষুদ্রতর ভাগশেষের ভাজক) পারস্পরিকভাবে বিভক্ত কর। সর্বশেষ অবশিষ্টাংশের সঙ্গে এমন একটি ঐচ্ছিক পূর্ণ সংখ্যা গুণ করতে হবে যাতে ঐ গুণফলের সঙ্গে ভাগশেষদ্বয়ের বিয়োগফল যোগ বা বিয়োগ করতে হবে।

(ভাগফল যুগ্ম সংখ্যক হলে যোগ এবং অযুগ্ম সংখ্যক হলে বিয়োগ করতে হবে) এবং সর্বশেষ অবশিষ্টাংশের ঠিক পূর্বের অবশিষ্টাংশের দ্বারা বিভাজ্য হবে। একটি পঙ্‌ক্তিতে এই ভাগ ফলগুলি একটির নীচে একটি বসাও তারপর ঐচ্ছিক পূর্ণসংখ্যা (মতি) বসাও তার নীচে সদ্যপ্রাপ্ত ভাগফল বসাও। মতিকে তার ঠিক উপরের সংখ্যা দিয়ে গুণ কর তারপর (এই মতির) নীচের সংখ্যাটি যোগ কর। এই পদ্ধতি পুনঃ পুনঃ কর তারপর শেষ সংখ্যাটিকে ক্ষুদ্রতর ভাগশেষের সঙ্গে জড়িত ভাজক দিয়ে ভাগ দাও; তারপর অবশিষ্টাংশকে বৃহত্তর ভাগশেষের সঙ্গে জড়িত ভাগশেষ দিয়ে গুণ কর এবং বৃহত্তর ভাগশেষ যোগ কর। তাহলেই দুটি ভাজকের সঙ্গে জড়িত (মূল) সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

প্রথম আর্যভট উপর্যুক্ত শ্লোকদুটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন। বৃহত্তর ভাগশেষের সঙ্গে জড়িত ভাজককে ক্ষুদ্রতর ভাগশেষের সঙ্গে জড়িত ভাগশেষে দিয়ে ভাগ কর যা অবশিষ্ট রহিল তাকে ক্ষুদ্রতর ভাগশেষের ভাজক দিয়ে আবার ভাগ করা এবং এই পদ্ধতি চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শূন্য ভাগশেষ হয়। শেষভাগফলকে মতি দিয়ে গুণ করে এই গুণফলের সঙ্গে ভাগশেষদ্বয়ের পার্থক্য যোগ বা বিয়োগ কর।

(যুগ্ম সংখ্যক ভাগফল হলে যোগ করতে হবে, অযুগ্ম সংখ্যক ভাগফল হলে বিয়োগ

করতে হবে) এরপর ভাগফলগুলি একটি পঙ্‌ক্তিতে একটির নীচে একটি বসাও তার নীচে সদ্য প্রাপ্ত ফল বসাও তার নীচে 'মতি বসাও। নীচস্থ যে কোন সংখ্যা (Penultimate) তার উপর সংখ্যা দিয়ে গুণ কর এবং তার নীচের সংখ্যা যোগ। এইভাবে পুনঃ পুনঃ কর। (এইভাবে প্রাপ্ত) শেষ সংখ্যাটিকে ক্ষুদ্রতর ভাগশেষের সঙ্গে জড়িত ভাজক দিয়া ভাগ দাও। অবশিষ্টকে বৃহত্তর ভাগশেষের সঙ্গে জড়িত ভাজকদিয়া গুণ কর এবং বৃহত্তর ভাগশেষ যোগ কর তাহলেই ঈপ্সিত সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

যাই হোক আর্যভটের সূত্র থেকে আমরা নিম্নলিখিত সমীকরণটির সমাধান করার পদ্ধতি জানতে পারি।

$$\mathrm{N}=ax+\mathrm{R}_1=by+\mathrm{R}_2.$$

এখানে a = বৃহত্তর ভাগশেষের সঙ্গে জড়িত ভাজক

b = ক্ষুদ্রতর ভাগশেষের সঙ্গে জড়িত ভাজক

R_1 = বৃহত্তর ভাগশেষ,

R_2 = ক্ষুদ্রতর ভাগশেষ,

এখন $c=\mathrm{R}_1 \sim \mathrm{R}_2$ ধরা যায় তাহলে আমরা নিম্নলিখিত দুটি সমীকরণ পাব।

(ক) $by=ax+c$ যখন $\mathrm{R}_1>\mathrm{R}_2$

(খ) $ax=by+c$ যখন $\mathrm{R}_2>\mathrm{R}_1$

আমরা $by=ax+c$ সমীকরণটি প্রথম আর্যভটের প্রণালীতে সমাধান করে দেখাচ্ছি। অবশ্য এখানে a এবং b মৌলিক সংখ্যা ধরা হয়েছে। এখন

$$\begin{array}{l}
b)\ a\ (q \\
\underline{\ bq\ } \\
r_1)\ b\ (q_1 \\
\quad \underline{r_1q_1} \\
\quad r_2)\ r_1\ (q_2 \\
\qquad \underline{r_2q_2} \\
\qquad \underline{\ r_3\ } \\
\qquad - - - \\
\qquad - - - \\
\qquad r_m)\ r_{m-1}\ (q_m \\
\qquad\qquad \underline{r_mq_m} \\
\qquad\qquad r_{m+1}
\end{array}$$

১। শ্রী জগবন্ধু ভট্টাচার্য কর্তৃক অনূদিত।

তাহলে (যখন $a<b$, তখন আমরা পাই $q=0$, $r_1=a$), দেখা যাচ্ছে

$$a=bq+r_1$$
$$b=r_1q_1+r_2$$
$$r_{m-2}=r_{m-1}q_{m-1}+r_m$$
$$r_{m-1}=r_mq_m+r_{m+1}$$

a-এর মান $by=ax+c$ সমীকরণটিতে বসালে পাওয়া যায় $by=(bq+r_1x)+c$ অতএব $y=qx+y_1$ এখানে $by_1=r_1x+c$.

যেহেতু $a=bq+r_1$, মান বসানোর পর আমরা পাই

$$y=qx+y_1 \cdots\cdots\cdots\cdots [\ 1\ ]$$

এখন $by=ax+c$ পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায়

$$by=r_1x+c \cdots\cdots\cdots [\ 1.1\ ]$$

আবার যেহেতু $b=r_1q_1+r_2$

ঠিক একইভাবে বসালে আমরা পাই $x=q_1y+x_1$. তাহলে [1.1] পরিবর্তিত আকার ধারণ করে এইরূপ হয়

$$r_1x_1=r_2y_1-c \qquad [\ 1.2\ ].$$

এইভাবে যদি এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় তাহলে আমরা নিম্নলিখিত সমীকরণ সমূহ পাই।

[1]	$y=qx+y_1$	$by_1=r_1x+c$	[1·1]
[2]	$x=q_1y+x_1$	$r_1x_1=r_2y_1-c$	[1·2]
[3]	$y_1=q_2x_1+y_2$	$r_2y_2=r_3x_1+c$	[1·3]
[4]	$x_1=q_3y_2+x_2$	$r_3x_2=r_4y_2-c$	[1·4]
…	… …	… … …	…
[2s]	$x_{s-1}=q_{2s-1}y_s+x_s$	$r_{2s-1}x_s=r_{2s}y_s-c$	[1·2s]
[2s+1]	$y_s=q_{2s}x_s+y_{s+1}$	$r_{2s}y_{s+1}=r_{2s+1}x_s+c$	[1·2s+1]

এখন আমরা দুটি ক্ষেত্র পাব (১) পারস্পরিক ভাগ করার ফলে এমন এক জায়গায় পৌছাব যেখানে কোন অবশিষ্ট থাকবে না। (২) অথবা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভাগফল পাবার পর আমরা আর অগ্রসর হবো না। যে কোন ক্ষেত্রই হো'ক আমরা প্রথম ভাগফলটিকে বাদ দেবো।

(১.) যখন শূন্য অবশিষ্ট থাকছে : যেহেতু a এবং b পারস্পরিক মৌলিক। অতএব শেষ ভাগশেষের ঠিক পূর্বের ভাগশেষ এক হবে।

(১'১) ধরা যাক যুগ্ম সংখ্যক ভাগফল। তাহলে

$$r_{2s}=1, \quad r_{2s+1}=0, \quad q_{2s}=r_{2s-1}$$

তাহলে সমীকরণদ্বয় [1·2s] এবং [1·2s+1] এইরূপ হবে

$$y_s=q_{2s}x_s+c \text{ এবং } y_{s+1}=c.$$

x_s'এর পছন্দমত সব পূর্ণ সংখ্যার মান দিলে আমরা y_s'এর একটি পূর্ণ মান পাব। এইভাবে আমরা x_{s-1} ইত্যাদির মান পেতে থাকবো এবং অবশেষে x এবং y এর মান পাব।

ডঃ দত্ত[১] এরপর বাকী ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবং পদ্ধতিগুলি প্রায় একই প্রকার বলে এখানে আর আলোচনা করা হলো না।

প্রথম ভাস্করাচার্যের পদ্ধতি : প্রথম ভাস্করাচার্য প্রথম আর্যভটের পদ্ধতিটিকেই অনুসরণ করেছেন তবে তিনি $\frac{ax-b}{b}$ = একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা $(=y)$ ধরে সমাধান করেছেন।

বলা বাহুল্য এখানে $b>a$, এবং a কে b দিয়ে ভাগ দিলে প্রথমে যে শূন্য ভাগফল, সেটাকে ধরেন নাই[২]। প্রথম ভাস্করাচার্য অবশ্য অহর্গণ নির্ণয় করতে গিয়েই এই ধরনের সমীকরণের সমাধান করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

ক্ষমাদিনেষ্ট গণান্যোন্য ভক্তশেষেণ ভাজিতৌ
হারভাজ্যৌ দৃঢ়ৌ স্যাতাং কুটাকারং তয়োর্বিদুঃ। ১·৪১

কৃপাশঙ্কর শুক্লা এটির ইংরাজী অনুবাদ এইরূপে করেছেন :

The divisor (which is 'the number of civil days in a yuga') and the dividend (which is 'the revolution-number of the desired planet') become prime to each other on being divided by the (last non-zero) residue of the mutual division of the number of civil days in a yuga and the revolution number of the desired planet. The operations of the pulveriser should be performed on them (i.e, on the abraded divisor and abraded dividend). So has been said[৩].

---

১. Bibhuti Bhusan Datta—B.C.M.S. Vol—24, 1932.

২. B.B. Datta & A.N. Singh. History of Hindu Mathematics, Part 2, Pages 35-53

৩. Mahā Bhāskarīya—Edited by Kripa Shankar Shukla. Page 26. [এবার থেকে এটিকে আমরা বলবো M.BH (K. S. S.)]

বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য এ থেকে যে সমীকরণটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে : $\frac{ax-c}{b}=y.$

এখানে a (= ভাজ্য) = গ্রহের আবর্তন সংখ্যা
b (= ভাজক) = একটি যুগে সাবন দিন
c (= ক্ষেপ) = গ্রহের আবর্তনের অবশেষ
x = (গুণক) = অহর্গণ
y = (ভাগফল) = গ্রহ কর্তৃক সম্পূর্ণ আবর্তনকাল

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে গোবিন্দস্বামী মহাভাস্করীয়ের ৪১ তম শ্লোকটির টীকা করতে গিয়ে বলেছেন :

ভূদিবসেষ্টগ্রহভগণপরস্পরভক্তশেষেণ ভূদিনগ্রহভগণৌ বিভজেত।
তত্র লব্ধৌ দৃঢ়ৌ ভবতঃ। অপবর্তিতয়োর্হারভাজ্যয়োঃ সুকরং
কুট্টাকার মিত্যপর্বতেনমুক্তম্। অনপবর্তিতাভ্যমপি কর্তব্যম্।
অর্থাদেতদুক্তং ভবতি—ভাজ্যভাগহারয়োরেকেন রাশিনা অপবর্তিত—
য়োনপবর্তিতয়োশ্চ ন বিশেষোপলব্ধিরিতি। এবং তয়োর্বিভক্ত
-য়োর্ণ পুনর্দ্বিত্বাদিসংখ্যকেন তন্নিঃশেষহরণসংভবঃ। এক সংখ্যকে।
তু ন ভবতি রূপান্তরাপত্তিঃ। অতস্তৌ দৃঢ়াবিত্যুচ্যেতে।
তয়োর্দৃঢ়ীভূতয়োঃ কুট্টাকারং বিদুস্তদ্বিদঃ। M.BH (T. S. K. S) পৃঃ ৫৪,].

বঙ্গানুবাদ : ভূমিসাবন দিনে ইষ্টগ্রহ ভগণসমূহের পরস্পর ভাগশেষ দ্বারা ভূমিসাবন দিনের দুই গ্রহের ভগণ দুইটিকে ভাগ করিবে। ঐ ভাগফল দুইটিই দৃঢ়দ্বয় হইবে। 'অপবর্তিত' ভাজ্য ও হারের 'কুট্টকার'এ অর্থাৎ কুট্টকগণিতে অপবর্তনে গণিতটি সহজ হয় বলিয়া কথিত আছে। অনপবর্তিতদ্বয়েরও (কুট্টক) কর্তব্য। অর্থাৎ এই কথাই বলা হয় যে ভাজ্যমানরাশিদ্বয়ের একটি রাশিদ্বারা অপবর্তিত বা অনপবর্তিতের কোনও বিশেষ ফল লাভ হয় না। এরূপে ঐ দুইটি রাশিকে দুই প্রভৃতি (দুই তিন প্রভৃতি ?) রাশি দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা সম্ভব নয়। সংখ্যাটি দ্বারা ভাগ করিলে কোন রূপান্তরই ঘটে না। অতএব ঐ দুইটিকেই পূর্বকথিত দৃঢ় বলা হয়। কুট্টকগণিতজ্ঞগণ কুট্টক গণিতে পূর্বোক্ত দুইটিকে সেই কারণে 'দৃঢ়'দ্বয় বলিয়া জানেন।[১]............

---

১. শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য কর্তৃক অনূদিত

বলা বাহুল্য গোবিন্দস্বামী এইটুকু ব্যাখ্যায় দৃঢ় কাকে বলে সেই কথাই উল্লেখ করেছেন।

যাই হোক এবার প্রথম ভাস্করাচার্যের মূল শ্লোকটি এবং তার অনুবাদ তুলে ধরছি। মহাভাস্করীয়ের প্রথম অধ্যায়ের ৪২—৪৪ তম শ্লোকগুলিতে প্রথম ভাস্করাচার্য বলেছেন

ভাজ্যং ন্যসেদুপরি হারমধশ্চ তস্য খণ্ডয়াত্ পরস্পরমধো বিনিধায় লব্ধম্।
কেনাহতোঽয়মপনীয় যথাস্য শেষং ভাগং দদাতি পরিশুদ্ধমিতি প্রচিন্ত্যম্।
আপ্তাং মতিং তাং বিনিধায় বল্ল্যাং নিত্যং হ্যধোঽধঃ ক্রমশশ্চ লব্ধম্।
মত্যা হতং স্যাদুপরিস্থিতং যল্লব্ধেন যুক্তং পরতশ্চ তদ্বত্।
হারেণ ভাজ্যো বিধিনোপরিস্থো ভাজ্যেন নিত্যং তদধঃস্থিতশ্চ
অহর্গণোঽস্মিন্ ভগনাদয়শ্চ তদ্বা ভবেদ্যস্য সমীহিতং যত্।

মর্মার্থ : উপরে ভাজ্য বসাও আর তার নীচে ভাজক বসাও। তারপর ভাগ কর। এবং এইভাবে পরস্পর ভাগ করে যাও। ভাগফলগুলিকে একটি পঙ্ক্তিতে সাজাও। তারপর এমন একটি রাশি পছন্দ কর যাতে ভাগশেষের সঙ্গে ঐ রাশিটিকে গুণ করে ঐ গুণফলের সঙ্গে ভাগের অবশিষ্টাংশ (residue of revolution) বিয়োগ করে তারপর ভাগশেষের সঙ্গে জুড়িত ভাজক দিয়ে ভাগ কর। এবার ঐ পঙ্ক্তিতে ঐ পছন্দমত রাশি এবং তারপর নূতন ভাগফলকে বসাও। পছন্দমত রাশিটিকে ঠিক পূর্বের পঙ্ক্তিতে অবস্থিত ঠিক পূর্বের রাশি দিয়ে গুণ কর এবং এই পছন্দমত রাশিটির নীচস্থ রাশি যোগ কর। এইভাবে এই পদ্ধতি অনুসরণ কর। এইভাবে সর্বোচ্চ রাশিটিকে ভাজক দিয়ে ভাগ কর এবং এর ঠিক নীচের রাশিটিকে ভাজ্য দিয়ে ভাগ করলে আমাদের প্রার্থিত অহর্গণ পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য প্রথম ভাস্করাচার্য যুগ্ম সংখ্যক ভাগফল এই পঙ্ক্তিতে নিয়েছেন। এই শ্লোক তিনটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গোবিন্দস্বামী বলেছেন :

ভাজ্যমুপরি ন্যস্য তস্যাধো হারং চ সংস্থাপ্যান্যোন্যং খণ্ডয়েত্। তত্র যদ্যল্লব্ধং তদধোঽধো নিধায় কেনাহতোঽয়ং ভাজ্য অস্য শেষমপনীয় হারেণ যথা পরিশুদ্ধং ভাগং দদাতি, তথা প্রচিন্ত্যম্। কথং পুনরবিচন্ত্যত্বাত্ কুট্টনগুণকারস্য, তদুপয়েঽভিধীয়মানে চিন্তনীয়াভিধানম্। নৈষ দোষঃ। রাশ্যোর্মহত্ত্বে তস্যাচিন্ত্যতা। অল্পত্বে তু সংচিন্তনীয় ইতি। অত এবাল্পত্বাপাদনায় পরস্পরখণ্ডনং, তন্নিবৃত্তয়ে পুনর্বল্ল্যপসংহারশ্চ ক্রিয়তে অয়মস্য চেতি ভাজ্যঃ পরামৃশ্যতে। শেষহননয়োস্তস্যৈব সংভবাত। যদিহ যস্য শেষমপনীয়তে তজ্জানীয়ং ভাজ্যমুপরিন্যস্যেদিতি, তদপ্যস্যেত্যনেনৈব সিদ্ধং ভবতি। স্বশেষমিতি বা পাঠো দ্রষ্টব্যঃ। যত্ পুনরিহ স্মর্যতে সমপদে মতিঃ কল্প্যেতি, তদপি পরস্পরভাগস্য দ্বিষ্ঠত্বাল্লব্ধম্।

অন্নচ্চ, উনং ভাজ্যমুপরি ন্যসেদিতি বদন্নেতজ্জ্ঞাপয়তি—উনে ভাজ্যেমতিঃ কল্পেতি বুদ্ধয়া বিচিন্ত্য যতসংখ্যয়া গুণিতো ভাজ্যঃ সা মতিঃ। তামাপ্তাং মতিং বল্ল্যা অধো বিনিধায় তস্যা অপি লব্ধমধো বিন্যস্য যন্মত্যা উপরি স্থিতং তন্মত্যা হতং লব্ধেন যুক্তং ভবেত্। এবং পরতঃ। যদ্যপি মতির্লব্ধং চ পরতো ন বিদ্যতে তথাপ্যুপান্ত্যমন্ত্যঞ্চ বিদ্যতে। তে ইহ লক্ষ্যেতে। এতদুক্তং ভবতি-উপান্ত্যেন হতমুপরিস্থিতমন্ত্যেন যুক্তং ভবেত্ এবং পরত ইতি যাবদ্ দ্বাবেব রাশী তাবদেবং কর্তব্যম্।

তত্রোপবিষ্টো রাশির্হারেণ হর্তব্যঃ। অধস্থস্ত বিধিনা ভাজ্যেন ভাজ্যঃ তয়োরূপরিশেষোঽহর্গণঃ। অধশেশ্ যস্ত ভগণাদিঃ। উদ্দেশকবশাদিদমুক্তমহর্গণো ভগণাদয়শ্চেতি। সর্বত্র হি নিরগ্রকুট্টাকারেঽয়মেব প্রয়োগঃ। তদুক্তম্ 'তদ্বা ভবেদ্যস্য সমীহিতং যত্' ইতি।- অথবা বেলাকুট্টাকারমুত্তরত্র বক্ষ্যতি, তমুদ্দিশ্যেদমুক্তম্ 'তদ্বা ভবেদ্যস্য সমীহিতং যত্ ইতি। ছেদীকৃতোঽহর্গণ ইতি যাবত্। বিধিগ্রহণং কিমর্থম্। বিনাপি তেন বিধিনা ভাজ্য ইতি লভ্যত এব। সত্যম্। কিং তু যাদৃশৌ, ন্যস্তৌ হারভাজ্যৌ তাদৃশাভ্যাং ভাজ্যাবিতি ন লভ্যতে। ক্রিয়মাণে হি তস্মিন্ গণিতব্যক্রিয়ায়াং বিজাত্যা সম্বন্ধাভাবাদ্ যাদৃশৌ ন্যস্তৌ তাদৃশভ্যামিতি লভ্যতে।

বঙ্গানুবাদ : ভাজ্যকে উপরে স্থাপন করিয়া তাহার নিম্নে 'হার' কে স্থাপন করিয়া একটিকে অপরটির দ্বারা খণ্ডিত করিবে। ইহার দ্বারা যে ভাগফল (লব্ধি) সমূহ পাওয়া যাইবে তাহাকে নীচে নীচে রাখিয়া কাহার দ্বারা এই ভাজ্যটিকে গুণ করিতে হইবে কোন 'হার' দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হইতে পারে তাহা বিশেষ চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হইবে। কুট্টন ব্যাপারে গুণকের চিন্তার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সেই উপায়ের জন্যই চিন্তা করিতে হইবে। ইহা দোষের নহে। রাশি অত্যাধিক বৃহৎ হইলে চিন্তার প্রয়োজন হয় না কিন্তু ক্ষুদ্র হইলে চিন্তা করিতে হয়। সুতরাং অনপত্ব প্রতিপাদনের জন্যই পরস্পর খণ্ডন করা হয় ; এবং তন্নিবারণের জন্যই বল্লীর উপসংহার করা হয় এবং এইটিই ইহার ভাজ্যরূপে বিবেচিত হয়। শেষ এবং গুণনও সেইজন্যেই সম্ভব হয়। এখানে যে শেষটিকে অপনীত করা হয় সেই জাতীয় ভাজ্যকে যে উপরে স্থাপন করা হয় তাহাতেও ইহা এই প্রকারেই সিদ্ধ হয়। "স্বশেষ" এই পাঠান্তরটিও দ্রষ্টব্য। এখানে যে 'মতি' শব্দ দ্বারা স্মরণ করা অথবা কল্পনা করা বুঝাইতেছে তাহাও পরস্পর ভাগের দু স্থানে বলিয়াই ভাগফল (লব্ধ) বলা হইয়াছে।

অপর এই যে—ছোট ভাজ্যটিকে উপরে স্থাপন করিবে এই কথা বলাই বুঝা যাইতেছে যে ভাজ্যটি ক্ষুদ্র হইলে 'মতি' কল্পনা করিবে অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা

করিয়া যে সংখ্যাদ্বারা (প্রশ্নে) ভাজ্যটিকে গুণ করিতে হইবে তাহাকেই মতি বা বুদ্ধি প্রস্থত বলা হইয়াছে। এই মতিকে ভাগ করিয়া বল্লীতে নীচে স্থাপন করিয়া তাহারও ভাগফলটিকে নীচে স্থাপন করিয়া যে 'মতি' উপরে ছিল সেই মতি দ্বারা গুণ করিয়া লব্ধির সহিত যোগ করিতে হইবে। পরেও এই প্রকারই হইবে। যদি মতি লাভ করিবার পরে আর কিছু না থাকে তথাপি তাহার উপান্ত এবং অন্ত থাকিবেই। অন্ত এবং উপান্ত্য যে আছে তাহা বুঝা যায় এই জন্য যে (নিয়মানুসারে) উপান্তের দ্বারা উপরিস্থিতটিকে গুণ করিয়া অন্তের সহিত যোগ করিতে হয়। এইরূপ পরে দুইটি রাশিকেই নির্ণয় করিতে হয়।

এ স্থলে উপরিস্থিত রাশিটিকে 'হার' দ্বারা ভাগ করিতে হইবে, অধস্থ রাশিটিকে ভাজ্যদ্বারা ভাগ করিবে। ঐ দুইটির উপরিস্থ শেষটিই অহর্গণ। অধঃস্থ-শেষটি ভগণাদি। প্রশ্নবশতই অহর্গণ এবং ভগণাদি বলা হইল। সর্বত্রই 'নিরগ্র' কুট্টকের ইহাই নিয়ম। কথিত হইয়াছে যে—যে স্থলে যাহা প্রশ্ন সেই অনুযায়ীই বলিতে হইবে। অথবা বেলাকুট্টাকার পরে বলা হইতেছে। সেই উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইয়াছে যে যে স্থলে যাহা সমীহিত (প্রশ্ন) তাহাই হইবে। অর্থাৎ ছিন্ন কর। অহর্গণ হইবে। এখানে বিধি গ্রহণ করা কেন হইল? বিধি গ্রহণ না করিলেও তো ভাজ্যটিকে পাওয়া যায়। কথাটি সত্য। কিন্তু যে প্রকার হার এবং ভাজ্য ন্যস্ত করা হইয়াছে সেই প্রকার দুইটি ভাজ্য যাইবে না। চেষ্টা করিলেও গণিতে বিশদৃশ (বিজাতীয়) দুইটি সংখ্যার সম্বন্ধ থাকে না বলিয়াই যে প্রকারের দুইটিকে লওয়া হইবে সেই জাতীয়ই লাভ করা যাইবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখানে প্রথম আর্যভটের স্থত্রকে অনুসরণ করা হয়েছে। যাই হোক এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ তুলে ধরা হোল।[১]

"শনির ভগণ শেষ 24, শনির ভগণ এবং অহর্গন নির্ণয় কর। দেওয়া আছে A দিনের জন্য সূর্যের ভগণ হবে 36641A/394479375.

ধরাযাক অজ্ঞাত দিনটি x. এবং শনি কর্তৃক x অজ্ঞাত দিনে y অজ্ঞাত ভগণ (Unknown revolutions performed by Saturn). তাহলে আমরা নিম্নলিখিত একমাত্রার অনির্ণের সমীকরণটি সমাধান করবো

$$\frac{36641x-24}{394479375}=y.$$

১। প্রথম ভাস্করাচার্যের লঘুভাস্করীয়ের অষ্টম অধ্যায়ের ১৭-তম শ্লোকের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য M,BH (K.S.S.) পৃঃ ৩০,

আমরা বুঝতে পারছি 36641 এবং 39447935 রাশিদ্বয় পারস্পরিক মৌলিক। স্থতরাং আমরা 36641 কে 394479375 দিয়ে ভাগ করবো এবং এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করেই চলবো অর্থাৎ

```
36641) 394479375 (10766
       394477006
       ---------
            2369)36641(15
                 35535
                 -----
                  1106)2369(2
                       2212
                       ----
                        157)1106(7
                            1099
                            ----
                               7)157(22
                                 154
                                 ---
                                   3)7 2
                                     6
                                     -
                                     1
```

$$\frac{1\times 27-24}{3}=1 \quad (\text{ভাগশেষ} = 0)$$

তাহলে মতি = 27.

এখন নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত বল্লী গঠন করা হোল

```
10766
   15
    2
    7
   22
    2
   27  ( মতি )
    1
```

সূত্রানুযায়ী আমরা নিম্নলিখিত সারণী (বা বল্লী) পাই

10766	10766	10766	10766	10766	3108044439	(গুণক)
15	15	15	15	288689	288689	ভাগফল
2	2	2	18665	18665		
7	7	8714	8714			
22	1237	1237				
55	55					
7						

নিয়মানুসারী 3108044439 কে 394479375 দিয়ে ভাগ কর এবং 288689 কে 36641 দিয়ে ভাগ কর তাহলে আমরা 346688814 এবং 32202 ভাগশেষ পাব।

x এবং y এর এই দুটিই সর্বনিম্ন মান যা সমীকরণকে সিদ্ধ করে।

অতএব অহর্গণ = 346688814, ভগণ = 32202.

ব্রহ্মগুপ্ত সরাসরিভাবে প্রথম আর্যভট ও প্রথম ভাস্করাচার্যের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছেন। তিনি ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৩-৫ শ্লোকগুলিতে বলেছেন ঃ

অধিকাগ্রভাগহারাদূনাগ্রচ্ছেদভাজিতাচ্ছেষম্।
যত্তত্ পরস্পনহৃতং লব্ধমধোঽধঃ পৃথক্ স্থাপ্যম্॥
শেষং তথেষ্টগুণিতং যথাগ্রয়োরন্তরেণ সংযুক্তম্।
শুদ্ধতি গুণকঃ স্থাপ্যো লব্ধং চান্ত্যা হ্যুপান্ত্যগুণঃ॥
স্বোর্ধ্বোঽন্ত্যযুতোঽগ্রান্তো হীনাগ্রচ্ছেদভাজিতঃ শেষম্।
অধিকাগ্রচ্ছেদহৃমধিকাগ্রযুতং ভবত্যগ্রম্॥

বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মগুপ্ত খুব স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন কখন ক্ষেপটি যোগ করতে হবে অথবা বিয়োগ করতে হবে। তিনি অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বলেছেন ঃ

এবং সমেষু বিষমেষ্বৃণং ধনং ধনমৃণং যদুক্তং তত্
ঋণধনয়োর্ব্যস্তত্বং গুণ্যপ্রক্ষেপয়োঃ কার্যম্॥

অর্থাৎ এই পদ্ধতি হবে যখন পারস্পরিক ভাগ দেওয়ার জন্য উদ্ভূত ভাগফলের সংখ্যা যুগ্ম হবে কিন্তু অযুগ্ম হলে পূর্বে যা ঋণাত্মক নেবার কথা বলা হয়েছে তা হবে ধনাত্মক এবং ধনাত্মকটি হবে ঋনাত্মক।

বলা বাহুল্য পৃথূদক্স্বামী ব্রহ্মগুপ্তের এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে সর্বদাই যে বৃহত্তর ভাগের শেষের সঙ্গে জড়িত ভাজক ক্ষুদ্রতর ভাগশেষের সঙ্গে জড়িত ভাজক দিয়ে ভাগ দিতে হবে তার কোন মানে নেই। অনেক সময় এর বিপরীত ক্রিয়াও করা যাবে। অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন তা থেকে বলা যায় $by = ax + c$ এই সমীকরণটি পরিবর্তন করে $ax = by - c$ করা প্রয়োজন তারপর b কে a দ্বারা ভাগ দিতে হবে এবং পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

মহাবীরের পদ্ধতি ঃ মহাবীর তাঁর পদ্ধতিতে পূর্বসূরীদের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এখানে তাঁর লিখিত গ্রন্থ গণিতসারসংগ্রহ থেকে শুধুমাত্র শ্লোকগুলি তুলে ধরা হোল।

ছিত্বা ছেদেন রাশিং প্রথম ফলমপোহ্যাপ্তমন্যোন্যভক্তং
স্থাপ্যোর্ধ্বাধর্যতোহধো মতিগুণমযুজাল্পেঽবশিষ্টে ধনর্ণম্।
ছিত্বাধঃ স্বোপরিঘ্নোপরিযুতহরভাগোঽধিকাগ্রস্য হারং
ছিত্বা ছেদেন সাগ্রান্তরফলসধিকাগ্রান্বিতং হারঘাতম্ ॥[১]

বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। মহাবীর ১৩৬$\frac{১}{২}$ শ্লোকে এই পদ্ধতিটিকে একটু পরিবর্তিত করে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ভাজ্যচ্ছেদাগ্রশেষৈঃ প্রথমহৃতিফলং ত্যাজ্যমন্যোন্যভক্তং
ন্যস্যান্তে সাগ্রমূর্ধ্বৈরূপরিগুণযুতং তৈঃ সমানাসমানে।
স্বর্ণঘ্নং ব্যাপ্তহারৌ গুণধনমৃণয়োশ্চাধিকাগ্রস্য হারং
হৃত্বা হৃত্বা তু সাগ্রান্তরধনমধিকাগ্রান্বিতং হারঘাতম্ ॥

দ্বিতীয় আর্যভটের পদ্ধতি ঃ দ্বিতীয় আর্যভট যে পদ্ধতিটি আলোচনা করেছেন সেটি এঁদের থেকে পৃথক। এবং তাঁর পদ্ধতিটি কিছুটা দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের পদ্ধতির সঙ্গে মিল আছে। অতএব আমরা দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের পদ্ধতি জায়গামত সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করবো। গোবিন্দস্বামী মহাভাস্করীয়ের টীকাতে প্রথম ভাস্করাচার্যের পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তিনি অন্যত্র একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন[১]

গুণকারভাগহারৌ বিভজেদন্যোন্যভক্তশেষেণ।
তৌ তত্র ভাজ্যহারৌ দৃঢ়াববাপ্তৌ বলির্দিষ্টৌ।
অন্যোন্যশেষভক্তং গত গন্তব্য যদা নিরবশেষম্।
তত্রেষ্টাভ্যাং কার্যং কুট্টনমন্যত্র দৃঢ়াভ্যাম্।

শুক্লা এই শ্লোকটিকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

Divide out the dividend (lit multiplier) and the divisor by the (non-zero) remainder of their mutual division. The resulting dividend and divisor are then said to be prime to each other.

When the **gata,** (i. e, negetive interpolator) or **gantavya** (i. e, positive interpolator) is found to be exactly divisible by the (non-zero) remainder of the mutual division, (it should be

---

১। গণিতসার সংগ্রহ—এল. সি. জৈন সম্পাদিত, পৃঃ ১১৫, শ্লোক ১১৫$\frac{১}{২}$; এবার থেকে এটিকে G.S.S (L.C.G) বলা হবে।

১৬

understood that the given interpolator corresponds to the true non-abraded values of the dividend and diviser, and so). One should proceed with the actual (non-abraded) values of the dividend and divisor in solving a pulveriser. In the contrary case (it should be understood that the given interpolator corresponds to the abraded values of the dividend and divisor, and so). One should proceed with their abraded values.[১]

বঙ্গানুবাদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। গোবিন্দস্বামী একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সম্পর্কে মূল আলোচনায় বলেছেন :

ভাজ্যং নিধায় তদধো হারং চ পুনঃ পরস্পরং ছিন্দ্যাত্।
লব্ধমধোঽধঃ প্রথমাবাপ্তস্যাধস্ততোঽপ্যন্যত্ ॥ ৫
বিভজেদেবং যাবদ্ ভাজকভাজ্যাবশূন্যরূপৌ স্তঃ।
মতিকল্পনা চ বিধিনা সমে পদে ব্যত্যয়াদ্বিষমে ॥ ৬
ভাজ্যাদ্ভাজ্যাহ্বতগতশেষোনাদ্ ভাজকাভিহতদেহাত্।
গত সহিতাদ্ ভাজ্যাপ্তং গতস্য হানৌ মতির্ভবতি ॥ ৭
রূপোনহারগুণিতাদ্গন্তব্যান্তস্য ভাজ্যলব্ধস্য।
হারহৃতস্য চ শেষং যোগে হারো মতিরশেষে ॥ ৮
মতিহতভাজ্যাচ্ছোধ্যং গতমগতং যোগয়েত্ততো বিভজেত্।
হারেণ মতিং বল্ল্যাঽধোঽধো নিধায়াপ্তমপ্যস্যাম্ ॥ ৯
উপবিষ্টস্বপান্ত্যহতং যুতমন্ত্যেনৈত্রমেব পরতশ্চ।
এবং তাবত্ কুর্যাদ্যাবদ্ দ্বাবেব তৌ রাশী ॥ ১০
উপরিস্থো হর্তব্যো হারেণাধঃ স্থিতশ্চ ভাজ্যেন।
শেষং দিনাদি চক্রাদি চ তত্ স্যাদ্যচ্চ তেনাপ্তম্ ॥ ১১

কৃপাশঙ্কর শুক্লা এই শ্লোকগুলির ইংরাজী অনুবাদ এইভাবে করেছেন :

Set down the dividend and underneath that (dividend set down) the divisor, and then perform their mutual division. Write down the quotients (of mutual division) One blow (the other : the second one under the first, the other & one under the second, and so on). Carry on the mutual division till the (reduced) dividend and the (reduced) divisor are different from

১। লঘুভাস্করীয়ম্—কৃপাশঙ্কর শুক্লা সম্পাদিত, পৃঃ ১০৪—১০৫। এবার থেকে এটিকে L. BH (K. S. S) বলা হবে।

zero. If the number of quotients (thius obtaind) is even, obtain the (number called) mati in accordance with the (following) rule ; If the number of quotients is odd, obtain the mati contrarily.

When the interpolator is negetive, divide the interpolator by the (reduced) dividend (bhājyāṛhta-gata), then subtract the resulting remainder from the (reduced) dividend (śeṣonād bhājyāt), then multiply the remainder obtained by the (reduced) divisor (bhājakābhihatadehāt), then increase the resulting product by the interpolator (gatasahitāt), and then divide the resulting sum by the (reduced) dividend (bhājyāptam) the quotient (obtained) is the **mati**.

When the interpolator is positive, diminish the (reduced) divisor by one (rūponahāra), by that multiply the interpolator (rūponahāraguṇitāt gantavya), divide that by the (reduced) dividend (āptasya bhājyalabolhasya), and then divide the (resulting) quotient by the (reduced) divisor (hārahṛtasya) ; the remainder (obtained) is the **mati**. In case the remainder is zero, the divisor itself is the **mati**.

Multiply the (reduced) dividend by the mati ; then subtract the gata (i.e, negetive interpolator) from or add the gantavya (i.e, positive interpolator) to that (product) ; and then divide that (difference or sum) by the (reduced) divisor. Write down the **mati** under the chain (of quotients), and underneath that (mati) write down the quotient (obtained) also.

By the penultimate number (of the chain of quotients) multiply the upper number and (to the product) add the last (i.e, lowermost) number. (After doing this rub out the last number). Repeat this process again and again until there are left only two number in the chain.

(Of these two numbers) divide the upper nnmber by the divisor and the lower number by the dividend (if it is possible). The remainders (obtained) denote (respectively) the days, etc. and the revolutions, etc, which are the requisite quantities.[১]

১. L. BH (K. S. S) ; পৃঃ ১০৬—১০৭।

বলা বাহুল্য গোবিন্দস্বামীর সূত্রের প্রথম অংশ আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাবো যে, যদি a এবং b এর ল, সা, গু β ধরা হয় তাহলে $a=\beta A$ এবং $b=\beta B$. যদি $c=\beta C$ ধরা যায় তাহলে আমরা পাব

$$\frac{\beta Ax \pm \beta C}{\beta B}=y \quad \text{বা} \quad \frac{Ax \pm C}{B}=y.$$

যদি λ'র দ্বারা C বিভাজ্য না হয় তাহলে

$\frac{Ax \pm C}{B}=y$ সমীকরণটি সমাধান করতে হবে।

এক্ষেত্রে প্রায় পুরানো নিয়মের পুনরাবৃত্তি গোবিন্দস্বামী করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন এখানে $A<B$ হলে তাহলেই সূত্রটি খাটবে। কিন্তু যখন $A>B$ হবে তখন কিভাবে সমীকরণটি সমাধান করতে হবে সে সব কথাও গোবিন্দস্বামী বলে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

হারদধিকে ভাজ্যে হারাপ্তং ভাজিতং পৃথক্কৃত্য।
বল্ল্যপহারান্তং পূর্বোক্তং কর্ম নিষ্পাদ্য ॥ ১৯
তত্রোপরিরাশ্যাহতপৃথকস্থসহিতো ভবেদধোরাশিঃ।
এষ বিশেষঃ গদিতঃ পরমপি তুল্যং পুরোক্তেন ॥ ২০

কৃপাশঙ্কর শুক্লা এই শ্লোক দুইটির ইংরাজী অনুবাদে বলেছেন ঃ

When the dividend is greater than the divisor, divide the dividend by the divisor and set down the quotient (obtained) in a separate place. Then (treating the remainder of the division as the new dividend) having carried out the aforsaid operations ending in the reduction of the chain (of quotients), increase, the lower number (of the reduced chain) by the product of the upper number (of the reduced chain) and the quotient written in a separate place. This has been stated to be difference (in this case); the other things are the same as stated before.[১]

শ্রীপতির পদ্ধতি ঃ সিদ্ধান্ত শেখরের চতুর্দশ অধ্যায়ের ২২-২৫ শ্লোকগুলিতে শ্রীপতি একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

বিভাজ্যহারং চ যুতিং নিজচ্ছিদা
সমেন বাঽহৃদাবপবর্ত্য সম্ভবে।

১. L. BH (K. S. S) পৃঃ ১১২.

বিভাজ্যহারৌ বিভজেত্ পরস্পরং
তথা যথা শেষকমেব রূপকম্ ॥ ২২
ফলান্যধোঽধঃ ক্রমশো নিবেশয়েন্
মতিং তথাঽধস্তদধশ্চ তত্ ফলম্ ।
ইদং হতং কেন যুতং বিবর্জিতং
হরেণ ভক্তং সদহো নিরগ্রকম্ ॥ ২৩
সমেষু লব্ধেষসমেষ্ব ণং ধনং
ধনং ত্বৃ ণং ক্ষেপমুশন্তি তদ্বিদঃ
মতিং বিচিন্ত্যেতি তদূর্ধ্বগং তয়া
নিহত্যলব্ধং চ তথা নিয়োজয়েত্ ॥ ২৪
পুনঃ পুনঃ কর্ম যথোত্ ক্রমাদিদং
যদা তু রাশিদ্বয়মেব জায়তে
হরেণ ভক্তঃ প্রথমো গুণো ভবেত্
ফলং দ্বিতীয়ং তু বিভজ্যরাশিনা ॥ ২৫

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের পদ্ধতি ঃ

ভাজ্যোহারঃ ক্ষেপকশ্চাপর্ত্যঃ কেনাপ্যাদৌ সংস্তবে কুট্টকার্থম্। যেন চ্ছিন্নৌ ভাজ্যহারৌ ন তেন ক্ষেপশ্চৈতদ্দুষ্টমুদ্দিষ্টমেব। পরস্পরং ভাজিতয়োর্যয়োর্যঃ শেষস্তয়োঃ স্যাদপবর্ত্তনং সঃ। তেনাপবর্ত্তেন বিভাজিতৌ যৌ তৌ ভাজ্যহারৌ দৃঢ়সংজ্ঞকৌ স্তঃ মিথোভজেত্তৌ দৃঢ়ভাজ্যহারৌ যাবদ্বিভাজ্যে ভবতীহ রূপম্। ফলান্যধোঽধস্তদধোনিবশ্যঃ ক্ষেপস্ততঃ শূন্যমুপান্তিমেন।

স্বোর্দ্ধে হতেঽন্ত্যেন যুতে তদন্ত্যং ত্যজেন্মুহুঃ স্যাদিতি রাশিযুগ্মম্। উর্দ্ধো বিভাজ্যেন দৃঢ়েন তষ্টঃ ফলং গুণঃ স্যাদপরো হরেণ। এবং তদৈবাত্র যদা সমাস্তাঃ স্যুর্লব্ধয়শ্চেদ্বিষমাস্তদানীম্। যদাগতৌ লব্ধিগুণৌ বিশোধ্যৌ স্বতক্ষণাচ্ছেষমিতৌ তু তৌ স্তঃ।[১]

মর্মার্থ ঃ ভাজ্য, হার ও ক্ষেপের অপবর্তন সম্ভব হইলে, কুট্টক নিরূপণ করিবার জন্য প্রথমে কোনও সমান অঙ্ক দ্বারা ভাজ্য, হার ও ক্ষেপের অপবর্তন করিবে। যে অঙ্ক দ্বারা ভাজ্য ও হারের অপবর্তন করা যায় যদি তদ্বারা ক্ষেপের অপবর্তন করা

(১) Līlāvatī (Colebrooke's Translation). 1927. Sanskrit Version. পৃঃ ১০২-১০৩ এবার থেকে এটিকে Lī(c) বলা হবে।

তাছাড়া ভাস্করীয় বীজগণিতম (A. S. S. No.—99.) পৃ. ৫৯, এটিকে B. Bi (A. S. S.) বলা হবে।

না যায়, তবে উদাহরণকে দুষ্ট জানিবে। দুইটি রাশিকে পরস্পর ভাগ করিলে শেষে যে ভাজক দ্বারা নিঃশেষ হয়, সেই ভাজকাঙ্কই রাশিদ্বয়ের বৃহত্তম অপবর্ত্তন। এই বৃহত্তমাপর্তন রাশি দ্বারা রাশিদ্বয়কে অপবর্ত্তিত করিলে তাহাদিগকে অপর কোন সমান সংখ্যা দ্বারা অপবর্তন করা যায় না, এজন্য তাহারা দৃঢ় হইয়া থাকে। ভাজ্য ও হারকে এইরূপ দৃঢ় ভাজ্য ও দৃঢ় হারে পরিণত করিবে। এই অপবর্তনাঙ্ক দ্বারা ক্ষেপকেও অপবর্তিত করিয়া দৃঢ় ক্ষেপ করিবে। ভাজ্য স্থানে শেষ ১ না হওয়া পর্যন্ত এই দৃঢ় ভাজ্য ও দৃঢ় হারকে পরস্পর ভাগ করিয়া ভাগফলগুলি অধঃ অধঃ শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপন করিবে। এই সকল ফল শ্রেণীর নীচে ক্ষেপ ও ক্ষেপের নীচে শূন্য স্থাপন করিবে। এই শ্রেণীর নাম বল্লী। বল্লীর অধস্থিত অঙ্ক অত্যাঙ্ক ও তাহার উপরিস্থ অঙ্ক উপান্তিমাঙ্ক নামে কথিত। উপান্তিমাঙ্ক দ্বারা তাহার উপরিস্থ অঙ্ককে গুণ করিবে এবং গুণফলে অন্ত্যাঙ্কযোগ করিয়া অত্যাঙ্ক ত্যাগ করিবে। তৎপরে বর্তমান উপান্তিমাঙ্ক দ্বারা তাহার উপরিস্থ অঙ্ককে গুণ ও গুণফলে বর্তমান অত্যাঙ্ক যোগ করিয়া অত্যাঙ্ক ত্যাগ করিবে। এইরূপ করিতে করিতে যে দুইটি রাশি উৎপন্ন হইবে, তাহার উর্দ্ধস্থ রাশির নাম লব্ধি বা ফল অধঃস্থিত রাশির নাম গুণ। যদি উর্দ্ধস্থ রাশি দৃঢ় ভাজ্য হইতে অধিক হয়, তবে তাহাকে দৃঢ় ভাজ্য দ্বারা ভাগ করিলে যাহা শেষ থাক তাহা ফল এবং অধঃ রাশি দৃঢ় হার হইতে অধিক হইলে, তাহাকে দৃঢ় হার দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা শেষ থাকিবে তাহা গুণ।

বল্লীস্থিত পরস্পর ভাগলব্ধ ফল শ্রেণী যদি সম (অর্থাৎ দুই, চারি, ছয় ইত্যাদি) হয়, পরে যে লব্ধি ও গুণ পাওয়া যাইবে তাহাই বাস্তবিক লব্ধি ও গুণ জানিবে। যদি ফল শ্রেণী বিষম (অর্থাৎ এক, তিন, পাঁচ ইত্যাদি) হয়, তবে এই লব্ধি ও গুণকে নিজ নিজ তক্ষণ হইতে অর্থাৎ লব্ধিকে দৃঢ় ভাজ্য হইতে এবং গুণকে দৃঢ় হার হইতে বিয়োগ করিলে বাস্তবিক লব্ধি ও গুণ হইবে। (রাধাবল্লভ লীলাবতী)

এর পর দ্বিতীয় ভাস্কাচার্য একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি লীলাবতী[১] এবং বীজগণিত[২] গ্রন্থদ্বয়ে বলেছেন :

একবিংশতিযুতং শতদ্বয়ং যদ্‌গুণং গণক পঞ্চষষ্টিযুক্।

পঞ্চবর্জিত শতদ্বয়োদ্ধৃতং শুদ্ধিমেতি গুণং বদাঽঽশু তম্।

অর্থাৎ ভো গণক! 221 কে যে গুণ দ্বারা গুণ করিয়া, তাহাতে 65 যোগ এবং 195 দ্বারা ভাগ করিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, সেই গুণক শীঘ্র বল।

---

(১) Li(c) পৃঃ ১০৪-১০৫ (২) B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ৭৭

ন্যাসঃ। ভাজ্যঃ ২২১। হারঃ ১৯৫। ক্ষেপঃ ৬৫। অত্র পরস্পর ভাজিত যোর্ভাজ্যভাজকয়োঃ শেষম্। ১৩; অনেন ভাজ্যহারক্ষেপা অপবর্ত্তিতা জাতা ভাজ্যঃ। ১৩; ক্ষেপঃ ৫; অনয়ো দৃঢ়ভাজ্যহারয়োঃ পরস্পরভক্তয়োলব্ধান্যধোঽধস্তদধঃ ক্ষেপস্তদধঃ শূন্য নিবেশ্যমিতি ন্যস্তে জাতা বল্লী ১

৭

৫

০

উপান্তিমেন স্বোর্দ্ধে হতে ইত্যাদি করণেন জাতং রাশিদ্বয়ম্ ৪০ এতৌ

৩৫

দৃঢ় ভাজ্যহারাভ্যাং ১৭ তষ্টৌ লব্ধিগুণৌ জাতৌ ৬। ৫। ইষ্টাহত স্বস্বহরেণ

১৫

যুক্তে ইতি বক্ষ্যমাণবিধিনৈতাবিষ্টগুণিতস্বতক্ষণধুক্তৌ বা লব্ধিগুণৌ ২৩।১০ দ্বিকেনেষ্টেন বা ৪০।৩৫ ইত্যাদি।

মর্মার্থ হচ্ছে : ভাজ্য $=221$, ক্ষেপ $=65$, হার $=195$.

তাহলে আমাদের $221x+65=195$ এই সমীকরণটি সমাধান করতে হবে। স্থতরাং

```
195)221 (1
    195
    ───
     26)195(7
        182
        ───
         13)26(2
            26
            ──
             ×
```

অপবর্তনাঙ্ক $=13$

এই 13 দ্বারা ভাজ্য, হার ও ক্ষেপকে অপবর্তিত করিলে দৃঢ় ভাজ্য 17, দৃঢ়ক্ষেপ 5, দৃঢ় হার 15.

```
15)17(1
   15
   ──
    2)15(7
      14
      ──
       1
```

ভাগের ফলের, 1, 7, এই দুইটি সংখ্যা জন্য ফলশ্রেণী সম।

বল্লী		
1	1	রাশিদ্বয়
7	35	40
5	5	35
0		

40কে দৃঢ় ভাজ্য 17 দ্বারা ভাগ করিলে শেষ 6 ইহা লব্ধি, 35কে দৃঢ় হার 15 দ্বারা ভাগ করিলে শেষ 5 থাকে ইহা গুণ। প্রশ্নোক্ত 221 কে 5 দ্বারা গুণ করিয়া তাহাতে 65 যোগ এবং 195 দ্বারা ভাগ করিলে কিছুই ভাগশেষ থাকিবে না। ভাগফল 6 হইবে।

$$\frac{221\times5+65}{195}=\text{ফল}$$

অথবা লব্ধির হর দৃঢ় ভাজ্য এবং গুণের হর দৃঢ় হার ইহাদের 1। 2. ইত্যাদি অভীষ্ট গুণ ফলের সহিত এই লব্ধি ও গুণ যোগ করিলে বহুবিধ লব্ধি ও গুণ হইবে।

$17\times1+6=23$ লব্ধি

$15\times1+5=20$ গুণ

অথবা

$17\times2+6=40$ লব্ধি

$15\times2+5=35$ লব্ধি ইত্যাদি।[১]

এরপর দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন: ভবতি কুট্টবিধের্যুতিভাজ্যয়োঃ সমপবর্তিতয়োরপি বা গুণঃ। ভবতি যো যুতিভাজকয়োঃ পুনঃ স চ ভবেদপবর্ত্তনসঙ্গুণঃ।

উদাহরণম্ঃ শতং হতং যেন যুতং নবত্যা বিবর্জিতং বা বিহৃতং ত্রিষষ্ট্যা। নিরগ্রং স্যাদ্বদ মে গুণং তং স্পষ্টং পটীয়ান্যাদি কুট্টকেঽসি।

ন্যাসঃ। ভাজ্যঃ। ১০০। হারঃ। ৬৩। ক্ষেপঃ। ৯০। জাতা পূর্ববল্লব্ধি ক্ষেপাণাং।

বল্লী ১
১
১
২
২
১
৯০
০

১. লীলাবতী—শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতিব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ। পৃঃ ৯৬—৯৭।

উপান্তিমেন স্বোর্দ্ধে হতেঽন্ত্যেন যুত ইত্যাদি করণেন জাতং রাশিদ্বয়ম্ ২৪০০ জাতৌ পূর্ববল্লব্ধিগুণৌ । ৩০ । ১৮ ॥ ২৫৩০

অথবা ভাজ্যক্ষেপৌ দশভিরপবর্ত্ত্য ভাজ্যঃ । ১০ । ক্ষেপঃ । ৯ । পরস্পরভজনা-লব্ধানি ফলানি ক্ষেপং শূন্যঞ্চাধোঽধো নিবেশ্য জাতা । বল্লী ০
৬
৩
৯
০

পূর্ববল্লব্ধোগুণঃ । ৪৫ । অত্র লব্ধির্ন গ্রাহ্যা। যতো লব্ধয়ো বিষমা জাতা অতো গুণে । ৪৫ । স্বতক্ষণাদস্মাদ্ । ৬৩ । বিশোধিতে জাতো গুণঃ স এব । ১৮ । গুণঘ্নাভাজ্যে ক্ষেপযুতে হরতষ্টে লব্ধিশ্চ । ৩০ ।

অথবা হারক্ষেপৌ । ৬৩ । ৯০ । নবভিরপবর্ত্তিতৌ জাতৌ হারক্ষেপৌ । ৭ । ১০ । তত্র লব্ধিক্ষেপাণাং

বল্লী ১৪
৩
১০
০

লব্ধো গুণঃ । ২ । ক্ষেপহরোপবর্ত্তন । ৮ । গুণিতো জাতো স এব গুণঃ । ১৮ । ভাজ্য । ১০০ । ভাজক ৬৩ । ক্ষেপভ্যো । ৯০ । লব্ধিশ্চ । ৩০ ।

অথবা ভাজ্যক্ষেপৌ পুনর্হারক্ষেপৌ চাপবর্ত্তিতৌ জাতৌ ভাজ্যহারৌ । ১০ । ৭ । ক্ষেপঃ । ১ । অত্র পূর্ববজ্জাতা

বল্লী ১
২
১
০

গুণশ্চ । ২ । হারক্ষেপাপবর্ত্তনেন জাতঃ স এব গুণঃ । ১৮ । পূর্ববল্লব্ধিশ্চ । ৩০ । ইষ্টাহতস্বস্বহরেণ যুক্তে ইত্যাদিনথবা গুণলব্ধী । ৮১ । ১৩০ । ইত্যাদি ।[১]

মর্মার্থ : ভাজককে অপবর্তিত না করিয়া অপবর্তিত ক্ষেপ ও ভাজ্য হইতে কুট্টবিধির নিয়মে যে গুণ পাওয়া যাইবে, তাহা বাস্তবিক গুণ হইবে। কিন্তু ভাজ্যকে অপরিবর্তিত না করিয়া কোনও অঙ্ক দ্বারা ক্ষেপ ও ভাজককে অপবর্তিত করিয়া ইহা হইতে গুণ সাধন করিলে, তাহা বাস্তব গুণ হইবে না। এই গুণকে ক্ষেপ ও ভাজকের (?) অপবর্তানাঙ্ক দ্বারা গুণ করিলে বাস্তব গুণ হইবে।

১. Li (C) পৃ: ১০৪—১০৬ B. Bi. (A. S. S)

উদাহরণ ঃ হে গণক ! যদি তুমি কুট্টক নিয়মে পটীয়ান্ হও, তবে 100'কে যে অঙ্ক দ্বারা গুণ করিয়া 90 যোগ করতঃ 63 দ্বারা ভাগ করিলে নিঃশেষ হয়, সেই গুণক আমাকে বল।

প্রশ্নে ভাজ্য 100, হার 63, ক্ষেপ 90। অর্থাৎ আমরা $100x+90=63y$ সমীকরণটি সমাধান করিবো।

ভাজ্য ও ক্ষেপকে 10 দ্বারা আবর্তিত করিলে ভাজ্য 10, হার 63, ক্ষেপ 9।

∴ 63) 10 (0
0
10) 63 (6
60
3) 10 (3
9
1

বিষমলব্ধি	বল্লী		
0	0	27	7
6	6	171	45
3	3		
	9		
	0		

বিষমলব্ধির জন্য গুণের হর 63 হইতে 45'কে শোধিত করিলে শেষ 18 বাস্তব গুণ। ভাজককে অপবর্তিত করা হয় নাই এজন্য লব্ধির হর 100 হইতে 7 বিয়োগ করিলে যে 93 থাকে, তাহা বাস্তবলব্ধি হইবে না।

$$\frac{100\times18+10}{63}=30 \text{ বাস্তব লব্ধি হইবে।}$$

অথবা হরে 63 এবং ক্ষেপ 90'কে 9 দ্বারা অপবর্তন করিলে ভাজ্য 100, ক্ষেপ 10, হার 7 ; পরস্পর ভাগ করিলে লব্ধি ৩০, গুণ ২, গুণকে অপবর্তনাঙ্ক 9 দ্বারা গুণ করিলে বাস্তব গুণ 18 লব্ধি সেই 30, বল্লী 14

3	430	30
10	30	2
0		

অথবা ভাজ্য ও ক্ষেপকে 10 দ্বারা অপবর্তন করিলে ভাজ্য 10, ক্ষেপ 9, হার 63, পুনর্বার ক্ষেপ ও হারকে 9 দ্বারা অপবর্তন করিলে ভাজ্য 10, ক্ষেপ 1, হার 7 ; বল্লী

1	3
2	2
0	

গুণ 2'কে হার ও ক্ষেপের অপবর্তনাঙ্ক 9 দ্বারা গুণ করিলে বাস্তব গুণ ১৮।

$$\frac{100\times18+90}{63}=30 \text{ লব্ধি।}$$

লব্ধি 30 গুণ 18 ; ইহাতে ইষ্টগুণিত নিজ হর যোগ করিলে

$100+30=130$ লব্ধি

63+18=81 গুণ

100×2+30=230 লব্ধি

63×2+18=144 ইত্যাদি[১]।

এরপর দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন: ক্ষেপজে তক্ষণাচ্ছুদ্ধে গুণাপ্তী স্তো বিয়োগজে।

অত্র পূর্বোদাহরণে নবতিক্ষেপে যৌ লব্ধগুণৌ জাতৌ। ৩০। ১৮। এতৌ স্বতক্ষণাভ্যামাভ্যাং। ১০০। ৬৩। শোধিতৌ মে শেষকে তন্মিতৌ লব্ধিগুণৌ নবতি শোধনে জ্ঞাতব্যৌ। ৭০। ৪৫। এতয়োরপি ইষ্টাহতস্বস্বতক্ষণং ক্ষেপ ইতি লব্ধিগুণৌ। ১৭০। ১০৮। অথবা। ২৭০। ১৭১ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়োদাহরণম্-যদ্গুণা গণক ষষ্টিরন্বিতা বর্জিতা চ দশভিঃ ষড়ন্তরৈঃ। স্যাত্ ত্রয়োদশহৃতা নিরগ্রকা তদ্গুণং কথয় মে পৃথক্ পৃথক।

ন্যাসঃ। ভাজ্যঃ ৬০। হারঃ ১৩। ক্ষেপঃ ১৬। প্রাগ্বজ্জাতা বল্লী ৪
১
১
১
১
১৬
০

তথা জাতে গুণাপ্তী। ২। ৮। অত্রাপি লব্ধয়ো বিষমাঃ। অতো গুণাপ্তৌ স্বতক্ষণাভ্যাং। ১৩। ৬০। শোধিতে। জাতে ১১। ৫২। এবং ষোড়শক্ষেপে এতৌ এব লব্ধিগুণৌ ৫২। ১১। স্বস্বহরাভ্যাং শোধিতৌ জাতৌ ষোড়শবিশুদ্ধৌ। ২। ৮।[২]

মর্মার্থ: ধনক্ষেপে যে লব্ধি ও গুণ হইবে তাহাদিগকে নিজ নিজ হর হইতে বিয়োগ করিলে ধনক্ষেপে লব্ধিও গুণ হইবে।

পূর্বোদাহরণে 90 যোগ করিতে হইবে বলা আছে। যদি প্রশ্নে 90 বিয়োগ করিবার কথা থাকিত, তবে 90 ক্ষেপে লব্ধি 30 এবং গুণ 18'কে তাহাদের যথাক্রমে তক্ষণ বা হর 100, 63 হইতে বিয়োগ করিলে 70 লব্ধি 45 গুণ হয়, ইহাই 90 বিয়োগ পক্ষে লব্ধি ও গুণ হইবে। ইহাতে 1 গুণ নিজ নিজ হর যোগ করিলে 170, 180; 2 গুণে যোগ করিলে 270, 171 ইত্যাদি।

দ্বিতীয় উদাহরণ: ভো গণক। 63'কে যে সংখ্য দ্বারা গুণ করিয়া তাহাতে

১. শ্রীরাধবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ তীর্থ সম্পাদিত লীলাবতী, পৃঃ ৯৭—৯৯।

২. Li (C) পৃঃ ১০৬—১০৭।

16 যোগ বা বিয়োগ করতঃ 13 দ্বারা ভাগ করিলে নিরগ্র হয় অর্থাৎ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না সেই সংখ্যা বল।

$y=\frac{60x+16}{13}$, 60 এবং 13 ইত্যাদির পরস্পর ভজনে ভাগফল 4, 1, 1, 1, 1, ইহাতে পূর্ববদ্ লব্ধিও গুণ যথাক্রমে 8 এবং 2; ভাগফল বিষমহেতু ইহাদিগকে নিজ নিজ হর 60, 13 হইতে বিয়োগ করিলে লব্ধি ও গুণ 52, 11; যদি প্রশ্নে 16 বিয়োগ থাকে তবে এই ধনক্ষেপে আগত লব্ধি ও গুণকে তাহাদের নিজ নিজ হর 60, 13 হইতে বিয়োগ করিলে লব্ধি ও গুণ 2, 8।

বল্লী
4
1
1
1
1
16
0

$y=\frac{60x+16}{13}$ এ স্থলে লব্ধি $52(=y)$, গুণ $11(=x)$।

$y=\frac{60x-16}{13}$ এ স্থলে লব্ধি $8\ (=y)$, গুণ $2\ (=x)$।[১]

এরপর দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন: গুণলব্ধ্যোঃ সমং গ্রাহ্যং ধীমতা তক্ষণে ফলম্। হরতষ্টে ধনক্ষেপে গুণলব্ধৌ তু পূর্ববত্ ক্ষেপতক্ষণলাভাঢ্যা লব্ধিং শুদ্ধৌ তু বর্জিতা।

উদাহরণম্। যেন সঙ্গুণিতা পঞ্চ ত্রয়োবিংশতিসংযুতাঃ বর্জিতা বা ত্রিভির্ভক্তা নিরগ্রাঃ স্যুঃ স কো গুণঃ।

ন্যাসঃ ভাজ্যঃ। ৫। হারঃ। ৩। ক্ষেপঃ। ২৩। অত্রবল্লী পূর্ববজ্জাতং রাশিদ্বয়ং ৪৬ / ২৩ এতৌ ভাজহারাভ্যাং তষ্টৌ অত্রাধোবশেৌ ২৩। ত্রিভিস্তষ্টে সপ্ত লভ্যন্তে ঊর্দ্ধলব্ধ্যোঃ সমং গ্রাহ্যং ধীমতা তক্ষণে

১
১
২৩
০

ফলমিতি অতঃ সপ্তৈব গ্রাহ্যাঃ এবং জাতে গুণাপ্তী। ২। ১১। ক্ষেপজে তক্ষণাচ্ছুদ্ধে ইতি ত্রয়োবিংশতিশুদ্ধৌ জাতা বিপরীত শোধনাদবশিষ্টলব্ধিঃ। ৬। শুদ্ধৌজাতে। ১। ৬।

ইষ্টাহতস্বস্বহরেণ যুক্তে ইতি বক্ষ্যমানবিধিনা ধনর্ণয়োরন্তরমেব যোগঃ ইতি বীজোক্ত্যা

১. শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ সম্পাদিত লীলাবতী পৃঃ ৯৯—১০১।

চইষ্টগুণিতস্বহারক্ষেপণেন যথা ধনলব্ধিঃ স্যাদিতি তথা কৃতে জাতে গুণাপ্‌তী। ৭। ৪। এবং সর্বত্র। অথবা হরতষ্টে ধনক্ষেপে ইতি।

ন্যাসঃ। ভাজ্য। ৫। হারঃ। ৩। ক্ষেপঃ। ২।

পূর্ববজ্জাতে গুণাপ্‌তী। ২। ৪। এতে স্বস্বহারাভ্যাং শোধিতে বিশুদ্ধিজে জাতে। ১। ১। ক্ষেপতক্ষণলাভাঢ্যা লব্ধিরিতি জাতৌ ক্ষেপজৌ লব্ধিগুণৌ ১০। ২। শুদ্ধৌ তু বর্জিতেতি শুদ্ধিজৌ ভবতঃ কিন্ত্বত্র শুদ্ধা ন ভবতি তস্মাদ্বিপরীত-শোধনেন ঋণলব্ধিঃ। ৬। গুণ। ১। ধনলব্‌ধ্যর্থং দ্বিগুণে স্বহারে ক্ষিপ্‌তে মতি জাতে ৭। ৪।[১]

মর্মার্থ ঃ বুদ্ধিমান গণক গুণ ও লব্ধি উভয় স্থানে তক্ষণ ফল সমান গ্রহণ করিবে। ক্ষেপ, হর হইতে অধিক হইলে হর দ্বারা তষ্ট করিয়া অবশিষ্ট ক্ষেপ দ্বারা গুণ ও লব্ধিসাধন করিবে। ধনক্ষেপ হইলে, ক্ষেপকে হর দ্বারা তক্ষণ করার যে ফল হইয়াছে, তাহা এই লব্ধিতে যোগ করিলে বাস্তব লব্ধি হইবে। ঋণক্ষেপ স্থানে সাধিত লব্ধি হইতে তক্ষণ ফল বিয়োগ করিলে বাস্তবলব্ধি হইবে। গুণ যথাগতই থাকিবে।

উদাহরণ ঃ 5'কে যে সংখ্যাদ্বারা গুণ করিয়া 23 যোগ বা বিয়োগ করতঃ 3 দ্বারা ভাগ করিলে নিঃশেষ হয় সেই সংখ্যা বল।

$y=\dfrac{5x+23}{3}$, 5, 3 ইহাদের পরস্পর ভাগ করিলে ভাগফল 1, 1,

বল্লী		
1	46	11
1	23	2
23		
0		

46'কে তাহার হর 5 দ্বারা তক্ষণ করিলে তক্ষণ ফল 9 হইতে পারে। কিন্তু 23'কে তাহার হর 3 দ্বারা তক্ষণ (ভাগ) করিলে 7 হয়।

উভয় স্থলেই তক্ষণ ফল সমান লইতে হইবে। এজন্য

$46-(3\times7)=11$ লব্ধি

$23-(3\times7)=2$ গুণ

যদি প্রশ্নে 23 বর্জিত থাকে তবে এই লব্ধি ও গুণকে তাহাদের হর 5, 3 হইতে বিয়োগ করিবে। এস্থলে 5 হইতে লব্ধি 11 বিয়োগ করা যায় না এজন্য 11 হইতে 5 বিয়োগ করিয়া ঋণ লব্ধি 6 গ্রহণ করিবে। 3 হইতে আগত গুণ 2 বিয়োগ করিলে 1 গুণ হইবে।

---

১. Li (C) পৃঃ ১০৭—১০৮।

ঋণলব্ধি 6 স্থানে ধনলব্ধি করিবার জন্য 'ইষ্টাহত স্বস্বহরেণ যুক্তে' এই নিয়মে $5\times2=10$ যোগ করিতে হইবে, কিন্তু 'ধনর্ণয়োন্তরমেব যোগঃ' এই নিয়মে $10-6=4$ লব্ধি। $3\times2=6$ পূর্বসিদ্ধ গুণ 1 সহিত যোগ করিলে গুণ 7; ঋণলব্ধি সাধনে সর্বত্রই এই নিয়ম জানিবে।

অথবা 'হরতষ্টে ধনক্ষেপে' এই নিয়মে ক্ষেপ 23কে হর 3 দ্বারা তক্ষণ করিয়া শেষ 2' কে ক্ষেপ করিলে বল্লী

1	4	ধনক্ষেপে লব্ধি 4 গুণ 2; ইহাদিগকে
1	2	নিজ নিজ হর 5। 3 হইতে বিয়োগ
2		করিলে লব্ধি 3 গুণ 1, 1;
0		

ক্ষেপেতক্ষণলাভাঢ্যা লব্ধিঃ শুদ্ধৌ তু বর্জিতা' এই নিয়মে $7+4=11$ ধনক্ষেপে লব্ধি। গুণ সেই 2;

$1-7=-6$ ঋনক্ষেপে লব্ধি। গুণ সেই 1; ইহাদিগকে ধনলব্ধি করিবার জন্য দ্বিগুণিত নিজ নিজ হর $5\times2=10$, $3\times2=6$ যোগ করিলে 'ধনর্ণয়োরন্তরমেব যোগঃ' এই নিয়মে লব্ধি 4 গুণ 7।[১]

এরপর দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন : ক্ষেপাভাবোঽথবা যত্র ক্ষেপঃ শুদ্ধোহরোদ্ধৃতঃ। জ্ঞেয়ঃ শূন্যং গুণস্তত্র ক্ষেপো হারহৃত ফলম্।

মর্মার্থ : ক্ষেপ না থাকিলে বা ক্ষেপকে হর দ্বারা ভাগ করিয়া নিঃশেষ হইলে গুণ 0 হইবে। ক্ষেপাভাব হইলে লব্ধি 0। ক্ষেপকে হর দ্বারা ভাগ করিলে যে স্থানে নিঃশেষ হয়, সে স্থানে এই ভাগফলই লব্ধি হইবে।[২]

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

যেন পঞ্চ গুণিতাঃ খসংধুতাঃ পঞ্চষষ্ঠিসহিতাশ্চ তেঽথবা।

স্যুস্ত্রয়োদশহৃতানিরগ্রকাস্তং গুণং গণক কীর্তয়াস্তমে।

ন্যাসঃ। ভাজ্য। ৫। হরে ১৩। ক্ষেপঃ। ০। জ্ঞেয়ং শূন্যং গুণস্তত্র ক্ষেপোহারহৃতঃ ফলমিতি ক্ষেপাভাবে গুণাপ্তী। ০। ০। ইষ্টাহতেত্যথবা। ১৩। ৫। বা ২৬। ১০।

ন্যাসঃ ভাজ্য। ৫। হরেঃ। ১৩। ক্ষেপ ৬৫

ক্ষেপঃ শুদ্ধোহরোদ্ধৃতঃ জ্ঞেয়ঃ শূন্যং গুণস্তত্র ক্ষেপোহারহৃতঃ ফলমিতি জাতে গুণাপ্তী। ০। ৫। বা ১৩। ১০। অথবা ২৬। ২৫। ইত্যাদি।

---

১. শ্রীরাধাবল্লব ব্যাকরণতীর্থ জ্যোতিশাস্ত্রী সম্পাদিত লীলাবতী পৃঃ ১০০—১০২।

২. ঐ পৃঃ ১০২।

মর্মার্থ : হে গণক। পাঁচকে যে সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া 0 (শূন্য) বা 65 যোগ করতঃ 13 দ্বারা ভাগ করিলে নিঃশেষ হয়, সেই সংখ্যা আমাকে বল।

$\frac{\text{ভাজ্য } 5 \text{ ক্ষেপ } 0}{\text{হার } 13}$ । ক্ষেপাভাবে গুণ 0 লব্ধি 0 হরে।

'ইষ্টাহত স্বস্বহরেণ যুক্তে' এই নিয়মে 1 ইষ্ট কল্পনায় গুণ 13 লব্ধি 5 এবং 2 ইষ্ট কল্পনায় গুণ 26 লব্ধি 10।

অথবা ভাজ্য 5 ক্ষেপ 65 হার 13 ; 'ক্ষেপঃ শুদ্ধেদ্ধরোদ্ধৃতঃ জ্ঞেয়ঃ শূন্যং গুণস্তত্র ক্ষেপো হারহৃতঃ ফলং' এই নিয়মে গুণ 0 ; লব্ধি $65 \div 13 = 5$।

পূর্ববত 1 গুণ ইষ্ট কল্পনায় $13+0=13$ গুণ। লব্ধি $5+5=10$. 2 গুণ ইষ্ট কল্পনায় $13 \times 2+10=$ গুণ ; $5 \times 2+5=15$ লব্ধি ইত্যাদি।[১]

নারায়ণের পদ্ধতি : নারায়ণের তাঁর গণিত কৌমুদী এবং বীজগণিতবতংসঃ গ্রন্থদ্বয়ে একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সম্পর্কে বলেছেন :

দৃঢ়ভাজ্যহরৌ বিভজেত্ পরস্পরং যাবদেকমবশেষম্।
বিন্যাহধোহধস্তাত্ ফলানি তদধস্তথা ক্ষেপম্॥
তদধঃ খমুপান্ত্যেনাহতে নিজোর্দ্ধেন্তিমেন সংযুক্তে।
অন্ত্যং জহাদেবং যাবদ্রাশিদ্বয়ং ভবতি॥
হরভাজ্যাভ্যাং তষ্টাবধরোর্দ্ধৌ তে ক্রমেণ গুণলব্ধী।
যদি লব্ধয়ঃ সমাঃ স্যুস্তদাগুণাপ্তো যথাগতে ভবতঃ॥
বিষমাশ্চেত্ তে শোধ্যে গুণলব্ধী স্বস্বতক্ষণাচ্ছেষে।
যোগমেব গুণলব্ধী নিজতক্ষণতো বিশোধিতে ক্ষয়জে॥
ইষ্টগ্নতক্ষণযুতে বহুধা ভবতো গুণাপ্তী তে।
সর্বত্র কুট্টকবিধৌ কার্যং সমতক্ষণং সুধিয়া॥[২]

মর্মার্থ নিষ্প্রয়োজন।

এছাড়া কমলাকর ও পরবর্তী বহু ভারতীয় গণিতবিদ এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

---

১. শ্রীরাধাবল্লব স্মৃতি ব্যাকরণতীর্থ জ্যোতিস্তীর্থ সম্পাদিত লীলাবতী পৃঃ ১১২।

২. গণিত কৌমুদী—পদ্মাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত পৃঃ ২১৩—২১৪। শ্লোকসমূহ ২১—২৫, এবার থেকে এটিকে G. K (P. D.) বলা হবে।

বীজগণিতবতংসঃ—কৃপাশঙ্কর শুক্লা পৃঃ ২৬. সূত্রসমূহ ৫৫—৫৯. এবার থেকে এটিকে B ī V (K.S.S.) বলা হবে।

(খ) $by=ax\pm 1$ এই ধরণের সমীকরণ সম্পর্কে প্রথম ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, নারায়ণ প্রমুখ আলোচনা করেছেন।

প্রথম ভাস্করাচার্যের পদ্ধতি

রূপমেকমপাস্যাপি কুট্টাকারঃ প্রসাধ্যতে।
গুণকারোঽথ লব্ধশ্চ রাশী স্যাতামুপর্যধঃ। ৪৫

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন ঃ

হৃতয়োঃ পরস্পরং যচ্ছেষং গুণকারভাগহারকয়োঃ
তেন হৃতৌ নেশ্চেদৌ তাবেব পরস্পরং হৃতয়োঃ।
লব্ধমধোঽধঃ স্থাপ্যং তথেষ্টগুণকারসঙ্‌ গুণংশেষম্‌।
শুদ্ধতি যথৈকহীনং গুণকঃ স্থাপ্যঃ ফলং চান্ত্যাত্‌।
অগ্রান্তমুপান্ত্যেন স্বোর্ধ্বো গুণিতোঽন্ত্যসংযুতোভক্তম্‌।
নিঃশেষভাগহারেণৈবং স্থিরকুট্টকে শেষম্‌॥ ১১

মর্মার্থ ঃ এদের পরস্পর ভাগ কর তারপর ভাগফলগুলি একটির নীচে অন্যটি স্থাপন কর। শেষ ভাগফলকে কোন ইচ্ছামত রাশি দিয়ে এমনভাবে গুণ করো যে এই গুণফলের সঙ্গে এক বিয়োগ দিলে শেষ ভাগশেষের সঙ্গে জড়িত ভাজক দিয়ে ভাগ দিলে ভাগশেষ কিছু থাকবে না। এই ঐচ্ছিক সংখ্যা এবং সর্বশেষ এইভাবে প্রাপ্ত] ভাগফল (পূর্বের বল্লীর নীচে) বসাও।

এই মতিকে (ইচ্ছামত ধরা সংখ্যাকে মতি বলা হয়) ঠিক উপরের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে তার নীচের সংখ্যা যোগ কর। তারপর এই পদ্ধতি অনুসরণ কর। এইভাবে সর্বোপরি রাশি পাওয়া গেলে পরিবর্তিত ভাজক দিয়ে ভাগ করলে আমরা আমাদের ইষ্ট সংখ্যা পাব (ভাবানুবাদ).

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের পদ্ধতি ঃ ক্ষেপে তু রূপে যদি বা বিশুদ্ধে স্যাতাং ক্রমাদ্‌ যে গুণকারলব্ধী। অভীপ্সিতক্ষেপবিশুদ্ধিনিঘ্নে স্বহারতষ্টে ভবতস্তয়োস্তে।

মর্মার্থ হচ্ছে ঃ 1 ধনক্ষেপ বা ঋণক্ষেপ কল্পনা করিয়া ভাজ্য ও ভাজক হইতে যে গুণ ও লব্ধি পাওয়া যায়, তাহাদিগকে অভীষ্ট ক্ষেপ দ্বারা গুণ করিয়া, নিজ নিজ হার দ্বারা তক্ষণ করিলে বাস্তব গুণ ও লব্ধি হইবে।[১]

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

প্রথমোদাহরণে দৃঢ়ভাজ্যাহারয়োঃ রূপক্ষেপয়োর্ণ্যাসঃ ভাজ্যঃ।

১. লীলাবতী—শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ সম্পাদিত পৃঃ ১০৩।

১৭। হারঃ। ১৫। ক্ষেপ। ১

অত্র গুণাপ্তী ৭। ৮। এতে ত্বিষ্টক্ষেপেণ পঞ্চকেন গুণিতে স্বহারণষ্টে জাতে ৫। ৬। অথ রূপশূদ্ধৌ গুণাপতী। ৮। ৭। তক্ষণাচ্ছুদ্ধৌ জাতৌ লব্ধিগুণৌ ৯। ৮ এতে পঞ্চগুণে স্বহারতষ্টে চ জাতে ১০। ১১। এবং সর্বত্র।

মর্মার্থ ঃ পূর্বপ্রদর্শিত কুট্টক প্রথমোদাহরণে দৃঢ়ভাজ্য 17, দৃঢ়হার 15, ধনদৃঢ়ক্ষেপ 5 ; 1 ধনক্ষেপ কল্পনা করিলে বল্লী

$$\begin{array}{cc} 1 & 8 \\ 7 & 7 \\ 1 & \\ 0 & \end{array}$$

এই গুণকে ক্ষেপ 5 দ্বারা গুণ করিলে গুণ 35 ইহাকে গুণের হার 15 দ্বারা তক্ষণ করিলে বাস্তব গুণ 5 ; লব্ধি 8 কে ক্ষেপ 5 দ্বারা গুণ করিলে বাস্তব লব্ধি 40 ইহাকে লব্ধির হার 17 দ্বারা তক্ষণ করিলে বাস্তব লব্ধি 6।

ঋণ দৃঢ়ক্ষেপ 5 হইলে, 1 ঋণক্ষেপ কল্পনা করিয়া বল্লী হইতে আগত লব্ধি 8 গুণ 7 কে "যোগজে তক্ষণাচ্ছুদ্ধে গুণাপ্তী স্তো বিয়োগজে' এই নিয়মানুসারে নিজ নিজ হার হইতে বিয়োগ করিয়া লব্ধি 9 গুণ 8। ইহাতে ক্ষেপ 5 দ্বারা গুণ করিয়া নিজ নিজ হার দ্বারা তক্ষণ করিলে 5 ঋণক্ষেপে লব্ধি 11 গুণ 10। এইরূপ সর্বত্র। 1 রূপক্ষেপ কল্পনা করিয়া লব্ধি ও গুণ যথাক্রমে 9। 8 ইহাদিগকে 5 ঋণক্ষেপ দ্বারা গুণ 45। 40 নিজ নিজ হর 17। 15 দ্বারা তক্ষণ করিলে 11। 10 বাস্তবলব্ধি ও গুণ হইবে। এইরূপ সর্বত্র জানিবে।[১]

$by=ax\pm1$ এই সমীকরণ দুটি নিয়ে নারায়ণ এবং তাঁর পরবর্তী যুগের ভারতীয় গণিতবিদেরা আলোচনা করেছেন।

(গ) $by-ax=\pm c$ এই সমীকরণ দুটি নিয়ে ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, নারায়ণ প্রমুখ আলোচনা করেছেন।

(ঘ) $ax+by+cz=d$ ঃ সমীকরণটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটি দুই এর অধিক অজ্ঞাত রাশির এক মাত্রার সমীকরণ। এ ধরনের সমাধান করতে গিয়ে ভারতীয়রা দুটি অজ্ঞাতরাশি ব্যতীত বাকীগুলির কোন নির্দিষ্ট মান ধরে তারপর কুট্টক প্রণালীতে সমাধান করেছেন। যেমন দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য তার বীজগণিত গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন ঃ মাণিক্যামলনীলমৌক্তিকমিতিঃ পঞ্চাষ্ট সপ্ত

১. লীলাবতী—শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণতীর্থ জ্যোতিশাস্ত্রী, পৃঃ ১০৩।

ক্রমাদেকস্যান্যতরস্য সপ্ত নব ষট্ তদ্রত্নসংখ্যা সখে। রূপাণাং নবতির্দ্বিষষ্টিরনয়োস্তৌ তুল্যবিত্তৌ তথা বীজজ্ঞ প্রতিরত্নজানি সুমতে মৌল্যানি শীঘ্রংবদ।[১]

অর্থাৎ একটি লোকের নিকট মাণিক্য নীলা এবং মুক্তা যথাক্রমে 5, 8 এবং 7টি করে আছে, অপর একটি লোকের নিকট যথাক্রমে 7, 9 এবং 6 করে আছে। প্রথম ব্যক্তি 90 টাকা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির 62 হোলে এদের ধনতুল্য হবে। তাহলে ঐ রত্নগুলির পৃথক পৃথক মূল্য কত?

আধুনিক বীজগণিতে এটি প্রকাশ করলে এইরূপ হবে—

$5x+8y+7z+90=7x+9y+6z+62$, এটির সমাধান দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য করেছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি উদাহরণ দিয়েছেন এবং ভাষ্যকার পৃথূদকস্বামী এটি সমাধান করতে গিয়ে একটি অজ্ঞাত রাশির নির্দিষ্টমান ধরে নিয়ে তারপর পূর্ব-প্রথা অনুযায়ী সমাধান করেছেন।

১৩.৬ একটি তুলনামূলক বিচার

বহু গণিত ঐতিহাসিক $ax-by=c$ সমীকরণটির সমাধানে ভারতীয় পদ্ধতিতে বৈদেশীক প্রভাবের কথা বলেছেন। অনেকে বিশেষ করে ক্যে প্রমুখেরা বলেন যে এই পদ্ধতির সমাধান প্রথম আর্যভট করেন নি। আমরা এখানে চীনা এবং গ্রীকদের মধ্যে এ সম্পর্কে কি ধরনের ধারনা ছিল এবং তারপর বিভিন্ন ভারতীয় পদ্ধতির সমাধান নিয়ে কিছুটা আলোচনা করবো।[২]

চীনা অবদান:—প্রথম শতাব্দীর প্রাক্কালে বিখ্যাত চীনা গণিতজ্ঞ সুন ৎসু (Sun, Tsu) এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ জানতেন। এই এক মাত্রার সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা সুয়াণ চীঙ্গ নামক গ্রন্থে বেশ ভালভাবে দেখা যায়। তাই চেঙ্গ এবং অন্যান্যদের মতে এটি ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। বিখ্যাত চীনা গণিত ঐতিহাসিক য়োশিও মিকামী তাঁর ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যাথেমেটিকস্ ইন চাইনা এণ্ড জাপান গ্রন্থে সুন ৎসুর একটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে "কতকগুলি দ্রব্য আছে যার সংখ্যা অজ্ঞাত। যদি—ঐ সংখ্যাকে 3 দিয়ে ভাগ

---

১. B. Bi. (A. S. S) পৃঃ ১১৭.

২. Ganguli, S. K. (Notes and question) India's contribution to the theory of indeterminate equations of the first degree, Vol 19, 1932. Pages 110-140, 153-168

১৩.৭ লিখতে গিয়ে এই প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ সাহায্য নিয়েছি। এজন্য আমি উক্ত প্রবন্ধকারের নিকট কৃতজ্ঞ।

দেওয়া যায় তাহলে 2 ভাগশেষ থাকবে, 5 দিয়ে ভাগদিলে 3 ভাগশেষ থাকবে, 7 দিয়ে ভাগ দিলে 2 ভাগশেষ থাকবে, সংখ্যাটি কত ?

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটি একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ এবং প্রশ্নানুসারে দাঁড়ায়

$$n=3x+2=5y+3=7z+2.$$

এই সমীকরণটির সাধারণ সমাধান হচ্ছে :

$n=3.5.7i+23, \quad x=5.7i+7, \quad y=3.7i+4$

$z=3.5i+5$ ($i=0$ বা যে কোন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা)

স্থন ৎস্থ বলেছেন—3 ভাজক এবং 2 ভাগশেষ অতএব সংখ্যাটি 140 ধর, 5 ভাজক এবং 3 ভাগশেষ হলে সংখ্যাটি 63 ধর, 7 ভাজক এবং 2 ভাগশেষ হলে সংখ্যাটি 30 ধর। এগুলির যোগফল 233, এথেকে $(3.5.7)\times 2$ বাদ দিলে 23 উত্তর। স্থন ৎস্থ এখানেই থেমে থাকেন নি, তিনি সংখ্যাগুলি ধরবার যৌক্তিকতা নিয়েও নানা যুক্তি দিয়েছেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন $ax-by=1$ সমীকরণটির সমাধান স্থন ৎস্থ আবিষ্কার না করলেও তিনি এটির নির্দিষ্ট দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

স্থন ৎস্থর পরে $ax-by=c$ সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন চীনা বৌদ্ধ "আই হিঙ্গ"। তিনি "তা ঐ য়েণ" (t'ai – yen) পদ্ধতি ব্যবহার করেন। অনেকগুলি সংখ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন সমীকরণ সমাধান করতে গিয়েই এই পদ্ধতির প্রয়োগ তিনি করেছিলেন। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যেহেতু তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন এবং আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের পরবর্তী লোক, অতএব এ ব্যাপারে ভারতীয় প্রভাব তাঁর মধ্যে পড়তে পারে। অবশ্য অনেকে এ মত বাতিল করে দেন কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে "চীন চিউ সাও" তার গ্রন্থ স্থ-স্থ চিউ চাঙ্গ'এ যা আলোচনা করেছেন তাতে আবিষ্কারক হিসাবে আই হিঙ্গের নামই বলা যেতে পারে। চীনা গণিত গ্রন্থে শত কুক্কুক নামে একটি উদাহরণ আছে যেটি অবিকল গণিতসার সংগ্রহে মহাবীর উল্লেখ করেছেন। এর ফলে অনেকে মনে করেন মহাবীর হয়তো অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানে চীনা প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারেন। আবার অনেকে এ মত খারিজ করে দিয়েছেন। তবে মহাবীরের পদ্ধতি এবং চীনা পদ্ধতি কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়াও অনেকে অনুমান করেন যে "শত কুক্কুট" উদাহরণটি চীনেরা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। এখন 'শত কুক্কুট' উদাহরণটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

শত কক্কুট উদাহরণ থেকে চীনারা যে সমীকরণ পায় সেগুলি হচ্ছে ঃ

(i) $x+y+3z=100$

$5x+3y+z=100$

(ii) $x+y+4z=100$

$5x+4y+z=100$

এথেকে দুটি এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ পাওয়া যায়

(iii) $7x=4(25-y)$

(iv) $19x=15(20-y)$

এদুটি সমীকরণ অত্যন্ত সহজভাবে সমাধান করা যায়।

মহাবীরের উদাহরণ থেকে নিম্নলিখিত সমীকরণ দুটি পাওয়া যায়—

$$3x+5y+7z+9w=100$$

$$5x+7y+9z+3w=100$$

গ্রীক অবদান গের্সার নিকোমেকাস এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডায়োফ্যাণ্টের সম্পর্কে রীতিমত ঐতিহাসিক বিতর্ক আছে। এ্যান্থলজি (500 খ্রীঃ) দুটি সমীকরণ দেন একটি হচ্ছে $x=4y$ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে তিনটি সমীকরণ যার মধ্যে চারটি অজ্ঞাত রাশি বর্তমান। অর্থাৎ

$$x+y=x_1+y_1$$

$$x=2y_1$$

$$x_1=3y$$

বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে বহু ঐতিহাসিক মনে করেন এক মাত্রার সমীকরণে গ্রীক অবদান যৎ সামান্য। এবং ফলে তাঁরা ক্যে'র মতকে ভ্রান্ত বলে ধরে নিয়েছেন।

ভারতীয় পদ্ধতি ঃ আমরা দেখলাম স্থন ৎস্থ সাধারণ পদ্ধতির (general method) একটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় প্রথম আর্যভট সাধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। আর্যভট এ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা স্থন ৎস্থর পদ্ধতি থেকে আলাদা। প্রকৃতপক্ষে আর্যভটের পদ্ধতি থেকে স্থন ৎস্থর পদ্ধতি পাওয়া যায় কিন্তু স্থন ৎস্থর পদ্ধতি থেকে আর্যভটের পদ্ধতি পাওয়া যায় না। তবে এটা ঠিক কথা যে প্রথম আর্যভটের উদাহরণ এবং স্থন ৎস্থর উদাহরণ অন্য কোন তৃতীয় জাতির মাধ্যম থেকে পাওয়া বা তাঁরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে বের করেছেন তা বলা কঠিন।

পূর্বের অনুচ্ছেদে আমরা প্রথম আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, প্রথম ভাস্করাচার্য, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ও দ্বিতীয় আর্যভটের প্রণালী নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছি। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে দ্বিতীয় আর্যভট এবং দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের প্রণালীর মধ্যে সাদৃশ যথেষ্ট রয়েছে। আবার প্রথম আর্যভট, দ্বিতীয় আর্যভট ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের প্রণালীর মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। প্রথমে দ্বিতীয় আর্যভট ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের প্রণালীর মধ্যে সাদৃশগুলি দেখাচ্ছি তারপর প্রথম আর্যভট, দ্বিতীয় আর্যভট ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের প্রণালীর পার্থক্যগুলি দেখাচ্ছি।

সাদৃশ্য (ক) একই প্রাথমিক প্রক্রিয়াদ্বারা উভয়েই মূল $ax=by+c$ সমীকরণটি সামাধান করেছেন।

(খ) উভয়েই মতি$=0$ ধরেছেন।

(গ) উভয়েই $ax=by+c$ সমীকরণটির বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন

(ঘ) উভয়ই $ax=by\pm1$ সমীকরণটিকে ক্ষেপ c দিয়ে গুণকরে $ax=by\pm c$ সমীকরণটির বীজ বের করেছেন

(ঙ) পরিবর্তিত সমীকরণ $Ax=By+C$ কে B এবং A দ্বারা ভাগ করে সর্বনিম্ন বীজগুলি একই নিয়মে পেয়েছেন

(চ) উভয়েই একই ধরনের ভাগফলের একটা সুবিন্যস্ত শৃঙ্খল পেয়েছেন যার ফলে $Ax=By+C$ অথবা $Ax=By-C$ সমীকরণটির বীজগুলি পেয়েছেন।

(ছ) $ax=by+c$ সমীকরণ থেকে $ax=by-c$ সমীকরণটির বীজ নির্ণয় করার পদ্ধতি উভয়েই এক ভাবে দিয়েছেন।

(জ) একই ভাজক সহ এক মাত্রার অনির্ণেয় সহ সমীকরণের নিয়ম উভয়ে একই রকম দিয়েছেন।

এছাড়াও আরও নানা সাদৃশ লক্ষ্য করা যায়।

পার্থক্য (ক) পরিবর্তিত $ax=by+c$ এর প্রথম পদ্ধতির সমাধান প্রথম আর্যভট ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। যদিও ভাগশেষের শৃঙ্খলটি দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রথম আর্যভটের শৃঙ্খল থেকে সাহায্য নিয়েছেন। এখন প্রথম আর্যভট, দ্বিতীয় আর্যভট ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের ভাগশেষের শৃঙ্খল নিয়ে তুলনা করা যাক।

প্রথম আর্যভট	দ্বিতীয় আর্যভট	দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য
Q_1	Q_1	Q_1
Q_2	Q_2	Q_2
Q_3	Q_3	Q_3

....	....	....
....	....	....
Q_{n-2}	Q_{n-2}	Q_{n-2}
Q_{n-1}	Q_{n-1}	Q_{n-1}
$Q\ t+c$	$I\ [\because c=1]$	c
t	ϕ	O
c	$\not{I}$	C (বাতিল)

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য c অতিরিক্ত হেতু বাতিল করে দিয়েছেন, দ্বিতীয় আর্যভট ঐ একই কারণে O এবং I কে বাতিল করে দিয়েছেন।

(খ) দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ক্ষেপ ঋণাত্মক হলে এবং ভাজক দ্বারা বিভাজ্য হলে সেক্ষেত্রে বাতিল করেন নি।

$Ax=By-mA$ সমীকরণে $x=-m$ যখন $y=o$ ধরেছেন।

$x=Bt-m \quad y=At$ এবং t এর এমন একটি সাংখিক মান দিয়েছেন যার ফলে x ধনাত্মক হয়। এছাড়াও আরও নানা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

এখন আমরা অনির্ণেয় সমীকরণের একটি উদাহরণ $63x=100y+90$ নিয়ে প্রথম আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, দ্বিতীয় আর্যভট, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখের প্রণালীতে সমাধান করে এঁদের পদ্ধতিগুলি স্পষ্ট করে তুলে ধরছি।

(ক) প্রথম আর্যভট

এ ক্ষেত্রে আর্যভটের শৃঙ্খলগুলি নিম্নরূপ

1	63	100	1
2	26	37	1
1	4	11	2
	1	3	3
		0	

$1\to 100t+2430$

$1\to(37t+900)+(26t+630)=63t+1530$

$1\to(26t+630)+(11t+270)=37t+900$

$2\to(11t+270)+(4t+90)=26t+630$

$2\to 2(4t+90)+(3t+9t)=11t+270$

$1\to(3t+90)+t=4t+90$

$3\to 3t+90$

t

90

এখন $63t+1530\equiv 18 \pmod{63}$

y এর লঘিষ্ঠ মান $y=18$

আবার $100t+2430\equiv 30 \pmod{100}$

x এর লঘিষ্ঠ মান $x=30$

(খ) ব্রহ্মগুপ্ত ও মহাবীরের পদ্ধতি :

($খ_১$) যুগ্ম সংখ্যক ভাগফলের ক্ষেত্রে—

চারটি ভাগফল 1, 1, 1, 2 নির্ণয় করার পর ভাজক 4, ভাজ্য 11, ক্ষেপ 90।

পরীক্ষার সাহায্যে আমরা পাই $11\times2+90$

4 দিয়ে ভাগ দিলে 28 ভাগফল হয়।

প্রথম ভাগফল বাদ দিয়ে শৃঙ্খল পাওয়া যায়

$1\rightarrow1\times86+58=144$

$1\rightarrow1\times58+28=86$

$2\rightarrow2\times28+2=58$

28

2 (মতি)

এখন $144\equiv18 \pmod{63}$

y এর লঘিষ্ঠ মান $y=18$

x এর লঘিষ্ঠ মান $x=30$

($খ_২$) অযুগ্ম সংখ্যক ভাগফল

ভাগফল 1, 1, 1, 2, 2 পাওয়া যায়। ভাজক $=4$, ভাজ্য $=3$, ক্ষেপ $=90$ একই থাকবে। অযুগ্ম সংখ্যক ভাগফল হেতু ক্ষেপ বিপরীত চিহ্নযুক্ত হবে, ভাজ্য হবে ভাজক এবং ভাজক হবে ভাজ্য। এক্ষেত্রে ভাজক $=3$, ভাজ্য $=4$, ক্ষেপ $=90$।

মতি এক্ষেত্রে 24 কারণ $(4\times24-90)$ 3 দ্বারা বিভাজ্য, ভাগফল $=2$।

প্রথম ভাগফল বাদ দিয়ে যে শৃঙ্খল পাওয়া যায়

$1\rightarrow1\times86+58=144$

$1\rightarrow1\times58+28=86$

$2\rightarrow2\times28+2=58$

$2\rightarrow2\times2+24=28$

2

24

যেহেতু $144 \equiv 18 \pmod{63}$

y এর লঘিষ্ঠ মান, $y=18$

x " " ", $x=30$

(গ) **মহাবীরের দ্বিতীয় পদ্ধতি :**

এক ভাগশেষ এলে ভাগ করা বন্ধ কর। এখানে 6 টি ভাগফল পাওয়া যায় অর্থাৎ যুগ্মসংখ্যক ভাগফল পাওয়া যাচ্ছে।

মহাবীর $t=1$ (প্রথম আর্যভটের প্রণীত মান) নিয়েছেন।

$\therefore \ y=63+1530$

যখন 63 দ্বারা লঘুকরণীতে পরিবর্তিত (reduced) হয় তখন

y এর লঘিষ্ট মান, $y=18$

x " " ", $x=30$

(ঘ) **দ্বিতীয় আর্যভটের প্রণালী :**

ক্ষেপ ও ভাজক থেকে G. C. M. 9 অপসারণ কর এবং পরিবর্তিত ক্ষেপ ও ভাজ্যের G. C. M 10

পরিবর্তিত (reduced) ভাজক $=7$

" ভাজ্য $=10$

" ক্ষেপ 1

অতএব দ্বিতীয় আর্যভটের প্রণালী থেকে নিম্নলিখিত শৃঙ্খল পাওয়া যায়।

2	7	10	1
	1	3	

$1 \rightarrow 1 \times 2 + 1 = 3$

2

1

পরিবর্তিত ভাজক, ভাজ্য ও ক্ষেপসহ ভাগফল এবং গুণক 2

অতএব প্রদত্ত ভাজক, ভাজ্য এবং ক্ষেপসহ

ভাগফল $x=3\times 10=30$

গুণক $y=2\times 9=18$

(ঙ) **দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের প্রণালী :**

($ঙ_1$) প্রথম আর্যভটের শৃঙ্খলে $t=0$ ধরে

সর্বোচ্চ সংখ্যা থেকে $x=2430$, $y=1530$ পাওয়া যায়

সর্ববৃহৎ নিয়ে পরিবর্তিত করলে $x=30$, $y=18$ পাওয়া যায়।

($ঙ_2$) ভাজ্য ও ক্ষেপ থেকে H. C. F 10 অপসারণ কর।

ভাজক $=63$, পরিবর্তিত ভাজ্য $=10$, পরিবর্তিত ক্ষেপ $=9$।

6	63	10	0
	3	10	3
		1	

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের নিয়ম অনুযায়ী নিম্নলিখিত শৃঙ্খল পাব

$0 \to 0 \times 171 + 27 = 27$

$6 \to 6 \times 27 + 9 = 171$

$3 \to 3 \times 9 + 0 = 27$

9

0

অযুগ্ম (এখানে 3) সংখ্যক ভাগফল

$63x = 10y - 9$ সমীকরণটি থেকে একজোড়া বীজ 27 এবং 171 পাওয়া যায়।

এখন $27 \equiv 7 \pmod{10}$, $\quad 171 \equiv 45 \pmod{63}$

অতএব $63x = 10y - 9$ এর লঘিষ্ঠ ধনাত্মক অখণ্ড বীজদ্বয় 7 এবং 45 পাওয়া যাচ্ছে।

$63x = 10y + 9$ এর লঘিষ্ঠ ধনাত্মক অখণ্ড বীজদ্বয় হচ্ছে

$(10-7)$ এবং $(63-45)$ বা 3 এবং 18.

$63x = 100y + 90$ এর লঘিষ্ঠ ধনাত্মক বীজদ্বয় হচ্ছে

$x = 3 \times 10 = 30, \qquad y = 18$

($ঙ_3$) ভাজক এবং ক্ষেপ থেকে G. C. M. 9 অপসারণ কর তাহলে পাওয়া যাবে

পরিবর্তিত ভাজক $=7$

" ভাজ্য $=100$

" ক্ষেপ $=10$

3	7	100	14
	1	2	

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের সূত্রানুযায়ী একটি শৃঙ্খল পাওয়া যাবে।

$14 \to 14 \times 30 + 10 = 430$

$3 \to 3 \times 10 + 0 = 30$

10

0

এখানে যুগ্ম $(=2)$ সংখ্যক ভাগফল পাওয়া যাচ্ছে।

অতএব $7x=100y+10$ এর 430 এবং 30 একজোড়া বীজ পাওয়া যায়।

এখন $430\equiv30 \pmod{100}$, $30\equiv2 \pmod 7$

অতএব উক্ত সমীকরণের 30 এবং 2 লঘিষ্ঠ বীজদ্বয়। অতএব আদি সমীকরণের বীজদ্বয় 30 এবং 18।

(ঙ৪) ক্ষেপ এবং ভাজক থেকে G. C. M 9 অপসারণ কর। এবং পরিবর্তিত ক্ষেপ এবং ভাজ্য থেকে G. C.M 10 অপসারিত কর। তাহলে পাওয়া যায়

পরিবর্তিত ভাজক $=7$

" ভাজ্য $=10$

" ক্ষেপ $=1$

যেহেতু পরিবর্তিত ক্ষেপ $=1$, অতএব বাকী পদ্ধতি ঘ'এর অনুরূপ।

১৩·৭ এক মাত্রার অনির্ণেয় সহ সমীকরণ

প্রথম মাত্রার অনির্ণেয় সহ সমীকরণ সম্পর্কে ভারতীয় গণিতবিদেরা ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে প্রথম আর্যভট, প্রথম ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখ গণিতবিদদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি সমাধান করেন।

(ক) $a_1x+b_1y+c_1z+d_1w=\omega$

$a_2x+b_2y+c_2z+d_2w=\omega$

$a_3x+b_3y+c_3z+d_3w=\omega$

$a_4x+b_4y+c_4z+d_4w=\omega$

(খ) $N=a_1x_1+r_1=a_2x_2+r_2=\cdots\cdots=a_nx_n+r_n.$

(গ) $\beta y_1=\alpha_1x\pm\gamma_1$

$\beta y_2=\alpha_2x\pm\gamma_2$

$\beta y_3=\alpha_3x\pm\gamma_3$

... ...

... ...

(ঘ) $\beta_1y_1=\alpha_1x\pm\gamma_1$

$\beta_2y_2=\alpha_2x\pm\gamma_2$

$\beta_3y_3=\alpha_3x\pm\gamma_3$

(ঙ) $x\pm\alpha=s^2$

$x\pm\beta=t_2$

(ক) দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এই ধরনের সমীকরণের জন্য উদাহরণসহ ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

"আদ্যং বর্ণং শোধয়েদন্যপক্ষাদন্যান্। রূপাণ্যন্যতশ্চাদ্যভক্তে। পক্ষে ঽন্যস্মিন্নাদ্যবর্ণোন্মিতিঃ সাদ্বর্ণস্যৈকস্যোন্মিতীনাং বহুত্বে। সমীকৃতচ্ছেদগমে তু তাভ্যস্তদন্যবর্ণোন্মিতয়ঃ প্রসাধ্যাঃ। অন্ত্যোন্মিতৌ কুট্টবিধের্গনাপ্তী তে ভাজ্যতদ্ভাজকবর্ণমানে। অন্যেঽপি ভাজ্যে যদি সন্তি বর্ণাস্তন্মানমিষ্টং পরিকল্প্য সাধ্যে। বিলোমকোত্থাপনতোঽন্যবর্ণমানানি ভিন্নং যদি মানমেবম্। ভূয়ঃ কার্য্যঃ কুট্টকোঽত্রান্ত্যবর্ণং তেনোত্থাপ্যোত্থাপযেদ্ব্যস্তমাদ্যান্।"

এ প্রসঙ্গে শ্রীপতি সিদ্ধান্ত শেখরে যা বলেছেন তা দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের উক্তির প্রায় কাছাকাছি। তিনি বলেছেন : (সিদ্ধান্ত শেখর ২য় গুখ পৃঃ ১০৯)

আদ্য বর্ণং প্রোজ্ভ্য পক্ষাতকুতোঽপি
ত্যক্ত্বা শেষানন্যতশ্চাদ্যভক্তে
প্রাহুস্তজ্জ্ঞাস্তা মিতীরাহুরেবং
কার্যাস্তল্যচ্ছেদনাভিশ্চভূয়ঃ ॥
একোন্মানে কুট্টকঃ স্যাত্ প্রমাণং
তান্যন্যনি স্যুঃ প্রতীপাত্ততশ্চ
কুট্টাকারে ভাজ্যবর্ণস্য মানং
তস্মিম্ লব্ধং হারবর্ণস্য চাহুঃ ॥

এটির মর্মার্থ হচ্ছে "যে স্থানে ২, ৩, ৪ প্রভৃতি অব্যক্ত বর্ণ থাকবে, সেই সকল স্থানে সমীকরণ অনেক হবে। এবং তাদের পুনঃ পুনঃ সমীকরণ করে শেষ সময়ে যদি শেষ বর্ণের মান ভিন্ন হয় তাহলে সেই স্থানে কুট্টকের নিয়মের ভাজ্য হারের বর্ণদ্বয়ের মান (ব্যক্ত) আনয়ন করবে, অতঃপর ঐ বর্ণমান (ব্যক্ত রাশি) দ্বারা উপরের সমীকরণ সমূহকে পরপর উত্থাপন দেবে, যদি উত্থাপন স্থানে পুনঃ বর্ণমান ভগ্নাংশ হয়, তাহলে সেই স্থানে পুনঃ কুট্টকের দ্বারা অভিন্ন মান আনয়ণ করবে, এইরূপ প্রথম বিলোমক্রমে উত্থাপন দিলে প্রত্যেক বর্ণের মানগুলি অভিন্ন হবে।

সমীকরণ শেষে যখন একটি বর্ণ আসবে, তখন তার মান কুট্টকের দ্বারা সাধন কর। কুট্টকস্থলে গুণ ও লব্ধিকে ভাজ্য এবং ভাজকের মান বুঝতে হবে, ঐ বর্ণমানের দ্বারা পূর্বরাশির মানে উত্থাপন দিয়ে পূর্ববর্ণের মান সাধন করবে। এরপর তৎ পূর্ব সমীকরণে ঐ বর্ণদ্বয় মান দ্বারা উত্থাপন দিলে তার পূর্বমান আসবে।"

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এই ধরনের অনির্ণেয় সহ সমীকরণ সম্পর্কে উদাহরণ দিয়েছেন তিনি বলেছেন—

"অশ্বাঃ পঞ্চগুণাঙ্গমঙ্গলমিতা যেষাং চতুর্ণা ধনান্যুষ্ট্রাশ্চ দ্বিমুনিশ্রুতিক্ষিতিমিতা অষ্টদ্বিভূপাবকাঃ তেষামশ্বতরা বৃষা মুনিমহীনেত্রেন্দুসংখ্যা ক্রমাত সর্বে তুল্যধনাশ্চ তে বদ সপত্বশ্বাদিমৌল্যানি মে।"[১]

মর্মার্থ: চার বণিকের যথাক্রমে পাঁচ, তিন, ছয় ও আটটি করে ঘোড়া; দুই, সাত, চার ও একটি করে উট; আট, দুই, এক ও তিনটি করে গাধা এবং সাত, এক, দুই ও একটি করে বৃষ আছে। সকলের ধন সমান হলে ঘোড়া প্রভৃতির মূল্য কত?

আধুনিক গণিতের ভাষায় এটি যদি লেখা যায় তাহলে এইরূপ হয়:

ধরা যাক একটি ঘোড়ার মূল্য x টাকা, একটি উটের মূল্য y টাকা, একটি গাধার মূল্য z টাকা এবং একটি বৃষের মূল্য w টাকা এবং তাহাদের প্রত্যেকের ধন ধরা যাক λ, তাহলে উপর্যুক্ত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়

$$5x+2y+8z+7w=\lambda$$
$$3x+7y+2z+w=\lambda$$
$$6x+4y+z+2w=\lambda$$
$$8x+y+3z+w=\lambda$$

এটি অবশ্য দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য সমাধান করেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একটি বিশেষ ধরনের সূত্র দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণটি হচ্ছে

"কস্ত্রয়োবিংশতিক্ষুণ্ণঃ ষষ্ট্যাহশীত্যা হৃতঃ পৃথক্
যদগ্রৈক্যং শতং দৃষ্টং কুট্টকজ্ঞ বদাহশু তম্।"[২]

এটিকে আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় লিখিলে দাঁড়ায়

$$\frac{23x-s}{60}=u, \qquad \frac{23x-t}{80}=v. \qquad \text{এবং} \quad s+t=100.$$

(খ) $N=a_1x_1+R_1=a_2x_2+R_2=\cdots\cdots\cdots=a_nx_n+R_n$ এই ধরনের সমীকরণ সম্পর্কে প্রথম আর্যভট কিছুটা আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত, প্রথম ভাস্করাচার্যও এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম ভাস্করাচার্য এ সম্পর্কে সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—কোন সংখ্যাকে 8 দিয়ে ভাগ দিলে 5 ভাগশেষ থাকবে, 9 দিয়ে ভাগ দিলে 4 ভাগশেষ থাকবে, 7 দিয়ে ভাগ দিলে 1 ভাগশেষ থাকবে?

---

১. BBi (A. S. S.) পৃঃ ১৬২, ২. ঐ পৃঃ ১৬৭।

অর্থাৎ যদি সংখ্যাটি N ধরা যায় তাহলে উপর্যুক্ত উদাহরণ থেকে আমরা পেতে পারি :

$$N=8x+5=9y+4=7z+1.$$

এটি সমাধান করতে গিয়ে প্রথম ভাস্করাচার্য যে নিয়ম প্রয়োগ করেছেন সেটি ইবন অল হাইথাম ও লিওনার্দো ফিবোনাচ্চির নিয়মের অনুরূপ।

ভারতীয়রা কত ব্যাপক এবং কত সুশৃঙ্খলভাবে এ ধরনের সমীকরণ নিয়ে আলোচন করেছেন সে সম্পর্কে ডঃ বি. বি. দত্ত গবেষণামূলক নিবন্ধে অতি প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছেন।[১]

(গ) $\beta y_1=\alpha_1 x\pm\gamma_1,\quad \beta y_2=\alpha_2 x\pm\gamma_2,\quad \beta y_3=\alpha_3 x\pm\gamma_3.$

এ ধরনের সমীকরণ সমাধান এবং আনুষঙ্গিক করণীয় যা কিছু সবই প্রথম আর্যভট এবং তাঁর উত্তরসূরীরা করে গিয়েছেন। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে এগুলি সাধারণ "সংশ্লিষ্ট কুট্টক" নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ সম্পর্কে বলেছেন :

"একো হরশ্চেদ্‌গুনকো বিভিন্নৌ তদা গুনৈক্য পরিকলপ্য ভাজ্যম্।
অগ্রৈক্যমগ্রং কৃত বক্তবত্তঃ সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞঃ স্ফুটকুট্টকোঽসৌ।"

"যদি কুট্টকস্থলে হর একই হয়, গুণক (ভাজ্য) ভিন্ন হয় তাহলে গুণযোগ গুণক এবং ক্ষেপযোগ ক্ষেপক মনে করে পূর্ব নিয়মে অঙ্ক করবে।"

এ সম্পর্কে একটি সুন্দর উদাহরণও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন

"কঃ পঞ্চনিঘ্নো বিহৃতস্ত্রিষষ্ট্যা সপ্তাবশেষোঽথ স এব রাশিঃ।
দশাহতঃস্যাদ্বিহৃতস্ত্রিষ্ট্যা চতুর্দশাগ্রো রাশিমেনম্।"[২]

অর্থাৎ কোন রাশিকে পাঁচ দিয়ে গুণ করে তেষট্টি দিয়ে ভাগ দিলে সাত ভাগশেষ থাকবে, ঐ রাশিকে দশ দিয়ে গুণ করে তেষট্টি দিয়ে ভাগ দিলে চোদ্দ ভাগশেষ থাকবে। এটিকে আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়—

$$\left.\begin{aligned}63y_1&=5x-7\\63y_2&=10x-14\end{aligned}\right\}$$

(ঘ) $\beta_1 y_1=\alpha_1 x\pm\gamma_1,\quad \beta_2 y_2=\alpha_2 x\pm\gamma_2,\quad \beta_3 y_3=\alpha_3\pm\gamma_3$

এ ধরনের সমীকরণ নিয়ে মহাবীর, শ্রীপতি প্রমুখেরা আলোচনা করেছেন।

---

১. Elder Āryabhaṭa's rule for the solution of indeterminate equations of the first degree—B. B. Dutta. Bull. Cal. math. soc. vol 24 (1932).

২. B. B ī (A. S. S.) পৃঃ ৯০, ২. ঐ পৃঃ ৯২

১৩·৮ একটি বিতর্ক

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য লিখিত লীলাবতী এবং বীজগণিত দেখে মনে হয় ভাস্করাচার্য $\frac{ax \pm c}{b} = y$, $\frac{dx \pm c}{b} = z$ ধরনের সমীকরণগুলি সমাধান করতে পারতেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে যে উভয় ক্ষেত্রের হর $= b$ বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের পূর্বের শ্লোকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিনি বলেছেন "একো হরশ্চেদ্ গুণকৌ বিভিন্নৌ" অর্থাৎ গুনক ভিন্ন কিন্তু হর একই হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যায় দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বিভিন্ন ভাজক নিয়ে কোন সমীকরণ এক্ষেত্রে সমাধান বা ব্যাপক আলোচনা করেছেন কি? ঐতিহাসিকেরা দুইভাগে বিভক্ত, একদল বলেন দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ ধরনের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেন নি। অপরদল বিভিন্ন নথিপত্র সহযোগে এ মত খণ্ডন করেন। তবে আমরা লক্ষ্য করেছি যে দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাই দলে ভারী। দ্বিতীয় দলের মধ্যে সারদাকান্ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের যুক্তিই অত্যন্ত সঙ্গত মনে হয়। তিনি উড়িষ্যা প্রদেশের অধিবাসী শ্রীধর মহাপাত্রের (1717 খ্রী) লিখিত লীলাবতীর একটি উড়িয়া ভাষ্য পান। তাছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশে লীলাবতীর উপর একটি ভাষ্য পান। এই ভাষ্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একমাত্রার অনির্ণেয় সহ সমীকরণে বিভিন্ন ভাজক ব্যবহার করে সূত্র সহ সমাধান করেছেন। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে অন্ধ্র, মহীশুর এবং উড়িষ্যায় যে লীলাবতীর ভাষ্য পাওয়া যায় তাতে সূত্রটি এবং উদাহরণের সামান্য হের ফের আছে লক্ষ্য করা যায়। তবে মূল বক্তব্য একই।

যাই হ'ক এখানে সূত্রটি উপস্থিত করছি—

হারে বিভিন্নে গুণকে চ ভিন্নে
স্যাদাদ্যরাশের্গুণকস্তু সাধ্যঃ।
দ্বিতীয় ভাজ্যঘ্নতদাদ্যজো গুণঃ[১]
ক্ষেপো তাবত ক্ষেপযুতো দ্বিতীয়ে ॥[২]
দ্বিতীয়ভাজ্যঘ্নতদাদ্যহারো
ভাজ্যো ভবেত্তত্র হরো হরঃ স্যাত্‌।[৩]

১। দ্বিতীয় ভাজ্যঘ্নগুণসস আদ্যঃ (মাদ্রাজ ও মহীশূর পাণ্ডুলিপিতে)
২। দ্বিতীয় (মহীশূর পাণ্ডুলিপিতে)
৩। ভাজ্যো ভবেত্তত্র হরোঽপর সস্যাত্‌ (মাদ্রাজ পাণ্ডুলিপিতে)

এবং প্রকল্প্যাপি চ কুট্টকেঽথ
জাতো গুণশ্চান্ত্যহরেণ নিঘ্নঃ।
গুণো ভবেদাদ্যগুণেন যুক্তো।[১]
হরঘ্নহারোঽত্র হর প্রদিষ্টঃ।
অথ তৃতীয়েঽপি তথৈবকুর্যা।[২]
দেবং বহুণামপি সাধয়েত্তু॥[৩]

অর্থাৎ "কুট্টকে জটিল উদাহরণের বিভিন্ন পরিস্থিতির নিষ্পত্তির জন্য যখন ভাজকগুলি ও গুণকগুলি পৃথক হয়ে যায়, যে সমস্ত অবস্থায় এক মাত্রার অনির্ণেয় সহ সমীকরণ সৃষ্টি করে, প্রয়োজনীয় পূর্ণসংখ্যাটিকে সে সব পরিস্থিতির সমাধান করতে হয়। তখন প্রথমেই সেই সংখ্যাটিকে বের করতে হবে যা নাকি প্রথম পরিস্থিতির (জ্ঞাত) ভাজ্য দ্বারা গুণ করতে হবে, তারপর দ্বিতীয় পরিস্থিতির ক্ষেপ দ্বারা পরিবর্ধন করলে, সেটি নূতন (অর্থাৎ দ্বিতীয়) উদাহরণের ক্ষেপ হবে (প্রথম পরিস্থিতিকে প্রথম উদাহরণ ধরা হয়েছে)। (জ্ঞাত) ভাজ্য (অর্থাৎ গুণক)টি পাওয়া যায় প্রথম পরিস্থিতির ভাজক এবং দ্বিতীয় পরিস্থিতির ভাজ্য থেকে এবং ভাজকটি দ্বিতীয় পরিস্থিতির সমান। কুট্টকের নিয়মানুযায়ী এই ক্ষেপ, ভাজ্য, এবং ভাজক হতে একটি গুণক পাওয়া যাবে।

এই গুণককে এবং প্রথম পরিস্থিতির ভাজককে প্রথম পরিস্থিতির (পূর্বে অজ্ঞাত) গুণক (যা প্রথম পরিস্থিতির সমাধান সক্ষম) দ্বারা পরিবর্ধিত করলে দুটি পরিস্থিতিরই সমাধানে সক্ষম প্রয়োজনীয় পূর্ণ সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। (যদি সাধারণ গুণকের অনেক মান দরকার হয় অথবা ক্ষেপটি ঋণাত্মক হয় অথবা উদাহরণে তিনটি পরিস্থিতি থাকে) তখন প্রথম দুই পরিস্থিতির ভাজকগুলির থেকে গুণফল সংখ্যাকে ভাজক ধরে নিয়ে পূর্বোক্ত গণিতবিদদের শেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করে আরও অগ্রসর হতে হবে। তিনের অধিক পরিস্থিতি থাকলেও একই পদ্ধতি ধরে এগোতে হবে।"

এরপর লক্ষ্য করা যায় যে ঐ পাণ্ডুলিপিতে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে। উদাহরণটি হচ্ছে

১। যুক্তে (মাদ্রাজ পাণ্ডুলিপিতে), নিঘ্নো (মহীশূর পাণ্ডুলিপিতে)
২। তদেব (মহীশূর পাণ্ডুলিপি)
৩। সাধয়ীত (মাদ্রাজ ও মহীশূর পাণ্ডুলিপিতে)

কঃ সপ্তনিঘ্নো বিহৃতো দ্বিষষ্ট্যা
একাবশেষেঽথ স এব রাশিঃ
ষড়াহতঃ সৈকশতেন[১] ভক্তঃ
পঞ্চাগ্রকশ্চাথ[২] স এব রাশি ॥
অষ্টাহতঃ সপ্তশশাঙ্কভক্তো।[৩]
নবাগ্রকো মে বদ রাশিসংখ্যাম্।
ঘনাগ্রকেনাপি তদেব রাশেঃ।
কিং সার্দ্ধনং কুট্ট বিধানমাশু।

অর্থাৎ মর্মার্থ হচ্ছে—সংখ্যাটি কত—

(ক) যেটি সাত দিয়ে গুণ করে তারপর বাষট্টি দিয়ে ভাগ দিলে তিন ভাগশেষ থাকে।

(খ) যেটি ছয় দিয়ে গুণ করে তারপর ১০১ দিয়ে ভাগ দিলে পাঁচ ভাগশেষ থাকবে।

(গ) যেটি আট দিয়ে গুণ করে তারপর সতেরো দিয়ে ভাগ দিলে নয় ভাগশেষ থাকে।

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ক্ষেপ ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দুটি ক্ষেত্রই এই শ্লোক গুলির মধ্যে দেখা যায়॥ অধ্যাপক সারদাকান্ত গাঙ্গুলী[৪] এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন

ধরা যাক সমীকরণগুলি এইরূপ

$$a_1x+c_1=b_1y\cdots\cdots(i)$$

$$a_2x+c_2=b_2z\cdots\cdots(ii)$$

$$a_3x+c_3=b_3w\cdots\cdots(iii)$$

ধরাযাক $x=\alpha$ (i) নং সমীকরণটির একটি সমাধান; তাহলে

---

১. চৈকশতেন (মাদ্রাজ ও মহীশূর পাণ্ডুলিপিতে)

২. পঞ্চাগ্রকশ্চাপি (” ” ”)

৩. সপ্তদশৈর্দ্বিভক্তো (” ” ”)

৪. Ganguli, S. K.—Bhaskaracharya and Simultaneous indeterminate equations of the first degree—Bull. Cal math Soc Vol 17 (1920) Pages 89—(এই প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ সাহায্য নিয়েছি। এজন্য প্রবন্ধকারের নিকট কৃতজ্ঞ)।

$x=\alpha+b_1t$ (t=যে কোন পূর্ণ সংখ্যা) (i) নং এর দ্বিতীয় সমাধান। অতএব আমরা এই মান (ii) নং এ বসিয়ে পাই

$$a_2(\alpha+b_1t)+c_2=b_2z$$

$$a_2b_1t+(a_2\alpha+c_2)=b_2z.$$

এ সম্পর্কে সমীকরণটিতে ব্যাপক আলোচনা করলে দেখা যায় যদি $t=\gamma$ সমীকরণটির একটি মান হয় তাহ'লে x এর যে মান (i) এবং (ii) নং কে সিদ্ধ করে তা হবে $\alpha+b_1\gamma$

যদি $x=\beta$ (i) এবং (ii) কে সিদ্ধ করে তাহলে

$$b_2(a\beta+c_1)=b_1b_2y$$

এবং $b_1(b_2\beta+c_2)=b_1b_2z$

$$\therefore\ (a_1b_2+a_2b_1)\beta+(b_2c_1+b_1c_2)=b_1b_2(y+z)$$

এ থেকে দেখা যায়

$$(a_1b_2+a_2b_1)x+(b_2c_1+b_1c_2)=b_1b_2(y+z)\cdots(iv)$$

সমীকরণটির $x=\beta$ একটি মান।

x এর যে মান (i), (ii), (iii) কে সিদ্ধ করে সেই মান (iv) এবং (iii) 'কে সিদ্ধ করে। এবং (i) (ii) এবং (iii) সহ সমীকরণের দুটি অংশে পরিণত হচ্ছে। যাই হ'ক এনিয়ে ব্যাপক আলোচনা করার দরকার নেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এক মাত্রার সহ সমীকরণে বিভিন্ন প্রকার ভাজক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে বিরুদ্ধবাদীরা এ মতের সমর্থক নয় কারণ তাঁরা বলেন

(১) লীলাবতীর কোন ভাষ্য এটি পাওয়া যায় না।

(২) কুট্টক লীলাবতী এবং বীজগণিতের আলোচ্য বিষয়। এবং দুটি গ্রন্থে এব্যাপারে প্রায় অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় কিন্তু উপরোক্ত সূত্রটি যেটি মহাপাত্রের ভাষ্যে পাওয়া গেছে বীজগণিতের কোথাও নেই।

(৩) লীলাবতী এবং বীজগণিতের আলোচ্য কুট্টকবিধি সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু উপর্যুক্ত সূত্রটি সিদ্ধান্ত শিরোমণির কোথাও প্রয়োগ করা হয় নাই।

এ ছাড়াও আরও নানা প্রকার যুক্তি দেখান হয়েছে।[১] ৩ নং যুক্তিটি একেবারেই

---

১. Krishnaswami Ayyangar—Bhaskaracharya and Sanslishta kuttaka, Journal of Indian mathematical Society, Vol 18 (1929)

দ্রষ্টব্য Ganguli's reply to Ayyangar's criticism, Journal of the Indian mathematical society Vol XIX (1931)

অচল। কারণ লীলাবতী ও বীজগণিতে এমন অনেক সূত্র আছে যার প্রয়োগ সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে নেই।

মহাবীরের গণিতসারসংগ্রহ গ্রন্থটি অপেক্ষা দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের লীলাবতী তখনকার দিনে বেশী প্রচলিত ছিল। লক্ষ্য করেলেই বোঝা যায় যে তখনকার দিনে গণিত অপেক্ষা জ্যোতির্বিদ্যা শিখবার আগ্রহ ছাত্রদের মধ্যে বেশী ছিল। এদিক থেকে লীলাবতী গ্রন্থটির প্রয়োজন বেশী। বর্তমানের মত বীজগণিতে প্রতীক ব্যবহারের সরল ও সহজ উপায় ছিল না ফলে বীজগণিতের সূত্রাদি বেশ কঠিনই মনে হত। হয়তো সেইহেতু উপর্যুক্ত শ্লোকগুলি লীলাবতী ও বীজগণিতে স্থান পায় নাই।

প্রথম আর্যভট, মহাবীর প্রমুখেরা একমাত্রার সহসমীকরণে এ ধরণের সূত্রাদি ও উদাহরণ নিয়ে যেখানে আলোচনা করেছেন সেখানে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান নি সে কেমন কথা। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একটি ক্ষেত্রে অনির্ণেয় সহসমীকরণের উল্লেখ করেছেন তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যে শ্লোকগুলি নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলি অন্তর্ভুক্ত না থাকলে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন আয়েঙ্গার মহাশয় কঠিনহেতু লীলাবতী বা বীজগণিতে এটি অন্তর্ভুক্ত করেন নাই এযুক্তি মানতে নারাজ।

(৬) ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা $x\pm\alpha=s^2$, $x\pm\beta=t^2$ ধরণের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭৪-তম শ্লোকে বলেছেন—

যাভ্যাং কৃতিরধিকোনস্তদন্তরং হৃতযুতোনমিষ্টেন।
তদ্দলকৃতিরধিকোনাঽধিকয়োরধিকোনয়ো রাশিঃ॥

বঙ্গানুবাদ না দিলেও স্পষ্টই বোঝায় যে এখানে ব্রহ্মগুপ্ত $x\pm a=u^2, x\pm b=v^2$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধানে বলেছেন ঃ

$$x=\left\{\frac{1}{2}\left(\frac{a-b}{m}\pm m\right)\right\}^2\mp a$$

বা $$x=\left\{\frac{1}{2}\left(\frac{a-b}{m}\mp m\right)^2\mp b\right\}$$

এখানে m যে কোন পূর্ণসংখ্যা

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য অবশ্য $\alpha x+c=u^2$, $\beta x+d=v^2$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধানের সূত্র দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"যত্রাব্যক্তং সরূপং হি তত্র তন্মানমানয়েত্ ।
সরূপস্যান্যবর্ণস্থ কৃত্বা কৃত্যাদিনা সমম্ ।
রাশিং তেন সমুত্থাপ্য কুর্যাভূয়োঽপরাং ক্রিয়াম্ ।
সরূপেনান্যবর্ণেন কৃত্বা পূর্বপদং সমম্ ।"[১]

অনুবাদ না উল্লেখ করলেও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে $\alpha x+c=u^2$, $\beta x+d=v^2$ ধরণের সমীকরণ গুলির সমাধানের সূত্র বলেছেন। তিনি এই সঙ্গে একটি উদাহরণ দিয়েছেন।

"যস্ত্রিপঞ্চগুণো রাশিঃ পৃথক সৈকঃ কৃতির্ভবেত্ ।
বদতং বীজমধ্যেঽসি মধ্যমাহরণে পটুঃ ।"[২]

অর্থাৎ কোন সংখ্যাকে তিন দিয়ে গুণ করে এক যোগ করলে বর্গ রাশি হবে; আবার পাঁচ দিয়ে গুণ করে এক যোগ করলে একটি বর্গ রাশি হবে ?

আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় লিখলে দাড়ায়

$$0x+1=u^2$$
$$5x+1=v^2$$

এটির সমাধানও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বের করেছেন। তিনি $x=16$, 1008 প্রভৃতি বলেছেন।

---

১. B. Bi (A. S. S) পৃঃ ১৮৬, ২. ঐ পৃঃ ১৮৭।

১৪·১ দ্বিঘাত সমীকরণ

দ্বিঘাত সমীকরণ বলতে আধুনিক বীজগণিতে $ax^2+bx+c=0$ ধরণের সমীকরণের কথাই ধরা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে এ ধরণের সমীকরণ সাক্ষাৎ মেলে সে কথা আগেই বলেছি। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দশক থেকে এ ধরণের সমীকরণের সমাধান কল্পে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। যাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে প্রথম আর্যভট (৪৯৯ খ্রীঃ), দ্বিতীয় আর্যভট (৯৫০ খ্রীঃ), ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খ্রীঃ), শ্রীধরাচার্য (৭৫০ খ্রীঃ), মহাবীরাচার্য (৮৫০ খ্রীঃ) শ্রীপতি (১০৩৯ খ্রীঃ), দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য (১১৫০ খ্রীঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম আর্যভট সমান্তর প্রগতির পদসংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে এ ধরণের সমীকরণের অজ্ঞাত রাশিটি কেমনভাবে বের করতে হবে সে কথা বলেছেন।

তিনি আর্যভটীয়ের গণিতপাদের ২০-তম শ্লোকে বলেছেন—

"গচ্ছোঽষ্টোত্তরগুণিতদ্দ্বিগুণাদ্যুত্ত বিশেষবর্গযুতাত্।
মূলং দ্বিগুণাদ্যূনং স্বোত্তরভজিতং সরূপার্ধম্॥"

অর্থাৎ (যদি কোন সমান্তর প্রগতির যোগফল, প্রথমপদ ও সাধারণ অন্তর জানা থাকে তাহলে পদসংখ্যা এইভাবে পাওয়া যাবে)—সাধারণ অন্তরের ৮ গুণ দিয়ে যোগফলকে গুণ কর। প্রথম পদের দ্বিগুণিতের সহিত সাধারণ অন্তর বিয়োগ দিয়ে ঐ বিয়োগফলের বর্গ লও। প্রথমোক্ত গুণফলের সহিত এই বর্গফল যোগ কর। মূল গ্রহণ করার পর প্রথম পদের দ্বিগুণ বিয়োগ কর। তারপর সাধারণ অন্তর দিয়ে ভাগ দাও। অতঃপর সমগ্রফলের সহিত এক (১) যোগ করে অর্ধেক লও।

অর্থাৎ যদি আমরা $s=n$-তম পদের যোগফল ধরি, $a=$ প্রথম পদ, $b=$ সাধারণ অন্তর, তাহলে $s=\frac{n}{2}\{2a+(n-1)b\}$ সমীকরণ থেকে

$$n=\frac{1}{2}\left\{\frac{\sqrt{8bs+(2a-b)^2}-2a}{b}+1\right\}$$ পাওয়া যাবে।

প্রথম আর্যভট $ax^2+bx=c$ ধরণের সমীকরণের সমাধানের কথাও বলেছেন। তিনি গণিতপাদের ২৫-তম শ্লোকে বলেছেন

"মূলফলং সফলং কালমূলগুণমর্ধমূলকৃতিযুক্তম্।
মূলং মূলার্ধোনং কালহৃতং স্যাত স্বমূলফলম্॥"[১]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটি একটি সুদ কষার অঙ্ক। শ্লোকটির মর্মার্থ আধুনিক গণিতের ভাষায় বললে এরকম হয় প্রতি a টাকায় r সুদ এবং t মাসে সুদ সহ সমগ্র টাকা A হলে তাহলে $A=r+\frac{r^2+t}{a}$ এবং

$$r=\left\{\frac{\sqrt{Aat+\left(\frac{a}{2}\right)^2}-\frac{a}{2}}{t}\right\}$$

ব্রহ্মগুপ্ত ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৪-তম শ্লোকে বলেছেন—

"বর্গচতুর্গুণিতানাং রূপনাং মধ্যবর্গসহিতানাম্।
মূলং মধ্যেনোনং বর্গদ্বিগুণোদ্ধৃতং মধ্যঃ॥"

অর্থাৎ অজ্ঞাতরাশির বর্গের সহগের চার গুণের সঙ্গে পরমমান গুণ কর। তারপর অজ্ঞাতরাশির সহগের বর্গ যোগ কর। (এই যোগফলের) মূল কত তারপর অজ্ঞাত রাশির সহগ বিয়োগ দাও। অতঃপর অজ্ঞাতরাশির বর্গের সহগের দ্বিগুণিত দিয়ে ভাগ দাও।

অর্থাৎ $ax^2+bx=c$ হলে

$$x=\frac{\sqrt{4ac+b^2}-b}{2a}$$

ব্রহ্মগুপ্ত (অষ্টাদশ অধ্যায়, ৪৫-তম শ্লোক) অন্যত্র বলেছেন

বর্গাহতরূপাণামব্যক্তার্ধকৃতি সংযুতানাং যত্।
পদমব্যক্তার্ধোনং তদ্বর্গবিভক্তমবক্তঃ॥

---

(১) (ক) প্রথম ভাস্করাচার্য গণিতপাদের এই শ্লোকটির টীকায় বলেছেন: মূলং শতাদি, ফলং বৃদ্ধিঃ, মূলস্য ফলং মূলফলম। সহ ফলেন বর্তত ইতি সফলং, আত্মীয়য়া বৃদ্ধয়া যুক্তং মূল ফলমিতি যাবত্। কালমূলগুণং, কালং চ মূলং চ কালমূলে কালমূলে গুণৌ যস্য মূলফলস্য তত্ কালমূলগুণং মূলফলং। অর্ধমূলকৃতিযুক্তং [অর্ধং মূলস্য অর্ধমূলং মূলার্ধমিতি, অর্ধমূলস্য কৃতিঃ অর্ধমূলকৃতিঃ, মূলকৃতশ্চতুর্থো ভাগ ইতি] [অর্ধ] কৃতিশ্বাদ দ্বয়োবর্গেণেতি চতুর্বিভাগঃ, তয়া অর্ধমূলকৃত্যা যুক্তং অর্ধমূলকৃতিযুক্তম্। তন্মূলং, তস্য নিষ্পাদিতস্য মূলং তন্মূলং। মূলার্ধোনং, মূলস্য শতাদেরর্ধেন উন মূলার্ধোনম্। কালহৃতং, কালেন হৃতম্ কালহৃতম্। স্বমূলফলং স্বস্য মূলস্য ফলং স্বমূলফলম্। [A. (k. s. s.) পৃঃ ১১৪]

(খ) সূর্যদেব যজ্বন গণিতপাদের এই শ্লোকটির টীকায় বলেছেন: মূলস্য শতাদৈঃ বৃদ্ধিরূপং ফলং, সফলম্ স্ববৃদ্ধয়া সহিতং কালেন মূলেন চ গুণিতা মূলার্ধস্য বর্গেন চ যুতম্। এবং বিধস্য যন্মূলং তন্মূলার্ধেন হীনম্ কালেন হৃতং স্বমূলস্য শতাদেঃ ফলং ভবতি। [A. (k. v. s.) পৃঃ ৬৪]

আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় লেখা হলে এইরূপ হয়

$$x=\frac{\sqrt{ac+(b/2)^2}-(b/2)}{a}$$

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন সমান্তর প্রগতির পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে ব্রহ্মগুপ্ত প্রথম আর্যভটের ন্যায় সূত্র দিয়েছেন।

মধ্যপদ লোপ করে দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান বা সূত্র ব্রহ্মগুপ্তের রচনায় পাওয়া যায়। তাছাড়াও দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি বীজ আছে সে কথা ব্রহ্মগুপ্তের নানা উদাহরণ বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উদাহরণে দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য সমাধান করার পদ্ধতি বিখ্যাত টীকাকার পৃথূদকস্বামী দিয়েছেন। ব্রহ্মগুপ্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৯ এবং ৫০-তম শ্লোকদ্বয়ে বলেছেন

মণ্ডলশেষাদ্ দ্ব্যূনাম্মূলং ব্যেকং দশাহত দ্বিয়ুতম্।
মণ্ডলশেষং ব্যেকং ভানোর্জ্ঞ দিনে কদা ভবতি॥
অধিমাসশেষপাদাত্ ত্র্যনাদ্বর্গোঽধিমাসশেষসমঃ।
অবমাবশেষতো বাঽবমশেষসমঃ কদা ভবতি॥

পৃথূদকস্বামী যা বলেছেন আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় লিখলে প্রথম শ্লোকটির অর্থ $10(x-1)+2=x^2+1$ এবং দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ $(x-3)^2=4x$

উভয় সমীকরণই $x^2-10x=-9$ হবে এবং $x=9,\ 1$

পৃথূদকস্বামী প্রথম উদাহরণের জন্য $x=9$ এবং দ্বিতীয় উদাহরণের জন্য $x=1$ ধরেছেন। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি বীজ আছে সে কথা ব্রহ্মগুপ্ত জানতেন।

শ্রীধরাচার্যের বীজগণিতে দ্বিঘাত সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন শ্রীধরাচার্যের বীজগণিত এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যেটকু তথ্য আমরা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের লেখা থেকে।

শ্রীধরাচার্য বলেছেন—

চতুরাহতবর্গসমৈ রূপৈঃ পক্ষদ্বয়ং গুণয়েত্।
অব্যক্তবর্গরূপৈরুক্তৌ পক্ষৌ মূলম্॥[১]

অর্থাৎ অব্যক্তের বর্গের গুণকের চতুর্গুণ দ্বারা উভয়পক্ষকে গুণ করা কর্তব্য; তারপর উভয়পক্ষে অব্যক্তের গুণকের বর্গের যোগ এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে উভয় পক্ষের বর্গমূল নির্ণয় কর। অর্থাৎ

১ দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি তাঁর বীজগণিত গ্রন্থে দিয়েছেন।

$ax^2+bx+c=0$ দ্বিঘাত সমীকরণটি সমাধান করতে হলে

প্রথম ধাপ : $4a^2x^2+4abx+4ac=0$

দ্বিতীয় ধাপ : $(2ax+b)^2+4ab=b^2$

তৃতীয় ধাপ : $(2ax+b)^2=b^2-4ac$ (অনুল্লিখিত)

চতুর্থ ধাপ : $2ax+b=\pm\sqrt{b^2-4ac}$

পঞ্চম ধাপ $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ (অনুল্লিখিত)

দ্বিঘাতের দুটি বীজ আছে কি নেই সে কথা শ্রীধরাচার্যের ক্ষেত্রে বলা দুষ্কর। ত্রিশতিকায় সমান্তর প্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দ্বিঘাত সমীকরণের অজ্ঞাত রাশি বের করার সূত্র দিয়েছেন।

গণিতসার সংগ্রহে মহাবীর একটি উদাহরণ এবং তার সমাধান করেছেন এবং তাঁর উদাহরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি বীজ থাকে তা জানতেন। তিনি বলেছেন—

শিখিনাং ষোড়শভাগঃ স্বগুণশ্চতে তমাকেষড়েহস্থাত্।

শেষনবাংশ স্বহতশ্চচতুরগ্রদশাপি কাতি তে স্যুঃ ॥

এই শ্লোকটির মর্মার্থ হচ্ছে যদি ময়ূরের সংখ্যা x ধরা যায় তাহলে

$$\frac{x}{16}\times\frac{x}{16}+\frac{15x}{16\times9}\times\frac{15x}{16\times9}+14=x$$

অর্থাৎ $\dfrac{a}{b}x^2-x+c=0$ ধরণের সমীকরণ পাওয়া গেল এবং এটির সমাধানে তিনি বলেছেন :

স্বাংশাপ্তহরাদূনাচ্চতুর্গুণাগ্রেণ তদ্বরেণ হতাত্।

মূলং যোজ্যং ত্যাজ্যং তচ্ছেদে তদ্দলং বিত্তম্ ॥

এটির মর্মার্থ হচ্ছে $x=\dfrac{\frac{b}{a}\pm\sqrt{(\frac{b}{a}-4c)\frac{b}{a}}}{2}$

অর্থাৎ এখানে দুটি বীজের সাক্ষাত মিলছে।

এছাড়াও তিনি দ্বিঘাত সমীকরণের অজ্ঞাত রাশি নির্ণয় করার অন্য সূত্র দিয়েছেন। শ্রীপতি (১০৩৯খ্রীঃ) সিদ্ধান্ত শেখরে যা বলেছেন তার মর্মার্থ হচ্ছে $ax^2+bx=c$ দ্বিঘাত সমীকরণটির অজ্ঞাত রাশি

$$x=\frac{\sqrt{ac+(\frac{b}{2})^2}-\frac{b}{2}}{a}$$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য তাঁর বীজগণিতে বলেছেন :—

"অব্যক্তবর্গাদি যদাঽবশেষং পক্ষৌ তদষ্টেন নিহত্য কিঞ্চিত্। ক্ষেপ্যং তয়োর্যেন পদপ্রদঃ স্যাদব্যক্তপক্ষস্য পদেন ভূয়ঃ। ব্যক্তস্য পক্ষস্য সমক্রিয়ৈবমব্যক্তমানং খলু লভ্যেতে তত্। ন নির্বহশ্চেদ্ঘনবর্গ বর্গেষ্বেবং তদা জ্ঞেয়মিদং স্ববুদ্ধ্যা। অব্যক্ত মূলর্ণগরূপতোঽল্পং ব্যক্তস্য পক্ষস্য পদং যদি স্যাত্। ঋণং ধনং তচ্চ বিধায় সাধ্যমব্যক্তমানং দ্বিবিধং ক্বচিতস্যাত্।" [B. Bi (A. S. S) পৃঃ ১৩৭]

অর্থাৎ যখন সমীকরণ স্থলে অব্যক্তবর্গ প্রভৃতি অবশিষ্ট থাকবে তখন কোন ইষ্ট সংখ্যা দিয়ে উভয় পক্ষকে গুণ করে কোন কিছু যোগ করবে যার ফলে রাশি মূলপ্রদ হয়। যদি অব্যক্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূলাত্মক ঋণ রাশির চেয়ে ব্যক্তপক্ষের মূল কম হয় তাহলে ঐ ঋণরাশিকে ধন ঋণ উভয়বিধ কল্পনা করে অব্যক্তমান দুই প্রকার সাধন করবে।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বহু উদাহরণে দ্বিঘাতে সমীকরণের দুটি বীজের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বীজগণিতের কোন একজায়গায় $x^2-55=-250$ সমীকরণটি দেওয়া আছে যেটি সমাধান করলে দুটি বীজ পাওয়া যাবে। এ সম্পর্কে পদ্মনাভের একটি উদাহরণ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উদ্ধৃতিটি হচ্ছে :

ব্যক্ত পক্ষস্য চেন্মূলমন্যপক্ষর্ণরূপতঃ
অল্পং ধনর্ণগং কৃত্বা দ্বিবিধোত্পদ্যতে মিতি ॥

টীকা নিষ্প্রোয়ন।[১]

দ্বিতীয় আর্যভটও পূর্বসূরীদের মত দ্বিঘাত সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ভারতীয় গণিতশাস্ত্র নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রথম আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য, শ্রীপতি, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা দ্বিঘাত সহ সমীকরণ (Simulteneous quadratic equation) সম্পর্কে বেশ ভালভাবেই জানতেন। অর্থাৎ তাঁরা নিম্নে বর্ণিত সমীকরণগুলির সমাধান জানতেন।

১. $\begin{cases} x-y=d \\ xy=b \end{cases}$ ২. $\begin{cases} x+y=a \\ xy=b \end{cases}$ ৩. $\begin{cases} x^2+y^2=c \\ xy=b \end{cases}$ ৪. $\begin{cases} x^2+y^2=c \\ x+y=a \end{cases}$

১. History of Hindu mathematics—B. B. Datta and A. N Singh, Vol 2, page 70.

(১) প্রথম সমীকরণটির সমাধান কল্পে প্রথম আর্যভট (৪৯৯খ্রীঃ) বলেছেন

দ্বিকৃতিগুণাত্ সংবর্গাদ্ দ্ব্যয়ন্তরবর্গেণ সংযুতান্মূলম্।
অন্তরযুক্তং হীনং তদ্ গুণকারদ্বয়ং দলিতম্।[১]

অর্থাৎ মর্মার্থ হচ্ছে—দুটি অজ্ঞাত রাশির গুণফলকে চার দিয়ে গুণ করে ঐ গুণফলের সঙ্গে অজ্ঞাত রাশিদ্বয়ের পার্থক্যের বর্গ যোগ কর। তারপর মূল গ্রহণ কর এবং আবার অজ্ঞাতরাশিদ্বয়ের পার্থক্য যোগ বা বিয়োগ কর। এরপর সমস্ত ফলের অর্ধেক নিলে অজ্ঞাত সংখ্যা দুটি পাওয়া যাবে।

একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এখানে $x-y=d$ এবং $xy=b$ সমীকরণ দেওয়া আছে। অর্থাৎ x এবং y অজ্ঞাতরাশিদ্বয় হলে এদের পার্থক্য এবং গুণফল দেওয়া আছে। তাহলে উপর্যুক্ত শ্লোকটিকে আধুনিক গণিতের ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়ঃ

$$x=\tfrac{1}{2}\{\sqrt{d^2+4b}+d\}, \quad y=\tfrac{1}{2}\{\sqrt{d^2+4b}-d\}$$

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেনঃ

"শেশবধাদ্ দ্বিকৃতিগুণাত্ শেষান্তরবর্গ সংযুতান্মূলম্।
শেষান্তরোনযুক্তং দলিতং শেষে পৃথগভীষ্ঠে ॥[২]

এই ধরণের সমীকরণ নিয়ে ব্রহ্মগুপ্তের পরবর্তীকালে কয়েকজন ভারতীয় গণিতবিদ আলোচনা করেছেন।

(২) দ্বিতীয় সমীকরণগুলির সমাধান কল্পে মহাবীর বলেছেন—

"রজ্জ্বর্ধবর্গরাশের্গণিতং চতুরাহতং বিশোধ্যাথ।
মূলং হি রজ্জ্বর্ধে সংক্রমনে সতি ভুজাকোটি ॥"[৩]

---

১. আর্যভটীয় গণিতপাদ—২৪তম শ্লোক।

এই শ্লোকটির টীকায় প্রথম ভাস্করাচার্য বলেছেন : দ্বয়োকৃতিঃ দ্বিকৃতিঃ, দ্বিকৃতির্গুণো যস্য স দ্বিকৃতিগুণঃ, তস্মাদ্ দ্বিকৃতিগুণাত্। কস্মাদিত্যাহ—সংবর্গাত্। দ্বয়ন্তরবর্গেণ সংযুতাত্। দ্বয়োরপ্যন্তরং দ্বয়ন্তরং, দ্বয়ন্তরস্য বর্গঃ দ্বয়ন্তরবর্গঃ, তেন দ্বয়ন্তরবর্গেণ সংযুতাত্। দ্বিকৃতিগুণাত্ সংবর্গাদ্, দ্বয়োরপ্যন্তরবর্গেণ মিশ্রিতাদ্যন্মূলম্। তদন্তরযুক্তং অন্তরেণ যুক্তং অন্তরযুক্তম্। হীনং বিরহিতম্। তদ্গুণকারদ্বয়ং তস্য সংবর্গস্য গুণকারদ্বয়ম্। দলিতম্ অর্ধিতম্। [$\bar{\text{A}}$ (K. S. S) পৃঃ ১১৩].

(খ) সূর্যদেব যজ্ব গণিতপাদের এই শ্লোকটির টীকায় বলেছেন : দ্বয়োর্বর্গঃ চত্বারি, তৈর্গুণিতাত্ সংবর্গাদ দ্বয়োরন্তরবর্গেণ চ সংযুক্তাদ্ যন্মূলং, তয়োরন্তরেণ একত্র হীনম্ অন্যত্র যুক্তম্, অর্ধীকৃতং চ গুণকারদ্বয়ং ভবতি গুণগুণ্যাত্মক রাশিদ্বয়ং ভবতি ইত্যর্থঃ। [$\bar{\text{A}}$ (K. V. S) পৃঃ ৬৩].

২. ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত—অষ্টাদশ অধ্যায়, ৯৯ তম শ্লোক।

৩. G. S. S. (L. C. J) ৭ম অধ্যায়—পৃঃ ২১৭, ১২৯$\frac{1}{2}$ তম শ্লোক।

এই শ্লোকটির আধুনিক বীগণিতের ভাষায় রূপ দিলে দাঁড়ায়

$$=\tfrac{1}{2}\{a+\sqrt{a^2-4b}\},\quad y=\tfrac{1}{2}\{a-\sqrt{a^2-4b}\}$$

অবশ্য যদি সহসমীকরণটি $x+y=a$ এবং $xy=b$ দেওয়া থাকে।

(৩) তৃতীয় সমীকরণগুলির সমাধানে মহাবীর বলেছেন

"কর্ণকৃতৌ দ্বিগুণীকৃতগণিতং হীনাধীকং কৃত্বা।
মূলং কোটিভুজৌ হি জেষ্ঠ হ্রস্বেন সংক্রমণে ॥[১]

অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে এখানে মহাবীর বলতে চেয়েছেন

$$x=\tfrac{1}{2}\{\sqrt{c+2b}+\sqrt{c-2b}\},\quad y=\tfrac{1}{2}\{\sqrt{c+2b}-\sqrt{c-2b}\}$$

(৪) চতুর্থ সমীকরণগুলির সমাধানে প্রথম আর্যভট বলেছেন :

সম্পর্কস্য হি বর্গাদ্ বিশোধয়েদেব বর্গসম্পর্কম।
যত্তস্য ভবত্যর্ধং বিদ্যাত্ গুণকার সংবর্গম্।[২]

অর্থাৎ এখানে বীজগণিতের ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়

$$x=\tfrac{1}{2}\{a+\sqrt{2c-a^2}),\ y=\tfrac{1}{2}\{a-\sqrt{2c-a^2}\}$$

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন—

কৃতি সংযোগাদ্ দ্বিগুণাদ্ব্যতিবর্গং প্রোহ্যমূলং যত্।
তেন যুতোনো যেগো দলিতঃ শেষে পৃথগভীষ্টে ॥[৩]

অর্থাৎ দ্বিগুণিত বর্গযোগের সঙ্গে শুধু শেষ বর্গযোগ বিয়োগ কর। তার মূল লও। এরপর এটিকে শেষযোগের সঙ্গে যোগ এবং হীন করে অর্ধেক লও তাহলে রাশি দুটি পাবে।

মহাবীর এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

কর্ণকৃতৌ দ্বিগুণায়াং রজ্জর্ধকৃতিং বিশোধ্য তন্মূলম্।
রজ্জর্ধে সংক্রমণীকৃতে ভুজা কোটিরপি ভবতি ॥[৪]

অর্থাৎ কোন আয়তক্ষেত্রের বাহুদ্বয় a এবং b হলে $\sqrt{a^2+b^2}=$ কর্ণ হবে এবং

---

১. G. S. S. (L. C. J.) ৭ম অধ্যায় ১২৭$\frac{১}{২}$ শ্লোক

২. আর্যভটীয় (গণিতপদ) ২৩ তম শ্লোক। (এই গ্রন্থের ২৮৩ ও ২৮৪ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য)

৩. ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত—অষ্টাদশ অধ্যায় ৯৮ তম শ্লোক।

৪. G. S. S. (L. C. J)—৭ম অধ্যায় ১২৫$\frac{১}{২}$ তম শ্লোক, পৃঃ ২১৬।

$2a+2b$= আয়তক্ষেত্রের পরিধি হবে। তাহলে উপর্যুক্ত শ্লোকের মর্মার্থ হবে

$$a=\frac{1}{2}\left\{\frac{2a+2b}{2}+\sqrt{2(\sqrt{a^2+b^2})^2-\left(\frac{2a+2b}{2}\right)^2}\right\}$$

$$b=\frac{1}{2}\left\{\frac{2a+2b}{2}-\sqrt{2(\sqrt{a^2+b^2})^2-\left(\frac{2a-2b}{2}\right)^2}\right\}$$

লক্ষ্যণীয় যে মহাবীরের উদাহরণটি ক্ষেত্রফলের সঙ্গে জড়িত আছে।

এই চার জোড়া সমীকরণ ছাড়াও দ্বিঘাত সহ সমীকরণের আরও দুই ধরণের দ্বিঘাত সহ সমীকরণ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি নারায়ণ তাঁর গণিত কৌমুদীতে দিয়েছেন।

$$\left.\begin{array}{r} x^2+y^2=c \\ x-y=d \end{array}\right\} \qquad \begin{array}{r} x^2-y^2=m \\ xy=b \end{array}$$

এই দুই জোড়া সমীকরণ গণিত কৌমুদীতে দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে বীজগণিতের কতকগুলি সমীকরণকে বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে সমাধান করা হয়েছে এবং এই পদ্ধতিকে 'বিষম কর্ম' বলে উল্লেখ করা করা হয়েছে।

১. $x^2-y^2=m$ ২. $x^2-y^2=m$

$x-y=n$ $x+y=p$

এই দু জোড়া সমীকরণের সমাধান ভারতীয়রা করেছিলেন এবং এই সমাধানগুলি আধুনিক গণিতের ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়

১. $x=\frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}+n\right)$, $y=\frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}-n\right)$

২. $x=\frac{1}{2}\left(p+\frac{m}{p}\right)$, $y=\frac{1}{2}\left(p-\frac{m}{p}\right)$

ব্রহ্মগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন

যোগোঽন্তর যুতহীনো দ্বিহৃতঃ সংক্রমণমন্তরবিভক্তং বা।

"বর্গান্তরমন্তরযুতহীনং দ্বিহৃতং বিষমকর্ম।"[১]

১. ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত—অষ্টাদশ অধ্যায় ৩৬ তম শ্লোক।

(১) (ক) গণিতপাদের ২৩-তম শ্লোকটির টীকাতে প্রথম ভাস্করাচার্য বলেছেন—সম্পর্কঃ সমাসঃ। যেন দ্বয়ো রাশ্যোঃ সম্পর্কো ভবতীতি দ্বয়োরেব সম্পর্কঃ পরিগৃহ্যতে। তস্য সম্পর্কস্য। হি পাদপূরণে। বর্গাত্ কৃতেঃ। বিশোধয়েদেব, অপনয়েদেব। কিমিত্যাহ-বর্গসম্পর্কম্। বর্গীকৃতয়োঃ সম্পর্কঃ বর্গসম্পর্কঃ বর্গসমাসঃ, তং বর্গসম্পর্কং সম্পর্কস্য বর্গাদ্বিশোধয়েত্। যত্তস্য ভবত্যর্ধং, তস্য শুদ্ধশেষস্য অর্ধং দলং যদ্ ভবতি। বিদ্যাদ্, অবুবদ্ধ্যাত্, গুণকারসংবর্গং গুণকারয়োঃ সংবর্গং গুণকার সংবর্গং, তং গুণকারসংবর্গং বিদ্যাত্। [Ā. (K. S. S) পৃঃ ১১২]

অর্থাৎ "দুটি রাশির বর্গান্তরকে রূপান্তর দিয়ে ভাগ দিয়ে যে লব্ধি পাওয়া যাবে তার সঙ্গে রাশ্যান্তর যোগ ও হীন করে অর্ধেক নিলে সংখ্যা দুটি পাওয়া যাবে।" এখানে $x^2-y^2=m$ কে বর্গান্তর বলা হচ্ছে এবং $x-y=n$ কে রাশ্যান্তর বলা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মহাবীর বলেছেন

যুতি বিযুতিদলকরণং সংক্রমণং ছেদলব্ধয়ো রাশ্যোঃ।
সংক্রমণং বিষমমিদং প্রাহুর্গণিতার্ণবান্তগতাঃ ॥[১]

শ্রীপতি বলেছেন

যোগাঽন্তরেণোনযুতো দ্বিভক্তঃ
কর্মোদিতং সংক্রমণাখ্যমেতত্
বর্গান্তরং স্বান্তারহৃত্যুতানং
যোগো দ্বিভক্তং বিষমাখ্যকর্ম ॥[২]

অর্থাৎ দুটি রাশির যোগের সঙ্গে দুটি রাশির অন্তরকে উনযুক্ত করে দুই দিয়ে ভাগ করলে রাশি দুটি পাওয়া যাবে। বর্গান্তরকে রাশ্যান্তর দিয়ে ভাগ করলে যোগ পাওয়া যায়। তারপর পূর্ব নিয়মে রাশি দুটি আসবে।

মহাবীর তাঁর গণিতসার সংগ্রহে একটি নূতন দ্বিঘাত সহ সমীকরণ দিয়েছেন যা সচরাচর ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে দেখা যায় না। তিনি যা বলেছেন সেটিকে আধুনিক গণিতে প্রকাশ করলে দাড়ায়

$$t+x=\alpha, \qquad trw=kx$$
$$t+y=\beta. \qquad tsw=ky$$
$$\frac{r}{s}=\frac{x}{y}=\frac{\alpha-t}{\beta-t}$$

তাহলে $t=\dfrac{r\beta-s\alpha}{r-s}$

অতএব $x=\left(\dfrac{\alpha-\beta}{r-s}\right)r,\ y\ \left(\dfrac{\alpha-\beta}{r-s}\right)s,\ w=\left(\dfrac{\alpha-\beta}{r\beta-s\alpha}\right)k$

(খ) গণিতপাদের ২৩ তম শ্লোকটি টীকায় সূর্যদেব যজ্ব বলেছেনঃ গুণগুণ্যরাশ্যোর্যোগবর্গাত্ তয়োরেব গুণগুণ্য-রাশ্যোর্বর্গযোগং ত্যজেত্। শিষ্টস্য যদর্ধং তত্ তয়োর্গুণগুণ্যরাশ্যোঃ সংবর্গ বিদ্যাত্। গুণ [ন] ক্রিয়ায়াং দ্বয়োরপি রাশ্যোরন্যোন্যগুণকারতস্য বিদ্যমানত্বাদ্ গুণকারসংবর্গ ইত্যুক্তম্। [$\bar{A}$ (K.V.S), পৃঃ ৬২]

১. গণিতসার সংগ্রহ—ষষ্ঠ অধ্যায় ২য় শ্লোক।

২. সিদ্ধান্ত শেখর—অব্যক্ত গণিতাধ্যায়, ১৩ তম শ্লোক।

১৫·১ অনির্ণেয় দ্বিঘাত সমীকরণ সম্পর্কে নিরীক্ষা

$Nx^2 \pm c = y^2$ এই সমীকরণটিকে অনির্ণেয় দ্বিঘাত সমীকরণ বলা হয়। এই সমীকরণটি নিয়ে প্রাচীন ভারতের গণিতজ্ঞরা এবং অন্যান্য দেশের গণিতজ্ঞরা ব্যাপক কাজ করেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মগুপ্ত। ব্রহ্মগুপ্ত $Nx^2+1=y^2$ এই সমীকরণটি তাঁর ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর পদ্ধতিটি পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, নারায়ণ কমলাকার প্রমুখ গণিতজ্ঞরা অনুসরণ করেছেন। শ্রীপতি তাঁর সিদ্ধান্ত শেখরে ব্রহ্মগুপ্তের পদ্ধতি অনুসরণ করেননি।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, নারায়ণ কমলাকর প্রমুখ ভারতীয় গণিতবিদেরা $Nx^2+k=y^2$ এই সমীকরণটি সমাধান করেছেন। সাধারণত যে পদ্ধতিতে এই সমীকরণটি সমাধান করা হয় তাকে 'চক্রবাল' পদ্ধতি বলা হয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে $Nx^2+1=y^2$ এবং $N_x{}^2+k=y^2$ উভয় সমীকরণেই N'কে একটি অবর্গ পূর্ণ রাশি ধরা হয়েছে।

১৫·২ অনির্ণেয় দ্বিঘাত সমীকরণ সম্পর্কে আধুনিক সমালোচকদের বিচার বিশ্লেষণ

ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, নারায়ণ, কমলাকর প্রমুখের কাজ নিয়ে ভারতীয় ও বিদেশী পণ্ডিতেরা ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এঁদের মধ্যে কোলেব্রুক (১৮১৭ খ্রীঃ), আয়েঙ্গার (১৯২৯-৩০ খ্রীঃ), সাজনা (১৯২৯-৩০ খ্রীঃ) ক্যে (১৯০৮ খ্রীঃ), গাঙ্গুলী (১৯২৮ খ্রীঃ) দত্ত, (১৯২৮ খ্রীঃ), শুক্লা (১৯৫০ খ্রীঃ), রামবিহারী ও জৈন (১৯৭৭ খ্রীঃ), মজুমদার (১৯৭৮), সেনগুপ্ত (১৯২৭) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

এইচ. টি. কোলেব্রুক তাঁর "Algebra, Arithmetic and Mensuration" গ্রন্থে বর্গপ্রকৃতি এবং চক্রবাল পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলা যেতে পারে ভারতীয় পদ্ধতির ইংরাজী অনুবাদ তিনি করেছেন।

বি. বি. দত্ত তাঁর "The Hindu solution of the general Pellian equation, The Algebra of Nārāyaṇa" প্রবন্ধ দুটিতে ভারতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। সারদাকান্ত গাঙ্গুলী "The source of the Indian

solution of the so called Pellian equation" প্রবন্ধে ক্যে'র মতের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেছেন। বলা বাহুল্য তিনি কোনমতেই ভারতীয় পদ্ধতিতে বিদেশী প্রভাব রয়েছে এ কথা মানেন নি।

কে. জি. সাজনা $x^2-67x^2=1$ কে সমাধান করতে গিয়ে $\sqrt{67}$ কে বিতত ভগ্নাংশে (Continued fraction) ভেঙ্গেছেন।

এ. এ. কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার "New light on Bhāskara's Cakravāla or cyclic method of solving indeterminate of second degree in two variable" প্রবন্ধে বলেছেন দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের পদ্ধতিতে বিতত ভগ্নাংশের কোন প্রয়োগ নেই। তিনি বলেছেন এই পদ্ধতিতে গউসের প্রভাব রয়েছে (অবশ্য গউস দ্বিতীর ভাস্করাচার্যের পরবর্তীকালের গণিতবিদ)

কৃপাশঙ্কর শুক্লা "S'rīdhara's Rational Solution of $Nx^2+1=y^2$" প্রবন্ধে শ্রীধরের পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

রামবিহারী এবং বি. এস. জৈন তার "Some mathematical contributions of ancient Indian Mathematicians as given in the works of Bhāskara-II" প্রবন্ধে $Nx^2+k=y^2$ সমীকরণটির ভারতীয় পদ্ধতিতে সমাধান করেছেন। সাম্প্রতিক কালে প্রদীপ কুমার মজুমদার $Nx^2+1=y^2$, $Nx^2+k=y^2$ প্রভৃতি সমীকরণগুলির ভারতীয় পদ্ধতিতে সমাধান করতে গিয়ে বলেছেন, এই পৌনঃ পুনিক বিতত ভগ্নাংশের (recurring continued fraction) প্রয়োগ রয়েছে। অর্থাৎ তিনি বলেছেন উক্ত সমীকরণগুলি সমাধান করতে গিয়ে ভারতীয়রা নিম্নলিখিত পৌনপৌনিক বিতত ভগ্নাংশের সূত্রগুলি জানতেন।

(ক) $\frac{p_c}{q_c}=\frac{P_n+Nq_n{}^2}{2p_nq_n}$

(খ) $Aq_iq_{i-1}-Bp_ip_{i-1}=(-1)^i\ b_{i+1}$

[দ্রষ্টব্য—Gaṇita Kaumudī and the continued fraction-Pradip Kumar Majumdar. Indian Journal of History of Science (Indian National Science Academy). Vol 13. no 1. pp. 1—5]

১৫˙৩ পরিভাষা, ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি

প্রাচীন ভারতের গণিতজ্ঞরা অনির্ণেয় দ্বিঘাত সমীকরণ অর্থাৎ $Nx^2+c=y^2$ এই সমীকরণটিকে বর্গ-প্রকৃতি অথবা কৃতি-প্রকৃতি বলতেন। এ সম্পর্কে দ্বিতীয়

ভাস্করাচার্য বলেছেন "তত্র রূপক্ষেপপদার্থং তাবৎ।[১] অর্থ অতি সরল। বর্গ প্রকৃতির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বিখ্যাত ভাষ্যকার কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বীজগণিতের টীকায় বলেছেন—"বর্গঃ প্রকৃতির্যত্রেতি বর্গ প্রকৃতিঃ। যতোঽস্য গণিতস্য যাবদাদিবর্গঃ প্রকৃতিঃ। যদ্বা যাবদাদিবর্গেষু প্রকৃতিভূতাদঙ্কাদিদং গণিতং প্রবর্তত ইতি বর্গ প্রকৃতিঃ। অত্র যাবদ্বর্গাদিষু প্রকৃতিভূতো যোঽঙ্কঃ স প্রকৃতিশব্দেনোচ্যতে। স চাব্যক্তবর্গগুণক এব।[২] বি. বি. দত্ত এবং এ. এন. সিং এই অংশটুকুর ইংরাজী অনুবাদে বলেছেন—"That in which varga (square) is the prakṛti (nature) is called the varga prakṛti ; for the square of Yāvat, etc, is the prakṛti (origin) of this (branch of) mathematics. Or, because this (branch of) mathematics has originated from the number which is the prakṛti of the square of yāvat, etc., So it is called the varga prakṛti. In this case the number which is the multiplier of the square of yāvat, etc., is denoted by the terms prakṛti (In other words) it is the co-efficient of the square of the unknown".[৩]

মনে হয় দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য 'প্রকৃতি' শব্দটির দুটি অর্থ করেছেন। প্রথম অর্থে তিনি বলেছেন তত্র বর্ণবর্গে যোঽঙ্কঃ সা প্রকৃতিঃ অথবা "তত্র যাবত্তাবদ্বর্গে যোঽঙ্কঃ সা প্রকৃতিঃ [There the number which is (associated) with the square of the unknown is the prakṛti.] দ্বিতীয় অর্থে বলেছেন "তত্রৈকাং বর্ণকৃতিং প্রকৃতিং প্রকল্প………" অথবা সরূপকে বর্ণকৃতি তু যত্র তত্রেচ্ছৈকাং প্রকৃতিং প্রকল্পে… ……" [Supposing the square of one of the two unknowns to the prakṛti][৪]

অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

$Nx^2 \pm c = y^2$ এই সমীকরণে যে দুটি বীজ পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে ব্রাহ্মস্ফুট

(১) The absolute number should be rūpa, which means unity as well as absolute number in general (History of Hindu Mathematics part 2. Datta and Singh P.-141)

(২) B. ī. (A. S. S.) পৃঃ ৯৩

(৩) History of Hindu Malhematics Part 2 (Datta ann Singh) P. 142

(৪) ঐ

সিদ্ধান্তের ভাষ্যকার পৃথূদকস্বামী, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য তাঁর বীজগণিত গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন :

ইষ্টং হ্রস্বং তস্য বর্গঃ প্রকৃত্যা ক্ষুণ্ণোং যুক্তো বর্জিতো বা স যেন।

মূলং দদাত্ ক্ষেপকং তং ধনর্ণং মূলং তত্র জ্যেষ্ঠ মূলং বদন্তি।[১]

অর্থাৎ ইষ্ট রাশিকে হ্রস্ব মনে করো। তার বর্গকে প্রকৃতির দ্বারা গুণ করে এমন রাশি যোগ বা বিয়োগ কর যাতে মূল পাওয়া যায়। যে রাশি যুক্ত বা বিযুক্ত হোল তাকে ধন বা ঋণ ক্ষেপ মনে কর এবং মূলকে জ্যেষ্ঠ মূল মনে কর। পৃথুদকস্বামী এ দুটি মূলকে বলেছেন কনিষ্ঠপদ বা আদ্যমূল এবং জ্যেষ্ঠ পদ বা অন্যমূল। 'c' কে বলা হয় ক্ষেপ, প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপক, এই পরিভাষাগুলি ব্রহ্মগুপ্ত শ্রীপতি, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা বিভিন্ন স্থানে বলেছেন।

১৫.৪ ব্রহ্মগুপ্তের উপসিদ্ধান্ত

ব্রাহ্মগুপ্ত তাঁর ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে বলেছেন :

মূলং দ্বিধেষ্টবর্গাদ্ গুণকগুণাদিষ্টযুত বিহীনাচ্চ।

আদ্যবধো গুণকগুণঃ সহান্ত্যঘাতেন কৃতমন্ত্যম্।

বজ্রবধৈক্যং প্রথমং প্রক্ষেপং ক্ষেপবধতুল্যঃ।

প্রক্ষেপশোধকহৃতে মূলে প্রক্ষেপকে রূপে ॥[২]

অর্থাৎ ইষ্ট বর্গকে গুণক দিয়ে গুণ করার পর অন্য ইষ্ট যোগ বা বিয়োগ করো তারপর মূলাকর্ষণ কর। এইভাবে দুবার কর। প্রথম দুটি বীজের গুণফলকে প্রকৃতি (N) দিয়ে গুণ করে দ্বিতীয় বীজদ্বয়ের গুণফল যোগ কর। তাহলে (নূতন) দ্বিতীয় বীজ পাওয়া যাবে। প্রথম দুটি বীজ এবং দ্বিতীয় দুটি বীজের ব্রজ্র গুনন করে তারপর যোগ কর। তাহলে প্রথম (নূতন) বীজ পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেপটী পূর্বের ক্ষেপদ্বয়ের গুণফল হবে।

অর্থাৎ এ থেকে বলা যায়

$Nx^2+k=y^2\cdots\cdots(1)$ এই সমীকরণটির $x=\alpha,\ y=\beta$ বীজদ্বয় পাওয়া যায় এবং $Nx^2+k_1=y^2\cdots\cdots$ (2)

এই সমীকরণটির $x=\alpha_1,\ y=\beta_1$ বীজদ্বয় পাওয়া যায় তাহলে ব্রহ্মগুপ্তের পদ্ধতি অনুযায়ী বলা যায়।

---

(১) B. Bī (A. S. S), পৃঃ ৯৩।

(২) ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত—অষ্টাদশ অধ্যায় ৬৪-৬৫ শ্লোক দুটি।

$x = \alpha\beta_1 \pm \alpha_1\beta,\ y = \beta\beta_1 \pm N\alpha\alpha_1$ বীজদ্বয়

$Nx_1 + kk_1 = y^2$……… (3) সমীকরণ থেকে পাওয়া যাবে।

অর্থাৎ $N(\alpha\beta_1 \pm \alpha_1\beta)^2 + kk_1 = (\beta\beta_1 \pm N\alpha\alpha_1)^2$…… (4)

এখন যদি $\alpha = \alpha_1,\ \beta = \beta_1$ এবং $k = k_1$ লওয়া যায় তাহলে (4) নং সমীকরণটি এইরূপ হয়।

$N(2\alpha\beta) + k^2 = (\beta^2 + N\alpha^2)^2$…… (5)

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

হ্রস্বজ্যেষ্ঠক্ষেপকান্ন্যস্য তেষাং তানন্যান্বাঽধো নিবেশ্য ক্রমেণ। সাধ্যান্যেভ্যো ভাবনাভির্বহূনি মূলান্যেষাং ভাবনা প্রোচ্যতেঽতঃ বজ্রাভ্যাসৌ জেষ্ঠলঘ্বোস্তদৈক্যং হ্রস্বং লঘ্বোরাহতিশ্চ প্রকৃত্যা। ক্ষুণ্ণা জ্যেষ্ঠাভ্যাসযুগ্জ্যেষ্ঠমূলং তত্রাভ্যাসঃ ক্ষেপয়োঃ ক্ষেপকঃ স্যাত্ হ্রস্বং বজ্রাভ্যাসয়োরন্তরং বা লঘ্বোর্ঘাতো যঃ প্রকৃত্যা বিনিঘ্নঃ ঘাতো যশ্চ জ্যেষ্ঠয়োস্তদ্বিযোগো জ্যেষ্ঠ ক্ষেপোঽত্রাপিচ ক্ষেপঘাতঃ[১]। অর্থাৎ "হ্রস্ব জ্যেষ্ঠ ও ক্ষেপ যথাক্রমে স্থাপন করিয়া তাহার নীচে ঐ হ্রস্ব জ্যেষ্ঠ ও ক্ষেপ পুনরায় স্থাপন করিয়া ভাবনা দিবে। অথবা অন্য হ্রস্ব, জেষ্ঠ ও ক্ষেপ স্থাপন করিয়া পূর্ব হ্রস্ব, জেষ্ঠ কানষ্ঠের সহিত ভাবনা দিলে বহু কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ মূল আসিবে। জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠের বজ্রাভ্যাস করিয়া যোগ করিলে যোগফল অন্য হ্রস্ব হইবে। অতঃপর লঘুদ্বয়ের গুণ করিয়া তাহাকে প্রকৃতির দ্বারা গুণ করিবে এবং তাহাতে জ্যেষ্ঠদ্বয়ের গুণফল যোগ করিলে জ্যেষ্ঠমূল পাওয়া যাইবে। ক্ষেপদ্বয়ের গুণফল ক্ষেপক হইবে। বা বজ্রাভ্যাসাদ্বয়ের অন্তর কনিষ্ঠ হইবে। এবং ঐস্থলে লঘুদ্বয়ের গুণফলকে প্রকৃতিদ্বারা গুণ করিবে এবং জ্যেষ্ঠদ্বয়ের গুণ করিবে। ঐ ফলদ্বয়ের অন্তর জ্যেষ্ঠ হইবে। এই স্থলেও ক্ষেপদ্বয়ের ঘাত ক্ষেপ হইবে।[২]

কৃষ্ণদৈবজ্ঞ দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের এই শ্লোকটির টীকায় বলেছেন ঃ

প্রথম সিদ্ধান্ হ্রস্বজ্যেষ্ঠ ক্ষেপকান্পঙ্‌ক্তৌ বিনাস্য তেষামধস্তানন্যান্বা হ্রস্বজ্যেষ্ঠক্ষেপকান্ক্রমেণ নিবেশ্যৈতেভ্যঃ পঙ্‌ক্তিদ্বয়স্থাপিতেভ্যো হ্রস্বজ্যেষ্ঠক্ষেপকেভ্যো যতো ভাবনাভির্বহূনি মূলানি সাধ্যান্যত এষাং ভাবনা প্রোচ্যতে। অন্যান্বেত্যত্র তস্যামেব প্রকৃতাবিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্যপি ভাবনাভিঃ ক্ষেপা অপি বহবো ভবন্তি তথাহপি নাস্তি নিয়মঃ। রূপক্ষেপপদজাসু ভাবনাসু ব্যভিচারত্। অতঃ ক্ষেপা বহবঃ সাধ্যা ইতি

১. B. Bi. (A. S. S.) পৃঃ ৯৩

২. যাদবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত।

নোক্তম্। ইষ্টক্ষেপে সিদ্ধে তেষামনুদ্দেশ্যত্বাচ্চ। তত্র ভাবনা দ্বিবিধা। সমসভাবনাঽন্তরভাবনা চেতি। তত্রপদয়োর্মহত্ত্বেঽপেক্ষিতে সমাসভাবনামাহ —বজ্রাভ্যাসৌ জ্যেষ্ঠলঘ্‌বোঃ ইত্যাদিনা। জ্যেষ্ঠলঘ্‌বোর্যৌ বজ্রাভ্যাসৌ তদৈক্যং হ্রস্বং স্যাত্। বজ্রাভ্যাসো নাম তির্যগ্‌গুণনম্। বজ্রস্য তির্যকপ্রহারস্বভাবত্বাত্। তস্মাদূর্ধ্বকনিষ্ঠেনাহঃস্থং জ্যেষ্ঠং গুণনীয়মধঃস্থকনিষ্ঠেনোর্ধ্বস্থ জ্যেষ্ঠং গুণনীয়ম্। তয়োরৈক্যং হ্রস্বং স্যাত্। লঘ্‌বোরাহতিঃ প্রকৃত্যা গুণিতা জ্যেষ্ঠয়োর্বদ্বধেন যুক্তা জ্যেষ্ঠমূলং স্যাত্। ক্ষেপয়োরভ্যাসঃ ক্ষেপকঃ স্যাদিতি।

অথ পদয়োর্লঘুত্বেঽভীপ্সিতেঽন্তরভাবনাহ-হ্রস্বং বজ্রাভ্যাসয়োরন্তরং বা ইতি। বজ্রাভ্যাসয়োরন্তরং বা হ্রস্বং স্যাত্। ঐক্যাপেক্ষয়া বিকল্পঃ। অত্র যঃ প্রকৃত্যা গুণিতো লঘ্‌বোর্ঘাতো তশ্চ কেবলো জ্যেষ্ঠয়োর্ঘাতস্তদ্বিয়োগো জেষ্ঠং স্যাত্। অত্রাপি ক্ষেপঘাতঃ ক্ষেপকঃ স্যাত্পূর্ববদেব। অত্র প্রথম সূত্রোপপত্তিঃ স্পষ্টতরা। অথ ভাবনোপপত্তিরুচ্যতে। তত্রাসংকরার্থমাদ্যদ্বিতীয়াদিপদপ্রথমাক্ষরোপলক্ষণপূর্বকং বীজ-ক্রিয়া লিখ্যতে। যথা—

কনিষ্ঠজ্যেষ্ঠক্ষেপাণাংপ্‌ঙক্তোন্যাসঃ আক ১ আজ্যে ১ আক্ষে ১
দ্বিক ১ দ্বিজ্যে ১ দ্বিক্ষে ১

অথ 'ইষ্টবর্গহৃতঃ ক্ষেপঃ ক্ষেপ স্যাত্' ইতিবক্ষমাদ্বসূত্রোক্তেন 'ক্ষেপ ক্ষুণ্ণঃ ক্ষুণ্ণে তদা পদে' ইত্যনেন প্রকারেণ পরস্পর-জ্যেষ্ঠমিষ্টং প্রকল্প্য পঙ্‌ক্তোর্জাতাঃ কনিষ্ঠজ্যেষ্ঠক্ষেপাঃ।

দ্বিজ্যে ০ আক ১ দ্বিজ্যে ০ আজ্যে ১ দ্বিজ্যেব ০ আক্ষে ১
আজ্যে ০ দ্বিক ১ দ্বিজ্যে ০ আজ্যে ১ আজ্যেব ০ দ্বিক্ষে ১

অত্রোঘ্‌র্তপঙ্‌ক্তৌ দ্বিতীয়জ্যেষ্ঠবর্গগুণিত আদ্যক্ষেপোঽস্তি। তত্র দ্বিতীয়জ্যেষ্ঠব-র্গোঽন্যথা সাধ্যতে। দ্বিতীয়কনিষ্ঠবর্গঃ প্রকৃতিগুণো দ্বিতীয়ক্ষেপযুতো জাতো দ্বিতীয়-জ্যেষ্ঠবর্গঃ। দ্বিক ০ প্র ১ দ্বিক্ষে ১ অনেন গুণিত আদ্যক্ষেপো জাতঃ ক্ষগুদ্বয়াত্মকঃ ক্ষেপঃ। দ্বিকব ০ আক্ষে ২ দ্বিক্ষে ০ আক্ষে ১। অত্রপ্রথমখণ্ড আদ্যক্ষেপো-ঽন্যথা সাধ্যতে। জ্যেষ্ঠ বর্গে হি খণ্ডদ্বয়মস্তি। প্রকৃতিগুণঃ কনিষ্ঠবর্গ একম্। ক্ষেপোঽপরম্। তত্র জ্যেষ্ঠবর্গাত্ প্রকৃতিগুণে কনিষ্ঠবর্গে শোধিতে ক্ষেপ এবাবশিষ্যতে। অত আদ্যকনিষ্ঠবর্গঃ প্রকৃতিগুণ আদ্যজ্যেষ্ঠবর্গাদপনীতো জাত আদ্যঃ ক্ষেপঃ। আকব ০ প্র ১ আজ্যেব ১। অয়ং প্রকৃতিগুণেন দ্বিতীয়কনিষ্ঠবর্গেণ গুণিতঃ সন্প্রকৃতক্ষেপা-দ্যখণ্ডং ভবেদিতি জাতমাদ্যং খণ্ডং খণ্ডদ্বয়াত্মকম্।

দ্বিকব ০ প্র ০ আকব ০ প্র ১ দ্বিকব ০ প্র ০ আজ্যের ১।

অত্র প্রথমখণ্ডে প্রকৃত্যা বারদ্বয়ং গুণনাজ্জাতং প্রকৃতিবর্গেণ গুণনম্। তথা সতি

জাতং প্রথমখণ্ডম্। দ্বিকব ০ আকব ০ প্রব ১ । এবমূর্ধ্বপঙ্‌ক্তৌ জাতং খণ্ডত্রয়াত্মকঃ ক্ষেপঃ।

দ্বিকব ০ আকব ০ প্রব ১ দ্বিকব ০ প্র ০ আজ্যেব ১ দ্বিক্ষে ০ আক্ষে ১ অনয়ৈব যুক্ত্যা দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তাবপি জাতঃ খণ্ডত্রয়াত্মিকঃ ক্ষেপঃ, দ্বিকব ০ আকব ০ প্রব ১ আকব ০ প্র ০ দ্বিজ্যেব ১ দ্বিক্ষে ০ আক্ষে ১ এবং পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে জাতাঃ কনিষ্ঠজ্যেষ্ঠক্ষেপাঃ

দ্বিজ্যে ০ আক ১ দ্বিজ্যে ০ আজ্যে ১

আজ্যে ০ দ্বিক ১ দ্বিজ্যে ০ আজ্যে ১

দ্বিকব ০ আকব ০ প্রব ১ দ্বিকব ০ প্র ০ আজ্যেব ১ দ্বিক্ষে ০ আক্ষে ১

দ্বিকব ০ আকব ০ প্রব ১ আকব ০ প্র ০ দ্বিজ্যেব ১ দ্বিক্ষে ০ আক্ষে ১

অত্র জ্যেষ্ঠ লব্ধোরেকোঽভ্যাস উর্ধ্বপঙ্‌ক্তৌ কনিষ্ঠম্। অপরোঽভ্যাসো দ্বিতীয়পঙ্‌ক্তৌ কনিষ্ঠম্। জ্যেষ্ঠং তুভয়ত্র জ্যেষ্ঠাভ্যাসরূপমেকব। অত্র প্রত্যেকং বজ্রাভ্যাসস্য কনিষ্ঠত্বকল্পনে ক্ষেপো মহান্ স্যাদিত্যাচার্যৈরন্যথা যতিতম্। তদ্যথা। বজ্রাভ্যাসযোগঃ কনিষ্ঠং কল্পিতম্। দ্বিজ্যে ০ আক ১ আজ্যে ০ দ্বিক ১ অস্যবর্গঃ। দ্বিজ্যেব ০ আকব ১ দ্বিজ্যেব আক ০ আজ্যে ০ দ্বিক ২ আজ্যেব ০ দ্বিকব ১ প্রকৃতগুণঃ।

দ্বিজ্যেব ০ আকব ০ প্র ১ দ্বিজ্যে ০ আক ০ আজ্যে ০ দ্বিক ০ প্র ২ আজ্যেব ০ দ্বিকব ০ প্র ১।

অয়ং কেন ক্ষেপেণ যুতঃ সমূলদঃ স্যাদিতি বিচার্যতে। তত্রাস্য খণ্ডদ্বয়ম্। একৈকবজ্রাভ্যাসজ জেষ্ঠবর্গতুল্যমেকম্। শেষমপরম্। তত্র কনিষ্ঠবর্গঃ প্রকৃতিগুণঃ ক্ষেপযুতো জ্যেষ্ঠবর্গঃ স্যাদিতি জাতৌ পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে জ্যেষ্ঠবর্গৌ।

দ্বিজ্যেব০ আকব০ প্র১ দ্বিকব০ আকব০ প্রব১ দ্বিকব০ প্র০ আজ্যেব১ দ্বিক্ষে০ আক্ষে১

আজ্যেব০ দ্বিকব০ প্র১ দ্বিকব০ আকব০ প্রব১ আকব০ প্র০ দ্বিজ্যেব১ দ্বিক্ষে০ আক্ষে১

পঙ্‌ক্তিদ্বয়েঽপি জ্যেষ্ঠাভ্যাসলক্ষণস্য জ্যেষ্ঠস্য তুল্যত্বাদেতৌ জ্যেষ্ঠবর্গাবপি তুল্যাবেব। তৃতীয়োঽয়মপি। দ্বিজ্যেব ০ আজ্যেব ১। অথ বজ্রাভ্যাসযোগরূপকল্পিতকানষ্ঠস্য বর্গাত্ প্রকৃতিগুণাদস্মাত্।

দ্বিজ্যেব ০ আকব ০ প্র ১ দ্বিজ্যে ০ আক ০ আজ্যে ০ দ্বিক ০ প্র ২ আজ্যেব ০ দ্বিকব ০ প্র ১ জেষ্ঠবর্গদ্বয়েঽপি পৃথকপৃথগপনীতে শেষং তুল্যমেব। দ্বিজ্যে ০ আক ০ আজ্যে ০ দ্বিক ০ প্র ২ আকব ০ দ্বিকব ০ প্রব ১ আক্ষে ০ দ্বিক্ষে১

ইদং শোধিতেন জ্যেষ্ঠবর্গেণ পুনর্যদি যোজ্যতে তর্হি কল্পিতকনিষ্ঠবর্গঃ প্রকৃতিগুণো

যথাস্থিতঃ স্যাত্। অথায়মপি জ্যেষ্ঠবর্গঃ। দ্বিজ্যেব ০ আজ্যেব ১ শোধিতেন সম ইতি। অনেন যোগ জাতঃ কল্পিতকনিষ্ঠবর্গপ্রকৃতিগুণঃ। দ্বিজ্যেব ০ আজ্যেব ১ দ্বিজ্যে ০ আক ০ আজ্যে ০ দ্বিক ০ প্র ২ আকব ০ দ্বিকব ০ প্রব ১ আক্ষে ০ দ্বিক্ষে ১

অস্মাত্ক্ষেপঘাতেন যুক্তাত 'কৃতিভ্য আদায় পদানি' ইত্যাদিনা পদমিদং দ্বিজ্যে ০ আজ্যে ১ আক ০ দ্বিক ০ প্র ১ লভ্যত ইত্যুপপন্নং 'লঘ্বোরাহতিশ্চ প্রকৃত্যা ক্ষুণ্ণা জ্যেষ্ঠাভ্যাসযুগজ্যেষ্ঠমূলম্' ইত্যাদি। এবং বজ্রাভ্যাসয়োরন্তরং কনিষ্ঠং প্রকল্প্যোক্ত-যুক্ত্যাঽন্তরভাবনোপপত্তিরপি দ্রষ্টব্যা। এবং খণ্ডক্ষোদেন বহুবিধা উপপত্তয়ঃ সন্তি গ্রন্থবিস্তরভয়ান্ন লিখ্যন্তে।[১]

কৃষ্ণদৈবজ্ঞ যা বলেছেন তাকে আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় লিখলে এইরূপ হবে।

আমরা পাই $N\alpha^2+K=\beta^2 \cdots\cdots\cdots (i)$

$N\alpha'^2+K'=\beta'^2 \cdots\cdots (ii)$

(i) নং সমীকরণকে β' দিয়ে গুণ করলে আমরা পাই

$$N\alpha^2\beta'^2+K\beta'^2=\beta^2\beta'^2 \cdots\cdots\cdots (iii)$$

(ii) নং সমীকরণ থেকে β'^2-এর মান (iii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই

$$N\alpha^2\beta'^2+K(N\alpha'^2+K')=\beta^2\beta'^2$$

অথবা $N\alpha^2\beta'^2+NK\alpha'^2+KK'=\beta^2\beta'^2 \cdots\cdots\cdots (iv)$

এখন (i) সমীকরণ থেকে $K=\beta^2-N\alpha^2$ মান পাওয়া যায়। এই মান (iv) নং সমীকরণে বসালে পাওয়া যায়

$$N\alpha^2\beta'^2+N\alpha'^2(\beta^2-N\alpha^2)+KK'=\beta^2\beta'^2$$

বা, $N(\alpha^2\beta'^2+\alpha'^2\beta^2)+KK'=\beta^2\beta'^2+N^2\alpha^2\alpha'^2 \cdots\cdots\cdots (v)$

(v) নং সমীকরণের উভয়পার্শ্বে $\pm 2N\alpha\beta\alpha'\beta'$ যোগ করলে পাওয়া যায়

$$N(\alpha\beta'\pm\alpha'\beta)^2+KK'=(\beta\beta'\pm N\alpha\alpha')^2 \cdots\cdots\cdots (vi)$$

এখন (vi) নং সমীকরণে $\alpha=\alpha'$, $\beta=\beta'$, $K=K'$ বসালে আমরা মূল সমীকরণ $N(2\alpha\beta)^2+K^2=(\beta^2+N\alpha^2)^2$ পাব।

যাই হোক ব্রহ্মগুপ্তের উপসিদ্ধান্ত থেকে আমরা সহজেই বলতে পারি যে $Nx^2+1=y^2$ এই সমীকরণটিই অসীম সংখ্যক সমাধান পেতে পারি।

ব্রহ্মগুপ্তের অন্য একটি উপসিদ্ধান্তে দেখা যায় যে যদি $x=\alpha$, $y=\beta$

(১) B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ৯৩-৯৬

$Nx^2+K^2=y^2$-এর সমাধান হয় তাহলে $x=\alpha/K$, $y=\beta/K$ $Nx^2+1=y^2$ এর সমাধান হবে। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন :

………"বর্গাচ্ছিন্নে ক্ষেপে তত্‌পদগুণিতে তদা মূলে"

অর্থাৎ যদি ক্ষেপকে বর্গাঙ্ক দিয়ে ভাগ দিলে কোন ভাগশেষ না থাকে তাহলে যে লব্ধি পাওয়া যাবে তাকে বর্গাঙ্কর মূল দিয়ে গুণ কর।

অর্থাৎ ধরা যাক বর্গ প্রকৃতিটি হচ্ছে $Nx^2 \pm p^2d=y^2$……(i) এখানে ক্ষেপ p^2d দিয়ে ভাগ দিলে কোন ভাগশেষ থাকছে না। এখানে $u=x/p$, $v=yp$ ধরে (i) নং সমীকরণে বসালে আমরা পাব $Nu^2 \pm d=v^2$। এটির ক্ষেপ পূর্বোক্ত সমীকরণের ক্ষেপকে p^2 দিয়ে ভাগ দিলে যা হবে তার সমান।

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন :

"ইষ্টবর্গহৃতঃ ক্ষেপঃ ক্ষেপঃ স্যাদিষ্টভাজিতে।

মূলে তে স্তোহথ বা ক্ষেপঃ ক্ষুণ্ণঃ ক্ষুণ্ণে তদাপদে।"

অর্থাৎ কোন ইষ্টবর্গের দ্বারা ক্ষেপকে ভাগ দিলে যদি নিঃশেষ অপবর্তিত হয় তাহলে তাকে ক্ষেপ মনে কর। এবং ইষ্ট দ্বারা কনিষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠকে ভাগ দেবে। বা ক্ষেপকে গুণ করলে বীজদ্বয়ও গুণ করা হবে।

শ্রীপতির পদ্ধতি : শ্রীপতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ সিদ্ধান্ত শেখরে চতুর্দশ অধ্যায়ের ৩৩ তম শ্লোকে বলেছেন—

রূপং কণীয়ঃ পদমস্য বর্গে হতে প্রকৃত্যা বিযুতে যুতে বা

ক্ষিপ্ত্বা পদং যচ্চ বৃহত্‌পদং তত্‌তাভ্যাং পদে ভাবনায় ত্বনন্তে।

অর্থাৎ 'এক বা ইষ্টকে কনিষ্ঠ মনে করিবে তাহার বর্গ করিয়া প্রকৃতির দ্বারা গুণ করিয়া ধন বা ঋণ ক্ষেপ যোগ বিয়োগ করিয়া যে মূল আসিবে তাহাকে জ্যেষ্ঠ পদ বলা হয়; ঐ জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠের দ্বারা ভাবনা দিলে অনেক কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ আসিবে।' [১]

অর্থাৎ বলা যেতে পারে যদি $m^2=$ইষ্ট মূলদরাশির বর্গ হয় তাহলে

$$N.\,1^2+(m^2-N)=m^2$$

বা, $N,\,1^2-(N-m^2)=m^2$

এরপর যে কোন একটিতে ব্রহ্মগুপ্তের উপসিদ্ধান্ত প্রয়োগ করলে আমরা পাব

$$N(2m)^2+(m^2-N)^2=(m^2+N)^2$$

(১) শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত।

$$\therefore \quad N\left(\frac{2m}{m^2 \sim N}\right)^2 + 1 = \left(\frac{m^2+N}{m^2 \sim N}\right)^2$$

অর্থাৎ $x = \frac{2m}{m^2 \sim N}$ এবং $y = \frac{m^2+N}{m^2 \sim N}$

$Nx^2+1=y^2$ সমীকরণটির দুটি বীজ। এখানে m = মূলদ রাশি।

এ পদ্ধতি সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন

ইষ্টবর্গপ্রকৃত্যোর্যদ্বিবরং তেন বা ভজেত্
দ্বিঘ্নামিষ্টং কনিষ্ঠং তত্ পদং স্যাদেকসংযুতৌ
ততৌ জ্যেষ্ঠ মিহানন্ত্যং ভাবনাতস্তথেষ্টতঃ ॥

অর্থ নিষ্প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য আমরা যদি ভারতীয় গণিত গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব $Nx^2+1=y^2$ সমীকরণটি সমাধান করতে $Nx^2+K=y^2$ এই সাহায্যকারী সমীকরণটি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এঁরা সাধারণত $K=\pm 1$, ± 2, ± 4 ধরে সমাধান করার চেষ্টা করেন।

(১) যদি $K=\pm 1$ হয় তাহলে সাহায্যকারী সমীকরণটি (auxiliary equation) হবে $N\alpha^2 \pm 1=\beta^2$ এখানে α এবং β পূর্ণ সংখ্যা। তাহলে ব্রহ্মগুপ্তের উপসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা পাব $Nx^2+1=y^2$ সমীকরণটির $x=2\alpha\beta$, $y=\beta^2+N\alpha^2$ বীজদ্বয়।

(২) $K=\pm 2$ হয় তাহলে সাহাজ্যকারী সমীকরণটি হবে $N\alpha^2 \pm 2=\beta^2$ দেখা যাবে

$x=\alpha\beta$, $y=\frac{1}{2}(\beta^2+N\alpha^2)$ $N\alpha^2+1=\beta^2$ সমীকরণটির সমাধান।

(৩) $K=4$ তাহলে সাহায্যকারী সমীকরণটি হবে $N\alpha^2+4$.

তাহলে আমরা $x=\frac{1}{2}\alpha\beta$, $y=\frac{1}{2}$ (β^2-2) বীজদ্বয় পাওয়া যাবে। (এখানে α যুগ্ম হবে)

অথবা $x=\frac{1}{2}\alpha(\beta^2-1)$, $y=\frac{1}{2}\beta(\beta^2-3)$ বীজদ্বয় পাওয়া যাবে (এখানে α = অযুগ্ম)

এ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৭ তম শ্লোকে বলেছেদ

চতুরধিকেহন্তপদকৃতিস্ত্র্যূনাদলিতাহন্ত্যপদ গুণাহন্ত্যপদম্।
অন্ত্যপদ কৃতির্ব্যেকা দ্বিহৃতাহহদ্যপদাহতাহহদ্যপদম্

(৪) $K=-4$ তাহলে সাহায্যকারী সমীকরণটি হচ্ছে $N\alpha^2-4=\beta^2$

তাহলে $Nx^2+1=y^2$ এর প্রথম অখণ্ড ধনাত্মক সমাধান হচ্ছে

$$x=\frac{1}{2}\alpha\beta\,(\beta^2+1)\,(\beta^2+3)$$

$$y=(\beta^2+2)\,\{\,\frac{1}{2}\,(\beta^2+3)\,(\beta^2+1)-1\}$$

এ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৮ তম শ্লোকে বলেছেন

চতুরূনেঽন্ত্যপদকৃতী ত্র্যেকযুতে বধদলং পৃথগ্ ব্যেকম্।

ব্যেকাদ্যাহতমন্ত্যপদবধগুণমাদ্যমন্ত্যপদম্।

এ সম্পর্কে ব্যাপক অথচ সুষ্ঠভাবে আলোচিত হয়েছে History of Hindu Mathematics vol 2. (পৃঃ—157-160) গ্রন্থে।

বলা বাহুল্য ব্রহ্মগুপ্তের উপসিদ্ধান্তটিকে 'ভাবনা' এই পরিভাষাই প্রাচীন ভারতীয়র গণিতজ্ঞরা ব্যবহার করতেন। 'ভাবনা' মূলত দুই প্রকার (১) সমাস ভাবনা (Addition lemma) (২) অন্তর ভাবনা (Subtration lemma) যদি কোন ভাবনাতে দুজোড়া সমান বীজ থাকে এবং ক্ষেপগুলিও সমান হয় তাহলে এই ভাবনাকে তুল্য ভাবনা বলা হয় অন্যথায় এটি অতুল্যভাবনা বলা হবে। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের লিখিত বীজগণিতের টীকা করতে গিয়ে কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

১৫.৫ চক্রবাল

N অবর্গপূর্ণ সংখ্যা হলে $Nx^2+1=y^2$ সমীকরণটির সাধারন ধনাত্মক অখণ্ড সমাধান করতে গিয়ে $Na^2+K=b^2$ ধরণের একটি সাহায্যকারী সমীকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এখানে অবশ্য a এবং b ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং $K=\pm1,\ \pm2$ এবং ±4 ; ভাবনা পদ্ধতির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে এটি সমাধান করা হয়েছে এবং এর অনেকগুলি সমাধানও পাওয়া গিয়েছে। ব্রহ্মগুপ্ত যে পদ্ধতির সাহায্যে এগুলি সমাধান করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে এবং তৃপ্তিকর পদ্ধতিতে করেন নি। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এই গুলির সমাধান নূতন পদ্ধতিতে করেছেন। এর নাম দিয়েছেন "চক্রবাল"। এই পদ্ধতিটি তিনি আবিষ্কার করেছেন সেকথা কোথাও বলেন নি। এ সম্পর্কে কৃষ্ণদৈবজ্ঞ বলেছেন "আচার্যা এতদগণিতং চক্রবালমিতি জগু" অর্থাৎ বিদ্বান অধ্যাপককুল এটিকে চক্রবাল বলেছেন।" অবশ্য আমরা দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের পূর্বে লিখিত কোন গ্রন্থে চক্রবাল সম্বন্ধে কোন আলোচনা দেখতে পাইনি। চক্রবাল পদ্ধতি আলোচনা করার পূর্বে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একটি উপসিদ্ধান্ত দিয়েছেন :

$Na^2+K=b^2$......(i) এই সমীকরণে a, b ধনাত্মক এবং K ধনাত্মক বা ঋণাত্ম হলে

$$N\left(\frac{am+b}{K}\right)^2+\frac{m^2-N}{K}=\left(\frac{bm+Na}{K}\right)^2$$ পাওয়া যায়।

এখানে m সমগ্র রাশি (whole numbers)

মূল আলোচনা

চক্রবাল পদ্ধতি সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন ঃ

হ্রস্ব জ্যেষ্ঠ পদক্ষেপান্ ভাজ্য প্রক্ষেপভাজকান্
কৃত্বা কল্প্যোগুণস্তত্র তথা প্রকৃতিতশ্চ্যুতে ॥
গুণবর্গে প্রকৃত্যোনেঽথবাঽল্পং শেষকং যথা।
তুত্ত ক্ষেপহৃতং ক্ষেপো ব্যস্তঃ প্রকৃতিশ্চ্যুতে ॥
গুণলব্ধিঃ পদং হ্রস্বং ততোজ্যেষ্ঠ মতোঽসকৃত্।
ত্যক্ত্বা পূর্ব্বপদ ক্ষেপাংশ্চক্রবালমিদং জগুঃ ॥
চত্যদ্বয়ে কযুতামেববভিন্নে ভবতঃ পদে।
চতুর্দ্বিঅেপমূলাভ্যাং রূপক্ষেপার্থভাবনা ॥[১]

মর্মার্থ : বর্গপ্রকৃতির নিয়মে আনিত হ্রস্ব জ্যেষ্ঠ এবং ক্ষেপকে যথাক্রমে ভাজ্য ক্ষেপক এবং ভাজক কল্পনা করিয়া কুট্টকের দ্বারা গুণলব্ধি আনয়ন করিবে। অতঃপর এমন গুণক সাধন করিব যাহাতে প্রকৃতি হইতে গুণবর্গ বিয়োগ করিলে অথবা গুণবর্গ হইতে প্রকৃতি বিয়োগ করিলে শেষ অল্প থাকিবে। তাহাকে ক্ষেপ দ্বারা ভাগ করিয়া তাহাকে ক্ষেপ মনে কর। যদি প্রকৃতি হইতে গুণবর্গ বিয়োগ হইয়া থাকে তাহা হইলে ক্ষেপকে ধন বা ঋণ বিপরীতক্রমে মনে করিবে, গুণকের সহিত যে লব্ধি আসিয়াছে তাহাকে হ্রস্ব মনে করিবে। অতঃপর জ্যেষ্ঠ সাধন করি'ব। এইরূপ অসকৃত ভাবনার দ্বারা হ্রস্ব জ্যেষ্ঠ ক্ষেপ সাধন করিবে। চার, দুই, এক ক্ষেপ আসিলে ঐ সময়ে ভাবনার দ্বারা রূপক্ষেপ সিদ্ধ হইবে।[২]

এবার একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ধরা যাক

$Na^2+K=b^2$......(i) একটি সমীকরণ। এখানে a, b পারস্পরিক মৌলিক পূর্ণসংখ্যা এবং K ধনাত্মক বা ঋণাত্মক। তাহলে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের উপসিদ্ধান্ত থেকে আমরা পাই

১. B. Bi (A. S. S) পৃঃ ৯৯।

২. শ্রীযাদবেন্দ্র শাস্ত্রী এই অনুবাদটি করে দিয়েছেন।

$$N\left(\frac{a.m+b}{K}\right)^2+\frac{m^2-N}{K}=\left(\frac{b.m+N.a}{K}\right)^2 \cdots\cdots(ii)$$

এখানে m এমন একটি পূর্ণসংখ্যা যাতে এটিকে কুট্টকবিধি অনুযায়ী নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ

$\frac{a.m+b}{K}$ একটি পূর্ণরাশি (whole numbers) ; বিভিন্ন মান পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এমনভাবে এদের মধ্যে থেকে মান পছন্দ করেছেন যে $|m^2-N|$ অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়। ধরা যাক m-এর মান l তাহলে

$$a_1=\frac{a.l+b}{K}$$

$$b_1=\frac{b.l+N.a}{K}$$

$$K=\frac{l^2-N}{K}$$

এখানে a_1, b_1, K_1 সবগুলিই পূর্ণসংখ্যা। এখন তাহলে (ii) নং সমীকরণটি এইরূপ হয় $Na_1{}^2+K_1{}^2=b_1{}^2 \cdots\cdots(ii)$

ঠিক এইভাবে আমরা অগ্রসর হলে এই ধরণের আর একটি সমীকরণ পাব।

$Na_2{}^2+K=b_2{}^2 \cdots\cdots\cdots(iv)$

এইভাবে অগ্রসর হতে থাকলে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের মতানুযায়ী বলা যায় আমরা এমন এক জায়গায় আসবো যখন $K=\pm1$ বা ±2 বা ±4 হবে।

নারায়ণের পদ্ধতি : নারায়ণ (১৩৫০ খ্রীঃ) এই পদ্ধতি সম্পর্কে ঠিক দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছেন। তিনি গণিত কৌমুদী এবং বীজগণিতবতাংশে বলেছেন :

হ্রস্বজ্যেষ্ঠক্ষেপান্ ভাজ্যপ্রক্ষেপভাজকান্ কৃত্বা।
কল্প্যো গুণো যথা তদ্বর্গাত্ সংশোধয়েত্ প্রকৃতিম্ ॥
প্রকৃতেগু'ণবর্গে বা বিশোধিতে জায়তে তু যচ্ছেষম্।
তত্ ক্ষেপহৃতং ক্ষেপো গুণবর্গবিশোধিতে ব্যস্তম্ ॥
লব্ধিঃ কনিষ্ঠমূলং তন্নিজগুণকাহতং বিযুক্তং চ।
পূর্বাল্পপদপরক্ষিপ্ত্যোর্ঘাতেন জায়তে জ্যেষ্ঠম্।

প্রক্ষেপশোধনেষ্বপ্যেকদ্বিতুর্ষ্ব ভিন্নমূলে স্তঃ
দ্বিচতুঃক্ষেপপদাভ্যাং রূপক্ষেপায় ভাবনা কার্যা।[১]

অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

চক্রবাল পদ্ধতি সম্পর্কে বহু উদাহরণ দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, নারায়ণ প্রমুখ দিয়েছেন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বীজগণিত থেকে একটি উদাহরণ তুলে ধরা হোল।

"কা সপ্তষষ্টিগুণিতা কৃতিরেকযুক্তা কা চৈকষষ্টিগুণিতা চ সখে সরূপা
স্যান্মূলদা যদি কৃতিপ্রকৃতির্নিতান্তং ত্বচ্চেতসি প্রবদ তাত ততালতাবত্‌" (পৃঃ ১০২)

অর্থাৎ কোন বর্গরাশিকে ৬৭ দ্বারা গুণ করিয়া এক যোগ করিলে বর্গরাশি হইবে। এবং কোন বর্গরাশিকে ১১ দ্বারা গুণ করিয়া এক যোগ করিলে বর্গরাশি হইবে।[২]

বলা বাহুল্য এখানে দুটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটিকে আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়

$67x^2+1=y^2 \ldots\ldots$(i)

$71x^2+1=y^2 \ldots\ldots$(ii)

এই দুটি উদাহরণের মধ্যে দ্বিতীয়টি ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রখ্যাত গণিতবিদ ফার্মাট (Fermart) ফেঁসিলে (Frenile) একটি পত্রে উল্লেখ করেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত সুইডেনবাসী গণিতবিদ লিওনার্দ অয়লার এটি সমাধান করেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এটি কৃষ্ণদৈবজ্ঞ এঁদের বহু পূর্বেই সমাধান করেছেন। যাই হোক আমরা এখানে প্রথম উদাহরণটির সমাধান তুলে ধরা হোল।

প্রথমোদাহরণে রূপং কনিষ্ঠং রূপত্রয়মৃণক্ষেপং চ প্রকল্প্য ন্যাসঃ প্র ৬৭ হ্র ১ জ্যে ৮ ক্ষে ৩। অত্র হ্রস্বং ভাজ্যং ক্ষেপং ভাজকং জ্যেষ্ঠং ক্ষেপং চ প্রকল্প্য

কুট্টকার্থং ন্যাসঃ ভা ১ ক্ষে ৮। অত্র হরতষ্টে ধনক্ষেপ
হ ৩

ইতি কৃতে জাতো বল্লী ০ লব্ধিগুণৌ ০ লব্ধিবৈষম্যাত্‌স্ব
২ ২
০

তগুণশুদ্ধৌ ১ ক্ষেপতগুণলাভা ২ দ্যা লব্ধিরিতি লব্ধিগুণৌ
১

১. বীজগণিতবতংস (নারায়ণ পণ্ডিত) প্রথম পর্ব (কৃপা শঙ্কর শুক্লা সম্পাদিত ৭৭-৮০ শ্লোক সমূহ) পৃঃ ৩৮-৩৯।

গণিত কৌমুদী ৮—১২ শ্লোকসমূহ পৃঃ ২৩৬।

২. যাদবেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী এটি অনুবাদ করে দিয়েছেন।

ই হরস্যর্ণত্বাল্লব্ধে ঋণত্বে কৃতে জাতৌ সক্ষেপৌ

ক্ষে ১ ল ৬

ক্ষে ৬ গু ১

অসতগুণস্য ১ বর্গে প্রকৃতেঃ ৬৭ বিশোধিতে শেষং ৬৬ অল্পং নস্যাত। অতো

রূপদ্বয়মৃণমিষ্টং ২ প্রকল্প্যেষ্টাহতস্বস্বহরেণেত্যাদিনা বা জাতৌ লব্ধিগুণৌ ৫/৭। অস্য গুণস্য ৭ বর্গ ৪৯ প্রকৃতেঃ ৬৭ শোধিতে শেষং ১৮ পূর্বক্ষেপেণানেন ৬ হৃতে লব্ধং ৬ অয়ং ক্ষেপঃ। গুণবর্গে প্রকৃতেঃ ৭ বিশোধিত ব্যস্তঃ সাদিতি ধনং ক্ষেপঃ ৬ লব্ধিস্তু ৫ কনিষ্ঠপদম্। অস্যর্ণত্বে ধনত্বে চেষ্টং হ্রস্বং তস্য বর্গ ইত্যাদাবুত্তরকর্মণি ন বিশেষেহস্তীতি জাতং ধনং কনিষ্ঠং ৫। অস্য বর্গে প্রকৃতিগুণে ষড়যুতে জাতং মূলং জ্যেষ্ঠং ৪১। অথবা মদুক্তপ্রকারেণ জ্যেষ্ঠং ৮ গুণক ৭ গুণিতং ৫৬ কনিষ্ঠেন ১ প্রকৃতি ৬৭ গুণেন ৬৭ যুতং ১২৩ ক্ষেপেণ ৬ ভক্তং ৪১ জাতং জেষ্ঠং। অস্যাপি কনিষ্ঠ স্যোব ধনত্বমিতি জাতং তদেব জ্যেষ্ঠং ৪১। এবং জাতা হ্রস্বজ্যেষ্ঠ ক্ষেপাঃ হ্র ৫ জ্যে ৬১ ক্ষে ৬। পুনরেষাং কুট্টকার্থং ন্যাসঃ ভা ৫ ক্ষে ৪১ অত্র পূর্ববল্লব্ধিগুণৌ
হ ৬

সক্ষেপৌ ক্ষে ৫ ল ১১

ক্ষে ৬ গু ৫

অস্যৈব গুণস্য ৫ বর্গে ২৫ প্রকৃতেঃ শোধিতেহল্পমন্তরং ৪২ ভবতি। ইদমন্তরং ৪২ ক্ষেপেণ ৬ হৃতং ৭ জাতেঃ ক্ষেপঃ। প্রকৃতিতশ্চ্যুতে ব্যস্ত ইতি জাত ক্ষেপঃ ৭। লব্ধিঃ কনিষ্ঠং ১১। অস্য বর্গে প্রকৃতিগুণে সপ্তহীনে মূলং ৯০। অথবা পূর্বজ্যেষ্ঠ ৪১ গুণ ৫ গুণিতং ২০৫ কনিষ্ঠেন ৫ প্রকৃতি ৬৭ গুণেন ৩৩৫ যুতং ৫৪০ ক্ষেপেণ ৬ ত্দৃতং ৯০ জাতং জ্যেষ্ঠম্ এবং জাতাঃ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ক্ষেপাঃ ক ১১ জ্যে ৯০ ক্ষে ৭। পুনরেষাং কুট্টকার্থং ন্যাসঃ ভা ১১ ক্ষে ৯০। অত্র ধনক্ষেপ হরতষ্টে
হ ৭

ইতিজাতাবল্লী ১
১
১
১
৬
০

রাশিদ্বয় ১৮ তষ্টং ৭ লব্ধয়ো বিষমা ইতি স্বতক্ষণাচ্ছোধনেন জাতৌ লব্ধিগুণৌ ৪/২
১২ ৫

ক্ষেপতক্ষণলাভা ১২ ঢ্যা ল্লব্ধিরিতি জাতৌ ১৬ হরস্যানত্বাল্লব্ধেঋণত্বমিতি জাতৌ
২

সাক্ষেপৌ লব্ধিগুণৌ ক্ষে ১১ ল ১৬̇ অস্য গুণস্য ২ বর্গস্য ৪ প্রকৃতে ৬৭ শ্চান্তরং ৬৩
ক্ষে ৭̇ গু ২

অল্পং ন স্যাদিতি রূপমৃণমিষ্টং ১̇ প্রকল্প্য ক্ষেপে ক্ষিপ্তে জাতৌ লব্ধিগুণৌ ল ২৭̇
গু ৯

অস্য গুণস্য ৯ বর্গে ৮১ প্রকৃত্যা ৬৭ হীনে ২৪ শেষ ক্ষেপণ ৭̇ ভক্তং জাতঃ ক্ষেপঃ ২̇ লব্ধি ২৭̇ কনিষ্ঠং পূর্বদ্ধনং ২৭। অস্য বর্গে প্রকৃতিগুণে দব্যনে মূলং জ্যেষ্ঠং ২২১। অথবা পূর্বজ্যেষ্ঠং ৯০ গুণ ৯ গু ৮১০ কনিষ্ঠেন ১১ প্রকৃতি ৬৭ গুণেন ৭৩৭ যুতং ১৫৪৭ ক্ষেপেণ ৭ ভক্তং ২২১ জাতং ধনং কনিষ্ঠবত্ ২১১ এবং কনিষ্ঠজ্যেষ্ঠক্ষেপাঃ ক ২৭ জ্যে ২১১ ক্ষে ২̇ অসানয়োস্তুল্যভাবনার্থং ন্যাসঃ

ক ২৭ জ্যে ২১১ ক্ষে ২̇

ক ২৭ জ্যেঃ ২২১ ক্ষে ২̇

ভাবনয়া জাতে চতুঃক্ষেপমূলে ক ১১৯৩৪ জ্যে ৯৭৬৮৪ ক্ষে ৪ দ্বয়মিষ্টং প্রকল্প্যে ষ্টবর্গহৃতঃ ক্ষেপ ইতি জাতে রূপক্ষেপমূলে ক ৫৯৬৭ জ্যে ৪৮৮৪২ ক্ষে ১।[১]

কৃষ্ণদৈবেজ্ঞের সমাধানটির পদ্ধতিকে আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে এইরূপ হয়।

আমরা সাহায্যকারী সমীকরণ লই

$$67.1^2-3=8^2$$

তাহলে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের উপসিদ্ধান্ত থেকে আমরা পাই

$$67\left(\frac{1.m+8}{-3}\right)^2+\frac{m^2-67}{-3}=\left(\frac{8.m+67.1}{-3}\right)^2 \quad \ldots\ \ldots\ \ldots\ (i)$$

কুট্টবিধিতে সমাধান করতে হলে

$\frac{m+8}{-3}=$ পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে এবং সেক্ষেত্রে $m=-3t+1$ হবে। এখন $t=2$, ধরলে আমরা পাব $m=7$ যার ফলে। m^2-67। লঘিষ্ঠ হবে। এইমান (i) নং সমীকরণ বসালে আমরা পাব $67.5^2+6=41^2$.

আবার দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের উপসিদ্ধান্ত থেকে আমরা পাই

$$67\left(\frac{5.n+41}{6}\right)^2+\frac{n^2-67}{6}=\left(\frac{41.n+67.5}{6}\right)^2 \quad \ldots\ \ldots\ \ldots\ (ii)$$

---

১. B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ১০২—১০৩।

$\frac{5.n+4}{6}$ = পূর্ণ সংখ্যার সমাধান কুট্টবিধিতে পাওয়া যায় $n=6t+5$; এখন $t=0$ ধরলে আমরা $n=5$ পাব এবং । n^2-67 । লঘিষ্ট হবে। তাহলে (ii) নং সমীকরণ এইরূপ হয় : $67.11^2-7=90^2$.

আবার আমরা দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের উপসিদ্ধান্ত থেকে পাই

$$67\left(\frac{11.p+90}{-7}\right)^2+\frac{p^2-67}{-7}\left(\frac{90p+67.11}{-7}\right)^2 \quad \cdots\;\cdots\;\cdots \quad (iii)$$

$\frac{11p+90}{-7}$ = পূর্ণ সংখ্যার সমাধান কুট্টকবিধিতে পাওয়া যায় $p=-7t+2$; এখন $t=-1$ তাহলে $p=9$ পাওয়া যায় এবং এরই ফলে । p^2-67 । লঘিষ্ঠ হবে। এই মান (iii) নং সমীকরণে বসালে পাওয়া যায়

$$67.27^2-2=221^2$$

এবার তুল্য ভাবনার সাহায্যে আমরা নিম্নোক্ত সমীকরণ পাই

$67\ (2.27.221)^2+4=(221+67.27^2)^2$

বা, $67\ (11934)^2+4=(97684)^2$

উভয় পক্ষকে 4 দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাই

$67\ (5967)^2+1=(48842)^2$

অতএব $67x^2+1=y^2$

সমীকরণটির সমাধান পাওয়া গেল $x=5967,\ y=48842$

১৫.৬ কয়েকটি বিশেষ ধরণের সমীকরণ

$Nx^2+1=y^2$ ছাড়াও প্রাচীন ভারতে নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) $Nx^2\pm c=y^2$, (খ) $Mn^2x^2\pm c=y^2$, (গ) $a^2x^2\pm c=y^2$

(ঘ) $c-Nx^2=y^2$, (ঙ) $Nx^2-K^2=y^2$ প্রভৃতি।

নীচে এই সমীকরণগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হোল।

(ক) $Nx^2\pm c=y^2$ সমীকরণটির সাধারণ সমাধান সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন

"রূপপ্রক্ষেপপদে পৃথগিষ্টক্ষেপ্যশোধ্যমূলাভ্যাম্।

কৃত্বাঽন্ত্যাদ্যপদে যে প্রক্ষেপে শোধনেবেষ্টে॥" (১৮-অধ্যায়, ৬৬তম শ্লোক)

অর্থাৎ রূপক্ষেপের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে পৃথক স্থাপন কর। ইষ্টক্ষেপের মধ্যে কনিষ্ঠ, জেষ্ঠের সঙ্গে ভাবনা দিয়ে ইষ্টক্ষেপে অন্য জেষ্ঠ কনিষ্ঠ হয়।

এ কথা সত্য $Nx^2 \pm c = y^2$ এর একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার সমাধান পাওয়া গেলে অসংখ্য সমাধান পাওয়া যাবে একথা ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন। তবে $Nx^2 \pm 1 = y^2$ সমীকরণের অখণ্ড সমাধানের সাহায্য নিয়ে পাওয়া যাবে।

(খ) $Mn^2x^2 \pm c = y^2$ সমীকরণটি প্রসঙ্গে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন
"বর্গচ্ছিন্নে গুণকে প্রথমং তন্মূল ভাজিতং ভবতি।" (১৮-অধ্যায়, ৭০তম শ্লোক)
অর্থাৎ ধরা যাক সমীকরণটি $Mn^2x^2 \pm c = y^2 \cdots\cdots(i)$

এখানে গুণক $M\,n^2$ কে n^2 দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে। এখন $nx = u$ ধরে (i) সমীকরণ এ বসালে আমরা পাব $Mu^2 \pm c = y^2 \cdots\cdots(ii)$

তাহলে প্রথম সমীকরণের প্রথম বীজ = দ্বিতীয় সমীকরণের প্রথম বীজ $\div n$ ঠিক এভাবেই দুইটি সমীকরণের দ্বিতীয় বীজদ্বয়ও নির্ণয় করা যাবে। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যও একই কথা বলেছেন।

(গ) $a^2x^2 \pm c = y^2$ সমীকরণটি সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন
বর্গ গুণকে ক্ষেপঃ কেনচিদ্বৃক্তযুতোনিতো দলিতঃ।
প্রথমো হ্রস্ব্যমূলমন্ত্যো গুণকারপদোদ্ধৃতঃ প্রথমঃ (১৮-অধ্যায়, ৬৯ তম শ্লোক)

অর্থাৎ বর্গাত্মক প্রকৃতিতে ক্ষেপকে ইষ্টরাশি দিয়ে ভাগ দিয়ে যে ফল পাওয়া যায় তারসঙ্গে ইষ্টরাশি যোগ বা বিয়োগ কর। তারপর অর্ধেক কর। ফলের প্রথমটি জেষ্ঠ বীজ এবং দ্বিতীয় রাশিকে গুণকের মূল দিয়ে ভাগ দিলে কনিষ্ঠ বীজ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ বক্তব্যকে আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় লেখা যায় তাহলে এইরকম দাঁড়ায়।

$$x = \frac{1}{2a}\left(\frac{\pm c}{m} - m\right), \quad y = \frac{1}{2}\left(\frac{\pm c}{m} + m\right)$$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ সম্পর্কে বলেছেন:
"ইষ্টভক্তো দ্বিধাক্ষেপ ইষ্টানাতয়ো দলীকৃতঃ
গুণ মূল হৃতশ্চাহহ্যা হ্রস্বজেষ্ঠে ক্রমাত পদে" [B. Bi (A.S.S. পৃঃ ১০৮)]

অর্থাৎ "ক্ষেপকে ইষ্টদ্বারা ভাগ দিয়া তাহাকে দুই স্থানে রাখিবে। প্রথম স্থানে ইষ্ট দ্বারা উন (বিয়োগ) কর। অন্যত্র যোগ কর। তারপর উভয়কেই অর্ধ কর। প্রথম স্থানের গুণকের মূল দ্বারা ভাগ দাও। তাহা হইলে ক্রমশ হ্রস্ব ও জেষ্ঠ পাওয়া যাইবে।" (যাদবেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত)

(ঘ) $c - Nx^2 = y^2$ ধরণের সমীকরণ সম্পর্কে সূত্র এবং ব্যাপক আলোচনা

ভারতীয় গণিতবিদেরা করেছেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ সম্পর্কে উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

ঋণগৈঃ পঞ্চভি ক্ষুণ্ণঃ কো বর্গঃ সৈকবিংশতিঃ

বর্গ স্যাদ্বদ চেদ্ বেতসি জ্ঞয়গপ্রক্কতৌ বিধিম্। [B. Bi (A.S.S.) পৃঃ ১১০]

অর্থাৎ কোন বর্গরাশিকে ঋণাত্মক পাঁচ দ্বারা গুণ করব এবং একুশ যোগ করব, তাহলে বর্গ হবে। অর্থাৎ আধুনিক গণিতের ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়

$$21-5x^2=y^2$$

(ঙ) $Nx^2-K^2=y^2$ সমীকরণ সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন :

রূপশুদ্ধৌ খিলোদ্দিষ্টং বর্গযোগো গুণোন চেত্।

অখিলে কৃতিমূলাভ্যাং দ্বিধা রূপং বিভাজিতম্

দ্বিধা হ্রস্বপদং জ্যেষ্ঠং ততো রূপবিশোধনে।

পূর্ব্ববদ্বা বা প্রসাধ্যেতে পদে রূপ বিশোধনে।"[B. Bi (A.S.S.) পৃঃ ১০৪-৫]

অর্থাৎ এক ঋণক্ষেপস্থলে গুণক যদি বর্গরাশিদ্বয়ের যোগ না হয় তাহা হইলে ঐ প্রশ্ন অসম্ভব মনে করিবে। অতঃপর ঐ বর্গদ্বয়ের (গুণকের) মূলের দ্বারা এককে ভাগ দিবে, তাহা হইলে দুটি কনিষ্ঠ মূল পাওয়া যাইবে। ঐ কনিষ্ঠদ্বয়ের দ্বারা পূর্ব নিয়মে জেষ্ঠ সাধন কর।

এ ধরণের সূত্রেই বা আলোচনার সুষ্ঠ সমাপ্তির জন্য দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন

ত্রয়োদশগুণো বর্গো নিরেকঃ কঃ কৃতির্ভবেত্।

কো বাঽষ্টগুণিতো বর্গো নিরেকো মূলদো বদ। [B. Bi (A.S.S.) পৃঃ ১০৫]

এটি সমাধান যেভাবে করেছেন তাতে অনেকগুলি ধাপ পেরোতে হয়েছে এবং যে বীজগুলি পেয়েছেন সেগুলি হচ্ছে

(১) $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ এবং $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$; (২) $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$; (৩) $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$; (৪) $(5, 18)$

এগুলি তিনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধান করেছেন এবং শেষে বলেছেন যে অসংখ্য বীজ পাওয়া যেতে পারে।

১৫.৭ বর্গকুট্টক এবং সংশ্লিষ্ট সমীকরণ

দ্বিমাত্রিক সমীকরণে বহু ধরণের উদাহরণ এবং নানা সূত্রের উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। এদের মধ্যে (i) $bx+c=y^2$ এবং (ii) $ay^2=bx\pm c$ ধরণের সমীকরণগুলিই বেশী দেখা যায়।

(i) $bx+c=y^2$ সমীকরণটি দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের ভাষায় বর্গকুট্টক বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মগুপ্ত অবশ্য $bx+c=y^2$ ধরণের কতকগুলি সমীকরণ জ্যোতির্বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে বলেছেন ঃ

স্থর্যবিলিপ্তাশেষং পঞ্চভিরূনাহতং তথা দশভিঃ।

বর্গ বৃহস্পতিদিনে কুর্বন্তা বত্সরাদ্ গণকঃ॥ (১৮ অধ্যায়, ৭৬-তম শ্লোক)

অর্থাৎ স্থর্যের বিলিপ্তার সঙ্গে পাঁচ বিয়োগ দিয়ে ঐ বিয়োগফলকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে বর্গরাশি হবে। অথবা স্থর্যের বিলিপ্তার সঙ্গে দশ বিয়োগ দিয়ে ঐ বিয়োগফলকে দশ দিয়ে গুণ করলে একটি বর্গরাশি হবে।

ধরা যাক স্থর্যের বিলিপ্তা $=x$ তাহলে প্রশ্নানুসারে $5(x-5)=$ কোন রাশির বর্গ ; ধরা যাক y^2 $\therefore$ $5x-25=y^2$ সমীকরণটি পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নে $10(x-100)=y^2$

বা $10x-100=y^2$ হবে।

এই বর্গ কুট্টক সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন—

'বর্গাদেয়ো হরস্তেন গুণিতং যদি জায়তে।

অব্যক্তং তত্র তন্মানমভিন্নং স্যাত্তথা তথা

কল্পোঽন্যবর্ণবর্গাদিস্তুল্যঃ শেষং যথোক্তবত্।'[১] [B. Bi (A.S.S.), পৃঃ ১৮৮)

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য অন্যত্র বলেছেন

হরভক্তা যস্য কৃতি শুধ্যতে সোঽপি দ্বিরূপপদগুণিতঃ

তেনাঽঽহতোঽন্যবর্ণো রূপপদেনান্বিতঃ কল্প্য॥

ন যদি পদং রূপণাং ক্ষিপেদ্ধরং তেষুহারতষ্টেষু।

তাবত্তাবদ্বর্গো ভবতি ন চেদেবমপি খিলং তর্হি।

আলাপিত এব হরো রূপাণি তু শোধনাদি সিদ্ধানি। [ঐ, পৃঃ ১৮৯]

এই শ্লোক থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য $bx+c=y^2$ সমীকরণটি সমাধান করতে গিয়ে দুটি ক্ষেত্রের অবতারণা করেছেন।

প্রথমতঃ যদি c একটি বর্গ রাশি হয় অর্থাৎ সমীকরণটি $bx+\lambda^2=y^2$ হলে $y=bv+\lambda$ এবং $x=bv^2+2\lambda v$ বীজদ্বয় পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অবশ্য c অবর্গ রাশি হলে সেই সমীকরণটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

$ax+c=y^2$ ধরণের সমীকরণ সম্পর্কে একটা উদাহরণও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বীজগণিতে পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে

কো বর্গশ্চতুরূনঃ সন্ সপ্তভক্তো বিশুধ্যতি।

ত্রিংশদূনোঽথবা কস্তং যদি বেত্‌সি বদ দ্রুতম ॥ [B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ১৮৯]

অর্থাৎ এটিকে আধুনিক গণিতের ভাষায় লেখা যায় তাহলে দাঁড়ায়

$7x+30=y^2$. এটির সমাধানও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য করেছেন

(*ii*) $bx\pm c=y^2$ সমীকরণটির সমাধান সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য আলোচনা করেছেন এ সম্পর্কে উদাহরণ তিনি বলেছেন।

"যদ্বর্গঃ পঞ্চভিঃ ক্ষুণ্ণস্ত্রিধুক্তঃ ষোড়শোদ্ধৃতঃ

শুদ্ধিমেতি তমাচক্ষ দক্ষোঽসি গণিতে যদি ॥" [B. Bi (A.S.S.) পৃঃ ১৯৩]

আধুনিক গণিতের ভাষায় এটি রূপ দিলে দাঁড়ায় $5y^2+3=16x$.

এটির সমাধানও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য করেছেন।

১৫.৮ একটি ভ্রান্ত মত খণ্ডন

গণিতজ্ঞ মাত্রেই জানেন, $Nx^2+1=y^2$ এই সমীকরণটিকে পেলীয় সমীকরণ বলা হয়। যতদূর জানা যায় তা থেকে অনুমিত হয় যে ব্রহ্মগুপ্তই প্রথম ভারতীয় যিনি এই সমীকরণটির অখণ্ড সমাধান নির্ণয় করতে গিয়ে অংশিক সাফল্য লাভ করেছিলেন। আগেই আমরা ব্রহ্মগুপ্তের উপসিদ্ধান্তে দেখেছি যদি K এবং K′ পাওয়া যায় যার ফলে

$$Na^2+K=b^2 \cdots\cdots (i)$$

$$Na'^2+K'=b'^2 \cdots\cdots (ii)$$

এবং তাহলে $N(ab'\pm a'b)^2+KK'=(bb'\pm Naa')^2 \cdots\cdots (iii)$

অর্থাৎ $N\left(\dfrac{ab'\pm a'b}{\sqrt{KK'}}\right)^2+1=\left(\dfrac{bb'\pm Naa'}{\sqrt{KK'}}\right)^2 \cdots\cdots (iv)$

যদিও KK′ পূর্ণবর্গ হয় তাহলে $Nx^2+1=y^2$ সমীকরণটির

$\dfrac{ab'\pm a'b}{\sqrt{KK'}}$ এবং $\pm\left(\dfrac{bb'+Naa'}{\sqrt{KK'}}\right)$ দুটি বীজ পাব।

যদি KK′ = পূর্ণবর্গ না হয় তাহলে (*ii*) কে (*i*) দ্বারা অপসারিত করা হয় এবং এক্ষেত্রে বীজদ্বয় হচ্ছে

$\dfrac{ab\pm ab}{K}$ এবং $\pm\dfrac{b^2\pm Na^2}{K}$; নিচের চিহ্ন ধরলে

$(0,\pm 1)$ বীজদ্বয় পাব এবং এটিকে বাদ দিয়ে উপরের চিহ্ন ধরবো এবং এর ফলে (*iii*) এবং (*iv*) থেকে পাওয়া যায়

$$N(2ab)^2+K^2=(Na^2+b^2)^2$$

এবং $N\left(\frac{2ab}{K}\right)^2+1 = \left(\frac{Na^2+b^2}{K}\right)^2$

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মগুপ্ত $Nx^2+1=y^2$ এর একটি মূলদ সমাধান (Rational solution) নির্ণয় করেছিলেন।[১]

আগেই দেখেছি K'র যে কোন মানের জন্য $Nx^2+1=y^2$ এর অখণ্ড সমাধান দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বের করেছিলেন। তাঁর উপসিদ্ধান্তটিতে এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তু বলে গণ্য করা যায়। তিনি বলেছেন $Na^2+K=b^2$ যদি হয় তাহলে—

$$N\left(\frac{a\alpha+b}{K}\right)^2+\frac{\alpha^2-N}{K}=\left(\frac{Na+b\alpha}{K}\right)^2$$

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন α'র এমন একটি অখণ্ড মান পাওয়া যাবে যার ফলে $\frac{a\alpha+b}{K}$ একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং $\frac{\alpha^2-N}{K}$ লঘিষ্ঠ হবে। এধরণের মান প্রথম আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্ত বের করেছিলেন অতএব দেখা যাচ্ছে যে পেলীয় সমীকরণের অখণ্ড বীজ বের করতে অন্ততঃপক্ষে তিনজন ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট (৪৯৯ খ্রীঃ), ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খ্রীঃ) ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য (১১৫০ খ্রীঃ) ব্যাপক চিন্তা করেছিলেন।

প্রবোধ সেনগুপ্ত মহাশয়[২] পল ট্যানারী, টি এল হীথ, জি আর ক্যে প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে মত না দিয়েও এক জায়গায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন "হয়তো ভাস্করাচার্যের উপসিদ্ধান্তটি কোন বিশেষ জাতির তত্ত্বের প্রভাবে প্রভাবিত।" ট্যানারী প্রমুখেরা সরাসরি বলেছেন যে এ ব্যাপারে ভারতীয়রা গ্রীকদের কাছে ঋণী। তবে কঠোর অথচ বিভ্রান্তিমূলক সমালোচনায় ক্যে সকলকে টেক্কা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "ব্রহ্মগুপ্ত পেলীয় সমীকরণটির সমাধান নিজে করেন নি" এবং সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিও করেন নি। তাছাড়াও এই সমীকরণ সম্পর্কে যে সব উদাহরণ ব্রহ্মগুপ্ত দিয়েছেন তা অধিকাংশই জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক এবং ব্রহ্মগুপ্তের জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রীক প্রভাবে প্রভাবিত। ক্যে এ কথা বলেই ক্ষান্ত হননি তিনি

---

১. Bibhuti Bhusan Datta—The Hndu solution of the general Pellian equation—Bull. cal. math. soc Vol XIX (1928) Page 87

২. Sengupta, P. C.—The origin of the Indian cyclic method for the Solution of $Nx^2+1=y^2$. Bull. Cal. Math. Soc Vol X (1918-1919) pp 73—80

আরও বলেছেন ডায়োফেণ্টের যে সব কাজ আমরা পড়েছি তাতে $ax^2+1=y^2$ ধরণের সমীকরণ না থাকলেও $ax^2-b=y^2$ ধরণের সমীকরণ তাঁর গ্রন্থে আছে। অতএব এ থেকে সিদ্ধান্ত লওয়া যেতে পারে যে পেলীয় সমীকরণে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা গ্রীকদের কাছে ঋণী।

ক্যে এক জায়গায় যে মন্তব্য করেছেন যে অনির্ণেয় (প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার) সমীকরণের অন্তর্ভুক্তি ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে অযৌক্তিক। তাঁর এমতকে খণ্ডন করেন সারদাকান্ত গাঙ্গুলী।[১] তিনি বলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যে সব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেগুলি অনির্ণেয় এক ও দুই মাত্রার সমীকরণ। এগুলি জ্যোতির্বিদদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু গ্রীকরা কি জ্যোতির্বিজ্ঞানে এ ধরণের সমীকরণ অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তাছাড়াও এটা প্রমাণ সাপেক্ষ যে ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত গ্রীকদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাছে ঋণী।

ক্যে বলেছেন যে ব্রহ্মগুপ্ত রোমেক, পৌলিশ ও যবন এই তিনটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন যদিও সিদ্ধান্তগুলি অনেক এবং এগুলি বিষয়বস্তুতে মূলত এক। সারদাবাবু অত্যন্ত জোরাল যুক্তির সাহায্যে ক্যে'র এ মত খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন ক্যে শ্লোকগুলি সঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। ক্যে সম্ভবত নিম্নোক্ত শ্লোকটি দেখে এ ধরণের অসংগত মত প্রকাশ করেছেন।

"অপমেবকৃতঃ সূর্যেদু পুলিশ রোমক বশিষ্ঠ যবনাদ্যঃ
যস্মাত্তস্মাদেকঃ সিদ্ধান্তো গ্রন্থরচনাদ্যাঃ। [ব্রাঃ স্ফু ২৪/৩]

এই শ্লোকটি উপরে এবং নীচের একটি করে শ্লোক নিয়ে পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে ব্রহ্মগুপ্ত কোথাও নিজের মৌলিকত্বকে অস্বীকার করেন নাই। তাছাড়াও তিনি উক্ত সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চাশতম শ্লোকে ছাইয়ের স্তূপ বলে বর্ণনা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে লাট প্রমুখের সিদ্ধান্তগুলিকে কঠোর সমালোচনা করেছেন। অপরপক্ষে নিজের গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন অতএব ক্যের যুক্তি এক্ষেত্রে ঠিকল না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে ব্রহ্মগুপ্তের জ্যোতিষগ্রন্থ গ্রীক প্রভাবে দুষ্ট তাহলেও কি করে বলা যেতে পারে পেলীয় সমীকরণে গ্রীক প্রভাবে প্রভাবিত। পেলীয় সমীকরণে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উদাহরণগুলি থাকায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষে এক এবং দুই মাত্রায় সমীকরণের সমাধান স্বাধীন ভাবে করা হয়েছিল।

১. Ganguli, Sarada Kanta—The Source of the Indian solution of the so called Pellian equations—Bull Call Math. Soc. Vol. XIX (1928) Page 151—

ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের এক জায়গায় বলা হয়েছে "কর্বন্নাবতসরাদ গণকঃ" "অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে উক্ত দুটি (সমীকরণ বা উদাহরণ) সমাধান করতে পারবেন তিনি গণিতজ্ঞ বলে পরিচিত হবেন।" এ ধরণের মন্তব্য তাঁরই করা সাজে যাঁর উক্ত উদাহরণগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আছে। অতএব ক্যোর যুক্তি এক্ষেত্রেও খাটল না।

ধরা যাক পেলীয় সমীকরণ সমাধান ব্রহ্মগুপ্ত সম্পূর্ণরূপে করেন নি। ক্যো একজায়গায় বলেছেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রূপে পরীক্ষা করে বলা যায় যে ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র এবং উদাহরণগুলি তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার নয় এবং তিনি যে সব নিয়ম দিয়েছেন তা সম্পূর্ণরূপে তিনি বুঝতেন না। তাছাড়াও কিছু কিছু সূত্রাদির অসংগত সমাধান করে বাকীটা পরে সমাধান করবেন বলেছেন কিন্তু বাকী অংশটুকু যেখানে সমাধান করেছেন সেখানে পূর্ববর্তী সূত্র অনুসরণ করেন নি। এছাড়াও একজায় গায় একটি নিয়মসহ উদাহরণ দিয়েছেন কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণে শুধু মাত্র চিহ্ন পরিবর্তন করেছেন কোন সূত্র দেন নি।

সারদাকান্ত গাঙ্গুলী ক্যো'র এ ধরণের মন্তব্যকে কঠোর ভাষায় খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন "ক্যো বলেছেন কতকগুলি নিয়মের অসংগত উদাহরণ আছে"। কিন্তু ক্যো একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছেন এবং এ দৃষ্টান্ত তাঁর মতকে সমর্থন করে না।

ক্যো'র তথাকথিত অসংগত উদাহরণগুলি হচ্ছে

(*i*) $13x^2+300=y^2$, (*ii*) $13x^2-27=y^2$

এগুলি সমাধান করতে গেলে $Nx^2+1=y^2$ এবং $Nx^2-4=y^2$

এদুটি সমীকরণের সাহায্যে নিতে হবে। যিনি ব্রহ্মগুপ্তের নিয়ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন তিনি ভুল মন্তব্যই করবেন এবং ক্যো সেইহেতু ভ্রান্ত মত পোষণ করেছিলেন।

(10,40) প্রথম সমীকরণটির বীজদ্বয় এবং (6,21) দ্বিতীয় সমীকরণটির বীজদ্বয়।[১] ব্রহ্মগুপ্ত শুধুমাত্র একটি সমাধান বের করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি অসংখ্য সমাধানের কথা উল্লেখ করেছেন অবশ্য $Nx^2+1=y^2$ সমীকরণটির সাহায্য প্রয়োজন সেকথাও বলেছেন। উক্ত সমীকরণদ্বয়ের বীজাদি বের করতে গেলে $13x^2+1=y^2$ সমীকরণটির বীজগুলি ব্যবহার করতে হবে। এই বীজগুলি উক্ত দুটি

১. H. T. Collebrooke—Algebra with Arithmetic and Mensuration from the Sanskrit of Brahma gupta and Bhaskara.

সমীকরণের ঠিক পূর্বেই বলা হয়েছে। $13x^2-4=y^2$ সমীকরণটির বীজদ্বয় (1,3) এমনিতেই পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে ক্যে'র যুক্তি টিকছে না।

এ কথা সত্য যে সমাধানটি অসম্পূর্ণ আছে তবে যে ভাবে এখানে ব্রহ্মগুপ্ত বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তাতে উক্ত উদাহরণগুলি এবং পূর্ববর্তী সূত্রাদির মধ্যে এক সামঞ্জস্য বিধান করছে।

ক্যে'র পরবর্তী মন্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে সারদাকান্ত গাঙ্গুলি

(i) $3x^2+900=y^2$ এবং (ii) $3x^2-800=y^2$ সমীকরণ দুটি উল্লেখ করেছেন এবং সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত যে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন এবং একটির সূত্র দিয়েছেন অপরটির সূত্র দেননি বলে ক্যে যে মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন সেই তথাকথিত বিতর্কমূলক উদাহরণ দুটি হচ্ছে— (i) $4x^2+65=y^2$ এবং (ii) $4x^2-60=y^2$

মনে হয় এইচ টি কোলেব্রুকের ইংরাজী অনুবাদ দেখে ক্যে এই মন্তব্য করে থাকবেন। কোলেব্রুক ক্ষেপ এর যা অর্থ করেছেন সেটি সঠিক নয়। ক্ষেপ, প্রক্ষেপ এর অর্থ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দুই হতে পারে। অতএব প্রথম সমীকরণটির সমাধানের মান প্রথম উদাহরণের সূত্রের সাহায্যে স্বভাবিক ভাবে এসে পড়ে এবং অনাবশ্যক একই সূত্র উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা না থাকায় ব্রহ্মগুপ্ত এক্ষেনে দেন নি। সুতরাং এক্ষেত্রে কে'র মন্তব্য সম্পূর্ণ অচল।

ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর নিজের একটি কাজ সহ একটি সূত্রের ত্রুটি দেখিয়েছেন। ক্যে এইটি নিয়ে তার মতের স্বপক্ষে বড় রকমের যুক্তি হিসাবে খাড়া করেছেন। ভাবিত বীজের আলোচনায় ব্রহ্মগুপ্ত $mxy=ax+by+c$ এই সমীকরণটির সমাধানের সূত্র দিয়েছেন। অনেকে বিশেষ করে ক্যে বলেন এটি ব্রহ্মগুপ্তের নিজস্ব সূত্র নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এ মত টেকেনি।

ব্রহ্মগুপ্তের পদ্ধতি (দ্বিতীয় পদ্ধতি) :

$x=k$ ধরলে $mxy=ax+by+c$ সমীকরণটি হবে $kmy=ak+by+c$ এ থেকে y এর মান বের করা যায়। এই পদ্ধতি যে কোন সংখ্যক অজ্ঞাত রাশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একথা ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন।

অন্য পদ্ধতি :

$mxy=ax+by+c$ সমীকরণটির c কে m এবং a'কে b দিয়ে গুণ করে যোগ কর। যোগ ফলকে যে কোন ইষ্ট রাশি p দিয়ে ভাগ কর এবং এই ভাগফলকে q ধর। এখন (p, q) এবং (a, b) জোড়দ্বয়ের মধ্যে একটি জোড়ের বৃহৎ

ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের এক জায়গায় বলা হয়েছে "কর্বন্নাবতসরাদ গণকঃ" "অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে উক্ত দুটি (সমীকরণ বা উদাহরণ) সমাধান করতে পারবেন তিনি গণিতজ্ঞ বলে পরিচিত হবেন।" এ ধরণের মন্তব্য তাঁরই করা সাজে যাঁর উক্ত উদাহরণগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আছে। অতএব কোের যুক্তি এক্ষেত্রেও খাটল না।

ধরা যাক পেলীয় সমীকরণ সমাধান ব্রহ্মগুপ্ত সম্পূর্ণরূপে করেন নি। কো একজায়গায় বলেছেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রূপে পরীক্ষা করে বলা যায় যে ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র এবং উদাহরণগুলি তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার নয় এবং তিনি যে সব নিয়ম দিয়েছেন তা সম্পূর্ণরূপে তিনি বুঝতেন না। তাছাড়াও কিছু কিছু সূত্রাদির অসংগত সমাধান করে বাকীটা পরে সমাধান করবেন বলেছেন কিন্তু বাকী অংশটুকু যেখানে সমাধান করেছেন সেখানে পূর্ববর্তী সূত্র অনুসরণ করেন নি। এছাড়াও একজায়গায় একটি নিয়মসহ উদাহরণ দিয়েছেন কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণে শুধু মাত্র চিহ্ন পরিবর্তন করেছেন কোন সূত্র দেন নি।

সারদাকান্ত গাঙ্গুলী কো'র এ ধরণের মন্তব্যকে কঠোর ভাষায় খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন "কো বলেছেন কতকগুলি নিয়মের অসংগত উদাহরণ আছে"। কিন্তু কো একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছেন এবং এ দৃষ্টান্ত তাঁর মতকে সমর্থন করে না।

কো'র তথাকথিত অসংগত উদাহরণগুলি হচ্ছে

(*i*) $13x^2+300=y^2$, (*ii*) $13x^2-27=y^2$

এগুলি সমাধান করতে গেলে $Nx^2+1=y^2$ এবং $Nx^2-4=y^2$

এদুটি সমীকরণের সাহায্যে নিতে হবে। যিনি ব্রহ্মগুপ্তের নিয়ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন তিনি ভুল মন্তব্যই করবেন এবং কো সেইহেতু ভ্রান্ত মত পোষণ করেছিলেন।

(10,40) প্রথম সমীকরণটির বীজদ্বয় এবং (6,21) দ্বিতীয় সমীকরণটির বীজদ্বয়।[১] ব্রহ্মগুপ্ত শুধুমাত্র একটি সমাধান বের করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি অসংখ্য সমাধানের কথা উল্লেখ করেছেন অবশ্য $Nx^2+1=y^2$ সমীকরণটির সাহায্য প্রয়োজন সেকথাও বলেছেন। উক্ত সমীকরণদ্বয়ের বীজাদি বের করতে গেলে $13x^2+1=y^2$ সমীকরণটির বীজগুলি ব্যবহার করতে হবে। এই বীজগুলি উক্ত দুটি

১. H. T. Collebrooke—Algebra with Arithmetic and Mensuration from the Sanskrit of Brahma gupta and Bhaskara.

সমীকরণের ঠিক পূর্বেই বলা হয়েছে। $13x^2-4=y^2$ সমীকরণটির বীজদ্বয় (1,3) এমনিতেই পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে ক্যো'র যুক্তি টিকছে না।

এ কথা সত্য যে সমাধানটি অসম্পূর্ণ আছে তবে যে ভাবে এখানে ব্রহ্মগুপ্ত বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তাতে উক্ত উদাহরণগুলি এবং পূর্ববর্তী সূত্রাদির মধ্যে এক সামঞ্জস্য বিধান করছে।

ক্যো'র পরবর্তী মন্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে সারদাকান্ত গাঙ্গুলি

(i) $3x^2+900=y^2$ এবং (ii) $3x^2-800=y^2$ সমীকরণ দুটি উল্লেখ করেছেন এবং সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত যে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন এবং একটির সূত্র দিয়েছেন অপরটির সূত্র দেননি বলে ক্যো যে মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন সেই তথাকথিত বিতর্কমূলক উদাহরণ দুটি হচ্ছে— (i) $4x^2+65=y^2$ এবং (ii) $4x^2-60=y^2$

মনে হয় এইচ টি কোলেব্রুকের ইংরাজী অনুবাদ দেখে ক্যো এই মন্তব্য করে থাকবেন। কোলেব্রুক ক্ষেপ এর যা অর্থ করেছেন সেটি সঠিক নয়। ক্ষেপ, প্রক্ষেপ এর অর্থ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দুই হতে পারে। অতএব প্রথম সমীকরণটির সমাধানের মান প্রথম উদাহরণের সূত্রের সাহায্যে স্বভাবিক ভাবে এসে পড়ে এবং অনাবশ্যক একই সূত্র উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা না থাকায় ব্রহ্মগুপ্ত এক্ষেনে দেন নি। সুতরাং এক্ষেত্রে কে'র মন্তব্য সম্পূর্ণ অচল।

ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর নিজের একটি কাজ সহ একটি সূত্রের ত্রুটি দেখিয়েছেন। ক্যো এইটি নিয়ে তার মতের স্বপক্ষে বড় রকমের যুক্তি হিসাবে খাড়া করেছেন। ভাবিত বীজের আলোচনায় ব্রহ্মগুপ্ত $mxy=ax+by+c$ এই সমীকরণটির সমাধানের সূত্র দিয়েছেন। অনেকে বিশেষ করে ক্যো বলেন এটি ব্রহ্মগুপ্তের নিজস্ব সূত্র নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এ মত টেকেনি।

ব্রহ্মগুপ্তের পদ্ধতি (দ্বিতীয় পদ্ধতি) :

$x=k$ ধরলে $mxy=ax+by+c$ সমীকরণটি হবে $kmy=ak+by+c$ এ থেকে y এর মান বের করা যায়। এই পদ্ধতি যে কোন সংখ্যক অজ্ঞাত রাশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একথা ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন।

অন্য পদ্ধতি :

$mxy=ax+by+c$ সমীকরণটির c কে m এবং a'কে b দিয়ে গুণ করে যোগ কর। যোগ ফলকে যে কোন ইষ্ট রাশি p দিয়ে ভাগ কর এবং এই ভাগফলকে q ধর। এখন (p, q) এবং (a, b) জোড়দ্বয়ের মধ্যে একটি জোড়ের বৃহৎ

রাশির সঙ্গে অপর জোড়ের ক্ষুদ্র রাশি যোগ কর। অর্থাৎ ধরা যাক এর ফলে আমরা $a+p$ এবং $b+q$ পাব। সুতরাং

$$x=\frac{b+q}{m},\ y=\left(\frac{a+p}{m}\right)$$

এখন $m^2xy-amx-bmy+ab=cm+ab.$

বা, $(mx-my)=cm+ab=pq$ (ধরা যাক)

তাহলে $x=b+p/m$ এবং $y=(a+q)/m$

বা $x=\dfrac{b+q}{m}$ এবং $y=\dfrac{a+p}{m}$

যাই হ'ক আরও নানা আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করা গিয়েছে যে ক্যো'র যুক্তি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং সেইহেতু গ্রাহ্য নয়।

এবার দেখা যাক পেলীয় সমীকরণের জন্য ব্রহ্মগুপ্ত গ্রীক বীজগণিতবিদ্ ডায়োফেণ্টের কাছে আদৌ ঋণী কিনা।

এ কথা সত্য যে ডায়োফেণ্ট $ax^2+1=b^2$ এর সাধারণ সমীকরণ (General equation) তাঁর গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তবে এই ধরণের সমীকরণের একটি বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

k^2 এমন একটি পূর্ণ বর্গ রাশি যেটি a এর নিকটস্থ এবং $y=kx+c$ ধরে $ax^2+c^2=y^2$ সমীকরণটির সমাধান করেছেন। তিনি যে সব উদাহরণ দিয়েছেন তার মধ্যে

(i) $72m^2+81=(8m+9)^2$ IV.31

(ii) $26x^2+1=(5x+1)^2$ V.9.

(iii) $65m^2+25=(8m+5)^2$ VI. 5.

ডায়োফেণ্ট এগুলি যে ভাবে সমাধান করেছেন তা ব্রহ্মগুপ্তের পদ্ধতি থেকে পৃথক। তাছাড়া ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর উপসিদ্ধান্তের পুনঃ পুনঃ প্রযোগ কার অসংখ্য সমাধানের কথা বলেছেন। অর্থাৎ প্রতিটি ধরণের সমাধান বের করতে ব্রহ্মগুপ্ত সচেষ্ট ছিলেন যদিও তিনি সম্পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। ক্যো একজায়গায় মন্তব্য করেছেন যে $ax^2-b=y^2$ ধরনের সমীকরণের সমাধান ডয়োফেণ্ট জানতেন। ক্যো এর এ মন্তব্য ভ্রান্ত কারণ ডায়োফেণ্ট এক জায়গায় বলেছেন :

$15m^2-36=$একবর্গ রাশি। এই সমীকরণটির সমাধান তিনি (ডায়োফেণ্ট) করতে পারেন নি। যাই হ'ক $26x^2+2=y^2$ সমীকরণটি নিয়ে ডায়োফেণ্ট ও ব্রহ্মগুপ্তের পদ্ধতির তুলনা মূলক বিচার করা যাক।

ডায়োফেণ্টের পদ্ধতি : $y=1+kx$ ধরা যাক, তাহলে আমরা পাই

$$26x^2+1=(1+kx)^2 \quad \text{অতএব} \quad x=\frac{2k}{26-k^2}.$$

ব্রহ্মগুপ্তের পদ্ধতি : যেহেতু $26.1^2-1=5^2$ এবং $1=(-1)(-1)$

$26x^2=y^2$ সমীকরণটির বীজগুলি ব্রহ্মগুপ্তের উপসিদ্ধান্তের সাহায্যে বলা যায় 2.1.5 এবং 26.1^2+5^2 বা 10 এবং 51.

উপসিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরের দুটি বীজ হবে

2.10.31 এবং 26.10^2+51^2 বা 1020 এবং 5021.

উপসিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৃতীয় বীজদুটি হবে

$10.5201+51.1020$ এবং $26.10.1020+51.5201$.

বা 104030 এবং 53045. এবং এই নিয়মে অনেকগুলি বীজ পাওয়া যায়।

ডায়োফেণ্টের পদ্ধতিতে $k=5$ ধরলে এক জোড়া বীজ পাওয়া যায় এবং k'র অন্য কত মান হলে একটি অখণ্ড বীজ পাওয়া যাবে তা বলা রীতিমত কঠিন ব্যাপার। অতএব আমরা স্পষ্টই দেখছি যে পেলীয় সমীকরণ সমাধানে ব্রহ্মগুপ্ত ও ডায়োফেণ্টের পদ্ধতি রীতিমত পার্থক্য বিদ্যমান।

$Nx^2+1=y^2$ সমীকরণটির সমাধান হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থে আছে বলে পল ট্যানারী, টি. এল হীথ প্রমুখেরা মনে করেন। কিন্তু বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে পণ্ডিত এ মতের সমর্থক নয় কারণ

(ক) ডায়োফেণ্ট নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি সমাধান করেছেন :

(i) $72m^2+81=$ কোন রাশির বর্গ

(ii) $26x^2+1=$ কোন রাশির বর্গ

(iii) $65m^2+25=$ কোন রাশির বর্গ

এগুলি সমাধান করতে গিয়ে পূর্বোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন এবং এর ফলে অনেকগুলি অখণ্ড বীজ পাওয়া যাচ্ছেনা।

$m^2+1=y^2$ বা $8m^2+1=y^2$ এবং $65m^2+1=y^2$

থেকে (i) এবং (iii) এর সমাধান পাওয়া যায়।

$Nx^2+1=y^2$ এর বিশেষ ধরণের সমাধান যদি Book V না থেকে থাকে Book IV এ-থাকতো কিন্তু কোনমতেই হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থে থাকতে পারে না।

(খ) $Nx^2+1=y^2$ সমীকরণটির অখণ্ড সমাধান যদি ডায়োফেণ্ট বের করতেন তাহলে নিশ্চয়ই উক্ত তিনটি সমীকরণের সমাধান প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেন।

এছাড়াও আরও নানা যুক্তি তর্ক এ ব্যাপ্যারে দেখানো হয়েছে।

কো অন্যত্র এমন একটি মন্তব্য করেছেন তা দেখে স্পষ্টই মান হয় তিনি ভারতীয়দের ছোট করে দেখানোর জন্য যত সব ভ্রান্তিমূলক মতবাদ প্রচার করেছেন।

ধরা যাক পেলীয় সমীকরণ সমাধানে ভারতীয়রা আর্কিমিডিসের কাছে ঋণী। পীথাগোরাস $2x^2-y^2=1$ সমীকরণটি সাধারণ পদ্ধতিতে সমাধান করে $\sqrt{2}$ এর পর পর মান বের করেছেন। আর্কিমিডিস $\sqrt{3}$ এর আসন্ন মান $\frac{265}{153}$ এবং $\frac{1351}{780}$ দিয়েছেন এ থেকে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে আর্কিমিডিস $x^2-2y^2=1$ এবং $x^2-3y^2=-2$ এর সমাধান করতে পারতেন। আর্কিমিডিসের বিখ্যাত Cattle problem থেকে বলা যায় $x^2-472949y^2=1$ এর ধনাত্মক অখণ্ডরাশির সমাধান তিনি জানতেন। এ সম্পর্কে হীথ বলেছেন—

"There is this difference between this solution and the simpler ones above that, while the first solution of the latter can be found by trial, the simplest solution of the eqation cannot, so that some general method, e-g, that of continued frations is necessary to find even the least solution in integers. Whether Archimedis was actually able to solve this particular equation. is a question on which there is difference of opinion. Tannery thought it is not impossible but as the smallest valus of x and y satisfying the eqution have 46 and 41 digits respectively, we may with gunther; feel double on the subject. There is however, nothing impossessible in the supposition that Aachimedes was in possesson of a number involved were not too great for manipulation in the Greek mumeration.

এ সম্পর্কে সারদাকান্ত গাঙ্গুলি বলেছেন, "If Archimedes was really in possesson as of a method of solving the pellian equations in integers, it is certain that neither Diophantus nor Brahmagupta was aware of it. As Bhaskara's method has been deduced from Brahmagupta's Lemma, the former ultimate source can not be Archimedes"

আবার Cattle problem থেকে $x^2-ay^2=1$ ধরণের সমীকরণ পাওয়া যায়

এবং এ থেকে কোন মতেই বলা যায় না আর্কিমিডিস এটির অখণ্ড সমাধান বের করতে পারতেন। হীথ তাঁর "ডায়োফেণ্ট" নামক গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন

"পেলীয় পদ্ধতি ভারতীয় বা গ্রীক প্রভাবে প্রভারিত তা বিতর্কের বিষয়। তবে কোন ক্রমেই চরম সিদ্ধান্তে আসা বাঞ্ছনীয় নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আরও সঠিক নিদর্শন পাওয়া না যায়। তিনি অন্যত্র বলেছেন $ax-by=c$ সমীকরণটির সমাধানকল্পে আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ইউক্লিডের কাছে ঋণী।" মনে হয় তার এ মন্তব্য ক্যো'র মতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এন. কে মজুমদার, সারদাকান্ত গাঙ্গুলী প্রমুখেরা বেশ জোরাল যুক্তির সাহায্যে বলেছেন যে ভারতীয়রা $ax-by=c$ সমীকরণটির সমাধানের জন্য গ্রীক প্রভাবে প্রভাবিত নয়। যাই হ'ক সমস্ত কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা যায় যে

(১) পেলীয় সমীকরণের অখণ্ড সমাধান ডায়োফেণ্টের হারানো এরিথমেটিকাতে আছে কিনা তা রীতিমত সন্দেহের ব্যাপার।

(২) তথাকথিত পেলীর সমীকরণ সমাধানে আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য গ্রীকদের কাছে ঋণী নয়।

(৩) ব্রহ্মগুপ্ত সম্পর্কে ক্যো প্রমুখদের মন্তব্য অত্যন্ত ত্রুটিযুক্ত সেইহেতু বর্জনীয়।

(৪) এক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ আর্যভটের পদ্ধতি গ্রীক প্রভাব মুক্ত।

(৫) ভারতীয় পেলীয় সমীকরণ সমাধানে বিদেশী প্রভাবমুক্ত।

১৬.১ দুই মাত্রার একটি সমীকরণ

দুই মাত্রার একটি অনির্ণেয় সমীকরণ সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বেশ কিছু আলোচনা করেছেন। তবে সূত্র ও উদাহরণ দুইই একত্রে উল্লেখ করে রীতিমত চাঞ্চল্য জাগিয়েছেন। বলা প্রয়োজন যে তিনি এই সমস্ত সূত্রের প্রথম প্রবর্তক কিনা তা বলা কঠিন। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন

"বর্গাদ্যং চেৎ তুল্যশুদ্ধো কৃতায়াং পক্ষস্যৈকস্যোক্তবদ্বর্গমূলম।
বর্গাপ্রকৃত্যাপরপক্ষমূলং তয়ো সমীকারবিধিঃ পুনশ্চ।
বর্গপ্রকৃত্যা বিষয়ো ন চেত স্যাত তদাঽন্যবর্ণস্য কৃতেঃ সমং তম্।
কৃত্বাপরং পক্ষমথান্যমানং কৃতি প্রকৃত্যাঽদ্যমিতিস্তথাচ।"
বর্গপ্রকৃত্যা বিষয়ো যথা স্যাত্তয়া সুধীভির্বহুধা বিচিন্ত্যম্।[১]

অর্থাৎ "সম শোধন প্রভৃতি দ্বারা যদি বর্গপ্রভৃতি অবশিষ্ট থাকে তবে প্রথম বা দ্বিতীয় পক্ষের মূল পূর্ব নিয়মে সাধন করিবে এবং দ্বিতীয় পক্ষের মূল বর্গ প্রকৃতির নিয়মে আনয়ন করিবে ও প্রথম মূলের সহিত সমীকরণ করিবে। যদি বর্গ প্রকৃতির নিয়ম সঙ্গত না হয় তবে অন্য কোন বর্ণের বর্গের সহিত সমীকরণের দ্বারা অন্য পক্ষের মান সাধন করিবে এবং পুনর্বার বর্গ প্রকৃতির দ্বারা প্রথম বর্ণের মান সাধন করিবে। বর্গ প্রকৃতির বিষয় যাহাতে সঙ্গত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাই চিন্তা করেন।"[২]

যাই হোক এর পর তিনি কয়েকটি বিশেষ ধরনের দ্বিমাত্রার একটি অনির্ণেয় সমীকরণের উদাহরণ এবং সমাধানের কিছু সূত্র ইত্যাদি দেন। তিনি নিম্নলিখিত দুই ঘাতের সমীকরণ দেন।

(ক) $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = y^2$

(খ) $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha' x^2 + \beta' x + \gamma'$

(গ) $\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma = z^2$

(ঘ) $\alpha^2 x^2 + \beta y^2 + \gamma = z^2$

(ঙ) $\alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 = z^2$

১. B. Bi. (A. S. S) পৃঃ ১৭৬

২. যাদবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে উক্ত অনুবাদ তিনি পাঠিয়েছিলেন।

(ক) $\alpha x^2+\beta x+\gamma=y^2$

ভাস্করাচার্য (১১৫০ খ্রীঃ) বলেছেন –

"একস্য পক্ষস্য পদে গৃহীতে দ্বিতীয় পক্ষে রূপযুক্তঃ
অব্যক্তবর্গোঽত্র কৃতিপ্রকৃত্যা সাধ্যে তথা জেষ্ঠ কনিষ্ঠমূলে ॥
জেষ্ঠং তয়ো প্রথম পক্ষপদেন তুল্যং কৃত্বোক্তবত্ প্রথমবর্ণমিতিস্ত সাধ্যা ॥
হ্রস্বং ভবেত প্রকৃতিবর্ণমিতিঃ সুধীভি রেবং কৃতিপ্রকৃতিরত্র নিয়োজনীয়া ॥"

অর্থাৎ এক পক্ষের মূল সাধন করিবার পরে যদি দ্বিতীয়পক্ষে রূপ রাশির সহিত অব্যক্তবর্গ অবশেষ থাকে তবে বর্গ প্রকৃতির দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ মূল সাধন করিবে, জ্যেষ্ঠ মূলকে প্রথম পক্ষের সমান করিয়া প্রথম বর্ণের মান সাধন করিবে। কনিষ্ঠ মূলকে প্রকৃতি বর্ণ মান মনে করিবে। তিনি যে পদ্ধতি বললেন তাকে আধুনিক রূপ দিলে এইরূপ হয়। (যাদবেন্দ্র শাস্ত্রী এটি অনুবাদ করে দিয়েছেন)

$\alpha x^2+\beta x+\gamma=y^2 \cdots\cdots\cdots$(i)

$\left(\alpha x+\dfrac{\beta}{2}\right)^2=\alpha y^2+\frac{1}{4}(\beta^2-4\alpha\gamma)\cdots\cdots$(ii)

যদি $z=\alpha x+\dfrac{\beta}{2}$, $\lambda=\frac{1}{4}(\beta^2-4\alpha\gamma)$ ধরা যায় তাহলে (ii) নং সমীকরণ নিম্নরূপ সমীকরণে পরিবর্তিত হয়।

$\alpha y^2+\lambda=z^2$

যদি $y=l$, $z=m$ অখণ্ড সমাধান হয় তাহ'লে $y=lq\pm mp$, $z=mq\pm\alpha lp$ আর একটি সমাধান পাওয়া যাবে। মনে রাখা প্রয়োজন $\alpha p^2+1=q^2$।

অতএব (i)-এর সমাধান

$x=\dfrac{-\beta}{2\alpha}+\dfrac{1}{\alpha}(mq\pm\alpha lp)$, $y=lq\pm mp$.

এখন ধরা যাক, যখন $z=m$ হয় তখন $x=r$ অর্থাৎ $z=\alpha r+\dfrac{\beta}{2}$ এটি স্থানে বসালে আমরা পাই

$x=\dfrac{1}{2\alpha}(\beta q-\beta)+qr\pm lp\cdots\cdots\cdots$(iii) $y=lq\pm(\alpha pr+\frac{1}{2}\beta p)\ \ldots$ (iv)

এখানে $q^2=\alpha p^2+1$ এবং $\alpha r^2+\beta r+\gamma=l^2$

$\therefore\ \alpha x^2+\beta x+\gamma=y^2$ সমীকরণটির একটি সমাধান পাওয়া গেল। দ্বিতীয় ভাস্করের পদ্ধতি অনুয়ায়ী অসংখ্য সমাধান পাওয়া যাবে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, বিখ্যাত গণিতবিদ লিওনার্দো অয়লার (iii) নং সমীকরণের শুধুমাত্র ধনাত্মক মানটি পুনরাবিষ্কার করেন, তবে তাঁর পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল ও অপ্রত্যক্ষ।

গ্রীক গণিতবিদেরা $\alpha x^2+\beta y+\gamma=y^2$ সমীকরণটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সমাধান করেছেন। আলেজান্দ্রীয়বাসী ডায়োফেন্ট বলেছেন। এই সমীকরণটির মূলদ সমাধান (Rational solution) সম্ভব হ'তে পারে যদি

(i) α ধনাত্মক ও বর্গ সংখ্যা হয়, (ii) (γ) ধনাত্মক বর্গ সংখ্যা হয়, (iii) $\beta^2-\alpha\gamma$ ধনাত্মক বর্গ সংখ্যা হয়।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, গ্রীক পদ্ধতি ভারতীয় পদ্ধতি থেকে পৃথক।[১]

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য (১১৫০ খ্রীঃ) উক্ত সমীকরণের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন তিনি বলেছেন—

কো রাশির্দ্বিগুণো রাশিবর্গৈঃ ষড়ভিঃ সমন্বিতঃ
মূলদো জায়তে বীজগণিতজ্ঞ বদাশু তম্ ॥ [B. Bi (A. S. S.) পৃ: ১৭৭]

অর্থাৎ হে বীজগণিতজ্ঞ সত্বর বল কোন সংখ্যার দ্বিগুণের সঙ্গে ঐ সংখ্যার বর্গের ছয়গুণ যোগ করলে বর্গমূলযোগ্য সংখ্যা পাওয়া যাবে। ধরা যাক সংখ্যাটি x, তাহলে

রাশির্দ্বিগুণো $=2x$

রাশিবর্গৈঃ ষড়ভি $=6x^2$

$\therefore$ রাশিদ্বিগুণো রাশিবর্গৈঃ ষড়ভিঃ সমন্বিত $=2x+6x^2$

এবং সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে $6x^2+2x=y^2$

(খ) $\alpha x^2+\beta x+\gamma=\alpha' y^2+\beta' y+\gamma'$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য (১১৫০ খ্রীঃ) তাঁর বীজগণিতে গ্রন্থে এ ধরনের সমীকরণের উল্লেখ করেছেন এবং উদাহরণ যেটি দিয়েছেন সেটি সমান্তর প্রগতি থাকে। তিনি বলেছেন—

সাব্যক্তরূপো যদি বর্ণবর্গস্তদাঽন্যবর্ণস্য কৃতেঃ সমং তম্।
কৃত্বাপদং তস্য তদন্যপক্ষ্যো বর্গপ্রকৃত্যোক্তদেব মূলে
কনিষ্ঠম্যাদ্যন পদেন তুল্যং জ্যেষ্ঠং দ্বিতীয়েন সমং বিদধ্যাত্।
[B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ১৭৯]

---

১. Bhibuti Bhusan Datta—The Hindu solution of the general pellian equation Bull. cal. math. soc (1928) Vol—19.

অর্থাৎ প্রথম পক্ষের মূল সাধনের পরে দ্বিতীয় পক্ষে যদি রূপের সহিত অব্যক্তবর্গ অবশেষ থাকে তবে অন্যবর্ণের বর্গের সহিত তাহাকে সমান করিয়া বর্গ প্রকৃতি দ্বারা কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ মান আনয়ন করিবে। সেই স্থলে কনিষ্ঠ আদ্যের সহিত তুল্য এবং জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয়ের সহিত তুল্য মনে করিবে।[১] এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন—

"ত্রিকাদিদ্ব্যুত্তরশ্রেঢ়্যাগচ্ছে ক্বাপি চ যত ফলম্।
তদেব ত্রিগুণং কস্মিন্নন্যগচ্ছে ভবেদ্বদ্।" [B. Bi. (A.S.S) পৃঃ ১৮০]

অর্থাৎ কোন প্রগতির পদ সংখ্যা কত, যদি প্রথম পদ ৩, সাধারণ অন্তর ২ হয় তাহলে ঐ প্রগতি যোগফলের ৩ গুণ। অন্য একটি প্রগতির যার প্রথম পদ ৩ এবং সাধারণ অন্তর ২ তার কোন নির্দিষ্ট পদসংখ্যার যোগফলের সমষ্টির সমান।

অর্থাৎ যদি প্রথমক্ষেত্রে পদসংখ্যা x ধরা হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পদসংখ্যা y ধরা হয় তাহ'লে

প্রথম ক্ষেত্রে $\quad \frac{x}{2}\{2.3+(x-1)2\}=x^2+2x$

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে $\quad \frac{y}{2}\{2.3+(y-1)2\}=y^2+2y$

সর্তানুসারে $\quad 3(x^2+2x)=y^2+2y$

বা, $\quad 3x^2+6x=y^2+2y$

এটির সমাধান সম্পর্কে ডঃ বি. বি. দত্ত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

(গ) $\alpha x^2+\beta y^2+\gamma=z^2$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য $\alpha x^2+\beta y^2+\gamma=z^2$......(i) সমীকরণটি সমাধান করতে গিয়ে কয়েকটি পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছেন যার ফলে (i) নং সমীকরণটি $Nx^2+c=y^2$ ধরনের সমীকরণে রূপান্তরিত হয়েছিল, তাঁর পদ্ধতিগুলি হচ্ছে

($গ_১$) ধরা যাক $x=my$ তাহলে এই মান (i) নং সমীকরণে বসালে আমরা পাব

$z^2=(\alpha m^2+\beta)y^2+\gamma=Ny^2+\gamma$

এখানে $N=(\alpha m^2+\beta)$। এর পর বর্গ প্রকৃতির নিয়মে এটি সমাধান করা যায়।

($গ_২$) $x=my\pm n$ (i) নং সমীকরণে বসালে আমরা পাব

$$z^2=\alpha(my\pm n)^2+\beta y^2+\gamma=Ny^2\pm 2\alpha mny+T$$

এখানে $N=\alpha m^2+\beta, \quad T=\alpha n^2+\gamma$

এরপর এটিকে 'বর্গ প্রকৃতি' অর্থাৎ $Lx^2\pm c=y^2$ ধরণের সমীকরণে পরিবর্তিত করে সমাধান করার কথা বলেছেন।

১. যাদবেন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক অনুদিত

(গ$_3$) $\omega^2=\beta y^2+\gamma$ ধরলে উক্ত (*i*) নং সমীকরণ পরিবর্তিত হয়ে $z^2-\omega^2=\alpha x^2$ আকার ধারণ করে। এর পর ধরা থাক $z-\omega=mx$,

$$z+\omega=\frac{\alpha}{m}, \quad \text{তাহালে} \quad z=\frac{1}{2}(m+\frac{\alpha}{m})\,x, \quad \omega=\frac{1}{2}\,(\frac{\alpha}{m}-m)\,x$$

পাওয়া যায়। এবং এরপর x, y এর মান পাওয়া যাবে।

(গ$_4$) $c=0$ ধরলে (*i*) নং সমীকরণ $\alpha x^2+\beta y^2=z^2$ আকারে পরিবর্তিত হয়। এখন $x=uy$, $z=vy$ বসালে দ্বিতীয় সমীকরণটি $\alpha u^2+\beta=v^2$ আকারে পরিবর্তিত হয়।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য $\alpha x^2+\beta y^2+\gamma=z^2$ ধরণের উদাহরণ দিয়েছেন তিনি বলেছেন—

তৌ রাশী বদ যত্ কৃত্যোঃ সপ্তাষ্টগুণয়োর্যুতিঃ।
মূলদা স্যাদ্বিযোগস্ত মূলদো রূপসংযুতঃ॥ [B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ১৮১]

অর্থাৎ দুটি রাশির বর্গকে যথাক্রমে ৭ এবং ৮ দিয়ে গুণ করলে তারপর যোগ করলে একটি বর্গরাশি হয়। এবং বিয়োগ করার পর। যোগ করলে একটি বর্গ রাশি হয়।

(*i*) $7x^2+8y^2=z^2$, (*ii*) $7x^2-8y^2+1=t^2$.

প্রথম সমীকরণে $x=uy$, $z=vy$ বসালে $7\,u^2+v^2$ পাওয়া যাবে।

$u=2$, $v=6$ একটি সমাধান $\therefore\ x:y:z=2:1:6$

দ্বিতীয় সমীকরণে $x=2y$ ধরে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য সমাধান করেছেন। এই মান দ্বিতীয় সমীকরণে বসালে $20y^2+1=t^2$ আকারে পরিবর্তিত হয়

$y=2$, $t=9$ এবং $y=36$, t - 161 দুটি সমাধান। অতএব $x=4$, $y=2$ এবং $x=72$, $y=36$ মান পাওয়া গেল।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, $\alpha x^2+\beta y^2+\gamma=z^2$ সমীকরণটি সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন :—

সরূপকে বর্ণকৃতী তু যত্র তত্রেচ্ছয়ৈকাং প্রকৃতিং প্রকল্প
শেষং ততঃ ক্ষেপকমুক্তবচ্চ মূলে বিদধ্যাদসকৃত সমত্বে। [ঐ পৃঃ ১৮০]

এরপর তিনি বলেছেন

সভাবিতে বর্ণকৃতী তু যত্র তন্মূলমাদায় চ শেষকস্য
ইষ্টোদ্ধ তসেষ্টবিবর্জিতস্য দলেন তুল্যং হি তদেব কার্যম্। [ঐ পৃঃ ১৮২]

অর্থাৎ প্রথম পক্ষের মূলানয়নের পরে দ্বিতীয় পক্ষে যদি দুটি বর্গরাশি অবশেষে থাকে (বর্গশেষ সরূপ বা অরূপ), তবে ইচ্ছানুসারে একটিকে প্রকৃতি এবং দ্বিতীয়টিকে ক্ষেপ মনে করে পূর্ব নিয়মে মূল সাধন কর। যে স্থানে কোন বর্ণের ঘাতের সঙ্গে বর্ণবর্গ থাকবে, সেই স্থানে যে পর্যন্ত মূল পাওয়া যাবে তা নিয়ে এস, শেষের ক্রিয়া এই রকম।

(ঘ) $\alpha^2x+\beta^2y^2+\gamma=z^2$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এধরণের সমীকরণ সমাধান করার একটি সূত্র দিয়েছেন এবং যে মান পাওয়া যায় তা আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়।

$$x=\frac{1}{2\alpha}\left(\frac{\beta y^2+c}{m}\right)-m$$

$$z=\frac{1}{2}\left(\frac{\beta y^2+c}{m}+m\right)$$

m এখানে যে কোন সংখ্যা।

এ ধরণের সমীকরণের উদাহরণ পরবর্তী কালে বিশিষ্ট গণিতবিদ কমলাকার তাঁর সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিবেকে আলোচনা করেছেন।

(ঙ) $\alpha x^2+\beta xy+\gamma y^2=z^2$

এই ধরণের সমীকরণ সমাধানের সূত্র দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য দিয়েছেন। তবে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা তাঁর বীজগণিতে নেই। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এ ধরণের সমীকরণ সমাধান করতে গিয়ে কখনও α কে, কখনও β কে বর্গরাশি ধরা হয়েছে আবার α এবং β কে অবর্গ রাশি হিসাবেও অনেক ক্ষেত্রে ধরে সমাধান করা হয়েছে।

১৬·২ দুইমাত্রার দুইটি সমীকরণ।

দ্বিমাত্রিক দুইটি সমীকরণ নিয়ে সমাধান ভারতীয়রা বেশ ভাল ভাবেই করেছেন। এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক। দ্বিমাত্রিক দুইটি সমীকরণ প্রথমত দুই ধরনের। সেগুলি হচ্ছে

১. $\alpha x^2+\beta y^2+\gamma=u^2$
$\alpha' x^2+\beta' y^2+\gamma'=v^2$

২. $\alpha^2x^2+\beta xy+\gamma y^2=u^2$
$\alpha' x^2+\beta' xy+\gamma' y^2+\gamma=v^2$

প্রথম ধরনের দ্বিমাত্রিক সমীকরণ আবার পাঁচ প্রকার যথা

(ক) $x^2+y^2+1=u^2$ (খ) $x^2+y^2-1=u^2$

$x^2-y^2+1=v^2$ $x^2-y^2-1=v^2$

(গ) $\alpha x^2+\beta y^2=u^2$ (ঘ) $\alpha(x^2\pm y^2)+\gamma=u^2$

$\alpha' x^2+\beta' y^2+\gamma'=v^2$ $\alpha'(x^2\pm y^2)+\gamma'=v^2$

(ঙ) $\alpha x^2+\beta y^2+\gamma=u^2$

$\alpha' x^2+\beta' y^2+\gamma'=v^2$

(ক) ও (খ) প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন—

"রাশ্যোর্যয়োঃ কৃতিযুতিবিযুতী চৈকেন সংযুক্তৌবর্গৌ।
রহিতে বা তৌ রাশি গণয়িত্বা কথয় যদি বেত্‌সি ॥" (ঐ পৃঃ ১৮৬)

এই শ্লোকের আধুনিক অর্থ করলে আমরা দুজোড়া দ্বিমাত্রিক সমীকরণ পাব সেগুলি হচ্ছে—

$x^2+y^2+1=u^2$ $x^2+y^2-1=u^2$
$x^2-y^2+1=v^2$ $x^2-y^2-1=v^2$

তবে এদুটি কোন পূর্বসূরীদের কাছ থেকে নিয়েছেন সে কথা দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রথমেই বলেছেন, কারণ তিনি "আদ্যোদ্যাহরণম" শব্দটি উল্লেখ করেছেন। সমাধান প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন।

"অত্র প্রথমোদাহরণে কল্পিতৌ রাশিবর্গৌ যাব ৪, যাব ৫ রূ ১ অনয়োর্যোগবিয়োগৌ রূপযুতৌ মূলদৌ ভবতঃ। কথিত প্রথমবর্গস্য মূলমেকো রাশিঃ যা ২। দ্বিতীয়স্যাস্য যাব ৫ রূ ১। বর্গপ্রকৃত্যা মূলে ক ১ জ্যে ২ বা ক ১৭ জ্যে ৩৮। অনয়োর্জ্যেষ্ঠপদং দ্বিতীয়রাশিঃ। হ্রস্বং যাবত্তাবন্মানে নোত্‌থাপ্য আদ্যরাশিঃ" এবং জাতৌ ২, ২ বা ৩৪, ৩৮

অথ দ্বিতীয়োদাহরণে তথৈব কল্পিত প্রথমরাশিঃ যা ২। দ্বিতীয়স্যাস্য যাব ৫ রূ ১। বর্গপ্রকৃত্যা মূলে ক ৪ জো ৯ বা ক ৭২ জ্যে ১৬১ কনিষ্ঠেন প্রথম উত্‌থাপিতো জ্যেষ্ঠং দ্বিতীয় ইতি জাতৌ রাশি ৮, ৯ বা ১৪৪, ১৬১ ॥

অর্থাৎ প্রথম সমীকরণটি হচ্ছে $x^2=5z^2-1$, $y^2=4z^2$

এখন বর্গ প্রকৃতির নিয়মে $x^2=5z^2-1$ এর সমাধান হচ্ছে (1,2), (17,38), অতএব (ক) এর সমাধান হচ্ছে

$x=2$ $x=38$
$y=2$ $y=34$

দ্বিতীয় সমীকরণটি হচ্ছে $x^2=5z^2+1,\ \ y^2=4z^2$

এখন বর্গপ্রকৃতির নিয়মে $x^2=5z^2+1$ এর সমাধান করা যাক।

তাহলে (4,9), (72,161) প্রভৃতি। z এবং x এর মান পাওয়া যাবে।

$\therefore$ (খ) এর সমাধান হচ্ছে—

$$\left.\begin{array}{l}x=9\\y=8\end{array}\right\}\qquad\left.\begin{array}{l}x=161\\y=144\end{array}\right\}$$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য আরও ব্যাপক আকারে সমাধান করার কথা বলেছেন। তাছাড়াও অসীম সংখ্যক অখণ্ড সমাধানের কথাও বলেছেন।

$$(\text{গ})\quad\left.\begin{array}{l}\alpha x^2+\beta y^2=u^2\\\alpha' x^2+\beta' y^2+\gamma=v^2\end{array}\right\}$$

ধরণের দ্বিমাত্রিক সমীকরণ দুটির সমাধানের কথাও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন।

$$(\text{ঘ})\quad\left.\begin{array}{l}\alpha(x^2\pm y^2)+\gamma=u^2\\\alpha'(x^2+y^2)+\gamma'=v^2\end{array}\right\}$$

ধরণের সমীকরণদ্বয় সমাধান করতে গিয়ে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য $x^2+y^2=z$ ধরে সমাধান করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন।

বর্গান্তরং কয়ো রাশ্যোঃ পৃথগ দ্বিত্রিগুণং ত্রিযুক্
বর্গৌ স্যাতাং বদ ক্ষিপ্রং ষট্‌কপঞ্চকয়োরিব।
ক্বচিদাদেঃ ক্বচিন্মধ্যাত্‌ ক্বচিদ্যন্ত্যাত্‌ ক্রিয়া বুধৈঃ
আরভ্যতে যথা লব্ধী নির্বহেচ্চ যথা তথা॥

[B. Bi (A.S.S.) পৃঃ ১৮৭-১৮৮]

আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রথমটি লিখলে দাঁড়ায়

$$\left.\begin{array}{l}2(x^2-y^2)+3=u^2\\3(x^2-y^2)+3=v^2\end{array}\right\}$$

এটির সমাধান করার পর তিনি x এবং y এর মান বের করেছেন।

$$\left.\begin{array}{l}x=\frac{1}{2}(\frac{11}{m}+m)\\y=\frac{1}{2}(\frac{11}{m}-m)\end{array}\right\}\qquad\left.\begin{array}{l}x=\frac{1}{2}(\frac{1199}{m}+m)\\y=\frac{1}{2}(\frac{1199}{m}-m)\end{array}\right\}$$

m যে কোন মূলদ রাশি।

$m=1$ নিলে $(x, y)=(6, 5)$ বা $(600, 599)$ হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এক্ষেত্রে বলেছেন—

ইদমন্তর হৃতংদ্বিঘান্তরেণোনযুতমদ্ধিতং রাশী ভবত ইতি প্রাগুক্তমতোঽন্তরমিষ্টং রূপং প্রকল্প্য জাতৌ রাশি $\frac{৬}{৫}$ বা $\frac{৬০০}{৫৯৯}$।

(ঙ) $$\left.\begin{array}{l}\alpha x^2+\beta y^2+\gamma=u^2\\ \alpha' x^2+\beta' y^2+\gamma'=v^2\end{array}\right\}$$

ধরণের সমীকরণদ্বয় সমাধান সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ধরণের দুইটি দ্বিমাত্রিক সমীকরণ

$$\alpha^2 x^2+\beta xy+\gamma y^2=u^2$$
$$\alpha' x^2+\beta' xy+\gamma' y^2=v^2$$

এই ধরণের সমীকরণ দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য সমাধান করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন [B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ১৮২]।

যয়োর্বর্গযুতির্ঘাতযুতা মূলপ্রদা ভবেত্।
তন্মূলগুণিতো যোগঃ সরূপশ্চাঽস্তু তৌ বদ॥

এটির অর্থ আধুনিক বীজগণিতে লিখিলে দাঁড়ায়

$$x^2+xy+y^2=u^2$$
$$(x+y)u+1=v^2$$

সমাধান সম্পর্কে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন—

অত্র রাশী যা ১। কা ১। অনয়োবর্গযুতি ঘাতযুতা যাব ১ যাকাভা ১ কা ১

অস্যা মূলং নাস্তীতি নীলকবর্গসম। মেতাং কৃত্বা পক্ষয়োঃ কালকবর্গং প্রক্ষিপ্য পক্ষৌ ষট্ ত্রিংশতা সংগুণ্য লব্ধং নীলকপক্ষমূলং নী=৬। পরপক্ষস্যাস্য যাব ৩৬ যাকাভা ৩৬ কাব ৩৬। যাবতো মূলমস্তি তাবতঃ সভাবিতে বর্ণকৃতী ইত্যাদিনা মূলং গৃহীতং যা ৬ কা ৩। শেযস্যাস্য কাব ২৭ ইষ্টেন কালকেন ১। হৃতস্যেষ্ট কালকবর্জিতস্য চ দলেন কা ১৩। তন্মূলসমং কৃত্বা লব্ধং যাবত্তাবন্মানং কা $\frac{৫}{৩}$। অনেন যাবত্তাবদুত্থাপ্য জাতৌ রাশী $\frac{৫}{৩}$। কা ১।

অনয়োর্বর্গযুতেঃ কাব $\frac{৩৪}{৯}$। ঘাতযুতায়াঃ কাব $\frac{৪৯}{৯}$ মূলং কা $\frac{৭}{৩}$। অনেন রাশিযোগো কা $\frac{৮}{৩}$ গুণিতঃ কাব $\frac{৫৬}{৯}$। সরূপো জাতঃ $\frac{\text{কা ৫৬ রূ ৯}}{৯}$ অমুং পোতকবর্গসমং কৃত্বা সমচ্ছেদীকৃত্য পক্ষয়োর্নরূপাণি প্রক্ষিপ্য লব্ধং কনিষ্ঠমূলং ৬ বা ১৮০। এতত কালকমান মিত্যনেনোতথাপিতৌ রাশি ১০। ৬ বা ৩০০। ১৮০ এবমেনকধা বীজগণিতম্ (ভাস্করাচার্য্যবিরচিতম্ রাধাবল্লভ পৃঃ ৩১৮)[১]

১. এই টীকাটি B. Bi. (A.S.S.) গ্রন্থে নেই।

অর্থাৎ সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে দাঁড়ায়

প্রথম সমীকরণটিকে 36 দিয়ে গুণ করলে আমরা পাই

$(6x+3y)^2+27y^2=36u^2$

অর্থাৎ $6x+3y=\frac{1}{2}(\frac{27y^2}{\lambda}-\lambda)$, $6u=\frac{1}{2}(\frac{27y^2}{\lambda}+\lambda)$

λ যে কোন মূলদ রাশি। $y=\lambda$ ধরলে

$6x+3y=13y$. অতএব এখান থেকে $x=\frac{5}{3}y$, $u=\frac{7}{3}y$ পাওয়া যায়।

এই মান $(x+1)u+1=v^2$ এ বসালে আমরা পাব $56y^2+9=9v^2$। বর্গপ্রকৃতি পদ্ধতি অনুযায়ী আমরা $y=6,180$ পাব। অতএব x এবং y এর মান এই রকম হবে—

$$\left.\begin{array}{l} x=10 \\ y=6 \end{array}\right\} \qquad \left.\begin{array}{l} x=300 \\ y=180 \end{array}\right\}$$

সপ্তদশ অধ্যায়

১৭.১ ত্রিঘাত এবং উচ্চঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ

আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভারতীয়রা গণিতজ্ঞরা দ্বিঘাত সমীকরণ, পেলীয় সমীকরণ প্রভৃতি নিয়ে ব্যাপক অথচ সুষ্ঠভাবে আলোচনা করেছেন। ত্রিঘাত এবং উচ্চঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ নিয়েও ভারতীরা আলোচনা করেছেন তবে এ ধরণের সমীকরণ নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা হাতে গণনা করা যায়। ভারতীয়দের মধ্যে মহাবীর, ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখের নাম এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়রা এ ধরণের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করার সময় কখনও সূত্র এবং কখনও উদাহরণ দিয়েছেন। তৃতীয় ও উচ্চঘাত অনুযায়ী ভারতীয়রা নিম্নলিখিত সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

(ক) $\left.\begin{aligned} x+y+z+w &= x^2+y^2+z^2+w^2 \\ x^3+y^3+z^3+w^3 &= x^2+y^2+z^2+w^2 \end{aligned}\right\}$ (i)

$(x+y)^2+(x+y)^3=2(x^3+y^3)$ (ii)

$bx+c=y^3.$ ... (iii)

(খ) $ax^4+bx^2+cx=d$ ... (i)

$ax^4+bx^2+c=u^3$ ... (ii)

(গ) (i) $ax^n=q$

(ii) $a\left(\dfrac{x^n-1}{x-1}\right)=p$

(iii) $ax^{2n+2}+bx^{2n}=y^2.$

(iv) $bx\pm c=ay^n.$

(ঘ) $\left.\begin{aligned} x^2+y^2 &= u^3 \\ x^3+y^3 &= u^2 \end{aligned}\right\}$ ... (i)

$\left.\begin{aligned} y-x &= u^2 \\ y^2+x^2 &= v^3 \end{aligned}\right\}$ ... (ii)

$\left.\begin{aligned} 3x+1 &= u^3 \\ 3u^2+1 &= v^2 \end{aligned}\right\}$ ... (iii)

(ক) (i) নং সমীকরণগুলি নিয়ে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য আলোচনা করেছেন তবে তিনি এগুলি করবার সূত্র দেন নাই। এ ধরণের সমীকরণের শুধুমাত্র উদাহরণ এবং তার সমাধান তিনি করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"অসমানসমচ্ছেদান্ রাশীংস্তাংশ্চতুরো বদ।
যদৈক্যং যদ্ঘনৈক্যং বা যেষাং বর্গৈক্যসংমিতম্ ॥" [B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ১৩২]

শ্লোকটির মর্মার্থ হচ্ছে—"সমান হরবিশিষ্ট অসমান চারিটি রাশি বল যাদের যোগ বা ঘনযোগ বর্গযোগের সমান।"

অর্থাৎ যদি চারিটি রাশি x, y, z এবং w ধরা যায় তাহলে প্রশ্নানুসারে বলা যায়

$$x+y+z+w=x^2+y^2+z^2+w^2 \quad \cdots \quad (i^1)$$

$$x^3+y^3+z^3+w^3=x^2+y^2+z^2+w^2 \quad \cdots \quad (ii^1)$$

[অত্র রাশয়ঃ যা ১, যা ২, যা ৩, যা ৪, এষাং যোগঃ যা ১০। বর্গযোগেনানেব যাব ৩০. সম ইতি পক্ষৌ যাবত্তাবতাঽপবর্ত্ত্যে।

ন্যাস : যা ৩০ রূ ০
যা ০ রূ ১০

সমশোধনাদিনা প্রাগ্বল্লব্ধযাবত্তাবন্মানেনোত্থাপিতা রাশয়ঃ $\frac{১}{৩}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{৩}{৩}$, $\frac{৪}{৩}$।

অথ দ্বিতীয়োদাহরণে রাশয়ঃ যা ১ যা, যা ২, যা ৩ যা ৪ ; এষাং ঘনৈক্যম্ যাঘ ১০০। এতদ্বর্গৈক্যমানেন যাব ৩০ সমমিতি পক্ষৌত্তাবদ্বর্গেণাপবর্ত্ত্য প্রাগ্বল্লব্ধ-যাবত্তাবন্মানেনাত্থপিতা জাতা রাশয়ঃ

$\frac{৩}{১০}$, $\frac{৬}{১০}$, $\frac{৯}{১০}$, $\frac{১২}{১০}$.]

দ্বিতীয় ভাস্কারাচার্য এটি সমাধান করতে গিয়ে $y=2x$, $z=3x$, $w=4x$ ধরেছেন এবং পরিপূর্ণভাবে সমাধান করেছেন। (i^1) সমীকরণটির থেকে $x=\frac{1}{3}$, $y=\frac{2}{3}$, $z=1$, $w=\frac{4}{3}$ এবং (ii^1) সমীকরণটি থেকে $x=\frac{2}{10}$, $y=\frac{6}{10}$, $z=\frac{9}{10}$, $w=\frac{12}{10}$ বের করেছেন।

(ii) নং $(x+y)^2+(x+y)^3=2(x^3+y^3)$

এ ধরণের সমীকরণের সমাধান পদ্ধতির সূত্র নিয়ে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য উল্লেখ করেন নি। তবে তাঁর বীজগণিতে এ ধরণের সমীকরণের উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। তিনি বলেছেন—

"রাশিযোগকৃতির্মিশ্রা রাশ্যোর্যোগঘনেনচেৎ
দ্বিঘ্নস্য ঘংনযোগস্য সা তুল্যাগণকোচ্যতাম্।" [B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ১৭৮]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে $(x+y)^3+(x+y)^2=2(x^3+y^2)$ সমীকরণটির কথাই উনি বলতে চেয়েছেন। সমাধান করতে গিয়ে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য $x=u+v$, $y=u-v$ ধরেছেন এবং শেষ পর্যন্ত $x=5, 76$, $y=1, 20$ প্রভৃতি মান বের করেছেন।

(iii) $bx+c=y^3$ সমীকরণটিকে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে "ঘন কুট্টক" বলে অভিহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এর সমাধান প্রণালীর সূত্র দিয়েছেন। সেই পদ্ধতি অনুযায়ী দুটি ক্ষেত্র আমরা দেখতে পাই। যথা $c=t^3$ অথবা $c\neq t^3$ ধরে নিয়ে সমাধান করার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"ষড়্ভিরূনো ঘনঃ কস্য পঞ্চভক্তো বিশুধ্যতি।
তং বদাস্তি তবালং চেদভ্যাসৌ ঘন কুট্টকে॥ [ঐ পৃঃ ১৯৩]

এটিকে আধুনিক গণিতের ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়, $5x+6=y^3$.
এটির সমাধানও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য করে দিয়েছেন।

(খ) $ax^4+bx^2+cx=d$ ধরণের সমীকরণের উদাহরণ দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বীজগণিতে পাওয়া যায়। তিনি যে উদাহরণটি দিয়েছেন সেই হচ্ছে

"কো রাশির্দ্বিশতীক্ষুণ্ণো রাশিবর্গযুতো হতঃ।
দ্বাভ্যাং তেনোনিতো রাশিবর্গবর্গোঽযুতং ১০০০০ ভবেত্।
রূপোনং বদ তং রাশিং বেত্সি বীজ ক্রিয়াং যদি। [ঐ পৃঃ ১৪৩]

অর্থাৎ কোন রাশিকে দুশ দিকে গুণ করবো, তাতে রাশির বর্গ যোগ করবো, সম্পূর্ণ ফলকে দুই দিয়ে গুণ করবো। যদি এই ফলকে বর্গ থেকে বাদ দেওয়া যায় তাহ'লে দশহাজারের এক কম হবে।

এখানে প্রশ্নানুসারে যদি রাশিটি x ধরা যায় তাহলে উপরোক্ত শ্লোকটির মর্মার্থ অনুযায়ী আমরা নিম্নলিখিত ধাপগুলি পেতে পারি

(α) x^2, (β) x^2+200x (γ) $2(x^2+200x)$

(δ) x^4, (θ) $x^4-2(x^2+200x)$ (ϕ) $x^4-2x^2-400x=9999$

$ax^4+bx^2+c=u^3$ ধরণের সমীকরণ দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বীজগণিতে পাওয়া যায়। তবে এগিয়ে খুব বেশী আলোচনা বা উদাহরণ চোখে পড়ে না।

(গ) $ax^n=q$ এবং $a\left(\dfrac{x^n-1}{x-1}\right)=p$ ধরণের সমীকরণ নিয়ে মহাবীরাচার্য আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর উদাহরণেগুলি অধিকাংশই গুণোত্তর প্রগতির উদাহরণে আলোচনা কালে স্বাভাবিক ভাবে সমাধান করতে পেরেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে মহাবীর নিম্নলিখিত সমীকরণ নিয়েও আলোচনা করেছেন

$$a_1\sqrt{b_1x}+a_2\sqrt{b_2(x-a_1\sqrt{b_1x})}$$
$$+a_3\sqrt{b_3\{(x-a_1\sqrt{b_1x})-a_2\sqrt{b_2(x-a_1\sqrt{b_1x})}\}}$$
$$+\ldots+R=x.$$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য $ax^{2n+2}+bx^{2n}=y^2$ ধরণের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি যে পদ্ধতি বলেছেন তা আধুনিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করলে আমরা দেখতে পাই $ax^2+b=z^2$ ধরে উক্ত সমীকরণে ($ax^{2n+2}+bx^{2n}=y^2$) বসালে সমীকরণটি $y^2=x^{2n}z^2$ আকারে পরিবর্তিত হয়। ভাস্করাচার্যের (দ্বিতীয়) বীজগণিতে এ ধরণের সমীকরণের উদাহরণ দেওয়া আছে। তিনি বলেছেন।

"যস্য বর্গকৃতিঃ পঞ্চগুণা বর্গশতোনিতা।

মূলদা জায়তে রাশিং গণিতজ্ঞ বদাহহশুতম। [B. Bi (A. S. S.। পৃঃ ১৭৯]

অর্থাৎ যার বর্গের বর্গকে পাঁচগুণ করে শতগুণিত কোন বর্গরাশি বিযুক্ত করলে মূল পাওয়া যাবে।

এটিকে আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়

$$5x^4-100x^2=y^2.$$

$bx\pm c=ay^n$ সমীকরণ নিয়ে খুব ব্যাপক এবং সুশৃঙ্খলভাবে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য আলোচনা না করলেও তিনি এসম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন।

(ঘ) $\left.\begin{array}{l} x^2+y^2=u^n \\ x^3+y^3=v^2 \end{array}\right\}$ ধরণের সমীকরণ নিয়ে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন

"ঘনৈক্যং জায়তে বর্গো বর্গৈক্যং চ যয়োর্ঘনঃ

দ্বতৌ চেদ্বেত্সি তদাহং ত্বাং মন্যে বীজবিদাং বরম। [ঐ পৃঃ ১৩৩]

মর্মার্থ হচ্ছে দুটি ঘনরাশির যোগ একটি বর্গরাশি এবং দুটি বর্গরাশির যোগ একটি ঘন রাশি হলে রাশি দুটি কত?

ভাস্করাচার্য এটির সমাধান করেছেন।

এরপর দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যকে $y-x=u^2$, $y^2+x^2=v^3$ ধরণের উচ্চঘাতের দুটি সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। তিনি বলেছেন—

"কয়োঃ স্যাদন্তরে বর্গো বর্গযোগা যয়োর্ঘনঃ

তৌ রাশি কথয়াভিন্নৌ বহুধা বীজবিত্তম্।" [ঐ পৃঃ ১৭৯]

অর্থাৎ সেই ধরণের জোড়া জোড়া রাশি আমাকে বল যাদের পার্থক্য একটি বর্গরাশি এবং যাদের বর্গযোগ একটি ঘনরাশি হয়। এটি আধুনিক গণিতে লিখলে দাড়ায়

$$\begin{array}{r} y-x=u^2 \\ y^2+x^2=v^3 \end{array}$$

এরপর দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য $x^3+y^2=u^2$, $x+y=v^2$ সমীকরণদ্বয় সম্পর্কে বলেছেন—

"ঘনবর্গযুতিবর্গো যয়ো রাশ্যোঃ প্রজায়তে।
সমাসোঽপি যয়োবর্গস্তৌ রাশী শীঘ্রমানয় ।" [B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ১৮১]

অর্থাৎ মর্মার্থ সেই দুটি রাশি বল যার একটি ঘনের সঙ্গে অপরটির বর্গ যোগ করলে একটি বর্গ রাশি হয় এবং রাশিদুটির যোগ ফলও একটি বর্গ রাশি হয়।

আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় লিখলে দাঁড়ায়

$$x^3+y^2=u^2,$$
$$x+y=v^2$$

এটির সমাধানও ভাস্করাচার্য করেছেন।

ভাস্করাচার্যের উদাহরণে $\begin{array}{l}3x+1=u^3\\ 3u_2+1=v^2\end{array}$ ধরণের সমীকরণের সমাধানও দেখতে পাওয়া যায়।*

---

* রাশ্যোর্যয়োঃ কৃতি বিয়ুতী চৈকেন স্বংযুতৌ বর্গৌ।
রহিতে বা তৌ রাশি গণয়িত্বা কথয় যদি বেত্সি॥ [B. Bi. (A. S. S.) পৃঃ ১৮৬]

১৮·১ কতকগুলি বিশেষ ধরনের সমীকরণ

ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, শ্রীপতি প্রমুখেরা কতকগুলি বিশেষ ধরণের সমীকরণের উদাহরণ তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ব্রহ্মগুপ্তের ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে (ব্রাঃ স্ফুঃ ১৮।৭৯)

"বর্গানক্বতিযুতো নানগাস্তত্ সংযোংতরদ্ধ ক্বতিভক্তঃ

তদ্‌গুণকৌ যুতিবিযুতৌ বর্গো ঘাতে চ রূপযুতে।

অর্থাৎ দুটি রাশির যোগ এবং অন্তর বর্গ রাশি হবে, দুটি রাশির গুণফলের সঙ্গে এক যোগ করলে একটি বর্গরাশি হবে। তাহলে এই দুটি রাশি আনতে হলে, এইরকম হবে—

$$x = k(\alpha^2+\beta^2)$$

$$y = k(\alpha^2-\beta^2)$$

$$k = \frac{(\alpha^2+\beta^2)+(\alpha^2-\beta^2)}{[\frac{1}{2}\{(\alpha^2+\beta^2)-(\alpha^2-\beta^2)\}]^2}$$

ভাস্করাচার্য (দ্বিতীয়) $x \pm y = u^2$, $xy = v^3$ ধরণের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"যুতৌ বর্গোঽন্তরে বর্গো যথোর্ঘাতে ঘনো ভবেত্

তৌ রাশী শীঘ্রমাচক্ষ দক্ষোঽসি গণিতে যদি।" [B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ১৩৩]

অর্থাৎ যদি তুমি গণিতে দক্ষ হও তাহলে সেই দুটি রাশি বলো, যাদের যোগ এবং বিয়োগফলে উদ্ভূত রাশি একটি বর্গরাশি হবে, এবং এ দুটি রাশির গুণফলে একটি ঘনরাশি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ যদি রাশি দুটি x এবং y ধরা যায় তাহলে প্রশ্নানুসারে $x \pm y = u$, $xy = v^3$ সমীকরণদ্বয় পাওয়া যাবে।

সমাধানের জন্য দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এইরূপ লিখেছেন—

অত্র রাশি যাব৫, যাব ৪, যোগঽন্তরে চ যথা বর্গঃস্যাত তথা কল্পিতৌ। অনয়োর্ঘাতঃ যাবব ২০। এয ঘন ইতি ইতীষ্টয়াবত্তাবদ্দশকস্থ ঘনেন যা ঘ ১০০০ সমীকরণে পক্ষৌ যাবত্তাবদঘণেনাপর্ত্ত্য প্রাগজ্জাতৌ রাশী ১০০০,০ ; ১২৫০০।

আশা করি এটির টীকা প্রয়োজন হবে না।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য অন্যত্র নূতন ধরনের সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেছেন—

রাশিক্ষেপাদ্বধক্ষেপো যদ্গুণস্তপদোত্তরম্।
অব্যক্ত রাশয়ঃ কল্প্যা বর্গিতাঃ ক্ষেপবর্জিতাঃ॥ [B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ৪৪]

অর্থাৎ সেই সমস্ত রাশি বের কর, যার সঙ্গে একটি প্রদত্ত রাশি যোগ করলে বর্গ রাশি পাওয়া যাবে এবং ঐ সমস্ত রাশি থেকে দুটি রাশি নিয়ে গুণ করে কোন প্রদত্ত রাশি যোগ করলে একটি বর্গরাশি পাওয়া যাবে।

অর্থাৎ মর্মার্থ অনুসারে এইরূপ সমীকরণ পাওয়া যায়।

$$x+\alpha=p^2$$
$$y+\alpha=q^2 \qquad xy+\beta=\xi^2$$
$$z+\alpha=r^2 \qquad yz+\beta=\eta^2$$
$$w+\alpha=t^2 \qquad zw+\beta=\lambda^2$$

এগুলির সমাধান তাঁর গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য একটি শ্লোকে অন্য এক ধরনের সমীকরণের উল্লেখ করেছেন এবং সমাধানও করেছেন। তিনি বলেছেন –

"রাশ্যোর্যোগবিয়োগকৌ ত্রিসহিতৌ বর্গৌ ভবতা তয়োর্বর্গৈক্যং চতুরূনিতং রবিযুতং বর্গান্তরং স্যাত কৃতিঃ সাঙ্কং ঘাতদলং ঘনঃ পদযুতিস্তেযাং ত্রিযুক্তাকৃতিস্তৌ রাশী বদ কোমলামলমতে ষট্ সপ্তহিত্বাপরৌ। [B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ১৮৫]

অর্থাৎ সেই জোড়া রাশি বল যাদের যোগ এবং বিয়োগফলের সঙ্গে তিন যোগ করলে বর্গরাশি হবে। যাদের বর্গ যোগ এবং বিয়োগ করার পর চার বিয়োগ বা বার যোগ করলে বর্গ রাশি পাওয়া যাবে। তাদের গুণফলের অর্ধেকের সঙ্গে ঐ জোড়ের ছোট রাশিটি যোগ করলে ঘনরাশি পাওয়া যাবে এবং যে সমস্ত বর্গরাশি পাওয়া যাবে তাদের প্রত্যেকটির বর্গমূল (বা ঘনমূল) নিয়ে তারপর যোগ করার পর দুই যোগ করলে একটি বর্গরাশি পাওয়া যাবে। তবে রাশি দুটি সাত এবং ছয় ব্যতীত হতে হবে। অর্থাৎ যদি রাশি দুটি x এবং y ধরা হয় এবং $x>y$ হলে প্রশ্নানুসারে

$$x-y+3=\alpha^2$$
$$x+y+3=\beta^2$$
$$x^2+y^2-4=\gamma^2$$
$$x^2-y^2+12=\delta^2$$
$$\tfrac{1}{2}xy+y=\lambda^3$$
$$\alpha+\beta+\gamma+\delta+\lambda=\xi^2$$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এটির সমাধান করে $(x, y)=(7, 6)$; (1527, 2‹6), বের করেছেন।

এ ধরনের আর একটি দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের বীজগণিতে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে সহস্রাধিক মান পাওয়া হতে পারে, সে কথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন— [B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ১৮২, ১৮৩]

যত্‌ স্যাত্‌ সাল্পবধার্ধতো ঘনপদং যদ্বর্গযোগাত্‌ পদং
যে যোগান্তযোর্দ্বিকাভ্যধিকয়োর্বর্গান্তরাত্‌ সাষ্টকাত্‌।
যচ্চৈতত্‌পদপঞ্চকং তু মিলিতং স্যাদ্বর্গমূলপ্রদং
তৌ রাশী কথয়াশু নিশ্চলমতে ষট্‌কাষ্টকাভ্যাং বিনা।"

এই শ্লোকটির অর্থ আধুনিক বীজগণিতে লিখলে দাঁড়ায়—

যদি $x>y$ হয় তাহলে

$$\sqrt[3]{\tfrac{1}{2}(x+y)}+\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{x^2-y^2+8}+\sqrt{x+y+2}+\sqrt{x-y+2}=q^2$$

এটির যে সমাধান ভাস্করাচার্য পেয়েছেন তাহচ্ছে
$(x,y)=(8,6)$, (1677/4,41), 15128,246),……প্রভৃতি।

ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, শ্রীপতি, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রমুখেরা $axy=bx+cy+d$ ধরনের সমীকরণের সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত তার নিজের সূত্রটি ছাড়াও একজন অজ্ঞাত গণিতবিদের সূত্রটিও তুলে ধরেছেন।' মহাবীর অবশ্য উক্ত সমীকরণটির সামান্য হেরফের করে সমাধান করেছেন অর্থাৎ মহাবীর

$xy\pm(bx+ay)=d-ab$ ধরণের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তিনি x এবং y এর মান এইরূপ বের করেছেন

$$x=\frac{d\sim ab}{b+1} \qquad x=\frac{d\sim ab}{d+b}$$

বা

$$y=\frac{d\sim ab}{d+b} \qquad y=\frac{d\sim ab}{a+1}$$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং তৎসহ উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণটি হচ্ছে

চতুস্ত্রিগুণয়ো রাশ্যোঃ সংযুতির্দ্বিযুতা তয়ো
রাশিঘাতেন তুল্যা স্যাত্তৌ রাশী বেত্‌সি চেদ্বদ। [B. Bi (A. S. S.) পৃঃ ১২৫]

অর্থাৎ দুটি রাশির একটিকে তিন দিয়ে গুণ করে যোগ কর। তারপর যোগ কর। এই যোগফল উক্তরাশিদ্বয়ের গুণফলের সমান।

অর্থাৎ আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় বললে দাঁড়ায় যদি রাশিদুটি x এবং y ধরাযায় তাহলে সমীকরণটি হবে

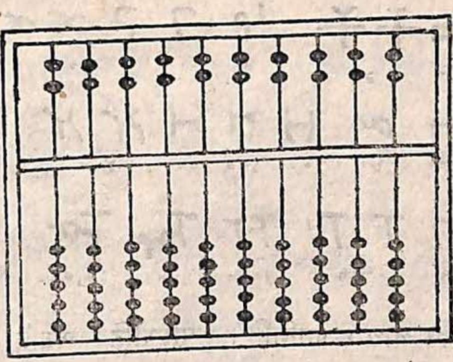
$$xy=4x+3y+2$$

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য এইভাবে সমাধান করেছেন

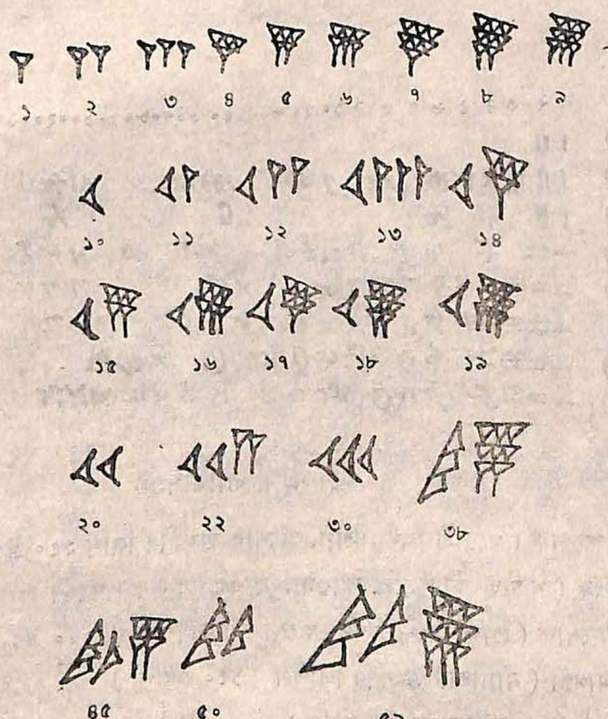
তত্র যথোক্তে কৃতে পক্ষৌ যা ৪ কা ৩ রূ ২
যা কা ভা ১

বর্ণাঙ্কাহতিরূপৈক্যম্ ১৪, এতেদৈকেনেষ্টেন হৃতং জাতে ইষ্টফলে ১, ১৪। এতে বর্ণাঙ্কাভ্যাং ৪, ৩, স্বেচ্ছয়া যুতে জাতে যাবত্তাবত্‌কালকমানে ৪, ১৮ বা ১৭, ৫, দিকে ৫, ১১ বা ১০, ৬; এটির অর্থ উল্লেখ না করলেও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে (x,y) এই মান (4,18) বা (17,5) পাওয়া যাচ্ছে তাছাড়া (5.11.) বা (10,6) মান গুলিও পাওয়া যাচ্ছে।

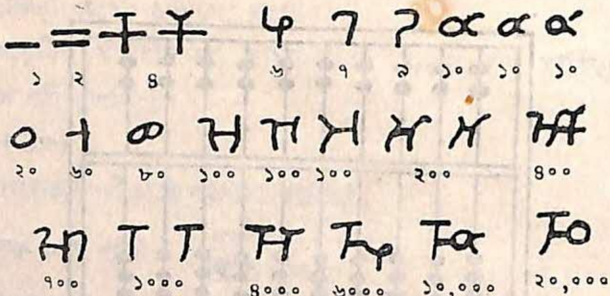
দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য অবশ্য এটি জ্যামিতিক প্রমাণের সাহায্যেও সমাধান করেছেন।



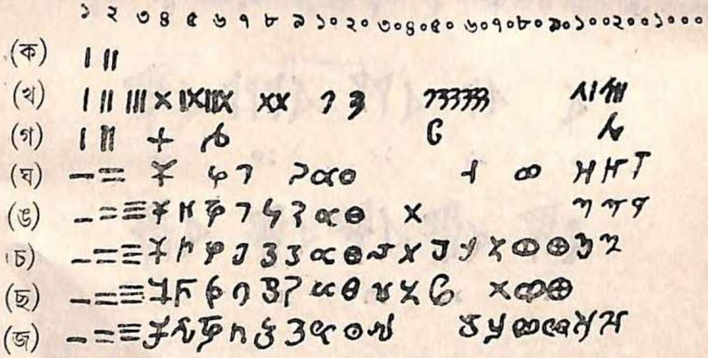
এ্যাব্যকাস



ব্যাবিলনের সংখ্যা লিপি। এক বলতে একটি খাড়া তীর চিহ্নকে বোঝাত। দুইকে বোঝাতে গেলে দুটো তীর চিহ্ন দেওয়া হোত। এই ভাবে নয় পর্যন্ত গণনা করা হোত। দশের জন্য বিশেষ চিহ্ন ছিল। এইভাবেই বড় বড় সংখ্যাকে ব্যাবিলনীয়রা লিখতো।



নানা ঘাট পর্বতে প্রাপ্ত সংখ্যালিপি। আনুমানিক সম্রাট অশোকের এক শতাব্দী পরে এটি লিখিত।



কয়েকটি সংখ্যালিপি

(ক) অশোক (খরোষ্ঠী সংখ্যালিপি, অশোক উৎকীর্ণ লিপি ২৫০ খ্রীঃ পূঃ)

(খ) শক (শক উৎকীর্ণলিপি, আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব এক শতাব্দী)

(গ) অশোক (ব্রাহ্মী সংখ্যালিপি, অশোক উৎকীর্ণলিপি, ২৫০ খ্রীঃ পূঃ)

(ঘ) নাগরী (নানাঘাট উৎকীর্ণ লিপি। ১৫০ খ্রীঃ পূঃ)

(ঙ) নাসিক (নাসিক উৎকীর্ণ লিপি। ১০০ খ্রীঃ)

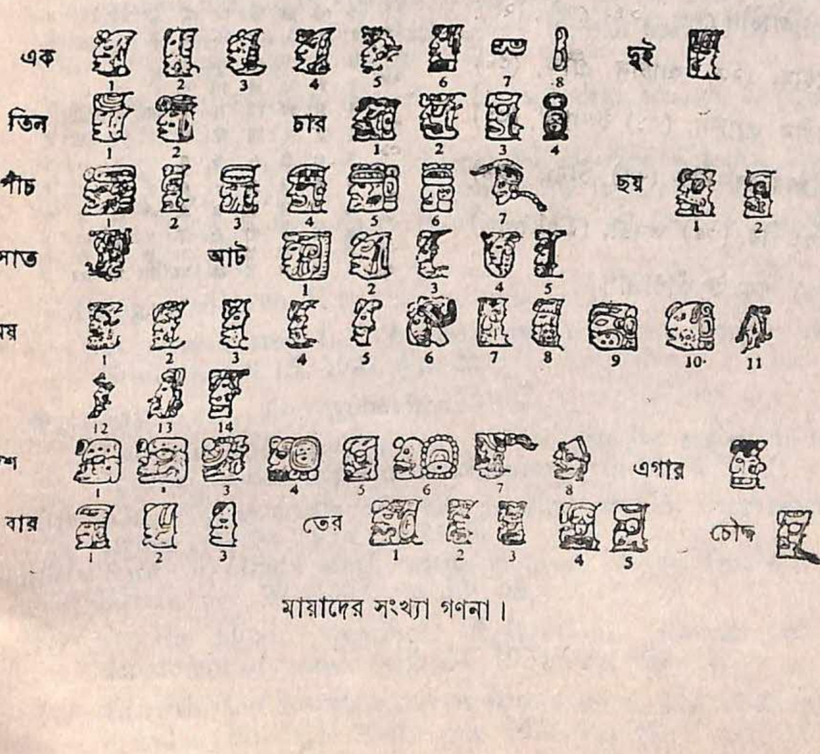
(চ) ক্ষত্রপ (ক্ষত্রপ মুদ্রা, ২০০ খ্রীঃ)

(ছ) কুষাণ (কুষাণ উৎকীর্ণ লিপি, ১৫০ খ্রীঃ)

(জ) গুপ্ত (গুপ্ত উৎকীর্ণ লিপি, ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ)



নাসিকে প্রাপ্ত সংখ্যালিপি। আনুমানিক প্রথম / দ্বিতীয় শতাব্দীতে এটি ছিল।



মায়াদের সংখ্যা গণনা।

(১) কাল্ডীয়, (২) আরবীয়, (৩) গোবার বা গোবর (৪) তার্তারীয়, (৫) স্যকত (syakat), (৬) নাগরী, (৭) কইথি (Kaithi), (৮) প্রাচীন নাগরী, (৯) বাঙ্গলা, (১০) উড়িয়া, (১১) তিব্বতীয়, (১২) নেপালী, (১৩) পাঞ্জাবী, (১৪) কাশ্মিরী, (১৫) বর্মীয়, (১৬) তামিল, (১৭) মালয়ালম্, (১৮) তেলেগু,(১৯)কানাড়ী, (২০) সিংহলীয় (২১) লেপচা; (২২) কম্বোজীয়; (২৩) শ্যামীয়, (২৪) বলি, (২৫) জাভানীয়, (২৬) প্রাচীন জেন্দ, (২৭) জেন্দ, (২৮) অহোম্, (২৯) প্রাচীন গ্রীক, (৩০) প্রাচীন ল্যাটিন, (৩১) ইংরাজী, (৩২) রোজার বেকনীয় (৩৩) চীনা, (৩৪) ইথিওপীয়, (৩৫) তখরী, (Takhari) (৩৬) শক উৎকীর্ণলিপি।



তথ্যসূত্র

Journals (European Languages)

● Ayyangar, A. A. Krishnaswami ;

(i) Bhāskara and saṃśliṣta kuṭṭaka. Journal of the Indian Mathematical society, vol 18, 1929.

(ii) New light on Bhāskara's cakravāla or cyclic method of solving indeterminate equation of the second degree in two variables. Journal of the Indian Mathematical socity, vol 18, 1929—1930. Pp 225—240.

(iii) A brief analysis of Bhāskara's Bijaganitam. with historical and critical notes. Journal of the Indian mathematical socicty, vol. 18, 1929—30. Pp 176—.

● Bag, A. K ;

(i) The method of Integral solution of Indeterminate equations of the type By=Ax±c in ancient and medieval India. Indian Journal of History of Science. vol 12, 1977, Pp-1-16.

(ii) Al-Bīrūnī on Indian Arithmetic : Indian Journal of History of Science. vol 10, 1973.

(iii) Binomial theorem in ancient India, Indian Journal of History of Science. vol I, 1966.

(iv) Symbol for zero in mathematical notation in India, Primer congreso Argentino De Historia De la ciencia. sept 11—13 De. 1969. Boletin de la Academia Nac de ciencias, co'rdoba, T. 48, 1970.

Balagangadharan, K :

A consolidated list of Hindu mathematical works. Math Student, vol 15, 1947. Pp, 55.

● Chakravarty, Gurugobinda :

Growth and development of progressive series in India Journal of the deperment of letters. vol-24, 1934, P

(ii) The Hindu terms of area, Journal of the deperment of letters ;vol 24, 1934, Pp 21-28

(iii) Surd in Hindu mathematics, Journal of the deparment of letters. vol. 24. 1934, Pp 29—58.

(iv) On the Hindu treatment of fractions. Journal of the deparment of letters. vol. 24. 1934—Pp. 59—76.

(v) Growth and development of permutation and combination in India ; Bull. Cal. Math. Soc. 1932. vol 24.

- Channabasappa ; N :

  On the square root formula in the Bakhshāli Manuscript. I. J. H. S. vol II 1976. Pp. 112—124.

- Chintamani, B. M : and Subbarayappa, B.V.

  (i) History of science in India. Pali sources ; I. J. H.S. vol. 6, 1971

  (ii) A note on colebrookes traslation of a stanza from Bhāskara's Līlavatī, I. J. H. S. vol 9. 1974.

- Das. Sukumar Ranjan.

  The origin and development of numerals. Indian Historical Quarterly. (iii) 1927. Pp 97—120.

- Datta, Bibhuti Bhusan.

  (i) The present mode of expressing numbers. Indian Historical Quarterly (iii) 1927. Pp. 530—40.

  (ii) On the origin of Hindu terms for root. American mathematical monthly. vol 38. 1931 Pp 371—076.

  (iii) The scope and development of the Hindu mathemetics ; Indian Historical Quarterly, 1929, Pp. 479—.

  (iv) Early literary evidence of the use of the zero in India ; American mathematical monthly. vol. 33, 1926, Pp 449—.

  (v) Early evidences of the use of the zero, American mathematical monthly. vol. 38, 1931, Pp 566.

  (vi) The Hindu contribution to mathematics ; Bull. Math. Association of Allahabad. vol. 1,2, 1927—29.

  (vii) On Nārāyāṇa's methods for finding approximate value of a surd. Bull. Cal. Math. Soc. vol—23, 1631, Pp 187.

  (viii) Elder Ārybhaṭa's rule for the solution of indeterminate equation of the first degree. Bull. Cal math Soc, vol—24, 1932. Pp 19.

  (ix) Testimony of early Arab writers on the origin of our numerals. Bull. Cal. Math. Soc. vol. 24, 1932, Pp 193.

  (x) The Hindu method of Testing Arithemetical operation J. A. S. B. vol. 23. 1927. Pp. 261—67.

  (xi) On Mūla, The Hindu term for Root. American mathamatical monthly. vol. 34, 1927 Pp 420—

  (xii) The science of calculation by the board. American mathematical monthly, vol. 35, 1928. Pp. 520—529.

  (xiii) Hindu value of π. J. A. S. B vol. 22, Pp. 25—42.

  (xiv) On the supposed indebtedness of Brahmagupta to chin chang suan shu. Bull. Cal. Math. Soc. vol. 22, Pp. 39.

  (xv) The jain School of mathematics. Bull. Cal. Math Soc, vol. 21. 1929, Pp—115.

  (xvi) The Bhakhshali Mathematics. Bull. Cal. Math. Soc. vol. 21. Pp. 1-

(xvii) The Hindu solution of the general Pellian equation. Bull. Cal. Math. Soc. vol 19, 1928, Pp—87.

(xviii) Early History of the Arithmetic of zero and infinity in India ; Bull Cal. Math. Soc, vol. 18, Pp—165.

(xix) Aryabhaṭa ; the auther of the Gaṇita. Bull. Cal. Math. Soc, vol 18 ; 1927, Pp 5.

(xx) Two Āryabhaṭas of Albiruni. Bull. Cal. math. Soc, vol 17, 1926, Pp. 59.

(xxi) Mathematics of Nemichandra.—
The Jaina antiquary. vol. 1, 1935 Pp. 25–24.

(xxii) The lost Jain, treatise on Arithmetic
The Jain antiquary, vol 2 no. 2, 1936, Pp. 38—41.

(xxiii) The Algebra of Nārāyaṇa. Isis, vol. 19, 1933, Pp. 472.

(xxiv) The present mode of expressing number. Indian Historical Quarterly, 1927. Pp. 530.

● Fleet J. F.

(i) The use of Abacus in India. Journal of the Royal Asiatic Society. vol, 1911.

(ii) Āryabhaṭa's system of expressing numbers. J. R. A. S. 1911.

(iii) The Katapayadi system of expressing numbers. J.R.A.S. 1911.

● Gandz, Solomon.

(i) On the origin of the term root. The American mathematical monthly, vol. 33, 1926, Pp. 261—263.

(ii) On the origin of the term 'root'.
The American mathematical monthly, vol. 33 1928, Pp. 67-75.

(iii) On three interesting terms relating to the Area. American mathematical monthly. vol. 39, 1927. Pp. 80—.

(iv) Did the Arabs know the Abacus ? A. M. M. vol. 34, 1927, Pp. 309—.

● Garver, Raymond.

Concerning two square root methed. Bull. Cal. Math. Soc. vol. 24. 1932, Pp. 99.

● Ganguli, Sarada Kanta :

(i) Bhāskarāchārya and Simultaneous Indeterminate equations of the first degree. Bull. Cal. Math. Soc. vol. 17. 1926, Pp. 89—.

(ii) Was Āryabhaṭa indebted to the Greaks for his alphabetic system of expressing numbers ?
Bull. Cal. Math. Soc. vol. 17. Pp. 195—.

(iii) Bhāskarāchārya's reference to previous teachers.
Bull. Cal. Math. Soc. vol. 18, 1927 Pp. 65—.

(iv) The Source of the Indian Solution of the so called pellian equation. Bull. Cal. math, vol. 19, 1928, Pp. 151—.

(v) Did the Babylonians and Mayas of central American posses place value arithmethic notation ?
Bull. Cal. math. Soc. vol. 22. Pp. 99—.

(vi) The Elder Āryabhaṭa and the modern arithmetical notation. American mathematical monthly. vol. 34. 1927, Pp. 409—.

(vii) India's contribution to the theory of indeterminates equations of the first degree. Journal of the Indian mathematical. Soc. vol. 19, 1932, Pp. 110—120, 122—140, 113—161.

(viii) The Indian origin of the modern place value arithmetical notation, part 3. American mathematical monthly vol. 40, 1933. Pp 21

(ix) The Indian origin of the mordern place valu arithmetical notation, part-4, A. M. M., vol, 40, 1933. Pp. 154—

(x) Notes on Āryabhaṭa.
Journal of the Bihar and Orissa Research Soc. vol. 12, 1926. Pp-88—

- Iyer, R. Venkatachalam.
  Pātigaṇita and the Hindu Abacus. Mathematics Student. vol. 18, 1940. Pp. 79—82.

- Jain. B. S.
  On the Gaṇitasāra samgraha of Mahāvīra (c850AD)
  I. J. H. S. vol. 12, 1977.

- Jain B. S. and Ram Behari,
  Some mathematical contribution of ancient. Indian mathe matians as given in the works of Bhāskaracarya. I. J. H. S. vol. 12, 1977.

- Karpinski, L. C.

(i) Hindu numerals among the Arabs. Bible. Math. vol (13). 1912—13. Pp 27—98.

(ii) Hindu mumerals in the Fihrist.Bible Math. vol. 11. (3). 1910—1I. Pp. 121—124.

- Kamalamma, K. N.
  On the Slution of a problem on indeterminate equations in in Sulba Sutra. Bull. Cal. Math. Soc. vol. 40.1948.

- Kaye, G, R.

(i) A Brief Bibliography of Hindu mathematics.
Journal and proceedings of the Asiatic society of Bengal, New series vol. 7. 1911 Pp 679.

(ii) References of Indian mathematics in certain Mediaeval works. Journal and proceedings of the Asiatic Society vol. 7. new seris, 1911, Pp. 801.

(iii) The Bakhsali Manuscript. Journal and proceedings of the Asiatic society of Bengal vol. 8. 1912, Pp 347—.

(iv) Notes on Indian Mathematics. Journal and proceedings of the Asiatic socity of Bengal. vol. 4. New seriese. 1908, Pp—111—

(v) The use of Abacus in Ancient India. Journal and proceedings of the Asiatic society of Bengal. vol. 4. New serie. 1908, Pp 293.

(vi) Two Āryabhaṭas
Bibleotheca mathematica. vol. 10, 1910. Pp. 289—92.

- Kern, H :
  On some fragements of Āryabhaṭa. Journal of the Asiatic society of Great Britain and Ireland. vol. 20,(1863).

- Khan. M. S.
  Āryabhaṭa 1 and al Bīrūnī- I. J. H. S. vol. 12, 1977.

- Mazumder, N. K.
  (i) Manava. Sulva. Sutram. Journal of the deperment of letters. vol. 8, 1922.
  (ii) Āryabhaṭa's Rule in relation to Indeterminate equation of the first degree. Bull. Cal. Math. Soc. vol 3. 1911—1912, Pp. 11—19.
  (iii) On Chinese indeterminate Analysis ; Bull. Cal. Math. Soc. vol 3, 1911—1912.

- Majumdar, Paradip Kumar.
  (i) A Rationale of Bhāskara I's method for solving $ax+c=by$. I. J. H. S. vol 13. 1978, Pp 10—.
  (ii) Gaṇita Kaumudī and the continued fraction ; I. J. H. S. vol 13, 1978, Pp-1—.
  (iii) Crisis in mathematics, International Journal of mathematical education in Science and Technology, London 1978, no 9, vol 1, Pp 47—50.

- Misra, R. D :
  Positive Integral kinds of numbers according to Jain concept. The jain Antiquary. vol. 15. no-1, 1949, Pp 32—40.

- Mitra, N. B
  Remarks on Kaye's article, Modern Review, vol 18, June-Dec, 1915 Pp 506-508.

- Mukherjee, R. N :
  Backgraund to the discovery of the symbol for zero. I.J.H.S. vol 12, 1977.

- Richeson. A. W :

  The numbers system of the Mayas. American. Mathematical Monthly, vol. 40, 1933. Pp. 542.

- Sanjana, K. J.

  (i) A brief analysis of Bhāskara's Bījagaṇitam with historical and critical notes. Journal of the Indian Mathematical Society vol 18, 1929-30, Pp 176-188.

  (ii) Notes and Questions- Journal of the Indian Mathematical Society. vol 18, 1929, Pp 18-22.

  (iii) Notes and Question- Journal of Indian mathematical society vol. 12, 1029-30 Pp 225.

- Seidenberg, A.

  (i) The origin of Mathematics. Archive for History of exact sciences. vol 18, 1978. Pp 301-342.

  (ii) The Ritual origin of counting. Archive for History of exact sciences. vol 2, 1962 Pp 1-40.

  (iii) The Ritual origin of Geometry. Archive for History of exact sciences. vol 1, 1962. Pp 488-527· (অধ্যাপক সেইডেন বার্গ ওঁর প্রবন্ধগুলি আমাকে পাঠিয়েছিলেন এজন্য ওঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ).

- Saraswati, T. A.

  (i) Development of mathematical ideas in India. I. J. H. S. vol 4, 1969.

  (ii) Mahāvira's treatment of series. Journal of Ranchi university. vol 1, 1962, Pp 43—.

- Sengupta, P. C.

  (i) Āryabhaṭa's lost work. Bull. Cal. Math. Soc. vol 22, 1930. Pp. 115—.

  (ii) Āryabhaṭa, the father of Indian epicyclic Astronomy. Journal of the department of letters. vol 19. 1929. Pp 1-56.

  (iii) The Āryabhaṭiyam (Translation). Journal of the department of letters. vol 16, 1927, Pp 1-56.

  (iv) The origin of the Indian cyclic method for the solution of $Nx^2+1=y^2$. Bull. Cal. Math. Soc. vol 10, 1918-1919, Pp 7-80.

- Sen, S. N.

  Āryabhaṭa's Mathematics, Bulletin National Institute of Sciences of India, vol 21, 1963. Pp 297-319.

- Singh, A. N.

  (i) History of mathematies in India from Jain sources. The Jain Antiquary, vol. 16, 1950, Pp 34-69.

  (ii) On the Indian method of root extraction. Bull. Cal. Math. Soc. vol. 8, 1927. Pp 123—.

- Smith, D. E and Mourad Salih
  (i) The dust numerals among the ancient Arabs. American mathematical monthly. vol 34, 192, Pp. 358-300.
- Smith, D. E. and Ginsburg. T.
  (i) Rabi Ben Ezra and the Hindu Arabic problem, Amer math monthly, vol 25, 1918, Pp 99-108
  (ii) New light on our numerals ; Bull. Amer. Math. Soc. vol 23. 1917.
- Sukla, K S.
  S'rīdhara's rational solution of $Nx^2+1=y^2$. Ganita, vol 1, 1950

পত্রিকা (বাংলা)

সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ঃ

১। স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যা লিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটির উদ্ভাবনকাল, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৩ বর্ষ।

প্রদীপকুমার মজুমদার ঃ

১। প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি।
(এটি পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত)

২। গণিতে শব্দ সংখ্যা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২।১১।১৩৭৪।

৩। ভারতীয় জ্যামিতি শাস্ত্রে মহর্ষি বৌধায়ন, বিশ্ববাণী, ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

৪। প্রাচীন ব্যাবিলনের গণিতচর্চা—ইতিহাস, শ্রাবন-পৌষ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

বিভূতিভূষণ দত্ত ঃ

১। শব্দ সংখ্যা প্রণালী—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

২। অক্ষর সংখ্যা প্রণালী—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৬ বর্ষ।

৩। জ্যামিতি শাস্ত্রে প্রাচীন হিন্দুর নাম ও তাহার প্রসার—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ।

৪। নাম সংখ্যা—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ।

৫। জৈন সাহিত্যে নাম সংখ্যা—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ।

৬। অঙ্কানাং বামতো গতিঃ—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ।

৭। মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪১ বর্ষ।

৮। মহাভারতে স্থানীয় মান তত্ত্ব—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৩ বর্ষ।

৯। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বয়স—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৪৪, বর্ষ।

১০। দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবন কাল—সাহিত্য পয়িষদ পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ।

যোগেশচন্দ্র রায় (বিদ্যানিধি) ঃ

১। আঙ্কিক শব্দ—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৬ বর্ষ।

অঙ্ক ভাবনা—প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। লীলাবতীর কিছু বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু লেখকের নাম নেই।

গ্রন্থসমূহ

(প্রকাশকদের নাম এখানে উল্লেখ করা হোলো না। এজন্য গ্রন্থসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকাশকদের কাছে মার্জনা প্রার্থী।)

১। এম. আকবর আলি—বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ১ম ও ২য় খণ্ড।

২। বিনায়ক গণেশ আপটে—(সম্পাদক) ভাস্করীয় বীজগণিতম্।

৩। B. D. Apte—Kuṭṭakāra Śiromoṇi.

৪। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য—অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি।

৫। E. T. Bell—The Development of Mathematics.

৬। M. Bloomfield—The Atharvaveda and The Gopatha Brāhmaṇa.

৭। গ. ণ. বেরমান—মানুষ কি করে গুণতে শিখলো, (অনুবাদক—বিনয় মজুমদার)।

৮। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—সূর্য-সিদ্ধান্ত।

৯। D. M. Bose, S. N. Sen and B. V. Subbarayappa. A Coincise History of Sciences in India.

১০। Carl Boyer, History of Mathematics,

১১। Buhler—Indian Palaeography.

১২। A. C. Burnell—Elements of South Indian Palaeography.

১৩। Florian Cajori—The History of Mathematics.

১৪। " " —The History of Mathematical Notations Vol. 1, 2.

১৫। W. Caland—Bibliotheca Indica—Vol. 2.

১৬। শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—প্রাচীন মিশর।

১৭। " " —প্রাচীন প্যালেষ্টাইন।

১৮। " " —ইরাণের ইতিকথা।

১৯। " " —প্রাচীন ইরাক।

২০। Lord Chalmers (Editor)—The Majihima Nikāya.

২১। V. Gordon Childe—Man Makes Himself.

২২। " —What happened in the history.

২৩। রমেশচন্দ্র দত্ত—ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম ও ২য় খণ্ড)।

২৪। H. T. Colebrooke—Algebra with Arithmetic and Mensuration from Sanskrit of Brahmagupta and Bhaskara.

২৫। „ Līlavatī (English translation)
২৬। Bibhuti Bhusan Datta—Science of Sulba.
২৭। „ and A. N. Singh—The History of Hindu Mathematics. Vol. 1, 2.
২৮। L. E. Dickson, – History of theory of numbers.
২৯। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত—ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র।
৩০। Sudhākara Dvivedi—śiṣyadhi vrddhidah by Lalla.
৩১। „ —Gaṇaka Taraṅginī.
৩২। „ —Triśatika (of śrīdharācrya)
৩৩। „ —Mahā Siddhānta.
৩৪। „ —Bījagaṇita (of Bhāskara) Revised. by Muralidhar Jha.
৩৫। Padmākara Dvivedi—Gaṇita Kaumudī (of Nārāyaṇa)
৩৬। দুর্গাশঙ্কর—সভ্যতা ও ধর্মের ক্রমবিকাশ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।
৩৭। Benjamin Farrington—Greek Sciences.
৩৮। James Gow—A. Short History of Greek Mathematics.
৩৯। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস।
৪০। Ekendra Nath Ghosh—Studies of Rgvedic deities in their Astronomical and Meteorological consideration.
৪১। কুঞ্জবিহারী গোস্বামী – প্রাক ঐতিহাসিক মহেঞ্জোদাড়ো।
৪২। শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী—(অনুবাদক) শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা।
৪৩। „ „ „ — „ অথর্ববেদ সংহিতা।
৪৪। স্বামী গম্ভীরানন্দ—উপনিষদ গ্রন্থাবলী, ১—৩ খণ্ড।
৪৫। বেলাবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ—ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র।
৪৬। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ—আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব, (মূল আরবী থেকে অনূদিত)
৪৭। T. L. Heath—History of Greek Mathematics.
৪৮। T. L. Heath. Diaphantus of Alexandria.
৪৯। „ Aristercus of Samos.
৫০। A. F. Rudlof Hoernle –. The Bower Manuscript.
৫১। কাজী মোতাহার হোসেন—গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস।
৫২। Iran Society—Al Bīrūnī commemoratoin volume.
৫৩। L. C. Jain—Gaṇitasāra samgraha.
৫৪। J. L. Jain—The sacred books of the Jains. vol 1, 2.
৫৫। Muralidhara Jha—Siddhānta S'iromoṇi.
H. R. Kapadia (Editor)—Ganita Tilaka (of S'ripati)
৫৬। G R. Kaye (Editor) Bakhsali Manuscript.
৫৭। A. B. Keith—Introduction to the Taittiriya Samhita.
৫৮। H. Kern—(critically edited with Commentary Bhatdīpika of Paramis'rara). Āryabhaṭiya of Āryabhaṭa.

৫৯। দুর্গাদাস লাহিড়ী—পৃথিবীর ইতিহাস, ১—৮ খণ্ড।
৬০। Lacy O Leary—How Greek Science passed in Arabs.
৬১। James Legge—The Sacred books of China.
৬২। A. A. Macdonell—A History of Sanskrit Literature.
৬৩। Macdonell and Keith—Vedic Index (2 volumes).
৬৪। Mazumdar, Roychoudhuri and Datta—An Advnaced History of India.
৬৫। Mazumdar and Pusalkar—The vedic age. vol 1.
৬৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার—প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা।
৬৭। Henrietta Midonick—The Treasury of Mathematics. Vol. 1, 2.
৬৮। Yoshio Mikami.—The development of Mathematics in China and Japan.
৬৯। বাবুয়াজী মিশ্র (সম্পাদক) সিদ্ধান্ত শেখর (শ্রীপতি কৃত)।
৭০। রাজেন্দ্রলাল মিত্র—ললিত বিস্তার।
৭১। Mathematical Association of America (Publisher) The Rhind Mathematical Papyrus.
৭২। মহিউদ্দিন (অনুবাদক)—বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম) (জর্জ সার্টন মূল লেখক)
৭৩। R. K. Mukherjee—Hindu Civilisation.
৭৪। রাজমোহন নাথ—মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা।
৭৫। Joseph Needham—Science and Civilisation in china. Vol 3.
৭৬। O. Neugebaur.—The Exact Science in Autiquity.
৭৭। Stuart Piggot—Pre-historic India.
৭৮। শুরনাড কুঞ্জন পিল্লেই—আর্যভটীয়ম্ [(আর্যভটকৃত)—গার্গ্যকেরল নীলকণ্ঠ সোম সুত্ব বিরচিত ভাষ্যোপেতম্]
৭৯। T. G. Pinches and J. N. Strassmair—Late Babylonian Astronomical and related texts.
৮০। Satya Prakash and Ram Swarup Sarma—Apstamba Sulba Sutram.
৮১। Satya Prakash and Ram Swarup Sarma—Baudhayana Sulba Sutram.
৮২। Satya Prakash—Founders of Science in Ancient India.
৮৩। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, (১ম খণ্ড)
৮৪। Louis Renu—The Civilisation of anciant India.
৮৫। Ranga charya - Gaṇita Sāra Samgraha.
৬৮। যোগেশচন্দ্র রায়—আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ (১ম ও ২য় খণ্ড)
৮৭। W. W. Rouse Ball—A short account of the history of Mathematics.

৮৮। (শ্রী) রাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ—সিদ্ধান্ত শিরোমণি।
৮৯। (শ্রী) রাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ—বীজগণিতম্, (শ্রী ভাস্করাচার্য বিরচিতম্)।
৯০। (শ্রী) রাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ—লীলাবতী।
৯১। রাধাকৃষ্ণন,সর্বেপল্লী—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস।
৯২। E. C. Sachau—Albirunis India.
৯৩। A. S. Saidan—The Arithmetic of Al uqlidisi.
৯৪। R. N. Saha—The Origin of the alphabet and numerals
৯৫। K. V. Sarma—A history of Kerala School of Hindu Astronomy.
৯৬। G. Sarton, -Introduction to the History of Science (Three Volumes, five parts)
৯৭। K. V. Sharma (Edited', Āryabhaṭīya of Āryabhaṭa (with the commentary of Sūryadeva Yajvan)
৯৮। Benoy Kumar Sarker—Hindu civilisation in exact Sciences.
৯৯। রমাতোষ সরকার—প্রাচীন ভারতের গণিতচিন্তা।
১০০। Ram Swarup Sharma—Brahmaspuṭa Sidhanta.
১০১। Sambasiva Sastri—The Āryabhaṭīya (of Āryabhaṭa)
১০২। বিধুশেখর শাস্ত্রী—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১ম ও ২য় খণ্ড।
১০৩। বিধুশেখর শাস্ত্রী—মিলিন্দপঞহো।
১০৪। B. N. Seal—Positive Sciences of the Ancient India.
১০৫। অমূল্যচরণ সেন—অশোকলিপি।
১০৬। সমরেন্দ্রনাথ সেন—বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)
১০৭। Probodh Chandra Sengupta—Ancient Indian Chronology.
১০৮। P. C. Sengupta—The Khaṇda Khādyaka.
১০৯। Shama Sastri (Edited with translation and his com) Vedenga Jyautisa. of Lagadha.
১১০। K. S. Shukla—The Maha Bhāskarīya
১১১। K. S, Shukla—The Pāṭīgaṇita of S'rīdharācārya.
১১২। Kripa Shankar Shukla in collaboration with K. V. Sarma—Āryabhaṭiya of Āryabhaṭa—critically edited with introduction, English translation, Notes, Comments and Indexes
K. S. Shukla (critically edited with introduction and Appendices) Bhāskara I and Someśvara.

১১৩। বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী – সিদ্ধান্ত শিরোমণি।
১১৪। বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী—সিদ্ধান্ত শিরোমণি (গ্রহ গণিতাধ্যায়)
১১৫। বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী—সিদ্ধান্ত শিরোমণি (গোলধ্যায়)
১১৬। D. E. Smith—Histroy of Mathematics Vol. 1, 2
১১৭। " Rara Mathematics
১১৮। " and W. C. Karpinski—The Hindu Arabic numerals.
১১৯। T. S. Kuppanna Sāstri—Mahā Bhāskariya. of Bhāskaracārya (Critically Edited with introduction and Appendices)
১২০। অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পাদক)—যাস্কের নিরুক্ত, ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড।
১২১। পরিতোষ ঠাকুর (অনুবাদক ও সম্পাদক)—সামবেদ সংহিতা।
১২২। G Thibaut—On the Sulba.
১২৩। G Thibaut and Sudhakara Dvivedi—Pañcasdhantika.
১২৪। B. G. Tilak—The Arctic home in the vedas.
১২৫। H. W. Turnbull—The Great Mathematicians.
১২৬। Ganga Prashad Upadhyay—Satapath Brāhmaṇa,
১২৭। C. S. Upsak—The history of palaeopraphy of Muryan Brāhmi script.
১২৮। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ – প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য।
১২৯। Vander Warden—Science Awakening
১৩০। M. Wheeler—The Indas civitisation.
১৩১। Monier Monier Williams—A Sanskrit English Dictionary.
১৩২। M. Winternitz—A history of Indian literature.

নির্ঘণ্ট

শ্রীপ্রদীপ কুমার মজুমদার রচিত 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা, প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাসের উপর একটি মূল্যবান সংযোজন। তথ্যবহুল ও সুলিখিত এই গ্রন্থে গ্রন্থকার কর্তৃক তাঁর প্রায় সমস্ত বক্তব্যকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা লক্ষনীয়। আশাকরি সুধী সমাজে গ্রন্থখানি যোগ্য সমাদর লাভ করবে।

শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র চাকী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ গণিতের স্যার আশুতোষ জন্মশত বার্ষিকী অধ্যাপক ও বিশুদ্ধ গণিত বিভাগের প্রধান (অবসর প্রাপ্ত), প্রাক্তন সভাপতি গণিত শাখা, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস।

শ্রীপ্রদীপ কুমার মজুমদার সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃত গণিত গ্রন্থ মন্থন করে বঙ্গ সাহিত্য সরস্বতীর জন্য যে অর্ঘ রচনা করেছে তা সর্বথা অভিনন্দনযোগ্য। "প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা" গ্রন্থটি রচনা করে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় হাত দেওয়া হয়েছে বলে মনে করি। গ্রন্থটি পড়তে পড়তে সদা সর্বদা মনে হয়েছে যে এই প্রচেষ্টা সার্থক। যা ছিল বিশেষ পণ্ডিত গোষ্ঠীর, তাকে অনবচ্ছিন্নরূপে সর্ব সাধারণের আয়ত্ত গোচরে করবার যে প্রচেষ্টা, আশা করি বিদগ্ধ ও উৎসাহী পাঠক মহল তা সর্বান্তকরণে প্রশংসা করবেন। এও আশা করি গ্রন্থটি বিভিন্ন বিদগ্ধ সমাজে সঠিকভাবে প্রচার হবে এবং এর উৎকর্ষতা যথাযথভাবে প্রসার হবে।

ডঃ বিনয় কুমার লাহিড়ী, এম. এস. সি., পি, এইচ্, ডি,
ডি. এস. সি, এফ্. এন্. এ. এস্. সি,

প্রাক্তন ডীন ফাকাল্টি অব সায়েন্সেস, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান (গণিত) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে গণিত সম্ভবতঃ প্রাচীনতম শাস্ত্র। দৈনন্দিন জীবনে পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার পটভূমিকে মানুষ করে গাণিতিক ভাষায় প্রথম বিধৃত করেছিল, সে গবেষণা নৃতাত্ত্বিকের। কিন্তু সেই বিধৃতি ক্রমে নানান পরিস্থিতি এবং পর্যায়ে যে ভাবে বিকশিত হয়ে উঠলো, তার ইতিহাস তথাকথিত রোমাঞ্চকর কাহিনীকেও যেন ম্লান করে দেয়। 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা' এর জন্যেই সর্বশ্রেণীর পাঠক পাঠিকার মনে রেখাপাত করবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই ধরণের রচনা বাংলা ভাষায় এই প্রথম। এবং উপস্থাপনার দিক দিয়ে একটি বড় রকমের উত্তরণ। শ্রীপ্রদীপ কুমার মজুমদার এ ব্যাপারে পথিকৃত হয়ে রইলেন।

সমরজিৎ কর